স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে দুটি মুসলমান প্রধান জেলায় (মালদা-মুর্শিদাবাদ) সংখ্যাগুরু-উদ্বাস্তু সহাবস্থান, ১৯৪৭-৭১।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের অধীনে ডক্টরেট (Ph.D) উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

গবেষকঃ মোঃ নাসির আহমেদ

পি. এইচ. ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ A00HI0400819

রেজিস্ট্রেশনের তারিখঃ ২১/০৮/২০১৯

তত্ত্বাবধায়কঃ ড. উৎসা রায়

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৫

CERTIFIED THAT THE THESIS ENTITLED

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে দুটি মুসলমান প্রধান জেলায় (মালদা-মুর্শিদাবাদ) সংখ্যাগুরু-উদ্বাস্তু সহাবস্থান, ১৯৪৭-৭১ submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Utsa Ray, Assistant Professor, Department of History, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Utsa Ray

Supervisor:

Dated: 6/11/25

ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF HISTORY
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA - 700 032

Candidate: Md. Nasir Ahmed

Dated: 06.11.2025

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি আমার গবেষণার কাজ সম্পন্ন করার জন্য যাদের সহায়তা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি, তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষভাবে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়িকা ডঃ উৎসা রায়, যাঁর বিষয় জ্ঞান, মূল্যবান দিকনির্দেশনা ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। এ জন্য আমি তাঁর কাছে ভীষণভাবে ঋণী। শুরুর দিন থেকে আজও পর্যন্ত তাঁর মূল্যবান পরামর্শ এবং উৎসাহ আমার পাথেয়। বিভিন্ন সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে তার সহানুভূতিশীল পথ নির্দেশনা আমাকে ভীষণ ভাবে সাহায্য করেছে।

আমার শ্রদ্ধেয়া তত্ত্বাবধায়িকার পাশাপাশি গবেষণা উপদেষ্টা কমিটি (RAC)-এর সদস্যাদ্বয় শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ডঃ অনুরাধা রায় ও শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ডঃ সমর্পিতা মিত্র মহাশয়ার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। তাঁরা গবেষণার প্রতিটি ধাপে আমাকে সহায়তা করেছেন এবং চিন্তাকে শাণিত করেছেন। তাঁদের জ্ঞানগর্ভআলোচনা, উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য এবং সময়োপযোগী পরামর্শ গবেষণার কাজে আমার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সংশোধনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের প্রতি, বিশেষত শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা সুচেতনা চট্টোপাধ্যায় ও বিভাগীয় প্রধান শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা ব্যানার্জি, যাঁদের মূল্যবান পরামর্শ এবং উৎসাহ আমার গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। গবেষণার বিষয়ে প্রথম যিনি ধারণা দিয়েছিলেন শান্তিপুর কলেজের সেই সহকারী অধ্যাপক আমার পূর্বতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় বিমান সমাদ্দার স্যরের কথা স্মরণ না করলেই নয়। তার সস্নেহ পরামর্শ, সহায়তা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছে। বিশেষভাবে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই IDSK-এর সহকারী অধ্যাপিকা শ্রদ্ধেয়া অন্বেষা দি ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সূচিব্রত সেনের প্রতি। তাঁদের জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ ও আলোচনা আমার গবেষণায় সাহায্য করেছে। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ড. কামরান এম কে মন্ডলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সস্নেহ সাহচর্য, মূল্যবান পরামর্শ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান কার্যালয় সমূহের প্রতি গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন লেখক, লেখিকা ও সম্পাদক, সম্পাদিকাদের কাছ থেকেও আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপকার পেয়েছি।

অবসরপ্রাপ্ত উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মী মোঃ জামালউদ্দিন মহাশয়ের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তার বিশেষ সহায়তার জন্য। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে যারা বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন, তারা হলেন মহলন্দীর অমল হাওলাদার, প্রাক্তন এমপি প্রমথেশ মুখার্জি, মালদা জেলার উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা নন্দকিশোর রায়চৌধুরী।

আমি আমার সকল বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গবেষণাকর্মে অবদান রেখেছেন। তাঁদের আন্তরিকতা, নিরন্তর সমর্থন, উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ আমাকে এই দীর্ঘ যাত্রায় এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। আমার পরিচিত ও বন্ধু মহলের মধ্যে হাসিবুর রহমান, অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত, আলিমুজ্জামান ও তইদুল ইসলাম এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মোঃ মইদুর রহমান, আবু কালাম আজাদ, সুমিত কান্তি ঘোষের কথা আমি কখনো ভুলতে পারব না। তাদের সমর্থন এবং উৎসাহ আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সবশেষে আমার পরিবারের সদস্যদের আমার দুই দিদি খাদিজা, রাজিয়া, আমার দাদা হাসানকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, তাদের সকলের সমর্থনের জন্য। তাদের হাত ধরে পরিবারের কচিকাঁচা সদস্যরা, আতিফা, ইশান, আসিফা, ইসরাত, সাইফকে অনেক ভালবাসা, আমার কাজের মধ্যে একরাশ খুশি বয়ে আনার জন্য। আমি বিশেষ করে বলতে চাই আমার বাবা-মা ও বিয়ের পরে নতুন করে পাওয়া বাবা-মার কথা। তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা, যাদের ধৈর্য, আস্থা, উৎসাহ, অমূল্য সমর্থন ও প্রতিটি মুহূর্তের পাশে থাকা আমাকে পরম নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতার ছত্রছায়ায় এই কাজে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

আমার গবেষণার কাজে আনন্দ ও স্ফুর্তির নিরন্তর যোগানদাতা আমার বছর চারেকের ছেলে রায়হানের কথা না বললে সবকিছু অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই গবেষণা কার্য সমাপ্তির প্রতি তার তাগাদা 'আব্বু, তুমি কখন আসবে? তোমার চ্যাপ্টার কদ্দূর?' আমাকে প্রতিনিয়ত আমার কাজের প্রতি আরো সক্রিয় করে তুলেছে।

এই গবেষণার প্রতিটি ধাপে যার নিঃশব্দ উপস্থিতি, নিরন্তর সহায়তা এবং অগাধ ধৈর্য আমাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে, আমার জীবনসঙ্গিনী (রায়িসা) গবেষণার চিন্তায়, লেখালেখি ও অধ্যায়ের বিশ্লেষণে আমাকে প্রয়োজনীয় স্থিতি ও সহায়তা দিয়েছে।

উৎসর্গ

মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আশ্রয়গ্রহণকারী ছিন্নমূল মানুষদের স্মৃতিতে

সূচিপত্র

ভূমিকা.....1-40

প্রথম অধ্যায়ঃ দেশভাগ: প্রস্তুতি ও পরিণতিতে মালদা ও মুর্শিদাবাদ.....41-81

১.১ সলতে পাকানোঃ দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতা।

১.২ মালদা-মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তি নিয়ে টানাপোড়েন।

১.৩ চূড়ান্ত পরিণতিঃ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ।

১.৪ জনজীবনে র‍্যাডক্লিফ লাইনের দরুন নানা সমস্যা।

১.৫ মালদা ভাগের বলি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ উদ্বাসন, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন ও সরকারি মনোভাব: একটি প্রেক্ষাপট.....82-119

২.১ পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনের ধারা।

২.২ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে হিন্দুদের চলে আসার কারণ।

২.৩ উদ্বাস্তু সমস্যা; পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনে সরকারি নীতি-প্রতিক্রিয়া।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ উদ্বাসন, মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমন, ও তাদের জীবন সংগ্রাম.....120-173

৩.১ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কারণ।

৩.২ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ।

৩.৩ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন দশকে উদ্বাস্তু আগমনের পরিসংখ্যান।

৩.৪ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের জীবন-সংগ্রাম।

৩.৫ উদ্বাস্তু নারীদের জীবন সংগ্রাম।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পূনর্বাসন.....174-232

৪.১ মালদা ও মুর্শিদাবাদের উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা।

৪.২ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তুদের আশ্রয়গ্রহণ ও বসতি স্থাপন।

৪.৩ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও জীবনধারণের ধরন।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাব.....233-310

৫.১ মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের আর্থ-সামাজিক প্রভাব।

৫.২ মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের সাংস্কৃতিক প্রভাব।

৫.৩ উদ্বাস্তু আগমনের ফলে মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষা ও সাহিত্য জগতের উপর প্রভাব।

৫.৪ মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের ফলের ইতিহাস চর্চায় ও নতুন পরিভাষার জন্মঃ সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সম্পর্কের সমীকরণ।

৫.৫ মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের রাজনৈতিক প্রভাব।

উপসংহার.....311-316

পরিশিষ্ট.....317-339

উপাদান.....340-361

চিত্র ও সারণির সূচি

মানচিত্রঃ

১.১ মুসলিম লীগ দ্বারা প্রস্তাবিত বৃহত্তর পূর্ববঙ্গ.....45
১.২ হিন্দু মহাসভা এবং নিউ বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ.....46
১.৩ কংগ্রেস দ্বারা প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ.....47
১.৪ বিভিন্ন মতাবলম্বী কংগ্রেস দ্বারা প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ.....53
১.৫ বাউন্ডারি কমিশন দ্বারা চিহ্নিত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চুড়ান্ত সীমারেখা.....55
১.৬ বিভাজন-পরবর্তী মালদা জেলা.....56
১.৭ বিভাগ-পরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলা.....56
৩.১ বাউন্ডারি কমিশন দ্বারা চিহ্নিত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চুড়ান্ত সীমারেখা.....138

চিত্রঃ

২.১ রাজাকার, আল শামস এবং আলবাদর বাহিনীদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের সময় হত্যাকাণ্ড.....99
৩.১ মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কারণ.....134
৩.২ "মাকে পথে ফেলে রেখে যাবো না".....156
৩.৩ নৌকা ও ট্রেন বোঝাই করে শরণার্থীদের ঢল.....157
৩.৪ শিয়ালদা স্টেশনের করুন চিত্র.....157
৩.৫ দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে উদ্বাস্তুদের হয়রানির চিত্র.....159
৪.১ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সম্প্রদায়ভিত্তিক বন্টন.....198
৪.২ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির থানাভিত্তিক বন্টন.....199
৪.৩ পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবার ও চাষযোগ্য জমির বন্টন.....207
৪.৪ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পরিবারগুলির পেশাভিত্তিক বণ্টন.....208

সারণিঃ

২.১ ১৯৪৬-৭০ পর্যন্ত কাল-পর্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা.....85
২.২ ১৬-ই জানুয়ারি, ১৯৫১-এর আগে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগত হিন্দুদের জনসংখ্যার বন্টন (শতাংশে).....88
৩.১ নদীয়ার একটা গ্রামের উদ্বাস্তুরা কেন পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছিল (লক্ষ্য হিসেবে).....135
৩.২ ১৯০১-১৯৫১ পর্যন্ত প্রতি দশকে মালদা জেলার জনসংখ্যার শতকরা পরিবর্তন.....141
৩.৩ ১৯০১-১৯৫১ সালে রাজ্য থেকে এবং রাজ্যের বাইরে মালদায় অভিবাসন এবং দেশত্যাগ.....141

৩.৪ ১৯৫১-৭১ পর্যন্ত বিভিন্ন দশকে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমন.....143
৩.৫ ১৯৪৬-৫১ পর্যন্ত প্রতিটি বছরে মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা.....144
৩.৬ ১৯৪৬-৫১ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা.....145
৩.৭ ১৯৪৬-৫১ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা.....147
৩.৮ ১৯৪৬-৫১ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা.....148
৩.৯ ১৯৬১ সালে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা.....149
৩.১০ ১৯৬১ সালে জনগণনা অনুযায়ী মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তুদের এই দুই জুলায় অবস্থানকাল.....150
৩.১১ মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের জনসংখ্যার পরিবর্তন.....151
৩.১২ ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মালদা, মুর্শিদাবাদ ও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সংখ্যা.....152
৩.১৩ ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুদের এই দুই জেলায় অবস্থানকাল....153
৩.১৪ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়া উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা (১৭-ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালের হিসাব).....154
৩.১৫ ১৯৭১-এ মালদা, মুশিদাবাদ জেলা ও পশ্চিমবঙ্গে মোট উদ্বাস্তুসংখ্যা.....154
৪.১ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আসা অভিবাসী.....175
৪.২ সরকার অনুমোদিত কলোনি.....185
৪.৩ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সরকারি ক্যাম্প, হোম ও কলোনিগুলিতে অবস্থানকারী ও এগুলির বাইরে অবস্থানকারী উদ্বাস্তু সংখ্যা.....186
৪.৪ মালদা ও মুশিদাবাদ জেলা বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনিসমূহ.....189
৪.৫ ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মালদার বিভিন্ন থানায় আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তু সংখ্যা.....193
৪.৬ ১৯৫১ জনগণনা অনুসারে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা.....194
৪.৭ ১৯৫৫ পর্যন্ত মালদা জেলার বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে আগত উদ্বাস্তু জনসংখ্যা এবং উদ্বাস্তু পরিবার সংখ্যা.....194
৪.৮ ১৯৫১ পর্যন্ত মালদা জেলার উদ্বাস্তুদের জন্য বিভিন্ন স্কিম.....196
৪.৯ ১৯৫১ জনগণনা অনুসারে মুর্শিদাবাদে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা.....200
৪.১০ ১৯৫৫ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে আগত উদ্বাস্তু জনসংখ্যা এবং উদ্বাস্তু পরিবার সংখ্যা.....201
৪.১১ মুর্শিদাবাদ জেলায় বারুজীবী কলোনিগুলিতে প্রয়োজনীয় সেচ পরিষেবা ব্যবস্থা.....204
৪.১২ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বারুজীবী ও কৃষিজীবী পরিবারের জনসংখ্যা.....205
৪.১৩ ১৯৫৫ সালে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি সাধারণ আর্থিক অবস্থা.....209
৪.১৪ ১৯৫৫ সালের সরকারি ক্যাম্পের বাইরে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির আবাস অবস্থা.....210

৪.১৫ ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মালদা জেলার উদ্বাস্তু ও তাদের ওপর নির্ভরশীল সদস্যদের সংখ্যা.....211
৪.১৬ ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকারি ক্যাম্পের বাইরে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সংখ্যা.....212
৪.১৭ ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মালদা জেলার উদ্বাস্তুদের সংখ্যা.....213
৪.১৮ ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মালদা জেলার উদ্বাস্তুদের সংখ্যা.....214
৪.১৯ ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তু ও তাদের ওপর নির্ভরশীল সদস্যদের সংখ্যা.....215
৪.২০ ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুদের সংখ্যা.....217
৪.২১ ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুদের সংখ্যা.....218
৪.২২ ১৯৬১ এবং ১৯৭১-এর জনগণনা অনুসারে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত উদ্বাস্তুদের তুলনামূলক সারণি.....220
৪.২৩ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিভিন্ন জীবিকায় নারী-পুরুষ অনুপাত.....229
৪.২৪ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার শহরাঞ্চলে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিভিন্ন জীবিকায় নারী-পুরুষ অনুপাত.....230
৫.১ মালদা জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি জনসংখ্যার দশকীয় পরিবর্তন.....235
৫.২ মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি জনসংখ্যার দশকীয় পরিবর্তন.....236
৫.৩ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার শহরগুলির জনসংখ্যার দশকীয় পরিবর্তন.....238
৫.৪ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম ও শহরে বিভিন্ন দশকে উদ্বাস্তু জনসংখ্যা.....239
৫.৫ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তু জনগণ ও স্থানীয়দের মধ্যে শহরে বাস করার প্রবণতা.....240
৫.৬ ১৯৬৪-৭০ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন ধরণের চালের ফলন.....248
৫.৭ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানীয় ও উদ্বাস্তু জনগণের মধ্যে শিক্ষার হারের তুলনা.....269
৫.৮ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানীয় ও উদ্বাস্তু মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার.....274
৫.৯ মালদা জেলায় লোকসভা নির্বাচন সমূহের ফলাফল.....285
৫.১০ মালদা জেলায় বিধানসভা নির্বাচন সমূহের ফলাফল.....286
৫.১১ মুর্শিদাবাদ জেলায় লোকসভা নির্বাচন সমূহের ফলাফল.....296
৫.১২ মুর্শিদাবাদ জেলায় লোকসভা নির্বাচন সমূহের ফলাফল.....298-99

ভূমিকা

একটা বাঁশের আড় পার হতে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম "এই যে বর্ডার!"
আমার ছোট্ট মেয়ে (গীতা) চেঁচিয়ে বলল "বাবা, বর্ডার কই?"
বললাম "ওই তো"।[1]

বাঁশের আড়ের দিকে চোখ রেখে চার-পাঁচ বছরের শিশু কন্যার চামড়ার চোখ হয়তো বর্ডার কি তা অনুধাবন করতে চেয়েছিল। প্রাপ্তবয়স্ক, পরিণতমনস্ক কিছু মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত সিদ্ধান্তের জেরে একই ভূখণ্ড কি করে একটা বাঁশের আড়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় শৈশবের ওই কাঁচা মগজ তার কিনারা করতে পারেনা। উপরের সংলাপগুলি কোনো গল্প, উপন্যাস বা কোনো চলচ্চিত্রের দুটি চরিত্রের মুখে বসানো সংলাপ নয়, বরং তা একেবারে নির্ভেজাল বাস্তব। উক্ত ঘটনাটি ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত (তখনো বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেনি) নড়াইল গ্রামের বাস্তুত্যাগী শরণার্থী দলের কয়েকদিন যাবৎ হাঁটার পর ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমানা পার করার ঘটনা। প্রশ্নকারী শিশুটি নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক প্রফেসর নবকৃষ্ণ বিশ্বাসের কণিষ্ঠা কন্যা। যে বর্ডারের খোঁজে ৭৩ বছরের বৃদ্ধ বাবাকে কাঁধে করে নিয়ে কয়েকদিন ধরে দিনরাত এক করে পায়ে হেঁটে নিজের গ্রাম নড়াইল থেকে পশ্চিমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, যে বর্ডারে এসে পৌঁছে তাদের দলটির "ওই যে বর্ডার, ওই যে বর্ডার" বলে উল্লাস, উচ্ছ্বাস সেই বর্ডারে এসেই ছোট্ট গীতার ওই প্রশ্ন। বর্ডার কী, কেন এই প্রশ্নে অতলন্ত পাথারে উত্তর খুঁজে ফেরে শিশুমন। নদী, বাতাস, পাখি এদের মতোই নিষ্পাপ ছোট্ট শিশুর কাছেও বর্ডারের অর্থ জানা নেই। এই ঘটনায় কারো কারো মনে পড়বে লেখক, পরিচালক জ্যোতি প্রকাশ দত্তের হিন্দি চলচ্চিত্র 'রিফিউজি'তে ব্যবহৃত জাভেদ আক্তার রচিত গানটি,-

"পানছি নাদিয়া পাওয়ানকে ঝোঁকে
কোয়ি সারহাদ না ইনহে রোকে...."

এই ঘটনার প্রায় দু-দশক আগে বাংলা থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরত্বে ভারত ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানাও এমনি এক বাস্তবের সাক্ষী হয়ে থেকে ছিল। লক্ষৌ-এর গুলাম আলি ছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির হাবিলদার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার পোস্টিং হয় রাওয়ালপিন্ডির কাছে চাকলালাতে। দেশভাগের আবহে চারিদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে, তিনি পারিবারিক বাসভূমিতে ফিরতে চাইলেও ফিরতে পারেন না, এবং তাঁকে বাধ্য করা হয় নবগঠিত পাক সৈন্যবাহিনীতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। ১৯৫০ সালে, এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কারিগর (artificial limb fitter) কে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তাকে পাক-সীমান্তবর্তী খোকরাপুরে নিয়ে আসা হয় এবং ভারতীয় ভূখণ্ডে 'জোর করে ঠেলে দেওয়া' হয় যেহেতু তিনি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু চেকপোস্টের ভারতীয় পুলিশ অনুমতিপত্র ছাড়া প্রবেশের কারণে গুলাম আলিকে গ্রেফতার করে এবং জেলখানায় বন্দী করে রাখে। অবশেষে 'পাকিস্তানি' হিসেবে তাকে

[1] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* (উত্তর ২৪ পরগণাঃ লিপিকা-বিশ্বাস, ২০১২), পৃ. ৪০।

পুনরায় পাকিস্তানেই চালান করে দেওয়া হয়। একজন পরিচয়হীন ব্যক্তি হিসেবে গুলাম আলি কোর্টে পাকিস্তানি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করলে ১৯৫৬ সালে তাঁকে ভারতীয় নাগরিক বলে ঘোষণা করা হয়, যদিও তিনি তখনো ভারতীয় নাগরিকত্ব পাননি। শেষ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানি পাসপোর্ট কিনে ভারতে প্রবেশ করেন এবং লক্ষ্ণৌ-এ তাঁর পরিবারের কাছে এসে পৌঁছান। লখনউ-এ তাঁর ভাইয়ের সহায়তায় তিনি এবার ভারতীয় পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন। এবারেও উত্তরপ্রদেশ আঞ্চলিক সরকার ১৯৫৭ সালে তাঁকে ভারত ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়, তিনি ওয়াঘা সীমান্তে ভারতীয় পুলিশের দ্বারা প্রত্যর্পিত হন কিন্তু সীমান্তের 'ওপারে' তাঁকে ভারতীয় ভেবে গ্রেফতার করা হয় এবং লাহোরের 'হিন্দু' ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়। ১৯৫৯ সালে তিনি 'Indian high commission'-এর কাছে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করলে সেখানে শুধুমাত্র ১৬-ই জুন ১৯৬০ থেকে ৭-ই জুলাই ১৯৬০ পর্যন্ত (মাত্র ২২ দিনের জন্য) ভারতে আসার অনুমতি পান। কিন্তু তার ওপর নজরদারি চালাতে থাকে পুলিশ প্রশাসন। পরে তিনি আবার ভারতে স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করেন কিন্তু অনুমতি পাননি।[2]

গুলাম আলি একজন দেশহীন লোক হিসেবেই থেকে যান যেহেতু ভারতীয় ও পাকিস্তানি প্রশাসন তাঁকে শাটলকক বানিয়ে ব্যাডমিন্টন খেললেন এবং শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করেই সীমান্ত নামক এক অদৃশ্য নেটের উপর দিয়ে তাঁকে ফেরত পাঠাতে থাকেন। আইনি জটিলতার ফাঁদে গুলাম আলী জিরোবার জায়গাটুকু পর্যন্ত পান না। বাসবী ফ্রেসারের ব্যাখ্যায় "পিতৃপুরুষের পরিচয় দাবি করা বা পারিবারিক স্মৃতি ও সাহচর্যগুলো যেন বিলাসিতা, তাই যেন সে সব মনের ভেতরে স্থান দেওয়া বা দাবি করার অনুমতি দেওয়া হল না"।[3] দেশভাগের ঘটনায় একজন পদস্থ সরকারি সেনাবাহিনীর কর্মীর যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমজনতার অবস্থা কিছুটা হলেও অনুমেয়। এরকম আরও কিছু করুণ জীবন বৃত্তান্ত ধরা পড়ে 'গরম হওয়া' 'টোবা টেক সিং', 'মহানগর' 'অশনি সংকেত' 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রের চরিত্র চিত্রণে। টোবা টেক সিং, নীরা, অনিতারা যাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই বাস্তব প্রতিরূপদের যাদের প্রত্যেকের জীবন দেশভাগের বিপর্যয়ের সাক্ষ্য বহন করে।

উদ্বাস্তু প্রসঙ্গঃ

উপরের ঘটনা দুটি উদ্বাস্তু জীবনের জটিলতা ও টানাপোড়েনের চিত্র তুলে ধরে। ভারতীয় উপমহাদেশে যে বিশেষ কারণে একসময় উদ্বাস্তু শব্দটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল তা হল ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। হঠাৎ একটিমাত্র সিদ্ধান্তে কিছু মানুষ রাতারাতি নিজেদের ভুল দেশে আবিষ্কার করেন। যে সিদ্ধান্ত কেড়ে নেয় তাদের আজন্ম পরিচিত জাতীয় পরিচয়। "নিজের দেশটা কি রাতারাতি অন্যের দেশ হয়ে যায় নাকি, হতে পারে কখনো?"

---

[2] Vazira Fazila-Yacoobali Zamindar, *The Long Partition and the Making of Modern South Asia: Refugees, Boundaries,* (New York: Columbia University Press, 2007), pp. 1-4.

[3] Bashabi Fraser (ed.), *Bengal Partition Stories: An Unclosed Chapter,* (London, Anthem Press, 2008).

পুত্রের কাছে বৃদ্ধ পিতার এই প্রশ্নের কোনো উত্তর থাকে না।[4] কিন্তু ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাজনের সাম্প্রদায়িক আবহ 'অপর' সম্প্রদায়ের মনে অস্বস্তিকর নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব জন্ম দেয়। পূর্বের জাতীয় পরিচয় আর বর্তমানের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের মধ্যে বিস্তার ব্যবধান বিরাজ করে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার তীব্রতা ও ব্যাপকতা অনুসারে কেউ প্রাণ বাঁচাতে কেউ বা এই ব্যবধান ঘোচাতে দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। অভিবাসন করেন অন্য দেশে। আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে শেকড় উপড়ে আসা এই সকল মানুষের পরিচয় হয় 'বাস্তুচ্যুত', 'উদ্বাস্তু', 'বিস্থাপিত' বা 'অভিবাসী'। বাস্তহারা এ সকল মানুষেরা যে দেশের শরণার্থী হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই দেশের প্রশাসন এই সকল পরিচয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে থাকেন এবং তাদের নাগরিকত্ব, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু আইনের এই সকল প্রটোকলের বাইরে একটি উদ্বাস্তু জীবন তার আশা-আকাঙ্ক্ষার জায়গা থেকে যে সমস্যাগুলি মোকাবিলা করে তা বর্ণনার অতীত।

কান্তি বি.পাকরাশি এই উদ্বাস্তু সমস্যাকে 'The biggest and complicated of all the problems' অর্থাৎ সবচেয়ে বড়ো ও জটিলতম সমস্যা বলে অভিহিত করেছেন। ১৯৪৮-১৯৪৯ সালের এর মধ্যে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলি উদ্বাস্তু জনগণের ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল, যারা নিরাপত্তাহীনতা ও বঞ্চনার স্থানে ফিরে যেতে চাননি।[5] প্রাচীনকাল থেকে উদ্বাস্তু বা শরনার্থী মানব ইতিহাসের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে থাকে।[6] এরিক হবসবম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৈরি হওয়া উদ্বাস্তু বা শরণার্থী সমস্যাকে বিশ্বব্যাপী মানবিক বিপর্যয় বলে উল্লেখিত করেছেন।[7]

পশ্চিমা বিশ্বে উদ্বাস্তুর আবির্ভাব ঘটেছিল বিংশ শতকের প্রথমদিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে শুধুমাত্র ইউরোপেই ৬০ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, তাদের নতুন পরিচয় হয়েছিল 'Displaced Person' বা 'বাস্তুচ্যুত'। সেই সময়ে প্রায় সমগ্র বিশ্বে 'ডিসপ্লেসমেন্ট' বা 'বাস্তুচ্যুতি' একটা Phenomenon বা ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। পৃথিবীর বুকে ধ্বংসাত্মক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মহাদেশ ও রাষ্ট্রগুলি নতুনভাবে পুনরুদ্ধার ও পুনঃর্গঠিত শুরু হচ্ছিল। তার পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যার স্থানান্তর ঘটেছিল। কোথাও আবার

---

[4] শঙ্খ ঘোষ, সুপারিবনের সারি, (কলকাতাঃ অরুণা প্রকাশনী, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯০), পৃ. ৬৪-৬৫।

[5] Kranti B. Prakashi, *The Uprooted: A Sociological Study of the Refugees of West Bengal,* (Calcutta: Editions India, 1971), pp. 21 & 42.

[6] Ian Talbot and Gurharpal Singh (ed.*), Regional and Partition: Bengal, Punjab and the Partition of the Subcontinent,* (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 325.

[7] Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991,* (London: Abacus, 1995), pp. 49-53.

পরিকল্পিতভাবে জনগণের স্থানান্তরের পেছনে রাজনৈতিক কৌশল ছিল।[8] ঐতিহাসিকরা দক্ষিণ এশিয়ার পার্টিশনের সঙ্গে ইউরোপীয় আদর্শের যোগসূত্র সন্ধানের চেষ্টা করেন। কারণ তখন ইউরোপীয় দেশগুলোতে ডিসপ্লেসমেন্ট এর ধারা দেখা যায়। যেমন জার্মানদের পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া এবং হাঙ্গেরিতে অভিবাসন, যা কিনা ১৯৪৫ পটাশডাম কনফারেন্সে Big three-র এই ট্রান্সফারের সিদ্ধান্তে সম্মতি দেওয়ার ফল।[9]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিক থেকে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের কারণে উদ্বাস্তুদের উৎপত্তি ঘটতে দেখা যায় এবং সমসাময়িক দক্ষিণ এশিয়াতেও দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। সব্যসাচী বসু রায় তাঁর "দক্ষিণ এশিয়ার উদ্বাস্তু সমস্যা" শীর্ষক এক বক্তৃতায় বলেছেন মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে থাকে মূলত তিনটি কারণে প্রথমত, সংঘাতের কারণে। ধর্মীয় সংঘাত, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, জাতিগত, সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব, গণহত্যা প্রভৃতি হতে পারে। যার বড় উদাহরণ বর্তমানে সিরিয়া, শ্রীলঙ্কার, মায়ানমার, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশগুলিতে দেখা যায়। সিরিয়াতে গৃহযুদ্ধের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। শ্রীলঙ্কাতেও গৃহযুদ্ধের কারণে বহু শরণার্থী দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয় নেয়। শ্রীলঙ্কা ছিল ব্রিটিশদের Model Colony। তাই অনেকে আশা করেছিল যে শ্রীলঙ্কা Model Democratic রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠবে। কিন্তু তা হয়নি, উল্টে গৃহযুদ্ধের কারণে শ্রীলঙ্কার বহু শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। মায়ানমারেও যা ঘটেছে তা নিছক পরিকল্পিত গণহত্যা। ফলে লক্ষ লক্ষ মায়ানমারবাসীরা উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমানে মায়ানমারদের সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। তারা নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে। এখানেই তাদের সমস্যা থেমে থাকেনি, বরং তারা আরো বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছে সেখানে শরণার্থী হিসাবেও গণ্য হয়নি। বাংলাদেশের কক্সবাজারে চলে আসা এইরকম প্রায় ১০ লক্ষ মায়ানমারবাসী শরণার্থীর মর্যাদা না পাওয়ায় আজকে তারা 'নেই রাজ্যের বাসিন্দা'য় পরিণত হয়েছেন। না তারা নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারছে, না তারা তাদের সাময়িক আশ্রয়স্থলে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছে। দ্বিতীয়তঃ উন্নয়নমূলক কারণ, যে কোনো উন্নয়নমূলক কারণ হতে পারে। যেমন- রাস্তাঘাট নির্মাণ, ব্যারেজ নির্মাণ বা বড় কোনো কনস্ট্রাকশন প্রভৃতি। তৃতীয়তঃ পরিবেশগত কারণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আছড়ে পড়ে যার ফলে বহু মানুষ ঘরছাড়া হয়ে বাস্তুহারা বা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। যেমন বাংলার ক্ষেত্রে দেখা গেছে আইলা, আম্ফান, সুনামি, ভূমিকম্প প্রভৃতি কারণে মানুষ ঘরছাড়া হয়েছিল। সব্যসাচী বসু রায় আরো বলেছেন

[8] উদাহরণস্বরূপ ইয়াসমিন খান তাঁর গ্রন্থে বলেছেন চিন দেশে ৯০ মিলিয়ন মানুষকে অভ্যন্তরীণ পুনঃস্থাপন করা হয়েছিল। ইউরোপের ৭ মিলিয়ন মানুষ ডিসপ্লেসড বা স্থানচ্যুত হয়েছিলেন। পূর্বাঞ্চল ও মধ্য ইউরোপ থেকে প্রায় ১২-১৩ মিলিয়ন জার্মানি বিতাড়িত হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে সাড়ে আট লক্ষ স্থানচ্যুত মানুষ ইউরোপের উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন পোলস, চেক, ল্যাটভিয়ান্স, লিথুয়ানিয়ান্স এবং ইউক্রেনিয়ন্সরা। Yasmin Khari, *The Great Partition: The Making of India and Pakistan,* (London: Yale University Press, 2007), p. xxi.

[9] *Ibid,* p. xxii.

উপনিবেশিক ভারতের বিভাজন হওয়ার পরও Passport entry act in India 1920, Registration foreigner act 1939 প্রভৃতি আইনগুলি বলবৎ ছিল। এই আইনগুলি প্রযোজ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতে যখন কোনো বিদেশবাসী আসত সেই ক্ষেত্রে, কিন্তু দেশভাগের পর ভারত বা ভারতীয় উপমহাদেশেরই মানুষ যারা উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে ও ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নেয় তাদের আগমনের সময়ও এই আইনগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। যার ফলে নতুন করে উদ্বাস্তুর উৎপত্তি হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ায় উদ্বাস্তু সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে।[10]

বর্তমান গবেষণায় উদ্বাস্তু সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে উদ্বাস্তু কারা অর্থাৎ উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা এবং উদ্বাস্তু হওয়ার শর্ত ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা থাকা আবশ্যিক।

চিত্র-১ নতুন শুরুর যাত্রায় শেষ ট্রেন ধরার লড়াই।



(Partition Horrors Remembrance Day, 14 August 2021, Govternment of India, p. 42.)

উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা ও শর্তঃ

কেলার উদ্বাস্তুদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন '..a man whose roots have been torn out of the soil of his traditional life..' অর্থাৎ, এমন একজন মানুষ যার শিকড় তার ঐতিহ্যবাহী জীবনের মাটি থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে।"[11] ভারতে উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা ও অর্থ

[10] আন্তর্জাতিক বক্তৃতা "দক্ষিণ এশিয়ার উদ্বাস্তু সমস্যা", ৬-ই সেপ্টেম্বর, ২০২০, https://www.youtube.com/watch?v=AEqpyJhJQo8, Last access on 09/10/2025.

[11] Stephen L. Keller, *Uprooting and Social Change: The Role of Refugees in Development,* (New Delhi: Manohar Book Service, 1975).

বদলে যেতে থাকে, আবার সময় ও স্থানভেদে বদলে যায় তাদের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম ও নীতিমালা, তাদের বরাদ্দ, যা উদ্বাস্তু সমস্যাকে কারো জটিল করে তোলে। ১৯৫১ সালে ইউ.এন সম্মেলনে উদ্বাস্তু নির্ধারণের জন্য একটা সংজ্ঞা তৈরি হয়েছিল। তা হল,-

"A refugee is a person owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it."[12]

আবার যখন পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যাপক হারে উদ্বাস্তুরা আসতে শুরু করল তখন ভারত সরকার তাদেরকে 'ডিসপ্লেসড' বা 'বাস্তুচ্যুত' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করছিলেন। তা হল,-

"A displaced person is one who had entered India (who left or who was compelled to leave his home in East Pakistan on or after October 15, 1947) for disturbances or fear of such disturbances or on account of setting up of the two dominions of India and Pakistan."

এরপরে আরও তিনটি ধারা যোগ হয়।

ক) পূর্ব বাংলার বাসিন্দা ছিলেন, কিন্তু পয়লা অক্টোবর ১৯৪৬-এর পর সেখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দরুন পূর্ব বাংলা ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫০ বা তার আগে;
(খ) উপরন্তু, পশ্চিম বাংলায় তিনি কোনো জমির মালিক নন; এবং
(গ) যিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষর কার্যালয়ে হলফনামা জমা দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে তিনি আর পূর্ব বাংলায় ফিরে যাবেন না।[13]

প্রথম সংজ্ঞাটি ছিল সংকীর্ণ ও ইউরোপকেন্দ্রিক এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু আগমনের বছরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। কেননা ১৯৫০ সালের পরেও পূর্ববঙ্গের বহু মানুষ বাংলায় আসতে থাকে। এই বিষয়ে ড. বিধানচন্দ্র রায় এক নতুন দিকে আলোকপাত করেন— "কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে 'উদ্বাস্তু' অভিধাটির অর্থ একটু বিশেষ ধরণের। কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনায় উদ্বাস্তু হল তারাই যারা বড়ো আকারের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দরুন তাঁদের ঘরবাড়ি থেকে বিস্থাপিত হয়েছেন।"[14] মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যেসমস্ত হিন্দু বাঙালি 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার', তাঁরাই হলেন বিস্থাপিত। এখানে 'উদ্বাস্তু' শব্দের পরিবর্তে শব্দটি 'বিস্থাপিত' ব্যবহার করলেন। তাহলে এখানে যেসব হিন্দু সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার স্বীকার না হয়েও পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তারা কোথায় যাবেন? যার ফলে বিস্থাপিত শব্দটি ব্যবহার করে উদ্বাস্তু বিষয়টি

[12] Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, UNHCR.

[13] The Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land Act, 1951, West Bengal Act XVI of 1951, Govt. of West Bengal; *Manual of Refugee Relief and Rehabilitation, vol-1,* (Kolkata: Govt. of West Bengal, 2001). P. 49.

[14] দ্য স্টেটস্ম্যান, ২৫ জানুয়ারি ১৯৫০; অভিজিৎ দাশগুপ্ত, বিস্থাপন ও নির্বাসন ভারতের রাষ্ট্র উদ্বাস্তু, পৃ. ২০-২১।

আরো জটিল আকার ধারণ করেছিল। পরবর্তীকালে আবার 'উদ্বাস্তু' (Refugee), 'বিস্থাপিত' (Displaced), 'দেশ-নিষ্ক্রান্ত' (Evacuee) শব্দগুলির পরিবর্তে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা 'অভিবাসী' (Migrant) বলে উল্লেখ করতে লাগলেন।

দেশভাগ পরবর্তীকালে আগত অভিবাসীদের প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ হল- (ক) ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়কালে আগত উদ্বাস্তুদের "Old migrants" বা "পুরনো অভিবাসী" এবং (খ) ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে আগত উদ্বাস্তুদের "New migrants" বা "নতুন অভিবাসী" নামে অভিহিত করা হয়।[15] সরকারি সংজ্ঞাগুলির মধ্যে উদ্বাস্তুদের নিয়ে স্পষ্ট সংজ্ঞার অভাব দেখা দেয়, যার ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা আজও বিরাজমান। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী অজিত প্রসাদ জৈন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, এতকাল পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের কোনো সংজ্ঞা না থাকায় পুনর্বাসন ব্যাপারে বহু জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তাই একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। সাহায্য ও পুনর্বাসন পাওয়ার অধিকারী উদ্বাস্তু বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হবে যিনি সাধারণত যে অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অথবা গোলযোগের জন্য বা ভয়ে ওইসব অঞ্চল থেকে ১৯৪৭ সালের ১-লা জুন তারিখ থেকে ১৯৫৪ সালের ৩১-শে ডিসেম্বরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আসতে পেরেছিলেন। তবে এর বেশ কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছিল। শর্তগুলিঃ—

ক) নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার ক্ষেত্রে ১৯৪৬ সালের ১-লা অক্টোবর।
খ) উদ্বাস্তু পরিবারের গৃহস্বামী যদি উদ্বাস্তু না হন তবে সেই পরিবারের কোনো ব্যক্তিকে উদ্বাস্তু ধরা হবে না।

তবে এতে কিছু শিথিলতা ছিল। যেমন সাহায্য ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ত্রাণ কমিশনার বা জেলার পুনর্বাসন কমিশনার ন্যায্য বলে মনে করে, তবে সেই সব ব্যক্তিরা সাহায্য বা পুনর্বাসন পাবেন। এখানে আরো বলা হয় যে পাকিস্থানে ঘরবাড়ি সব হারিয়েছে বা ভারতে কোনো কিছু নেই বা কারো কোনো সাহায্য পায়নি তারাও পাবেন। এর পাশাপাশি উদ্বাস্তু কারা হবে তার প্রমাণ হিসেবে তাদের পরিচয় পত্র নির্ধারণ করা হয়ঃ—

ক) ১৯৫১ সালের জনগণনায় যাদেরকে উদ্বাস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে।
খ) যাদের ১৯৫১ সালের মার্চ থেকে ১৯৫২ সালের ১৬ই অক্টোবর এর মধ্যে বর্ডার স্লিপ আছে।
গ) যারা ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবরের পর এসেছেন এবং ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আসতে পারে তাদের ক্ষেত্রে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট লাগবে।
ঘ) যাদের বর্ডার স্লিপ বা সার্টিফিকেট বা ১৯৫১ সালের জনগণনায় উদ্বাস্তু বলে ঘোষণা নেই তাদের এফিডেভিটের মাধ্যমে পুনর্বাসন কমিশনার বা জেলার পুনর্বাসন অফিসার ব্যতীত তাদের উদ্বাস্তু নয় বলে ঘোষণা করিতে পারে।[16]

উপরে উল্লেখিত শর্তগুলো থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। যদি কোনো ব্যক্তি ১৯৫১ সালের জনগণনায় নিজেকে উদ্বাস্তু হিসেবে নথিভুক্ত করতে না পারেন, বা কোনো ব্যক্তি বর্ডার স্লিপ না পেয়ে থাকেন বা পেলেও তা

[15] *Manual of Refugee Relief and Rehabilitation, vol-1,* (Kolkata: Govt. of West Bengal, 2001), p. 1.
[16] *যুগান্তর পত্রিকা,* ১৬-ই জুলাই ১৯৫৪ সাল।

হারিয়ে যায় বা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট না থাকে সেক্ষেত্রে পুনর্বাসন অফিসার তাদের উদ্বাস্তু নয় বলে চিহ্নিত করতে পারবেন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন থেকে তারা বঞ্চিত হবেন। অতএব উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে উদ্বাস্তু 'কে' বা 'কারা' এ নিয়ে সরকার ও জনতার মধ্যে বহু বিতর্ক থেকে গিয়েছিল। রাবিন্দর কৌর যেমন বলেছেন, পার্টিশনের পর 'উদ্বাস্তু' শব্দটি সাধারণভাবে গৃহহীনতা ও নিরাপত্তাহীনতার প্রতীক হলেও এটি প্রশাসনিকভাবে পূর্ণ আইনি সংজ্ঞা পায়নি। উদ্বাস্তু পরিচয় নিবন্ধনের মাধ্যমে নির্ধারিত হত, যেখানে নাম, নিবন্ধন নম্বর ও আগমনের তারিখ সম্বলিত উদ্বাস্তু কার্ড জারি হত। এই কার্ড রেশন কার্ড, আশ্রয়, শিক্ষা ও চাকরির জন্য অপরিহার্য ছিল।[17]

কোনো একটি স্থানে শরণার্থী বা উদ্বাস্তু আগমনে সেই স্থানের শাসকবর্গ এবং সেই সমস্ত শরণার্থী উভয় পক্ষকেই যে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয় তা হল উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষের চরম দুই প্রান্তে অবস্থিত দুটি প্রদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও সংস্কৃতিক বৈপরীত্য যেমন ছিল তেমনি এই দুই প্রদেশের সাম্প্রদায়িকতা, দাঙ্গা, হিংসা, অসহিষ্ণুতার পারদেও পার্থক্য ছিল। পাঞ্জাবের সহিংসতা ছিল চরম এবং জেনোসাইড সদৃশ, যেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল ও লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল। কারণ পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং সশস্ত্র গ্রুপের যেমন শিখ ও মুসলিম লীগের প্রভাব বেশি ছিল। যার কারণে পাঞ্জাব প্রদেশ প্রায় এক থেকে দুই মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ১৪.৫ মিলিয়ন মানুষের বাস্তুচ্যুতি এবং প্রায় এক লক্ষ নারী অপহরণের সাক্ষী থাকে।[18] বিপরীতে বাংলায় সহিংসতার মাত্রা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিংসা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। ১৯৪৬ সালে কলকাতা দাঙ্গা ও নোয়াখালী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল, যা বাংলার ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়, কিন্তু তবুও ঐতিহাসিকদের মতে তা পাঞ্জাবের মতো গণহত্যার স্তরে পৌঁছায়নি। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় ৫৩ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল।[19] পাঞ্জাবের সহিংসতা প্রত্যক্ষ শারীরিক আঘাত হেনেছিল এবং তাৎক্ষণিক ছিল, যা প্রাদেশিক রাজনীতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (হিন্দু, মুসলিম, শিখ) পারস্পরিক বিরোধিতার কারণে উদ্ভূত; বিপরীতে বাংলায় এই সহিংসতা যতটা দৃশ্যমান শারীরিক আঘাতে পরিলক্ষিত হয়েছিল তার চেয়েও বেশি ছিল মানসিক এবং সামাজিক, যা দীর্ঘমেয়াদী ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। হডসন যেমন বলেছেন, পূর্ব পাঞ্জাবে দাঙ্গার ভয়াবহতা এতটা ছিল যে একদিকে যখন ভারত পাকিস্তান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় একদল শিখ বাহিনী মুসলিম মহিলাদের ধরে ধরে ধর্ষণ করেছে, অপহরণ করছে,

---

[17] Ravinder Kaur, "Distinctive Citizenship: Refugees, Subjects and Post-colonial State in India's Partition", *Cultural and Social History*, 6(4), 2009), pp. 429-46.

[18] Andrew J. Major, 'The chief Sufferers': Abduction of women during the Partition of Punjab, *South Asia, Vol. XVIII*, Special Issue, (1995), pp. 57-72; Prashant, Bharadwaj and Others 'The Big March: Migratory Flows after the Partition of India', *Economic and Political Weekly,* (August 30, 2008).

[19] Pran Nath Luthra : *Rehabilitation,* (Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India: New Delhi, 1972), 18-19.

নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরাচ্ছে, হত্যা করছে ও পুড়িয়ে দিচ্ছে। আবার বর্ডারের উল্টো দিকে পশ্চিম পাঞ্জাবে একদল মুসলিম শিখদের গুরুদ্বার পুড়িয়ে দিচ্ছে, নারীদের ধর্ষণ করছে, অসংখ্য শিখদের হত্যা করে মৃতস্তূপে পরিণত করেছে।[20] আবার ইয়াসমিন খানের ব্যাখ্যা দুটি রাষ্ট্রই অনিবার্যভাবে সংঘটিত সহিংসতার প্রিজমের মাধ্যমে একে অপরকে দেখেছিল এবং বিচ্ছিন্ন পাঞ্জাবের বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে সতর্ক দৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি তাকিয়েছিল।[21]

দ্বিতীয়তঃ পাঞ্জাবের সহিংসতার তীব্রতা গণ-স্থানান্তরকে খুব দ্রুতগতির, স্বল্পমেয়াদি, ব্যাপকতর ও উভয়মুখী প্রক্রিয়ায় পরিণত করেছিল। পাঞ্জাব প্রদেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাত্র ৪২ দিনে সাড়ে ৮ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং এই অঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ বিনিময় হয়েছিল।[22] পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে হিন্দু-শিখরা ভারতে চলে এসেছিল এবং ভারতের মুসলিমরা পশ্চিম-পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। ইতিহাসে 'Big March' নামে পরিচিত এই ঘটনা পশ্চিম-পাঞ্জাব থেকে ৬.৩১ শতাংশ জনসংখ্যা স্থানান্তরিত করেছিল।[23] উল্টোদিকে বাংলার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু আগমন ছিল দীর্ঘমেয়াদী, ধীরগতি, ধাপে ধাপে সংগঠিত হওয়া একটি নিরবচ্ছিন্ন ও প্রধানত একমুখী একটি প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে সীমানা অতিক্রমকারী মানুষের সংখ্যাও কখনোই পাঞ্জাবের মত ব্যাপক রূপ ধারণ করেনি, যদিও সর্বোপরি লক্ষ লক্ষ মানুষ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন।

শুধুমাত্র সহিংসতা ও গণ-স্থানান্তরই নয়, এই দুই প্রদেশে আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ পাঞ্জাব ও বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার দুই ধরনের নীতি অবলম্বন করেছিল। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (১৯৪৭-১৯৫০) সীমাবদ্ধ থাকায় এবং সেখানে গন-স্থানান্তর উভয়মুখী হওয়ায় পরিকল্পিতভাবে এই সমস্যার সমাধানের প্রয়াস করা হয়েছিল। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে এই প্রয়াস ছিল 'Population Exchange' বা জন বিনিময় যা পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে সহজ হয়েছিল এবং অনেকাংশেই একটা সমাধানের আশা জাগিয়ে ছিল। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের দীর্ঘমেয়াদী, একমুখী (পশ্চিমমুখী) স্রোতের কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বলে দেওয়া সহজ হয় যে এখানে জন বিনিময় অপ্রযোজ্য। পাশাপাশি উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করে নিজের নিজের দেশে ফিরে যাওয়া ও বসবাসের জন্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে যে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব-

---

[20] H. V. Hodson, *The Great Divive: Britain-India-Pakista,* (London: Hutchinson & Co, 1969), p. 403.

[21] Yasmin Khari, *The Great Partition,* p. 142.

[22] Ritu Menon and Kamla Bhasin, Recovery, Rupture, Resistance: Indian State and Abduction of Women during Partition, *Economic and Political Weekly,* Apr. 24, 1993.

[23] Prashant, Bharadwaj and Others 'The Big March: Migratory Flows after the Partition of India', *Economic and Political Weekly,* (August 30, 2008).

পাকিস্তানে চলে যাওয়া বহু উদ্বাস্তু পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করলেও পাকিস্তানে এই চুক্তির বাস্তবায়নের অসারতা সমসংখ্যক বিপরীত প্রত্যাবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি, ফলে সেক্ষেত্রেও জন বিনিময়ের সমীকরণ ব্যর্থ হয়।

কিন্তু এই সমস্ত অ-নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয়গুলি ছাড়াও বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতের দুই প্রদেশে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাত দুষ্ট মনোভাব ও আচরণের মতো নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়গুলি পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়।[24] পাঞ্জাবে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি মাথাপিছু বরাদ্দের তুলনায় বাংলায় আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি মাথাপিছু বরাদ্দের স্বল্পতার সমালোচনা করে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় ও তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর জহরলাল নেহেরুর মধ্যে চিঠি আদান প্রদান পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈমাত্রিকসুলভ মনোভাবকেই প্রকাশ করে।[25] হডসনের লেখাও একই দিকে ইঙ্গিত করে। পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য মুসলিমদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ এবং বিভিন্ন পুনর্বাসনের জন্য নীতি প্রয়োগ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র কিছু ঋণ প্রদান করে পরবর্তীকালে সেগুলোকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে মুকুব করে দেওয়া ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের মতো কোনো নীতি গ্রহণ করেননি।[26] শুধু তাই নয়, জয়া চ্যাটার্জির অভিমত অনুসারে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের দেশ ছেড়ে চলে আসার কারণ সঠিকভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা না করে উদ্বাস্তুদের প্রতি তার দায় এড়াতে চেয়েছিল। বাংলার উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারি নীতি ছিল: উদ্বাস্তুদের সাময়িক ত্রাণ দেওয়া, দেশ ছেড়ে আসার ব্যাপারে ভীষণভাবে নিরুৎসাহিত করা, যারা এসেছে তাদের ফিরে যেতে উৎসাহিত করা, শর্তসাপেক্ষে প্রকৃত উদ্বাস্তু চিহ্নিত করা এবং পুনর্বাসনের জন্য তাদের বাংলার বাইরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো।[27] অথচ "তারা স্বেচ্ছায় তাদের ঘর বাড়ি ছেড়ে আসেননি বা নতুন দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে নিজেদের দেখেননি...যাকে তারা নিজেদের জমি, নিজেদের বাস্তুভিটে, নিজেদের ঘর ভাবতে শিখেছিলেন, তারা আসতে চাননি সেই জায়গা ছেড়ে"।[28]

আবার তাই ইয়ং তান ও জ্ঞানেশ কুদাসিয়া পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে একটা অন্য বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, দেশভাগের বহু আগে থেকে পাঞ্জাবিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করেছে। কারণ ব্রিটিশ ভারতে অনেক পাঞ্জাবিরা আর্মিতে কাজ করতেন। কাজের সূত্রে তাদের ভারতের বাইরে সিঙ্গাপুর, হংকং

---

[24] Joya Chatterji, *The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-67*, (Cambridge University Press, 2007); প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩)।

[25] Saroj Chakrabarty, *With Dr. B. C. Roy and other Chief Ministers: A Record up to 1962,* (Calcutta: Benson's, 1974).

[26] H. V. Hodson, *The Great Divide,* p. 403.

[27] Joya Chatterji, *Partition's Legacies,* (Delhi: Suny Press, 2021), pp. 310-54.

[28] Alok Bhalla, *Partition Dialogues: Memories of a Lost Home,* (New Delhi: Oxford University Press, 2006), p. 4.

এবং আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হতো। যার ফলে শিখদের একটা বড় অংশ ছিল ভারতের বাইরে। কাজেই ১৯৪৭ সালে যখন দেশভাগ হল তখন তাদের ভারতের বাইরে যোগাযোগ অনেকাংশে কাজে লেগেছিল। দেশভাগের সময়ের হিংসাপূর্ণ পরিস্থিতিতে শিখ সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে গিয়ে সাফল্যের সাথে নতুন করে জীবন যাপন শুরু করতে পেরেছিলেন।[29] কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো অভিবাসনের কথা জানতে পারা যায় না। বাংলায় উদ্বাস্তুরা হয় নিজেদের ক্ষমতায় তাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছে না হয় তারা সরকারি সাহায্য পেয়েছে। যার কারণে সরকারি পরিকল্পনা অনুসারে তাদের অনেককে আন্দামান নিকোবর, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের দণ্ডকারণ্যে যেতে হয়েছিল।

পশ্চিমা বিশ্বের গবেষকদের কথায় উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিরাট হাতিয়ার। উদ্বাস্তু সমস্যাকে কোন চোখে দেখা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করছে সেই সমস্যার সমাধানে সফলতার বিষয়টিও। ফিনল্যান্ডের গবেষিকা Liisa H. Malkki রিফিউজি শিবিরগুলিকে অন্যভাবে দেখার কথা বলেছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে রিফিউজি শিবিরগুলিকে শুধুমাত্র 'Place of Refuge' হিসেবে দেখলে হবে না, সেগুলিকে দেখা উচিত 'Devise of Power' হিসেবে।[30] ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলায় উপযুক্ত পরিকল্পনা ও পরিকাঠামোর অভাব দেখা যায়। বাংলার উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিয়ালদা স্টেশনে রিফিউজি ক্যাম্পগুলিতে একদিকে জীবন্ত মানুষের নিত্যকর্ম অন্যদিকে মৃত মানুষের লাশের পাশাপাশি সহাবস্থান, রাতের অন্ধকারে শিশুর কান্নার আর্তনাদ, যুবতী নারীদের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অসহায় অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করে, বিভিন্ন প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে দেহ ব্যবসায় জড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি বহুবিধ ঘটনার নিদারুণ করুন চিত্র।[31] জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন পুরানা কিলা-র ক্যাম্পের মুসলিম রিফিউজিদের অবস্থা হিন্দু ক্যাম্পের অবস্থার চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল। কারণ হিসেবে তিনি অপর্যাপ্ত পরিমাণের ত্রাণ বিতরণের কথা উল্লেখ করেছেন।"[32] দিল্লিতে যখন ব্যাপক আকারে দাঙ্গা বাধাতে শুরু করল তখন দিল্লির মুসলিমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পুরানা কিলা, জামা মসজিদ প্রভৃতি জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে কলেরা, অনাহার প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের জীবন ধারণ করতে হয়েছিল।[33] Liisa H. Malkki তার যুক্তির স্বপক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ Post-war ইউরোপের প্রসঙ্গ টেনে উল্লেখ করেছেন যে, ইউরোপ মহাদেশে উদ্বাস্তু পরিচালনাকারীরা উদ্বাস্তুদের বিষয়টি শুধুমাত্র

---

[29] Tan Tai Yong and Gyanesh Kudaisya, *The Aftermath of Partition in South Asia,* (London and New York: Routledge, 2000), pp. 225-31.

[30] Liisa H Malkki, "Refugees and Exile: From Refugee Studies to the National Order of Things." *Annual Review of Anthropology*, no. 24, 1995, pp. 495–523.

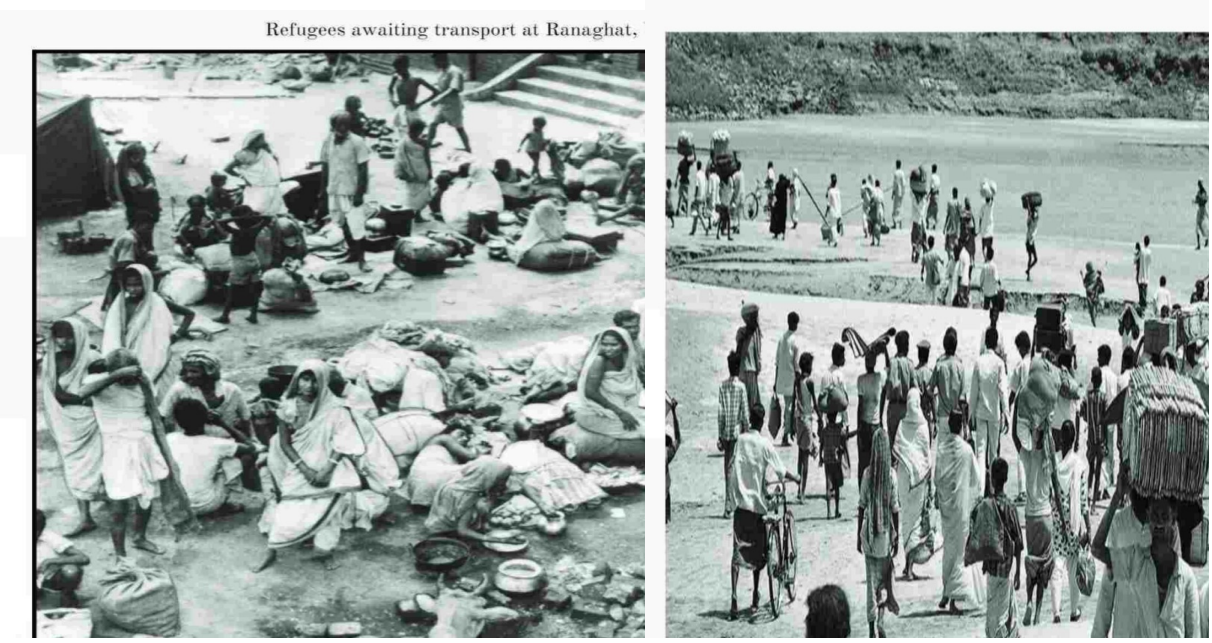
[31] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব।*

[32] Gyanendra Panday, Partition and Independence in Delhi, 1947-48, *Economic and Political Weekly, 1997,* pp. 2261-72.

[33] Yacoobali Zamindar, *The Long Partition,* pp. 34-39.

মানবিকতার নজরেই দেখে নি বরং তাদেরকে দেখা হয়েছিল সামরিক সমস্যা রূপেও। জার্মানিতে যে সমস্ত রাজনৈতিক, সামরিক ক্যাম্পগুলি ছিল সেগুলিকে উদ্বাস্তু শিবিরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন উদ্বাস্তু শিবিরগুলিকে পরিদর্শনযোগ্য করে, প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক দক্ষতায় শিবিরের বন্দীদের শ্রেণিকরণ, পৃথকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[34]

চিত্র-২ উদ্বাস্তু জীবনের দুর্দশার চিত্র (বামে- রানাঘাটে অপেক্ষমাণ উদ্বাস্তুরা, ডানে- শরণার্থীদের ঢল)



(Partition Horrors Remembrance Day, 14 August 2021, Govternment of India, pp. 10 & 19.)

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু ইতিহাস চর্চায় 'প্যারাডাইম শিফট', স্মৃতির ব্যবহারঃ

আধুনিক ইতিহাস লেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রাষ্ট্র, জাতি এবং ইতিহাসের মধ্যে গভীর সম্পর্ক, যা সাধারণত প্রচার করা হয় না। বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের ইতিহাসের পথ, প্রেক্ষাপট এবং গতিপ্রকৃতি ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানির ইতিহাসে উনিশ শতকে এক ভাষা, এক জাতির সন্ধানে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের পর হলোকাস্টের প্রভাবে জার্মান ইতিহাস লেখা বদলে যায়, যেখানে দায়িত্ব ও অপরাধবোধ নিয়ে বিতর্ক দুটি জাতিগোষ্ঠী (জার্মান ও ইহুদি) গঠন করে। ফ্রান্সের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক তথা যুক্তিবাদী জাতীয়তাবাদের উপর জোর দেওয়া হয়, যেখানে অঞ্চলের মানুষ, স্বাধীনতা এবং সমতার ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্স নিজেকে রাষ্ট্রের সৃষ্ট একটি দেশ হিসেবে দেখে, যেখান থেকে জাতি তৈরি হয়, আর জার্মানি নিজেকে ভাষা ও বংশের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই উপনিবেশিক শোষণের ভূমিকা উপেক্ষা করা হয়।

[34] Malkki, Liisa H, Refugees and Exile, pp. 495–523.

ইতিহাসকে স্বাভাবিক, স্বয়ংক্রিয় এবং স্বাধীন বিকাশ হিসেবে দেখানো হয়, যা বিশ্ব পুঁজিবাদ বা ইউরোপীয় আধিপত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত।[35]

দেশভাগের দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ইতিহাস চর্চা চলতে থাকে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস তাই উপনিবেশবাদের বিরোধী এবং সমালোচনামূলক। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, দেশভাগের জন্য কে কতটা দায়ী তাই ছিল তখনকার ইতিহাস রচনার মূল প্রতিপাদ্য। কিন্তু পরবর্তী দশকগুলোতে দেশভাগের ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যাকে বলা যায় প্যারাডাইম শিফট। দেশভাগের ইতিহাস চর্চায় স্থান পেল দেশভাগের পরবর্তী সময়ে কি হল সেই সব ঘটনা। দেশভাগের কারণ থেকে সরে দেশভাগের পরিণতির দিকে সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিপাত দেশভাগের ইতিহাস রচনায় নবযুগের সূচনা করল। ডেভিড গিলমার্টিন খুব সুন্দর ভাবে এই দুই ধরনের ইতিহাস লেখার ভঙ্গিকে “High Politics” বা "উচ্চ রাজনীতি” (যা স্থানীয় জীবনের দৈনন্দিন রাজনীতি থেকে সম্পুর্ন বিচ্ছিন্ন) এবং “History from below” বা “নিম্ন স্তরের ইতিহাস” বলে উল্লেখ করেছেন। তার কথায় “ভারতভাগের নাটকীয়তা মূলত কেন্দ্রীভূত হয়েছে কয়েকজন ব্যক্তির উপর, যারা কোটি কোটি নীরব মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলেন।[36] মুশিরুল হাসান যথার্থই বলেছেন, "দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এর আগে কখনো এত কম সংখ্যক মানুষ এত বেশি মানুষকে বিভক্ত করেনি"।[37]

পরের দিকে দেশভাগের ইতিহাসকে বোঝার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতার কাহিনী একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। কারণ, ঐতিহাসিকদের মতে, ‘’এ যাবৎ পরস্পরের প্রতি কাদা ছোড়াছুড়ি, এক ষড়যন্ত্রের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষতিই করেছে’’।[38] এতদিন পর্যন্ত ইতিহাসের বইগুলো রাজনৈতিক আলোচনা বা "উচ্চ রাজনীতি"র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বহনকারীদের বয়ানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে ভারতভাগের গভীর এবং বেদনাদায়ক প্রভাব তুলে ধরার চেষ্টা শুরু হয়। সাধারণ মানুষ—যারা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কোনো অংশ ছিল না—তারা ভারতভাগের ফলে সহিংসতা, উৎপাটন এবং ক্ষতির মধ্যে পড়েছিল। তাদের কাহিনীগুলোতে হতাশা এবং বিভ্রান্তির মিলিত একটি সাধারণ অনুভূতি ছিল, — মানুষ বুঝতে পারেনি কেন এবং কীভাবে তাদের জীবন এমনভাবে বিপর্যস্ত হল। কিন্তু এই ঘটনাগুলোতে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে ভারতভাগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার কোনো চিত্র ফুটে ওঠে না। ফলে, উচ্চপর্যায়ের

---

[35] Gyanendra Pandey, Memory, History, and the Question of Violence: Reflections on the Reconstruction of Partition, (*Calcutta: Centre For Studies in Social Sciences*), pp.46-48.

[36] David Gilmartin, ‘Partition, Pakistan, and South Asian History: In Search of a Narrative,’ *Journal of Asian Studies, 57.* no. 4, Nov 1998.

[37] Mushirul Hasan, *Introduction to India's Partition: Process, Strategy, Mobilization*, (Delhi: Oxford University Press, 1994), p. 43.

[38] Tan Tai Yong and Gyanesh Kudaisya, *The Aftermath of Partition in South Asia,* p. 8.

রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্যে একটি গভীর বিচ্ছেদ দেখা যায়, যা দেশভাগের ইতিহাস রচনায় নতুনভাবে উঠে আসছিল। জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে এই দুই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য করেন,- 'ঐতিহাসিকদের ইতিহাস' যা বিভাজনকে শুধু সাংবিধানিক ব্যবস্থা মনে করে, এবং 'জীবিতদের স্মৃতি' যা এটিকে সম্প্রদায়ের ভাঙন এবং পুনর্গঠন হিসেবে দেখে।[39] জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে তাঁর প্রবন্ধে সাবল্টার্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৪৭ দেশভাগের ইতিহাস পুনর্লিখনের জন্য আহ্বান জানান।

তবে আরো পরে দেশভাগের ইতিহাস রচনায় এল আরো এক পরিবর্তন। এতদিন ইতিহাস চর্চায় দেশভাগের ফলে মানুষ যে হিংসার শিকার হয়েছেন কেবলমাত্র সে কথাই গুরত্ব পেত, কিন্তু এই প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসে, হিংসায় শিকার হওয়ার পরেও তারা কিভাবে পুনর্জীবিত হয়েছিলেন তার কাহিনীও এবার ইতিহাস চর্চায় নিজের জায়গা করে নিল। এই ধরনের গবেষণাগুলি ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের রাজনীতির বাইরে গিয়ে তার পরবর্তী সময়কালের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির দিকে আলোকপাত করেছে। স্থান পেয়েছে, পুনর্বাসন নীতি ও তা নিয়ে টানাপোড়েনের বিতর্ক, ন্যায্য অধিকারের দাবিতে উদ্বাস্তু আন্দোলন এবং সংগ্রামের দ্বারা নিজেদের অধিকার আদায়ের মধ্যে দিয়ে কিভাবে উদ্বাস্তুরা খুঁজে পেয়েছেন নতুন পরিচয়, এই সমস্ত বিষয়। এই নতুন ধরনের ইতিহাস চর্চায় উদ্বাস্তুদের শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় ভুক্তভোগী হিসেবে নয়, বরং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছে। ১৯৮০-র দশকে দেশভাগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটা উন্নয়নশীল ধারা পরিলক্ষিত হয়। এই সময় জাতীয় স্তরের ইতিহাস চর্চার কাজ আঞ্চলিক স্তরে বিস্তার লাভ করে।[40]

আরো পরের দিকে দেশভাগের ইতিহাসে পুরুষকেন্দ্রিক লেখালেখির ঊর্ধ্বে উঠে লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনার কাজ শুরু হল। পুরুষতান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে দেশভাগে মহিলাদের জীবনের কাহিনী উঠে আসতে শুরু করল। আজন্ম পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার লড়াইটা মোটেও সহজ ছিল না। সেই লড়াই এ যাদের কথা খুব কম পাওয়া যায়, অথচ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভাজনে সবচেয়ে বেশি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তারা হলেন মহিলারা। প্রথমদিকে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদদের চিন্তাধারায় 'উচ্চ-রাজনীতি'র (high politics) বিভাজনের ইতিহাস প্রাধান্য পাওয়ার কারণে মহিলাদের দুর্দশার কথা দীর্ঘদিন ধরে দেশভাগের ইতিহাসের আলোচনার বাইরে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই ট্র্যাজেডির 'মানবিক' দিকের ওপর জোর দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিলে মহিলাদের অভিজ্ঞতা অবশেষে বিভাজনের ইতিহাসে যথাযথ স্থান পায়। সর্বপ্রথম ঊর্বশী বুটালিয়া ও পরবর্তীকালে ঋতু মেনন, ইয়াসমিন খান, ইয়াকুব আলী

---

[39] Pandey, Gyanendra : *Remembering Partition,* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

[40] Tan Tai Yong and Gyanesh Kudaisya, *The Aftermath of Partition in South Asia,* (London and New York: Routledge, 2000). P. 8.

জমিনদার, অনিতা ইন্দর সিংদের রচনায় মূলত পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু নারীদের দুর্দশার করুণ কাহিনী, তাদের উপর হওয়া অত্যাচারগুলির কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সেই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাতেও দেশভাগের ইতিহাস রচনায় মহিলাদের অবস্থান তুলে ধরার কাজ শুরু হয় যশোধরা বাগচী, শুভরঞ্জন দাশগুপ্তের হাত ধরে।

আরো পরে গার্গী চক্রবর্তী, জয়ন্তী মৈত্র কাঞ্জিলাল, নীলা দত্ত কিংবা পল্লবী চক্রবর্তীর লেখায় এই ধারা অনুসৃত হয় তবে এক্ষেত্রেও বিভাজনের পটভূমিতে মহিলাদের ইতিহাস তুলে ধরার দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এদের লেখায় দেশভাগে লাঞ্ছিত, অপহৃত, ধর্ষিত মহিলাদের করুণ কাহিনীর পাশাপাশি তাদের সংগ্রাম ও স্বনির্ভরতার কাহিনীও উঠে আসতে লাগল। কর্মক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে লেখালেখি দেশভাগ ও উদ্বাস্তু ইতিহাস চর্চায় আরো এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করল।

ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৭৫-৭৬ বছর আগে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছেন,- শুধুমাত্র রাজা, রাষ্ট্র, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ, রাজসভা নয় বরং এর বাইরে নানা বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণির "শিল্পী-মানপ-ব্যাপারী-বণিক-ক্ষেত্রকর" "চণ্ডাল পর্যন্ত যে অকীর্তিত জনসাধারণ" তাদের কথা, তাদের "দৈনন্দিন সুখদুঃখের, জীবনসমস্যার, নিজের বৃত্তি-সংপৃক্ত নানা প্রশ্নের এবং সাফল্য-অসাফল্যের প্রকাশ ও পরিচয়" ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করে। "বাঙালীর ইতিহাস" রচনার উপাদানের অনুসন্ধানে ইতিহাসের যুক্তি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য,-

"আমাদের দেশে ইতিহাসালোচনায় এই সমাজ-তাত্ত্বিক দৃষ্টি ও আলোচনাপদ্ধতি আজও পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে নাই"। "রাজ-কাহিনী এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকাহিনী আজও আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণা ও আলোচনার একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে"। কারণ "ইতিহাসের কোন যুক্তি, কার্যকারণসম্বন্ধের কোনও ব্যাখ্যা বা ইঙ্গিত এই ইতিহাস-পরিকল্পনার পশ্চাতে নাই"। "মানুষের সমাজই মানুষের সর্বপ্রকার কর্ম'কৃতির উৎস, এবং সেই সমাজের বিবর্তন-আবর্তনের ইতিহাস দেশকালধৃত মানব-ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে"। তাহার একটি কর্ম অন্য আর একটি কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে দেখা ও পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না-একটি কর্মের সঙ্গে অপরাপর কর্মকে যুক্ত করিয়া দেখিলে তবে তাহার সম্পূর্ণ রূপ ও প্রকৃতি দৃষ্টি-গোচর হয়। দেশকালধৃত মানুষের সমাজ সম্বন্ধেও এ কথা সত্য এবং সর্বত্র স্বীকৃত। এই সত্য স্বীকৃতি না পাইলে ইতিহাস যথার্থ ইতিহাস হয়ে উঠিতে পারে না"।[41]

তাই পরবর্তীকালে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই নিম্নস্তরের ইতিহাস, লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণ বা ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে ইতিহাস রচনার যে ধারার সূচনা হয়েছিল তাতে জীবনী, আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ, মৌখিক ইতিহাস, সাক্ষাৎকার, স্মৃতি প্রভৃতি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠল।

দীপেশ চক্রবর্তী তার প্রবন্ধে উল্লেখ করছেন যে, "Memory is a complex phenomenon that reaches out far beyond what normally constitutes an historian's archive" ঐতিহাসিকের মহাফেজখানা (যেমন নথি, দলিল বা পুঁথি) সাধারণত কাগজ-কলমের উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়। কিন্তু memory বা 'স্মৃতি' বহুদূর বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক। স্মৃতি মানুষের মনের মধ্যে বেঁচে থাকা অভিজ্ঞতা, যা ঘটনা, আবেগ আর

[41] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব,* (কলকাতাঃ লেখক-সমবায়-সমিতি, বৈশাখ ১৩৫৯), পৃ. ২-৩।

ছবির মাধ্যমে ইতিহাসকে জীবন্ত করে। তিনি স্মৃতির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেন, "মানুষ কি মনে করতে চায়, কথাটা তা নিয়ে নয়। কথাটা এই যে মানুষ কি মনে করতে চায় না। এ এমন এক স্মৃতি যা আমাদের জীবনের নানা আঘাত, নানা তিক্ততার মোকাবেলা করতে সাহায্য করে।"[42] ইয়াকুব আলী জামিনদার যেমন বলেছেন বিভাজনের ইতিহাস বোঝার জন্য কেবলমাত্র প্রথাগত মহাফেজখানার নথির উপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়; বরং এই নথিগুলোর মধ্যে যে ফাঁক বা নীরবতা রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলোর পেছনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বোঝা জরুরি।[43] ইতালির মৌখিক ইতিহাসবিদ আলেসান্দ্রো পোর্তেল্লির বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, "এটি (গল্প বলা) বোঝায় যে উদ্বাস্তুদের গল্পগুলো শুধু স্মৃতি নয়, বরং সময়ের সাথে লড়াইয়ের একটি রাজনৈতিক কাজ। এটি মৌখিক ইতিহাসের গুরুত্ব তুলে ধরে, যা প্রচলিত লিখিত ইতিহাস থেকে ভিন্ন"।[44] দেশভাগ ও উদ্বাস্তু ইতিহাস চর্চার বিবর্তনের এই ধারাকে অনুসরণ করে, ইতিহাসের দাবিকে মান্যতা দিয়ে বর্তমান গবেষণায় স্মৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সাম্প্রতিককালে, সাক্ষাৎকার, মৌখিক আখ্যান ইতিহাস রচনার কাজে জীবন্ত দলিল হিসেবে উঠে এসেছে। কারণ উদ্বাস্তুদের মৌখিক আখ্যান (ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত) ঐতিহাসিক আখ্যান থেকে অনেক পৃথক। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা প্রায়শই সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, বিশেষত নিম্নবর্গ ও উদ্বাস্তুদের স্মৃতিকে উপেক্ষা করে। জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে যেমন তার প্রবন্ধে সহিংসতার স্মৃতি (যেমন- হত্যা, ধর্ষণ, উচ্ছেদ) কীভাবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ইতিহাস রচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, মৌখিক আখ্যান স্মৃতি, আবেগ, ট্রমা, এবং নীরবতায় ভরা।[45]

সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সহাবস্থানঃ

বর্তমান গবেষণা উদ্বাস্তু সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যাগুলির পাশাপাশি একটি বিশেষ দিকে আলোকপাত করবে তা হল সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সহাবস্থান। দেশভাগের মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া এই পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করলে দেখা যায়; ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে কোনো দেশ দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। যার ফলে; সেই সকল প্রতিটি দেশে বিভাজনের কারণের উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি বা সংস্কৃতিগত বিভিন্নতায় একদল মানুষ সংখ্যাগুরু ও একদল মানুষ সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। এই দেশভাগের ফলস্বরূপ শুরু হয় অভিবাসন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

---

[42] Dipesh Chakrabarty 'Remembered Villages: Representations of Hindu-Bengali Memories in the Aftermath of the Partition,' Mushirul Hasan (ed.), *Inventing Boundaries: Gender, Politics and the Partition of India,* (Delhi: Oxford University Press, 2000), p. 318.

[43] Yacoobali Zamindar, *The Long Partition,* p. 14; Shahid Amin, *Event, Metaphor, Memory: Chauri Chaura, 1922-1992,* (Berkley: University of California Press, 1995).

[44] Alessandro Portelli, 'The Time of My Life': Functions of Time in Oral History, *International Journal of Oral History,* vol. 2, no. 3, November 1981, pp. 162–80.

[45] Pandey, Gyanendra : *Remembering Partition.*

মানুষেরা কখনো অত্যাচারিত হয়ে, কখনো বা অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে, আবার কখনো স্বেচ্ছায় তাত্ত্বিকভাবে তাদের জন্য নির্ধারিত দেশে নাগরিক হয়ে বসবাস করার জন্য তাদের বর্তমান দেশত্যাগ করছে। তাদের জন্য নির্ধারিত যে তাত্ত্বিক দেশে তারা অভিবাসন করছে সেই দেশে তাদের স্বধর্মী, স্বজাতি, বা সমসংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষেরা সংখ্যাগুরু। তারা সেই দেশে গিয়ে সেই সংখ্যাগুরুদের মধ্যে নিজেদের পুনঃস্থাপন করার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চিন্ততা বা নির্ভরতা খুঁজে পান। কিন্তু তাদের গন্তব্য দেশে বসবাসকারী আদিনিবাসীদের সঙ্গে তাদের একটা পার্থক্য থেকে যায়, কারণ তারা সীমানার ভুল প্রান্তে থেকে যাওয়ায় ভিনদেশী, তারা অধিবাসী নন, অভিবাসী। এই 'অভিবাসী' থেকে 'নাগরিকে' পরিণত হওয়ার যাত্রাপথটুকু আবার স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করে। কালক্রমে অভিবাসীরা তাদের গন্তব্য দেশের অধিবাসীদের (সংখ্যাগুরু) সঙ্গে মিলেমিশে গেলেও সেই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যারা দেশত্যাগ করেনি তাদের সঙ্গে এই অভিবাসীদের সম্পর্কের সমীকরণ একটু ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়; এই ভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি বা সংস্কৃতির সংখ্যালঘুদের কারণে তাদের পূর্ব ঠিকানা ত্যাগ করে চলে আসতে হয়েছে, তা হতে পারে কোনো প্রত্যক্ষ দৈহিক আক্রমন, নিরাপত্তাহীনতা, মানসিক অস্বস্তি বা নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের জায়গা থেকে। কাজেই, পৃথিবীর বুকে যেখানেই দেশভাগ বা জাতিরাষ্ট্র গঠনের ঘটনা ঘটে সেখানে ফলশ্রুতি হিসেবে অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রচুর উদ্বাস্তুর আবির্ভাব ঘটে; যার থেকে জন্ম নেয় উদ্বাস্তু সমস্যা। অনিবার্য কারণেই নবগঠিত সেই সকল রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু-উদ্বাস্তু বা সংখ্যালঘু-অভিবাসী সম্পর্কের সমীকরণ (minority and migrants group integration) সমাজবিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[46] কারণ এটি কোনো সরল সম্পর্ক নয় বরং জটিল পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় এটি তার স্বরূপ নির্ধারণ করে।

কিন্তু বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র মালদা ও মুর্শিদাবাদ দুটি মুসলিম প্রধান জেলা হওয়ায়, ভিন্নধর্মী বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্থানীয় মানুষের সঙ্গে এই জেলা দুটিতে আগত অভিবাসীদের সম্পর্ক অনুধাবনের ক্ষেত্রে 'সংখ্যালঘু-অভিবাসী' শব্দবন্ধের পরিবর্তে 'সংখ্যাগুরু-অভিবাসী' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করতে হয়। জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে উদ্বাস্তু সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা, উদ্বাস্তু আগমনের প্রেক্ষাপট ও প্রভাব, উদ্বাস্তু সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা, প্রভৃতি বিষয় অনুধাবনে সহায়ক গ্রন্থগুলির প্রতি অবলোকন প্রয়োজন, যা বর্তমান গবেষণার বিবেচ্য প্রশ্নের শনাক্তকরণে সাহায্য করবে।

বিষয়ভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনাঃ

শুরুতেই যে ঘটনা দুটি উল্লেখ করা হয়েছে সেই ঘটনা দুটি যে সমকেন্দ্রিক বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছে তার কেন্দ্রে রয়েছে 'দেশভাগ'। এই দেশভাগের স্বরূপ সকলের জন্য একই ছিল না, কারো কাছে সুরক্ষিত স্বদেশের নিশ্চয়তা

[46] Joya Chatterji, *The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-67*, (Cambridge University Press, 2007), p. 3.

তো অন্যের কাছে চিরকালীন ক্ষতি বা 'হারানো বাড়ি'র প্রতীক।[47] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে দক্ষিণ এশিয়ার বুকে সবচেয়ে আলোচিত ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ত্রিবিধ ঘটনার যুগপৎ সমাপতন,- ১৯৪৭ সালের ভারতীয় ভূখণ্ডে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার অবসান, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও দেশভাগ। দীর্ঘ দুশো বছর বিদেশি শক্তির শাসনের অধীনে দিনাতিপাত করতে করতে অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত ভারতবাসীদের মধ্যে যে বোধ বা ভাবনার অঙ্কুরোদগম ও সঞ্চার ঘটেছিল তা হল জাতীয়তাবাদ। তবে ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র পরাধীনতা থেকে মুক্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা অর্জনেই থেমে থাকে নি বরং তা পর্যবসিত হয়েছিল দেশভাগের দ্বারা জাতি-রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্তে। ফলস্বরূপ ভারতীয় ভূখণ্ডে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান ঘটে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দুটি জাতি-রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। তাই ১৯৪৭-এর ভারতের দেশভাগকে বুঝতে হলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, জাতির-রাষ্ট্র ও দ্বিজাতি তত্ত্বকে বুঝতে হয়। জাতি-রাষ্ট্রের উৎপত্তি পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম ছিল না। ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৭-৯৯) পর ফ্রান্সকেই প্রথম জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা হলেও, কিছু কিছু ঐতিহাসিক ১৬৪৯ সালে ইংরেজ কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠাকে জাতি-রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রথম উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করেন। পরবর্তীকালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি যেমন ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুগস্লোভিয়া, বেলজিয়াম জাতি-রাষ্ট্রের গঠনের অভিজ্ঞতা বহন করছে।[48] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতি-রাষ্ট্র হল এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে একটি জাতি বা জনগোষ্ঠী একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করে, যারা সাধারণত একই সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস বা পরিচয় ভাগ করে নেয়।[49] আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী রজার্স ব্রুবেকার তাঁর গ্রন্থে জাতিরাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন, "states of and for particular nations." অর্থাৎ জাতি-রাষ্ট্র হল "নির্দিষ্ট জাতির এবং তাদের জন্য রাষ্ট্র।"[50]

জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব মূলত কোথাও সামন্ততন্ত্র কোথাও বা ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসানে। এর মূলগত ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ (Nationalism)। জাতীয়তাবাদ মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ পরিচয় (ভাষা, সংস্কৃতি,

---

[47] J. D. Greenberg, 'Generations of Memory: Remembering Partition in India/Pakistan and Israel/Palestine, *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 25.1, 2005, p. 90.

[48] Yuval Feinstein, fact-checked by The Editors of Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/nation-state, Last Accessed on 09/10/2025.

[49] জাতি-রাষ্ট্র, "আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র—অর্থাৎ, একটি রাষ্ট্র — যা নাগরিকদের একটি সম্প্রদায়ের নামে শাসিত হয় যারা নিজেদেরকে একটি জাতি হিসেবে পরিচয় দেয়। একটি ভূখণ্ড এবং সেখানে বসবাসকারী জনসংখ্যার উপর একটি জাতি-রাষ্ট্রের শাসনের বৈধতা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি মূল জাতীয় গোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের (যার মধ্যে সমস্ত বা শুধুমাত্র কিছুসংখ্যক নাগরিক অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে) অধিকার থেকে উদ্ভূত হয়। মূল জাতীয় গোষ্ঠীর সদস্যরা রাষ্ট্রকে তাদের নিজস্ব বলে মনে করে এবং রাষ্ট্রের আনুমানিক ভূখণ্ডকে তাদের মাতৃভূমি বলে মনে করে। সেই অনুযায়ী, তারা দাবি করে যে রাষ্ট্রের ভেতরে এবং বাইরের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি রাষ্ট্রের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে স্বীকৃতি দেবে এবং সম্মান করবে। Ibid.

[50] Rogers Brubaker, *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

ধর্ম, ইতিহাস) গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের একটি রাষ্ট্রের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে। এই জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে অ্যান্ডারসন বলেছেন, জাতীয়তাবাদ একটি কল্পিত সম্প্রদায়, যা পশ্চিমে গড়ে উঠেছে এবং উপনিবেশে তা অনুকরণ করা হয়েছে। মুদ্রণ পুঁজিবাদ এবং আধুনিকতা এর মূল চালিকাশক্তি।[51] আবার পার্থ চ্যাটার্জির চেতনায় উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদ পশ্চিমের সরল অনুকরণ নয়। এটি বস্তুগত ক্ষেত্রে পশ্চিমের দক্ষতা গ্রহণ করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করে একটি অনন্য সার্বভৌমত্ব তৈরি করে।[52]

উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে বি-উপনিবেশিকরণের (ডিকলোনাইজেশনের) প্রেক্ষাপটে এই জাতি-রাষ্ট্র গঠনের ধারণা দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজন (Partition of India) ঠিক এই জাতি-রাষ্ট্র গঠনের একটি মাইলফলক। ব্রিটিশ-ভারতের বিভাজন ও ভারত-পাকিস্তান দুটি জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভব ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ফল, যার পেছনে একটি প্রধান শক্তি ছিল জাতীয়তাবাদ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে একটি সাধারণ লক্ষ্যের (স্বাধীনতা) অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

বলা বাহুল্য, বৃহত্তর লক্ষ্য এক হলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিত পৃথক পৃথক গোষ্ঠীগুলির কিছু ক্ষুদ্র স্বার্থ চেতনা এবং সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের পৃথক পৃথক একাধিক উপলক্ষ্য ছিল। যার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ নির্ভেজালভাবে একটিমাত্র সাধারণ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। ক্ষমতার দখল নেওয়া, অধিকার প্রতিষ্ঠা বা সার্বভৌমত্ব অর্জনের প্রচেষ্টায় বহু বছর আগে ইংরেজ সরকারের বপন করা কুখ্যাত 'Divide and Rule' নীতির শিকার হয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কতিপয় নেতৃবৃন্দ নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে হাতিয়ার করে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনকে সামনে নিয়ে আসেন। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির মুখে ভারতীয় ভূখণ্ডে 'জাতীয়তাবাদ' ও তার থেকে উদ্ভূত জাতি-রাষ্ট্রের 'জাতি' তার সংজ্ঞা বদলাতে থাকে। এই নব সংজ্ঞায়িত 'জাতীয়তাবাদ' বা 'জাতি' এ যাবৎ পরিচিত 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান' এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতবর্ষকে বৃহত্তর একটি সংস্কৃতি, এক ঐতিহ্য বা ইতিহাসের পরিচয় বহনকারী একটিমাত্র জাতি হিসেবে আর পরিগণিত করতে পারে না, 'ধর্ম' সেখানে নতুন ভাবী জাতি-রাষ্ট্রদ্বয়ের জাতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' (Two-Nation Theory)-এর অবতারণা করা হয়। এই 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'-এর উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা (হিন্দু-মুসলিম) অনুসারে ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতকে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দুটি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়। এইভাবে ভারতের 'স্বাধীনতা' একা আসতে পারে না, বরং 'স্বাধীনতা' ও 'দেশভাগ' একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ হয়ে যুগপৎ ভারতভূমিতে পদার্পণ করে।

---

[51] Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,* (London: Verso, 1991), pp. 164-86.

[52] Partha Chatterjee, *The National and its Fragments: Colonial and Post-colonial Histories,* (New Jersey: Princeton University Press, 1993), pp. 4-14.

ভি পি মেনন ও জি ডি খোসলার মত কিছু উচ্চপদস্থ আমলা, মাওলানা আজাদ ও রাম মনোহর লোহিয়ার মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের রচনায় ইতিপূর্বে ভারতের দেশভাগের জন্য কে বা কারা দায়ী এই প্রশ্ন উঠে আসে। বিভাজন-পূর্ববর্তী ভারতে দুই ধরনের জাতীয়তাবাদ (ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ) কিভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল ঐতিহাসিক মায়া টিউডর খুব সুন্দর করে তার স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। স্বাধীনতার আগের দশকগুলোতে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই জাতীয়তাবাদকে কিভাবে ব্যবহার করেছিল তাও তিনি দেখিয়েছেন। [53] জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, সুচেতা মহাজন, অনিতা ইন্দর সিং, আয়েশা জালাল, ইয়াসমিন খান, সেমন্তী ঘোষ প্রমুখের লেখাতেও জাতি-রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ ও দ্বিজাতিতত্ত্ব নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা পাওয়া যায়। ভারত ও পাকিস্তান এই দুই জাতি-রাষ্ট্রের গঠনে জাতীয় স্তরে দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতি কিভাবে তার পথ প্রশস্ত করেছিল তা এদের রচনায় উঠে আসে। তবে ১৯৯০-এর দশকে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে দেশ বিভাজনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বোঝার জন্য প্রাদেশিক রাজনীতির প্রতি মনোনিবেশের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ জাতীয় রাজনীতির স্তর এবং প্রাদেশিক রাজনৈতিক সমীকরণ কখনো এক হয় না। প্রাদেশিক ভাষা, পরিচয়, জাতি-বর্ণ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টে যায়।

শীলা সেন, হুমায়রা মোমেন এবং হারুন-অর-রশিদ-এর গবেষণাগুলো দেখিয়েছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে পাকিস্তান আদর্শ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বা ১৯৪৭-এর আগেই মুসলিম জোতদার কৃষকদের সমর্থন ক্রমশ ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি থেকে সরে গিয়ে মুসলিম লিগের দিকে ঝুঁকেছিল।[54] আবার জয়া চ্যাটার্জির Bengal Divided গ্রন্থ প্রচলিত ইতিহাসের ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করে, ভারত বিভাগকে প্রধানত মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলাফল হিসেবে দেখায়। লেখিকার যুক্তি অনুসারে, বাংলার বিভাগে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উত্থান এবং হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির সক্রিয় ভূমিকা ছিল মুখ্য। এই শ্রেণি, যারা ঐতিহ্যগতভাবে বাংলার অর্থনীতি, শিক্ষা ও প্রশাসনে প্রভাবশালী ছিল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার সম্ভাবনাকে তাদের ক্ষমতার জন্য হুমকি হিসেবে দেখেছিল। ফলস্বরূপ, তারা বাংলার বিভাজনকে

[53] ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করে গড়ে উঠেছিল, আর পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ হিন্দু রাজত্বের বিরোধিতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। তবে, এই দুই জাতীয়তাবাদের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল, যা তাদের শাসনব্যবস্থার ভিন্ন ফলাফলের কারণ হয়েছিল। এরপর তিনি বিভাজনের পরবর্তী ভারতের গণতান্ত্রিক এবং পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন বিশ্লেষণ করেন, যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত। Maya Tudor, *The Promise of Power: The Origins of Democracy in India and Autocracy in Pakistan,* (New York: Cambridge University Press, 2013), pp. 65-66.

[54] Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal, 1937-47,* (New Delhi: Impex India, 1976); Humaira Momen, *Muslim Politics in Bengal: A Study of the Krishak Praja Party and the Elections of 1937,* (Dacca: Sunny House, 1972); Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947,* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1987).

তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।[55] লাডলীমোহন রায়চৌধুরীর "ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ" একদম শুরু থেকে ব্রিটিশ সরকার, মাউন্টব্যাটেন, সিরিল রেডক্লিফ, জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, নিউ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন, সোহরাওয়ার্দী ও বসু ভাতৃদ্বয় প্রত্যেকের অবস্থান বিশ্লেষণ করে ভারতভাগ ও বিশেষত বাংলা ভাগের রাজনীতিকে তুলে ধরে।[56]

বাংলা ভাগের স্বপক্ষে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি প্রাদেশিক স্তরে দেখা গিয়েছিল তার বিপরীতে একটি অন্য মতও ছিল। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়া চ্যাটার্জি, জ্ঞানেশ কুদাসিয়া, তাই তাং ইয়ং, লাডলী মোহন রায়চৌধুরী, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী প্রমুখের রচনায় বঙ্গভঙ্গের বিপরীতে সোহরাওয়ার্দী, বসু ভাতৃদ্বয় অর্থাৎ শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু এবং আবুল হাসেমের নেতৃত্বে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের বাইরে একটি স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্র United Bengal বা অখন্ড বাংলার পরিকল্পনার কথা উঠে আসে। তারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন অখন্ড বাংলার এই ধর্মনিরপেক্ষ পরিকল্পনা কেন রাজনৈতিক সমর্থন না পেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল।[57]

আর.সি মজুমদারের লেখায় যেমন বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান সুস্পষ্ট, বৈরিতাপূর্ণ পার্থক্যের কথা উঠে আসে তেমনি আবার বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর লেখায় বহু বছর পাশাপাশি বসবাস করা বিভাজন-পূর্ববর্তী বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি উদাসীন অথচ বিদ্বেষহীন সহাবস্থানের চিত্র ফুটে ওঠে, যা আপাত দৃষ্টিতে অদূর ভবিষ্যতে দেশভাগের মতো ঘটনার সম্ভাবনার পূর্বাভাস দিতে পারেনা। এদের মধ্যে জ্ঞানেশ কুদাশিয়া, তাই ইয়ং তাং, লিওনার্দো গর্ডন ইত্যাদিদের গবেষণা উল্লেখযোগ্য। লিওনার্দো গর্ডন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের যথাক্রমে 'টোল' ও 'মাদ্রাসা'য় শিক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন উদাহরণ টেনে

---

[55] হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির এই রাজনৈতিক কৌশলকে তিনি শুধু ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য নয়, বরং একটি 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' পরিচয় গড়ে তোলারও প্রয়াস হিসেবে দেখেছেন। সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উসকে দিয়ে বিভাজনের পক্ষে জনমত গড়ে তুলে বাংলা ভাগের পথ প্রশস্ত করার পেছনে লেখিকা হিন্দু মহাসভা এবং অন্যান্য হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর ভূমিকা বিশদভাবে তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিশেষত কলকাতা ও নোয়াখালির ঘটনা, যা বিভাগের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৪৬-৪৭ সালের ঘটনাবলী পুনর্মূল্যায়ন করে তিনি দেখান যে, বাংলার বিভাগ কেবল একটি প্রতিক্রিয়াশীল ফলাফল নয়, বরং হিন্দু সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রকল্পের ফসল। Joya Chatterjee, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-47,* (United Kingdom: Cambridge University Press, 1994).

[56] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* (কলকাতাঃ দে'জ, ২০০৪)।

[57] Bidyut Chakrabarty, *The Partition of Bengal and Assam, 1932-1947*, (London and New York: Routledge Curzon, 2004); Tan Tai Yong and Gyanesh Kudaisya, *The Aftermath of Partition in South Asia,* (London and New York: Routledge, 2000); বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর : *পলাশী থেকে পার্টিশান,* (কলকাতাঃ ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৩); রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন : *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* (কলকাতাঃ দে'জ, ২০০৪)। এ প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যেমন বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মতে, এই আন্দোলন চিন্তাগতভাবে আকর্ষণীয় হলেও রাজনৈতিকভাবে অসংহত ছিল—এই কারণেই তিনি একে "a thesis without synthesis" বলে অভিহিত করেছেন, Bidyut Chakrabarty, The 1947 United Bengal Movement: A Thesis Without Synthesis, The *Indian Economic and Social History Review* 30 (4), 1993.

তিনি দেখান প্রায় ছয়শো বছর ধরে একসঙ্গে বসবাসকারী দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একে অপরের ঐতিহ্য সম্পর্কে খুব কম জানত। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক ও স্পষ্ট পার্থক্য বরাবরই ছিল তবু বিদ্বেষ ছিল না বললেই চলে।[58]

সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক লেখালেখির পাশাপাশি সাহিত্যিকদের রচনাতেও দেশভাগ জায়গা পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'ভারতবর্ষ' গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে এক মলিন বসনা থুরথুরে বুড়ির দুর্দশা চেয়ে চেয়ে দেখা হিন্দু-মুসলমান ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অবিচলিত, নির্লিপ্ত চোখগুলি মৃত বুড়ির (যদিও তার মৃত্যু ঘটেনি, তাকে মৃত ভাবা হচ্ছিল) অন্তিম সংস্কারের বেলায় তাকে চিতায় তোলা হবে না কবরে দেওয়া হবে এই বিতর্কে পরস্পরের বিরুদ্ধে রক্তবর্ণ ধারণ করে।[59] এছাড়াও খুশবন্ত সিং-এর *'ট্রেন টু পাকিস্তান* সাদাত হাসান মান্টোর *'টোবা টেক সিং*, ভীষ্ম সাহনীর '*তামস,'* অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *'খোয়াবনামা'*, গৌর কিশোর ঘোষের *'প্রেম নেই* প্রভৃতি রচনায় দেশভাগ-পূর্ববর্তী সময়ে পাঞ্জাব ও বাংলার সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার চিত্র ফুটে ওঠে।

তবে স্বাধীনতার প্রাক্কালের পরিবর্তিত জাতীয়-রাজনীতি থেকে রাজ্য-রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে প্রভাব মুক্ত থাকতে পারেনি যার জন্য বাংলার মানুষকে অবাক করে কলকাতার বুকে নারকীয় দাঙ্গা 'The Great Calcutta killings' এবং নোয়াখালীর মতো দাঙ্গাগুলি সংঘটিত হতে পেরেছিল। এবং এই সবকিছুর মিলিত ফল ছিল বাংলার ভাগ। দেশের দুই চরম প্রান্তে অবস্থিত দুটি প্রদেশ, পশ্চিমের পাঞ্জাব এবং পূর্বের বাংলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনদের প্রধান ধারণভূমি হওয়ায় এই অঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাব ও বাংলার ওপর অস্ত্রোপচারের ফলে এই দুই প্রদেশের মধ্যে দন্ডায়মান কাঁটাতারের বেড়া ক্ষতের নিদর্শন স্বরূপ যুগ যুগ ধরে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টায়রত। কারণ এই বিভাজন শুধু ভৌগোলিক বিভক্তি ছিল না, বরং নতুন জাতীয় পরিচয়, নাগরিকত্ব, সীমান্ত এবং সম্প্রদায়িকতার (communalism) গঠনের প্রক্রিয়া, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের স্থানান্তর, হত্যাকাণ্ড এবং দীর্ঘমেয়াদী আঘাত সৃষ্টি করেছিল।

১৯৪৭ এর ভারত বিভাজনের স্বরূপ বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে উঠে এসেছে। অলোক ভাল্লা এই বিভাজনকে দেখেছেন এক জটিল ট্রাজেডি রূপে।[60] ইয়াসমিন খানের দৃষ্টিতে এটি *'দ্য গ্রেট পার্টিশন'* (২০০৭) বা

---

[58] R. C. Majumder, *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century,* (Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1960), pp. 4-7; Leonard A. Gordon, 'Divided Bengal: Problems of Nationalism and Identity in the 1947 Partition' in Mushirul Hasan (ed.), *India's Partition: Process Strategy and Mobilization,* (New Delhi: Oxford University PressUP, 1998), p. 280; Dr. Chittabrata Palit and Dr. Ujjal Roy, *Bengal Before and After the Partition (1947): The Changing Profile of a Province,* (Kolkata: Corpus Research Institute, 2020), pp. 62-63.

[59] সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সেরা ৫০টি গল্প,(কলকাতাঃ দে'স পাবলিশিং, ২০১৬), পৃ. ১৫৫-১৫৮।

[60] Alok Bhalla, (ed.), *Stories About the Partition of India*, p. vi.

'মহা বিভাজন' যাকে তিনি স্বাধীনতার বিজয় হিসেবে নয়, বরং একটি বিপর্যয়কর বিচ্ছেদ হিসেবে চিত্রিত করেন। তিনি দেখান কীভাবে অভিজাত সিদ্ধান্ত সাধারণ জীবনকে ধ্বংস করে, এবং রোম্যান্টিক বিভাজন মিথ্যাকে সমালোচনা করে।[61] ভাজিরা ফাজিলা ইয়াকুব আলী জামিন্দারের চোখে আবার এটি 'Long Partition' বা 'দীর্ঘ বিভাজন' যা 'আমলাতান্ত্রিক হিংসা'-কে চিত্রিত করে, যা স্বাধীনতার অনেক পরেও বহু মানুষকে অধিকারহীন, অধিকারবঞ্চিত এবং আইনি অনিশ্চয়তার ফাঁদে ফেলে রেখেছে। এজন্য একে তিনি "a holocaust of a tragedy" বলে অভিহিত করেছেন। তারা দেখিয়েছেন, বিভাজন-পরবর্তী রাষ্ট্র-নির্মাণ প্রচেষ্টাগুলি, সীমান্ত-নির্মাণ এবং শরণার্থী সংকট মোকাবিলার দ্বারা চালিত এবং তা কীভাবে আইনি জটিলতায় নববিভক্ত ভূখণ্ডে বাসকারীদের প্রান্তিক করে তুলেছে এবং তাদের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।[62] পাশাপাশি প্রিয়া সাতিয়া, সুরঞ্জন দাসের গবেষণাগুলি বিভাজনের ফলে সৃষ্ট গভীর ক্ষতের সন্ধান করে। বাসবী ফ্রেসারের লেখায় সীমানার ভুল প্রান্তে থেকে যাওয়া মানুষদের মনে সীমানা অতিক্রম করার পরেও 'অনাত্মবোধ' বা 'unbelongingness' এর জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উঠে এসেছে।[63] গবেষক সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশভাগ-দেশত্যাগ গ্রন্থটি বাংলার পটভূমিতে দেশভাগের আখ্যান তুলে ধরে।[64]

পাশাপাশি সাহিত্যিকদের রচনায় নজর দিলে, নবেন্দু ঘোষের *'উলুখড়',* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'খতিয়ান',* অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *'স্বাক্ষর',* প্রফুল্ল রায়ের *'মাঝি',* সমরেশ বসুর *'আদাব'* প্রভৃতি রচনায় দেখা যায় দেশভাগের পটভূমিতে দরিদ্র হিন্দু ও মুসলিম শ্রেণির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেকার বিভেদের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে তাদের সাধারণ শত্রু দারিদ্র্য। আবার দীপঙ্কর দাসের *'একজন জন্মের ঋণ*, শঙ্খ ঘোষের *'সুপারিবনের সারি'* প্রভৃতিতে দেশ ভাগকে মানতে না পারা ও নিজের দেশের প্রতি আকুতি ঝরে পড়ে।

দেশভাগ বিশেষত বাংলার ভাগের সিদ্ধান্তে সীলমোহর পড়লে সবচেয়ে বড় বিরোধ বেঁধেছিল বাংলাকে ভাগ করা নিয়ে, কিসের ভিত্তিতে বাংলাকে ভাগ করা হবে এবং বাংলার কোন অংশ কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে তা নিয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক ও জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তর্কাতর্কি ও বিবাদের অন্ত ছিল না। যদিও সেই বাংলা ভাগের বা সীমানা নির্ধারণের সিদ্ধান্তে বা প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের কোনো রকম অংশগ্রহণ ছিল না। অথচ এই সীমানা নির্ধারণের জটিলতায় তাদের ভুগতে হয়েছিল দীর্ঘদিন। কোন জেলা, কোন গ্রাম সীমানার কোন দিকে পড়বে জানা ছিল না। সীমানা রেখা তৈরি হওয়ার পরেও সব তর্কের অবসান হয়ে যায়নি। সীমানা পারাপার, সীমান্ত সমস্যা, সীমান্তে জনজীবন, সীমান্ত বাণিজ্য, সীমান্ত রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি নতুন করে

---

[61] Yasmin Khan, *The Great Partition.*

[62] Yocoobali Zamindar, The Long Partition and the Making of Modern South Asia.

[63] Bashabi Fraser (ed.), *Bengal Partition Stories: An Unclosed Chapter,* (London, Anthem Press, 2008).

[64] বন্দোপাধ্যায়ের, সন্দীপ : *দেশ ভাগ-দেশ ত্যাগ,* (কলকাতাঃ অনুষটুপ, ১৯৯৪)।

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। উলিয়াম ভ্যান স্যান্ডেল, জয়া চ্যাটার্জি, জ্ঞনেশ কুদাশিয়া, বিদ্যুৎ চক্রবর্তী প্রভৃতি লেখকদের গ্রন্থগুলি সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতাসহ উপরোক্ত বিষয়গুলিকে তুলে ধরে।[65] রাজর্ষি বিশ্বাসের 'দেশভাগে বঙ্গ সীমান্ত' গ্রন্থটি সীমান্ত অঞ্চলগুলির বিভিন্ন সমস্যা যেমন নদী ও চরকেন্দ্রিক জল-সীমান্ত সংকট, নো ম্যানস ল্যান্ড, বেরুবাড়ি সংকট, সাতগাছি সংকট, ছিটমহল, চোরাচালান সীমান্ত-সুরক্ষা, অনুপ্রবেশ প্রভৃতি বিষয়ের কয়েক দশকের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে।[66]

রণবীর সমাদ্দারের রচনাতেও সীমান্ত-রাজনীতি ও সীমান্ত-জনজীবনের চালচিত্র উঠে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন, সীমান্তের লোকেরা বেঁচে থাকার তাগিদে সীমান্তে উপার্জনের চেষ্টা করলে তা প্রশাসনের দ্বারা বারবার ব্যাহত হতে থাকে, যার ফলে প্রায়ই গ্রামবাসীদের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হয়। লেখক জাঁ ফ্রাঁসোয়া বায়ার্তের 'The Politics of The Belly' (পেটের রাজনীতি)-এর ধারণা ব্যবহার করে সীমান্ত অঞ্চলের অপ্রাতিষ্ঠানিক বাণিজ্য এবং অভিবাসনকে বর্ণনা করেছেন। চোরাচালান, নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে মৃত্যু অর্থনৈতিক বাধ্যতা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের দ্বন্দ্ব প্রকাশ করে।[67] রণবীর সমাদ্দার সীমানা সংক্রান্ত নতুন কিছু সমস্যার প্রতি আলোকপাত করেছেন এবং সেই আলোচনা সাপেক্ষে তিনি দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে হওয়া দেশভাগের সামনে একটি বড় প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। তিনি বিভাজনকে একটি স্থির ঘটনা নয়, বরং একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখান, যা সীমান্ত অঞ্চলে ৭০-৭৫ বছর ধরে 'বিদঘুটে বাস্তবতা' (grotesque reality) তৈরি করেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, বিভাজনের পর সীমান্ত গ্রামগুলি মিশ্র সম্প্রদায় থেকে একচেটিয়াভাবে হিন্দু বা মুসলিম গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে, যা ম্যাকঅ্যালপিনের 'ভাঙা গ্রাম' ধারণার সাথে মিলে যায়। পাশাপাশি তিনি দেখিয়েছেন, নতুন জাতি-একতা (যেমন নমঃশূদ্র বা চাই-মণ্ডল) গড়ে ওঠা এবং মুসলিমদের ফেরত আসা, পবিত্র স্থানগুলির চারপাশে নতুন বসতি গড়ে ওঠা (যেমন বসিরহাট, মুর্শিদাবাদ) সামাজিক-সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের শক্তি তুলে ধরে, যা বিভাজনের ধর্মীয় ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করে।[68]

সীমান্ত রেখার কাঁটাতারের বেড়া, যাদের জীবন, পরিবার পরিচিতিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল তাদের সর্বপ্রথম পরিচয় তারা উদ্বাস্তু। ভূমিকার শুরুতে বর্ণিত ঘটনাগুলি দেশভাগের যে নেতিবাচক পরিণতির দিকে ইঙ্গিত

---

[65] Willem van Schendel, *The Bengal Borderland: Beyond State and Nation in South Asia,* (London: Anthem Press, 2004); Joya Chatterji, "The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Lartdscape, 1947-1952', *Modern Asian Studies,* 33, (1), 1999; Bidyut Chakrabarty, *The Partition of Bengal and Assam.*

[66] বিশ্বাস, রাজর্ষি : *দেশভাগে বঙ্গসীমান্তঃ ভারত-পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক,* (কলকাতাঃ গাঙচিল, জানুয়ারি ২০২৩)।

[67] Ranabir Samaddar, *The Marginal Nation: Transborder Migration from Bangladesh to West Bengal,* (New Delhi: Sage Publications, 1999). P. 61.

[68] Ranabir Samaddar (ed.), *Reflections on Partition in the East,* (New Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1997), pp. 99-101.

করে তা উদ্বাস্তু সমস্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯৪৭ সালের বিভাজন বা দেশভাগের পরিকল্পনা পক্ষান্তরে পাকিস্তানের জন্ম এমন মৃত্যু ও ধ্বংসের দৃশ্যপটের জন্ম দেবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কেউ ভাবেনি যে স্বাধীনতা এমন ভয়াবহ রূপে আসবে। স্বাধীনতার অমৃত স্বাদ আস্বাদনকারী স্বস্থানে থেকে যাওয়া বেশিরভাগ জনগণ এই ভয়াবহতা আঁচ করতে পারবেনা, স্বাধীনতার সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে যাদের জীবনে এই ভীষণ সংগ্রাম নেমে আসে সেই সকল ভুক্তভোগীরাই জানেন উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে আসা যাওয়া ছিল। ফেলে আসা গ্রাম, ছেড়ে আসা বাড়িতে একবার গিয়ে ওঠা, আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পুনর্মিলন, চেনা রাস্তা, মাঠ, পুকুর পেরিয়ে চাষের ক্ষেতটাতে একবার গিয়ে দাঁড়ানো এসবের মধ্যে দিয়ে শিকড়ের রসটুকু একবার আস্বাদ করা যেত। তারা ভেবে নিয়েছিল দেশভাগ হয়েছে কিন্তু বিচ্ছেদ হয় নি। কিন্তু হঠাৎ যখন দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথা চালু হল তখন তারা মর্মাহত ও হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ পারমিট ব্যবস্থা মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। যারা দেশভাগের পরে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন, তাদের জন্য এই নতুন নিয়ম অপ্রত্যাশিত বাধা সৃষ্টি করেছিল। পারমিট ব্যবস্থা শুধুমাত্র সীমান্ত নিয়ন্ত্রণই নয়, বরং দুই দেশের মধ্যে মানসিক, প্রশাসনিক ও আইনি বিভাজনকে দীর্ঘায়িত করেছিল, যা পার্টিশনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইয়াকুব আলী জামিনদার একে 'Real Partition' বলে উল্লেখ করেছেন।[69] পশ্চিম সীমান্তে নতুন পরিচয়, নাগরিকত্ব পাওয়া ইত্যাদির জন্য যখন মানুষকে লড়তে হচ্ছে পূর্ব সীমান্তে বাংলায় তখন শিয়ালদা প্ল্যাটফর্ম, ইন্টারসেপশন সেন্টার, ত্রাণ শিবিরের তাঁবুর তলায় মনুষ্যেতর জীবন যাপনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বাংলার শরণার্থীরা।

অন্বেষা সেনগুপ্তের প্রবন্ধে শিয়ালদহ স্টেশনে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জীবনচিত্র এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী এক দশকের ইতিহাস উঠে এসেছে। ব্যস্ততম শিয়ালদা রেলস্টেশনে হাজার হাজার বাস্তহারা মানুষদের সংসার, সর্বসমক্ষে পরিবারের মহিলাদের স্নান, ও অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম সারা, গাদাগাদি করে থাকার ফলে মহামারী ছড়ানোর ঘটনা প্রকৃতি বিষয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে।[70] সহায় সম্বলহীন শরণার্থীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন পাওয়ার যোগ্যতা নির্ণয়কারী দলিল বর্ডার স্লিপ বা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাওয়া নিয়ে নানা জটিলতায় নূন্যতম ত্রাণটুকুও অনেকের ভাগ্যে জোটেনি। অপর এক গবেষণায় দেখা যায়, পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তুরা যখন সরকারের কাছ থেকে বারবার বঞ্চিত হয়েছেন তখন তাদের অনেকেই বাধ্য হয়ে নিজেদেরকে উদ্বাস্তু হিসেবে রেজিস্ট্রেশন না করে নিজেদের উদ্যোগে পুনর্বাসন করেছিলেন। এবং রেজিস্ট্রিভুক্ত উদ্বাস্তুদের ভিতরেও প্রায় ৫০

[69] Yocoobali Zamindar, *The Long Partition and the Making of Modern South Asia,* p. 82.

[70] Anwesha Sengupta, 'Bengal Partition Regugees at Sealda Railway Station,1950-60', *South Asia Research,* Vol. 42(1), pp. 1-16.

শতাংশ মানুষ যারা সরকারি কোনো প্রকার সাহায্য গ্রহণ করেননি।[71] কারণ আগেই বলা হয়েছে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে যে নীতি বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল বাংলার ক্ষেত্রে তা হয়নি।

উদ্বাস্তুরা তাদের এই 'উদ্বাস্তু' তকমার পরিবর্তে তাদের 'নাগরিক' হিসেবে গ্রহণের দাবি জানায়, কারণ তারা পার্টিশনের 'উচ্চ রাজনীতি'র শিকার ছিল।[72] কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 'উদ্বাস্তু' পরিচয়ের অর্থ ও সংজ্ঞা বদলায় মাত্র। পরিস্থিতি বদলায় না। স্থানীয় সংকটে এটি আরও বৈচিত্র্যময় হয়। ফলে, উদ্বাস্তুরা রাষ্ট্রের খামখেয়ালি ধারণার শিকার হয়ে তাদের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান শিকারে পরিণত হয়।[73] আবার এর উল্টো দিকে দেখা যায়, এক শ্রেণির বাস্তুচ্যুত জনগণ এতটাই অসহায় যে তাদের মধ্যে নিজেদের 'উদ্বাস্তু' পরিচয় দিয়ে সামাজিক পরিমন্ডল থেকে নিজেদেরকে চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আর.এন. সাক্সেনা বলেছেন,

"Those among the displaced people who are still pursuing relatively less stable livelihood, have less security of settlement..." are more burdened with familial obligations, etc., tend to identify and isolate themselves from the local social milieu as 'refugees').[74] অর্থাৎ, তারা সেই সমস্ত বাস্তুচ্যুত জনগণ, পারিবারিক বাধ্যবাধকতা ও অন্যান্য সমস্যায় জর্জরিত হয়ে যাদের জীবিকা ছিল কম স্থিতিশীল ও জীবন ধারণের নিরাপত্তাবোধ ততটা ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের আগমন এবং তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি পরিকল্পনা, বাস্তবের মাটিতে সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত আকর গ্রন্থ 'উদ্বাস্তু'। লেখক জলপাইগুড়ি জেলার জেলাশাসক ও পরবর্তীকালে অবসরপ্রাপ্ত পুনর্বাসন দপ্তরের আমলা হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় খুব কাছ থেকে উদ্বাস্তু সমস্যা মোকাবিলায় আমলাতান্ত্রিক ও দপ্তরি কাজগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, যার প্রতিফলন ঘটে তার রচনায়।[75] তবে দেশত্যাগ করে আসা গবেষক প্রফুল্ল চক্রবর্তী রচিত 'প্রান্তিক মানব' উদ্বাস্তু সমস্যা সংক্রান্ত অপর এক আকর গ্রন্থ। যেখানে একদম তৃণমূল স্তরে মিশে গিয়ে কাছ থেকে দেখা বাংলায় আগত উদ্বাস্তুদের দুর্দশা, বঞ্চনা, জীবন সংগ্রাম, তাদের আন্দোলন এবং বামপন্থী রাজনীতির গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের অনুসন্ধান ফুটে ওঠে।[76] যদিও এই দুটি গ্রন্থই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক রচনা, তবুও দুটি ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ

---

[71] রনজিৎ রায়, *ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গঃ কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন,* (কলকাতাঃ শঙ্খ প্রকাশন, ১৯৭৭) পৃ. ১০০।

[72] অভিজিৎ দাশগুপ্ত, *বিস্থাপন ও নির্বাসন ভারতের রাষ্ট্র উদ্বাস্তু সম্পর্ক,* (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৮), পৃ. ২০-২১।

[73] Anindita Ghoshal, *Refugees, Borders and Identities: Right and Habits in East Northeast India*, (London & New York: Routledge, 2021), pp. 71-73.

[74] R N Saksena, *Refugee: A Study in Changing Attitudes,* (Bombay: Asian Publishing House, 1961). pp. 8-9, 53 & 128.

[75] হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৭০।

[76] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩)।

দুজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম পরিসরের বিভিন্নতা হেতু দুই গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান ও বিপরীত প্রতিপাদ্য উঠে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনায় কান্তি বি.পাকরাশির *'The Uprooted'* নামক গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে যে কোনো গবেষক তার সহায়ক গ্রন্থের তালিকায় রাখতে চাইবেন। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট এর গবেষক ও শিক্ষক হওয়ার সুবাদে শ্রী পাকরাশির লেখায় বাংলায় উদ্বাস্তু আগমন, তাদের গণনা করা, তালিকাভুক্ত করা, তাদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার পশ্চাদপট রচনা থেকে শুরু করে তথ্য সংগ্রহের সমস্যা, জটিলতা, তথ্য বিশ্লেষণ, তালিকাবদ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠেছে।[77] জয়া চ্যাটার্জির *'The Spoils of Partition'* বাংলায় বিভাজন-পরবর্তী উদ্বাস্তু প্রসঙ্গকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ আকর গ্রন্থ। ১৯৪৭-৬৭ পর্যন্ত সময়কালে সীমাবদ্ধ এই গবেষণায় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণির বিভিন্ন পর্যায়ে দেশত্যাগ করে চলে আসার পটভূমি, তাদের জন্য পক্ষপাতদুষ্ট, বিলম্বিত, অপর্যাপ্ত ও বাধাপ্রাপ্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা, স্বীয় অবস্থানে থেকে যাওয়া পক্ষান্তরে দেশত্যাগ করে না যাওয়া ভারতীয় জনসমষ্টি এবং উদ্বাস্তু আগমনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতির ওঠা পড়া ইত্যাদি বিষয়গুলির গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপন পাওয়া যায়।[78]

বর্তমান বাংলাদেশের নড়াইলে অবস্থিত নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন সিনিয়র অধ্যাপক, পূর্বোক্ত নবকৃষ্ণ বিশ্বাসের *'ভারতে শরণার্থী'* নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা। তিনি নিজে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদে সাময়িকভাবে (প্রায় নয় মাস) আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, দেশ স্বাধীন হলে আবার তিনি ফিরে যান। ফলে তার লেখা এই গ্রন্থ বর্তমান ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গিকে সাকার করতে সাহায্য করবে তা অনস্বীকার্য।[79] মনন কুমারের 'বাংলার পার্টিশন-কথা উত্তর প্রজন্মের খোঁজ' দুই খন্ডের গ্রন্থটি ভুক্তভোগী মানুষের স্মৃতিকে সংরক্ষিত করে।[80] এর পাশাপাশি বিভিন্ন সাহিত্যিকদের লেখায় উদ্বাস্তু জীবনের যে চালচিত্র উঠে এসেছে তাদের মধ্যে রমেশ চন্দ্র সেনের *পথের কাঁটা,* দেবেশ রায়ের '*উদ্বাস্তু*', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *'বল্মীক'*, *'নোনা জল, মিঠে মাটি', 'আবাদ',* সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *'অর্জুন'*, প্রফুল্ল রায়ের *'কেয়া পাতার নৌকা'*, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের '*স্বরলিপি*' অন্যতম।

---

[77] Kranti B. Prakashi, *The Uprooted: A Sociological Study of the Refugees of West Bengal,* (Calcutta: Editions India, 1971).

[78] Joya Chatterji, *The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-67*, (Cambridge University Press, 2007); জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন: বাংলা ও ভারত, ১৯৪৭-৬৭,* আবু জাফর অনূদিত, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০)।

[79] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতের শরণার্থী (১৯৭১)*।

[80] মননকুমার মণ্ডল (সম্পাঃ), *বাংলার পার্টিশন-কথাঃ উত্তর প্রজন্মের খোঁজ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড,* (কলকাতাঃ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০২০)।

উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সামগ্রিক এই সকল আলোচনার পাশাপাশি মহিলা উদ্বাস্তুদের দুর্দশার উপর প্রথম আলো ফেলেছিলেন উর্বশী বুটালিয়া। বাস্তুহারা নারীর জীবন-যন্ত্রণার কথা তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি দেশভাগ-কেন্দ্রিক গবেষণায় এক নতুন পথের দিশা দেখালেন। যারা অসহায় মহিলাদের সংকটকে দুটি জাতি-রাষ্ট্র এবং তাঁদের পুরুষদের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন লেখিকা তাদের সমালোচনা করেছেন। *'The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India'*-তে তিনি পারিবারিক ইতিহাস উদঘাটনের পাশাপাশি নারীদের উপর হওয়া অত্যাচার ও নিগ্রহ লিপিবদ্ধ করেন। তবে এই গ্রন্থে শুধুমাত্র পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু ও শিখ মহিলাদের অভিজ্ঞতাকেই তুলে ধরা হয়েছে। তার গবেষণায় দেখা যায়, উদ্বাস্তু জীবনে নারীরা কিভাবে তাদের পরিবার-পরিজন, পরিচিত-অপরিচিতদের কাছে শারীরিক ও মানসিক দুই ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। লেখিকার কথায় "It is their homes that are destroyed, their bodies violated, their men killed." বুটালিয়ার হাতিয়ার ছিল মৌখিক আলোচনা ও সাক্ষাৎকার।[81] এর পাশাপাশি ইয়াসমিন খান, ইয়াকুব আলী জমিনদার, অনিতা ইন্দর সিং প্রমুখদের লেখনীতেও উঠে এসেছে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের মনস্তাত্বিক সংকট ও মহিলাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এর কথা। তবে বিভাজন পরবর্তী সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে পাঞ্জাবে অপহৃত মেয়েদের পুনরুদ্ধার ও তাদের পরিবারে ফিরিয়ে আনার যে অভিযান চালানো হয়েছিল; তার তুলনায় বাংলার অবস্থা ছিল তথৈবচ।

একই পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে যশোধরা বাগচি ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত *'The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India'*-গ্রন্থে পূর্ব ভারতে দেশভাগকালে নারী-জীবনের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। এই বই থেকে উদ্বাস্তু মহিলাদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যার কথা জানা যায়। তারা যে লাঞ্ছনা ও বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন তা তাদের মনস্তত্ত্বে চিরকালীন স্মৃতি হয়ে থেকে গিয়েছিল। দেশভাগ পরবর্তী ইতিহাসে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে "মহিলাদের অস্তিত্ব খোঁজার লড়াই" বলেই উল্লেখ করা হয়।[82] কারণ সুরক্ষিত, সহজ, সরল পারিবারিক অবস্থান থেকে অনেক মহিলা সংগ্রাম করে, পরিবারের আর্থিক দায় নিতে বাধ্য হন। কখনো কখনো নিজের সর্বস্ব দিয়ে সংসার বাঁচাতে হয়েছে। যেমন স্বামী, সন্তানের প্রতিপালনের জন্যে বাধ্য হয়ে জনৈকা সুলেখার কলকাতার কুখ্যাত হাড়-কাটা গলিতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা; যা বর্ণিত হয়েছে জয়ন্তী মৈত্র কাঞ্জিলালের *"দেশভাগ: বিপন্ন প্রান্তিক নারী"* গ্রন্থে। নীলা দত্তের *"ছিন্নমূলের ডায়েরি'*র পাতা থেকে উঠে আসে পরিবারের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য উদ্বাস্তু নারীর জীবনের করুন আত্মত্যাগের কাহিনী। উঠে আসে নিজের শরীর বেচে মান-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তাদের

---

[81] Butalia, Urvashi : "Community, State and Gender onr Women's Agency during Partition" *Economic and Political Weekly*, April 24, 1993, Vol. 28, No.17, pp. ws-13-14.

[82] Jasodhara Bagchi and Subhoranjan Dasgupta (ed.), *The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India edited,* (Kolkata: Stree, 2003), pp. 75-77.

টিকে থাকার কথা। "প্রায়ই দেখা যেত কিছু কিছু মহিলা অনুপস্থিত। বিছানা পাতা আছে, অথচ লোক নেই। পরে প্রকাশ পেল বাড়তি রোজগারের জন্য ওরা রাত্রে বেরিয়ে যেত। বাউন্ডারির বেড়ার তলা দিয়ে গর্ত কেটে রানাঘাট শহরে চলে যেত দেহব্যবসা করতে।"[83] যশোধরা বাগচী, *"পরিযায়ী নারী ও মানবাধিকার"* এ যথার্থই বলেছেন "পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী জন্মসূত্রে পরিযায়ী।" "বিশ্বব্যাপী নারী অভিবাসনের ঘটনা ঘটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পরিবেশ সঙ্কট, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বাতাবরণে এবং অপহৃতা, নির্যাতিতা হয়ে নারী এক পুরুষ হতে অন্য পুরুষের হাতবদল হয় পণ্যের ন্যায়। তাদের শরীর পুরুষের আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হতে বাধ্য হয়।"[84] উদ্বাস্তু নারীরা যে শুধু অপরাপর ধর্মের পুরুষদের দ্বারাই লাঞ্ছিত হতেন তাই নয়, বহু ক্ষেত্রে নিজ ধর্মের লোকেরাও তাদের অসহায়তার সুযোগ নিত। আর তাদের আত্মীয়-পরিজন এমনকি বাবা-মাও বহু ক্ষেত্রে ধর্ষিত হবার আগে স্বহস্তেই তাদের খুন করত, কারণ তাদের কাছে সম্মান ছিল জীবনের থেকেও দামি।[85] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করতে থাকে। এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে দেখা যেত নারী, অনাথ শিশু এবং 'Unattended girls'. এই উদ্বাস্তু নারী ও অনাথ শিশুদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল পি.এল.ক্যাম্প ও হোমে। তবে পি.এল.ক্যাম্প ও হোমগুলির অবস্থা ভয়াবহ ছিল। একসময় সিনেটর এডওয়ার্ড কিনেডি ক্যাম্পগুলিতে গিয়ে দেখেন অপুষ্টির অভাবে বহু শিশুর মৃত্যু হচ্ছে এবং মৃতদেহগুলি ঠিকমতো সৎকার করার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না।[86]

গার্গী চক্রবর্তীর '*Coming Out of Partition: Refugee Women of Bengal*'-এ লিঙ্গভিত্তিক ইতিহাস চর্চায় দাঙ্গার ফলে ভুক্তভোগী মহিলারা স্থান পেয়েছেন, তা শুধু তাদের বেঁচে থাকার করুণ চিত্র নিয়ে নয় বরং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকেও বিবেচনা করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নারীদেরকে দেশভাগের হিংসাত্মক সংঘাতে সবচেয়ে বড় শিকার 'অবলা নারী' হিসেবে দেখানোর মনোভাব থেকে বেরিয়ে এসে লেখিকা এই সকল মহিলাদের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়া, রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ঘটনা উল্লেখ করে তার 'রনংদেহী যুদ্ধং দেহী' রূপ এঁকেছেন।[87]

---

[83] নীলা দত্ত, *ছিন্নমূলের ডায়েরি,* (কলকাতাঃ ঋত প্রকাশন, ২০১৬), পৃ. ২৮।

[84] যশোধরা বাগচী, *পরিযায়ী নারী ও মানবাধিকার,* (কলকাতাঃ সেতু প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ১০।

[85] যশোধরা বাগচী, *নারী ও নারীর সমস্যা,* (কলকাতাঃ অনুষ্টুপ, ২০১২), পৃ. ১০৫-৭।

[86] Asha Hans, 'Refugee Women and Children Need for Protection and Care', in Ranabir Samaddar (ed.), *Refugees and the State Practices of Asylum and Care in India, 1947-2000,* (New Delhi: Sage Publication, 2003), p. 373; Sandip Bandyopadhyay, 'Millions Seeking Refuge: The Refugee Question in West Bengal: 1971', in Pradip Kumar Bose (ed.), *Refugees in West Bengal: Institutional Practices and Contested Identities*, (Calcutta: Calcutta Research Group, 2000), p. 39.

[87] Gargi Chakravartty, *Coming Out of Partition: Refugee Women of Bengal,* (New Delhi: Bluejay Books, 2005), pp. xi-xiv.

পৌলমী চক্রবর্তী তার '*The Refugee Woman'* গ্রন্থে পূর্ব-বাংলার উদ্বাস্তু নারীদের জীবন, তাদের উপর হিংসা ও রাজনৈতিক ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি দেখিয়েছেন তারা কিভাবে সক্রিয়ভাবে বামপন্থী আন্দোলন বা প্রতিবাদে অংশ নিয়ে নিজেদের পরিচয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং দুটি উপন্যাস—জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা' এবং সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি' এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের দ্বারা নারীদের আখ্যানকে তিনি তার গ্রন্থে চিত্রিত করেছেন।[88]

"চেনা মাটি, চেনা চারপাশ, চেনা পাড়া—এই সবকিছুর সঙ্গে বিচ্ছেদের মুহূর্তে ভেতরে যেন একটা ভাঙনের শব্দ বাজে। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যাওয়ার মধ্যেও যে বেদনা, সেটা কেবল স্থান বদলের কষ্ট নয়। কিন্তু নিজের দেশ ছেড়ে, শিকড় উপড়ে অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা? সেটা অন্য মাত্রার। সেখানে শুধু স্থান নয়, নিজের অস্তিত্বের একটা অংশকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করার ব্যথা। এতদিনের বেঁচে থাকা, সব মুহূর্ত যেন অর্থহীন হয়ে যায়। চেনা বারান্দা, পাশের বাড়ির জানালা, পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকান, অফিস-ফেরত সন্ধ্যার আলো—সব যেন খাদের কিনারে ঝুঁকে পড়ে। সেই কষ্টটা শুধু ছেড়ে যাওয়া নয়, নিজেকে হারিয়ে ফেলার, চিরতরে কিছু হারিয়ে যাওয়ার অসহ্য যন্ত্রণা"।[89] সুকুমার রায় বেঁচে থাকলে তার 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ এই ভাঙার আওয়াজের বর্ণনা কিভাবে দিতেন তা অনুমান করা যায় না, তবে দেশভাগ দেশত্যাগ এই ঘটনাগুলি বাস্তুচ্যুত মানুষের জীবনে যে ভাঙনের সুর বাজিয়েছিল তার আভাস পল্লব দাস ও অরিজিৎ ভট্টাচার্যের এই লেখায় কিছুটা পাওয়া যায়। উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব, কিংবা ত্রাণ, পুনর্বাসন ও অন্যান্য সমস্যা থেকে উত্তরণের পরেও যে সমস্যা বা সংকট দীর্ঘদিন তাদের জীবনকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছিল তা ছিল পরিচয় সংকট বা 'Identity Crisis'. কারণ দেশত্যাগের ফলে একজন উদ্বাস্তু কেবলমাত্র তার ভিটে জমি বা আত্মীয় পরিজনদেরই পেছনে ফেলে আসেন না, ফেলে আসেন তার সামাজিক স্থিতাবস্থা (social status), সমাজে গড়ে ওঠা তার ইমেজ, সম্মান, সমীহ, তার জীবন ধারণ, পরিচিত চারপাশের ব্যক্তি ও বস্তুর সঙ্গে তার মানসিক সমীকরণ, আর্থ-সামাজিক (socio-economic) ও মনো-সামাজিক (socio-psychic) ভিত্তি ইত্যাদি সবে মিলে তার সামগ্রিক পরিচয়। নতুন ঠিকানায় এসে ঠাঁই-নড়া মন তার হারিয়ে যাওয়া পরিচয়ের এইসব টুকরোগুলোকে পাজলের টুকরোর মতো জোড়াতালি দিয়ে তার পরিচয়ের পুরনো অবয়বকে ফিরে পেতে চায়। এক অপূরণীয় ক্ষতি তাদের যে মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে নামতে বাধ্য করে তা সবার অলক্ষ্যে ঘটে চলা নিরন্তর একটি প্রক্রিয়া। স্টিফেন কেলার তাঁর '*Uprooting and Social Change: The Role of Refugees in Development'*-এ দেখিয়েছেন জোরপূর্বক স্থানান্তরের ট্রমা উদ্বাস্তুদের ব্যক্তিত্ব, মনোভাব ও

---

[88] Paulomi Chakraborty, *The Refugee Woman: Partition of Bengal, Gender, and the Political,* (New Delhi: Oxford University Press, 2018).

[89] Pallab Das and Arijit Bhattacharya, *Divided Bengal: Impact of Partition (1947),* (Burdwan: Avenel Press, 2019), p. 9.

সামাজিক আচরণকে বহু বছর পরেও প্রভাবিত করে।[90] আবার রাবিন্দর কৌরের লেখায় 'শরণার্থী' থেকে "স্থানীয়" হয়ে ওঠার কাহিনী পাওয়া যায়। তবে এই লেখাগুলি পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের কেন্দ্র করে। বাংলার উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে শরণার্থী থেকে স্থানীয় হয়ে ওঠার যাত্রা অনেকের ক্ষেত্রেই আরো কঠিন ছিল।

১৯৮০-র দশকে জাতীয় স্তরের দেশভাগের ইতিহাস রচনার কাজ যেমন আঞ্চলিক স্তরে বিস্তার লাভ করেছিল, পরবর্তীকালে প্রাদেশিক স্তরের ইতিহাস রচনার পরিসর তেমন ভাবেই রাজ্য স্তর থেকে জেলা স্তরে বিবর্ধিত হয়েছিল। উদ্বাস্তু নিয়ে জেলাভিত্তিক কাজ একদম সাম্প্রতিকতম সংযোজন। এই সংযোজনে জাপানি সমাজবিজ্ঞানী টেটসূয়া নাকাতানির গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়, যা নদীয়া জেলার একটি বিশেষ গ্রামকে কেন্দ্র করে। পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের ওপর বিভিন্ন গবেষণা মূলক নিবন্ধ উল্লেখযোগ্য। রণবীর সমাদ্দারের *'The Marginal Nation'*, অসীম কুমারের গবেষণা, মনিকা মন্ডলের *'Settling the Unsettled'*-এ মালদা জেলার বিভিন্ন প্রসঙ্গ আংশিকভাবে উঠে এলেও তা এই জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের সামগ্রিক রূপকে তুলে ধরে না। মুর্শিদাবাদ জেলার ওপর ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দ্বিজাতি তত্ত্বের অবতারণায় ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বুকে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ধারণভূমি হিসেবে দুটি মুসলিম প্রধান জেলা মালদা ও মুর্শিদাবাদ–এই দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস চর্চা চোখে পড়ে না। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা ভিত্তিক যে কাজগুলি দেখা যায় তা মূলত আংশিক, এক বা একাধিক কোনো নির্দিষ্ট গ্রামকেন্দ্রিক, বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেখানে এই দুই জেলার উদ্বাস্তুদের উদ্বাসন, তাদের ত্রাণ, পুনর্বাসন, আর্থসামাজিক অবস্থা, উদ্বাস্তু রাজনীতি, উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর সামগ্রিক গবেষণা বা আলোচনা পরিলক্ষিত হয় না। সর্বোপরি মালদা মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে; সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দেশভাগ সংখ্যালঘু সংকট, দেশত্যাগ ও অভিবাসনের মাধ্যমে সমস্ত কিছুর উত্তরণ শেষে আবারো সেই সংখ্যালঘু হয়ে মুসলিম-প্রধান এলাকায় আশ্রয় নেওয়ার ঘটনায় যে বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়েছে তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা অনুসন্ধানেই বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলি রূপ পেয়েছে।

গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্নসমূহঃ

উদ্বাস্তু বিষয়ক যেকোনো গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণ, পরিচিত এবং প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্নের অবতারণা থেকে যায়। যেমন তাদের আগমনের কারণ, আগমন কাল, সমস্যা, সংগ্রাম, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি। বর্তমান গবেষণাতেও নির্বাচিত ক্ষেত্রে এই সকল সাধারণ, উদ্বাস্তু বিষয়ক কিছু প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হবে ও তার সঙ্গে বিশেষ কিছু প্রশ্নও থাকবে। বর্তমান গবেষণার মূল উপজীব্য হল পশ্চিমবঙ্গে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ।

[90] Stephen L. Keller, *Uprooting and Social Change: The Role of Refugees in Development,* (New Delhi: Manohar Book Service, 1975).

প্রাথমিকভাবে, গবেষণার সময়কালের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সময়ে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের পরিসংখ্যান, তাদের দেশত্যাগের কারণ, তাদের জীবন সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়গুলি জানা প্রয়োজন। এরপর অবশ্যই জানতে হবে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে তাদের আশ্রয় গ্রহণ, বসতি স্থাপন, তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন, তাদের জীবনযাত্রা, জীবিকা নির্বাহ, ও সর্বোপরি এই দুই জেলায় উদ্বাস্তু আগমন কি প্রভাব ফেলেছিল ইত্যাদি সম্পর্কে। যেকোনো উদ্বাস্তু সংক্রান্ত গবেষণা বা আলোচনায় ব্যবহৃত উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির অবতারণা বর্তমান গবেষণার সাধারণ কাঠামোস্বরূপ একটি অস্থিসমূহ সমন্বিত কঙ্কালের প্রতিরূপ নির্মাণ করবে ঠিকই কিন্তু তাতে রক্ত মাংস, সুঠাম পেশি, ত্বক ইত্যাদি সংযোজন করে সম্পূর্ণ অবয়ব গঠনে সাহায্য করতে প্রয়োজন উপরিউক্ত সাধারণ প্রশ্নগুলির বাইরে কিছু বিশেষ, কেন্দ্রীয় প্রশ্নসমূহ, যার অনুসন্ধানে বর্তমান গবেষণার সম্পূর্ণ অবয়ব বা প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন সম্ভব। বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত ভৌগোলিক ক্ষেত্রের স্থান মাহাত্ম্য পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংক্রান্ত গবেষণা থেকে একে ব্যতিক্রমী চরিত্রের অধিকারী করেছে। কারণ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই দুটি জেলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। যার ফলে, ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া দেশভাগে পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ করে উদ্বাস্তু হয়ে এই দুই জেলায় আশ্রয় নেওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যা এই দুই জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলো থেকে পৃথক করে রেখেছে। সেই কথা মাথায় রেখেই বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলির নির্বাচনেও সেই ব্যতিক্রমী সত্তার অনুষঙ্গ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, যে সমস্ত প্রশ্নগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র অধ্যায়ন করার সুযোগ হয়ত হবে না।

প্রথমতঃ যে ধর্মীয় বিভিন্নতা ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের কারণে এই দেশভাগ ও তার ফলশ্রুতিতে উদ্বাস্তু সমস্যার জন্ম; মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে তা কতটা প্রাসঙ্গিক ও কার্যকরী ছিল? কারণ তারা পূর্ববঙ্গেও যেমন সংখ্যালঘু ছিলেন, মুসলিম-প্রধান মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে এসেও তারা ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সেই সংখ্যালঘুই থেকে গেলেন। এক্ষেত্রে তাদের সংখ্যালঘু সংকটের উত্তরণ ও সমস্যার সমাধান কতখানি হয়েছিল? তাদের অবস্থানের পরিবর্তন, তাদের অবস্থার পরিবর্তনে কতটা সাহায্য করেছিল? দ্বিতীয়তঃ সমকালীন বিশ্বের দেশভাগ ও দেশভাগের ফলে উদ্ভুত উদ্বাস্তু সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনায় Minority and Migrant group integration (সংখ্যালঘু-অভিবাসী সহাবস্থান) একটি বহুলালোচিত বিষয়। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বিশেষ দুই জেলার স্থানীয় অধিবাসীদের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর পারস্পারিক অবস্থান বিনিময়ের কারণে উক্ত পরিভাষার পরিবর্তে 'Majority-Migrant group integration' (সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সহাবস্থান) নামক এই নতুন পরিভাষা জন্ম নিচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী ঘটনা। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে সংখ্যাগুরু ও অভিবাসী সমন্বয় কেমন ছিল তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার অবকাশ থেকে যায়। তৃতীয়তঃ দেশভাগ-পরবর্তী ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কলক্রমে কংগ্রেসের অধঃগমন ও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের হাত ধরে বঙ্গীয় রাজনীতিতে বামপন্থী দলগুলির ভীত শক্ত হয় ও প্রসার লাভ

করে। ১৯৭৭-এ ঘটে ক্ষমতার পালাবদল। প্রায় সমগ্র বাংলা জুড়ে যেখানে বামপন্থী রাজনীতির উত্থান ঘটে সেখানে এই দুই জেলার রাজনীতিতে বামপন্থী দলগুলি বহুদিন তেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বরং ('কংগ্রেসের গড়' নামে পরিচিত) এই জেলা দুটিকে দীর্ঘদিন যাবৎ কংগ্রেসের একাধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ কি? এই সকল কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই দুই জেলার ব্যতিক্রমী চরিত্রের সঙ্গে সাজুজ্য রেখেই আনুষঙ্গিক একটি প্রশ্ন হল ভারতীয় ডোমিনিয়নে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্তি।

গবেষণায় অনুসৃত পদ্বতিবিদ্যাঃ

বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলির উত্তর অন্বেষণের উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে, এর গতিপ্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসরণ করে বলা যায়, বর্তমান গবেষণা গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় প্রকার গবেষণার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। বর্তমান গবেষণার পদ্ধতিবিদ্যা তাই স্বাভাবিকভাবেই এই দুই প্রকার গবেষণার পদ্ধতিগত ভিত্তিকে অনুসরণ করবে। বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য অনুসন্ধান ও আহরণের ক্ষেত্রটি সুবিস্তৃত ও বহুমুখী।

বর্তমান গবেষণার নির্বাচিত ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু আগমন ও সমস্যাগুলিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য ও তুলনামূলক আলোচনার অগ্রসরে ভারত, পাঞ্জাব ও বাংলার বিভাজন এবং উদ্বাস্তু সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা সন্দর্ভ, গবেষণাধর্মী গ্রন্থ বা প্রবন্ধ, সমকালীন ও পরবর্তীকালীন দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সাহিত্য, আত্মজীবনী ও জীবনমূলক গ্রন্থ, স্মৃতিকথা, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতে অন্তর্ভুক্তির ইতিহাসকে ফিরে দেখতে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কর্মরত বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মী ও আমলাদের লিপিবদ্ধ করা নথি, বিশেষ করে ট্রান্সফার অফ পাওয়ার এর বিভিন্ন খন্ডে তুলে ধরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রসিডিংস, পার্টিশন প্রসিডিংশ-এর বিভিন্ন খন্ড এছাড়াও রেডক্লিফ ও ব্যাগে অ্যাওয়ার্ড সমূহের নথি বিশেষ সহায়ক হয়েছে। মহাফেজখানা লব্ধ বিভিন্ন সরকারি ফাইল, পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র অফিসের লেখ্যগার, ঐতিহাসিকদের একাউন্ট, ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা সম্বলিত বিবরণ যেমন,- হান্টারস একাউন্ট, এম ও কার্টারস রিপোর্ট, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার জনগণনা ও গেজেটিয়ারগুলিতে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে দেশভাগের পরিণতিতে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উপর র‍্যাডক্লিফ লাইনের আশু প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন দশকে প্রকাশিত ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ এবং মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার জনগণনা, বিভিন্ন সময় প্রকাশিত জেলা গেজেটিয়ার সমূহ মারফত এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের যাবতীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন কালপর্বে আগত উদ্বাস্তুদের জনসংখ্যা (লিঙ্গ, বয়স ও গ্রামীণ বা শহুরে অঞ্চলে বসবাসের ভিত্তিতে), তাদের ভারতে আসার সময় কাল, জন্মসূত্রে পূর্ববঙ্গের কোন জেলায় থেকে আসছেন, তাদের শিক্ষার হার, লাইভলিহুড বা জীবন ধারনের ধরণ সংক্রান্ত তথ্য, তাদের পেশা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি উপরোক্ত

পরিসংখ্যান ভিত্তিক তথ্যগুলির জন্য ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট সমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। এই সমস্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি তাদের শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, পেশা নির্বাচন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই পেশার পরিবর্তন, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, ও জীবনধারণের ধরনকে বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

এই সমস্ত মহাফেজখানা-নির্ভর, হাতে ছুঁয়ে দেখা প্রামাণ্য দলিল নির্ভর নির্জীব তথ্যের পাশাপাশি বাস্তব জীবনকে প্রত্যক্ষ করা, চোখের সামনে থেকে দেখা বিভিন্ন ঘটনার অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহনকারী জ্যান্ত অস্তিত্বের মৌখিক ভাষ্য মালদা মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস রচনার কাজে এক অন্যতম উপাদান বা হাতিয়ার। এজন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত দেশান্তরী মানুষদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা তাদের উত্তর প্রজন্মের মুখনিঃসৃত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগ, জীবন সংগ্রাম এই দুই জেলাকে বেছে নেওয়া, পুনর্বাসন, স্থানীয়দের প্রতিক্রিয়া, সামাজিক মেলামেশা, তাদের শিক্ষা জগৎ, কর্ম জগৎ, রাজনীতি, সমাজ সম্পর্কিত উদ্ভূত বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এর জন্য মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনিতে বসবাসকারী উদ্বাস্তু পরিবারগুলি চিহ্নিতকরণ, তাদের কাছে পৌঁছোনো এবং সরাসরি তাদের মুখ থেকে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ সংগ্রহের এক সুদীর্ঘ, আয়াসসাধ্য পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। এই মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করার কাজে সাক্ষাৎকার দানকারী মানুষদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক স্তর, বর্ণ, পেশা, শ্রেণি, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বহনকারী দেশান্তরী মানুষদের সন্ধান পাওয়া যায়নি, তাদের ক্ষেত্রে তাদের উত্তর প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি এই সকল মানুষের বক্তব্যের সমর্থনে এবং সঠিক দিকনির্দেশনায় তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্র, পত্রিকা, মহাফেজখানার দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র, ফাইলসমূহ ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন, উদ্বাস্তুদের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা, পদক্ষেপ, পরিকল্পনা, পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, সীমাবদ্ধতা, সমস্যা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদির জন্য কেন্দ্র সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত এস্টিমেট কমিটি সমূহের রিপোর্ট, লোকসভার বিতর্ক, রাজ্য সরকারের ‘উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রক’ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত ম্যানুয়াল সমূহ, বিভিন্ন ওয়ার্কিং কমিটির রিপোর্ট, ফ্যাট ফাইন্ডিং কমিটির রিপোর্ট, বিভিন্ন স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভের রিপোর্টগুলি, ব্যক্তিগত ও সরকারি চিঠিপত্র ইত্যাদি এই সন্দর্ভের রসদ জুগিয়েছে।

এই দুই জেলার অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিসরে উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাব আলোচনায় প্রথমে সংশ্লিষ্ট জেলার ইতিহাস এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত বহুবিধ গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- 'ভারতবর্ষ', ' তিন কুড়ি দশ', ' বাঙ্গালার ইতিহাস', ' আদ্যের গম্ভীরা', মালদা ও মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত যথাক্রমে 'গৌড় বার্তা' ও 'মহার্ণব' নামক লিটল ম্যাগাজিন প্রভৃতি। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা

থেকে প্রকাশিত স্থানীয় পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িকী, প্রতিবেদন ও লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে প্রকাশিত জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের নিয়ে বিভিন্ন লেখালেখি, এই দুই জেলার বিভিন্ন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও লেখা থেকেও ভাষা, সাহিত্য, খাদ্যাভ্যাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের অনুসন্ধানে সাহায্য করে। উদ্বাস্তু আগমনের রাজনৈতিক প্রভাব বুঝতে এই দুই জেলার বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচনসমূহের নির্বাচনী কেন্দ্র, প্রার্থী, ফলাফল প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে ইলেকশন ডাইরেক্টরি, ও জেলা গেজেটিয়ারসমূহ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান কার্যালয়লব্ধ তথ্যসমূহ বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

উপরিউক্ত যাবতীয় উপাদানগুলি সংগ্রহের জন্য কলকাতাস্থিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানা, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বা সংবাদপত্রের লেখ্যগারের পাশাপাশি কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার বিশেষ সহায়ক হয়েছে। প্রতিবছর মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অনুষ্ঠিত বইমেলা, জেলা গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন পুস্তাকালয়গুলির বহু আকর গ্রন্থের যোগান দিয়েছে। এছাড়াও বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, আর্কাইভ, জাতীয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার, সর্বোপরি বৈদ্যুতির মাধ্যমের আন্তর্জালিক সুবিস্তৃত তথ্য ভান্ডার সমস্ত কিছুই পদ্ধতিবিদ্যার অঙ্গ হয়ে বর্তমান গবেষণাকে সাকার করতে সাহায্য করেছে।

অধ্যায় বিভাজনঃ

প্রথম অধ্যায় **"দেশভাগ: প্রস্তুতি ও পরিণতিতে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা":** বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলি উত্থাপনের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক ঘটনা সূতিকাগারের ভূমিকা পালন করছে তা নিঃসন্দেহে ভারতীয় ডোমিনিয়নে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্তি। ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগের মুহূর্তে এই দুইটি জেলাই ছিল মুসলিম-প্রধান। কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়টি বিবেচনা করলে এই দুই জেলার পাকিস্তান ডোমেনিয়ানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোন অনিবার্য কারণে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা এবং আংশিক ভাবে মালদা জেলা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করা হল এই অধ্যায়ে তারই অবতারণা করা হয়েছে। অবিভক্ত বঙ্গীয় প্রদেশের প্রধানত কলকাতা-নির্ভর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবক উপাদান হিসেবে এই দুই জেলার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতভুক্তিকে বোঝার জন্য তৎকালীন বাংলা প্রদেশের রাজ্য-রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাদেশিক রাজনীতির পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক কিছু দেশীয় রাজনীতির অনুষঙ্গও আলোচনা প্রসঙ্গে এসে পড়েছে। বাংলা বিভাজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দুই বঙ্গের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের জন্য সীমানা কমিশন গঠন, বাংলা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে তৎকালীন বাংলা ও বাংলার বাইরে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির দর-কষাকষি, তাদের দাবিগুলির পেছনে যুক্তি, পাল্টা যুক্তির তরজা, মানচিত্রসহ দুই পক্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর দাবিকৃত, বাংলার অঞ্চলসমূহ সীমানা কমিশনের কাছে প্রস্তাব পেশ করা; মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগ্য নির্ধারণের আলোচনায় এই ক্রম অনুসৃত হয়েছে। এই দুই জেলার ভারতে

অন্তর্ভুক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি স্বীকার স্বরূপ খুলনা জেলার পূর্ববঙ্গে অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। দেশভাগের প্রস্তুতি লগ্নে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে এই দড়ি টানাটানি শেষে চূড়ান্ত পরিণতিস্বরূপ রেডক্লিফের রোয়েদাদ অনুসারে এই দুই জেলার ক্ষেত্রে সীমানা রেখা কিভাবে অনুসরণ করা হবে মানচিত্র সহযোগে তা তুলে ধরা হয়েছে।

ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকে গৌড়বঙ্গের গৌরব স্বরূপ অবিভক্ত মালদা জেলা ও নবাবী আমলে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ জেলার সুখ্যাতির সাক্ষ্য বহন করে। বস্ত্র বয়ন শিল্প, রেশম শিল্প, পিতল ও কাঁসা শিল্প, হাতির দাঁতের কাজ, সোনার কাজ, মাটির কাজ, বিদরীর কাজ, আম ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ এই দুই জেলার সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জনের উল্লেখ পাওয়া যায় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাঙ্গালা'য়। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মতো এই দুই জেলারও অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলাগুলির সঙ্গে স্থল ও জলপথে যে যোগাযোগ, কৃষি-শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আমদানি-রপ্তানিতে প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে; একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা এই যোগাযোগের হঠাৎ ছেদে এই দুই জেলার অর্থনীতি ও জনজীবনের ওপর কিছু আশু প্রভাব পড়েছিল বইকি। এই রেডক্লিফ লাইনের দরুন বিশেষত মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে কি কি খেসারত দিতে হয়েছিল কিছু ঘটনা সাপেক্ষে তা তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় **"উদ্বাসন, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন ও সরকারি মনোভাব: একটি প্রেক্ষাপট":** বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিশেষ ভৌগোলিক পরিসরে যে বিশদ উদ্বাস্তু আলোচনা প্রয়োজন তার প্রকৃত অনুধাবন, সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন ও উদ্বাস্তু সমস্যার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ছাড়া অসম্ভব। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, দেশভাগ ও জাতি রাষ্ট্র গঠনের জন্মলগ্নে এই দুই শিশু রাষ্ট্রের আর্থ-রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন পরিস্থিতি দুই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যে দোদুল্যমান অবস্থায় ঠেলে দিয়েছিল তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে সংখ্যালঘুদের পশ্চিমমুখী স্রোতের তুলনায় পূর্বমুখী স্রোতের ক্ষীণতা পশ্চিমবঙ্গবাসী সংখ্যালঘুদের তুলনায় পূর্ববঙ্গবাসী সংখ্যালঘুদের দোদুল্যমান অবস্থার ব্যাপকতাকে প্রকাশ করে। এই অধ্যায়ের প্রথমে, দুই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের বুকে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু জনগনের আগমনের পরিসংখ্যান তালিকাসহ তুলে ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের এই উদ্বাসনের কারণ অর্থাৎ তাদের নিজ দেশত্যাগে বাধ্যকারী বিভিন্ন কারণসমূহ, বিভিন্ন গবেষণা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ, সরকারি, বেসরকারি দলিল সমূহের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের জনসমুদ্র পশ্চিমবঙ্গের বুকে তরঙ্গের আকারে আছড়ে পড়লে নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতবর্ষের বুকে আত্মপ্রকাশিত সদ্য বিভাজিত, সর্বকনিষ্ঠ এই সীমান্ত রাজ্যকে তার কর্তিত কলেবর, সীমায়িত

ভূমিভাগ ও খর্বীকৃত অর্থনৈতিক কাঠামো, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সাদরে অভ্যর্থনা করার সাহস যোগাতে পারেনি। এই রাজ্যে পূর্ব থেকে বিদ্যমান অতি জনঘনত্বের পাশাপাশি ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তীয় উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতি কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর পার্থক্য সমস্যাটিকে আরো জোরালো ও ঘোরালো করে তোলে। বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপায়ন এবং অনুদানের পরিমাণে পরতে পরতে পাঞ্জাব ও বাংলায় যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্র সরকারের বৈষম্যমূলক মনোভাব ও নীতি কোনো মুখোশ ছাড়াই আত্মপ্রকাশ করেছিল। স্বনির্ভর যে শ্রেণি পশ্চিমবঙ্গে এসে নিজের চেষ্টায় অথবা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় নিজেদের পুনর্বাসিত করেছিলেন তাদের অবস্থা ততটা খারাপ না হলেও; অর্থহীন, সম্পদহীন ও শিক্ষা বা বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে সক্ষমতাহীন কপর্দকশূন্য অবস্থায় নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে এসেছিলেন সরকারের মুখাপেক্ষী সেই সব কৃষি-নির্ভর কায়িক শ্রম-নির্ভর শ্রেণির অবস্থা হয়েছিল সবথেকে খারাপ। যে পরিত্রাণের আশায় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে তারা পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন; গন্তব্যে পৌঁছে তাদের বঞ্চনা, লাঞ্ছনা ও অবহেলাকে আশ্রয় করে সেই যাত্রা থেমেছিল শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, উদ্বাস্তু ত্রাণ শিবিরের তাঁবুর তলার দমবন্ধকর পরিবেশ ও দণ্ডকারণ্যের কানাগুলিতে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনে রাজ্যটিকে কোন কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ বাস্তুতাগী, গৃহহীন, সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলোর প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মনোভাব, ও তাদের নীতি-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ হয়েছে। বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত ভৌগলিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশ্নসমূহ ও আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানে এই অধ্যায় ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচনা করেছে।

তৃতীয় অধ্যায় **"উদ্বাসন, মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমন, ও তাদের জীবন সংগ্রাম":** এই অধ্যায় দিয়েই বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত ভৌগলিক ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত। পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনার ভিত্তিতে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু জনগণের উদ্বাসনের বিষয়টি বিভিন্ন কারণ সাপেক্ষে তুলে ধরা হবে। তাদের দেশত্যাগের পেছনে সামগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কারণগুলির অনুরূপতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান করা হবে। এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের তাদের দেশত্যাগের কারণের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করে স্তম্ভ চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হবে। পাশাপাশি অন্যান্য জেলার উপর অনুরূপ গবেষণালব্ধ ফলাফলের তুলনামূলক আলোচনা থাকবে। এই আলোচনাকে অনুসরণ করবে, বিভিন্ন দশকের বিভিন্ন সময়ে এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তু জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সমূহ, যা বিভিন্ন তালিকাসহ উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি সেই সংখ্যা, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তু জনসংখ্যা এবং এই দুই জেলার মোট জনসংখ্যার নিরিখে আনুপাতিক অংশে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে তা বিশ্লেষণ করা হবে। পরবর্তী অংশের আলোচনায় এই অধ্যায়ের সবচেয়ে কৌতুহলী এবং অন্যতম প্রধান একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হবে, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের একাংশের মালদা ও মুর্শিদাবাদ দুটি মুসলিম-প্রধান জেলাকে আবাসস্থল হিসেবে বেছে

নেওয়ার কারণ শীর্ষকে। বিভিন্ন প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়সমূহ যেগুলি দেশ-ছাড়া, গৃহহারা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু জনগণের মনে এই দুই জেলাকে তাদের বসতি স্থাপনের জন্য পছন্দের তালিকায় এনে দিয়েছিল বা আনতে বাধ্য করেছিল সেগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা থাকবে।

ঘর ছেড়ে অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভের দিন থেকে পুনরায় ঘর-বাঁধা ইস্তক এই পথ তাদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না বরং ছিল কন্টকাকীর্ণ। অধ্যায়ের সর্বশেষ অংশে তাই তুলে ধরা হবে এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তু জনগণের সংগ্রামের দিনগুলি। অনেকেই হয়ত সরকারি চাকরিতে অপশন দিয়ে সসম্মানে অথবা অর্থ-বিত্তশালী শ্রেণি তাদের সম্পদের জোরে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও কারিগর শ্রেণি তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে, কেউ রেল, কেউ স্টিমার, কেউবা বাস-ট্রাকে করে এদেশে এসে অর্থ উপার্জনের জন্য নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে জীবিকা নির্বাহ করতে পেরেছিলেন। এরা যারা নিজেদের চেষ্টায় ও পরিচিতের সহায়তায় নিজেদের পুনর্বাসিত করেছিলেন, তাদের সংগ্রামের কাহিনী ততটা করুণ রসের উদ্রেক না। কিন্তু যারা শামিল হয়েছিলেন, যে যার সাধ্যমতো সামান্য কিছু সম্বল, রাস্তার রসদ, পোশাক পোঁটলা-পুঁটলি, ঝুড়ি-ঝাঁকায় ভরে কোলের সন্তানটিকে কাঁখে করে, ভয়ে-আতঙ্কে-আশঙ্কায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ঝুঁকির সীমানা পারাপারে, ছেলের কাঁধে চড়ে চলা অসুস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাবা-মা, ঝাঁকায় বোঝাই আসন্ন প্রসবা গর্ভবতী মহিলা কিংবা সদ্যোজাত মা-হারা শিশুর কান্নায়, শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মনুষেতর জীবন গুজরানে, ইন্টারসেপশন সেন্টারের লাইনে, 'প্রাইভেসি', 'গোপনীয়তা' শব্দগুলোকে পরিহাস করে গোয়ালে ঠাসা গবাদি পশুর ন্যায় একটি তাঁবুতে ২০টি পরিবারের একত্রবাসে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন রোগ-প্রবণ, ভিন রাজ্যের বিজন, পরিত্যক্ত প্রান্তরের ঊষর ভূমিতে দণ্ডকারণ্যে; সে সকল মানুষের জীবন সংগ্রামের স্বরূপ উদঘাটন সাদা কাগজের গায়ে কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে সম্ভবপর হয় না। তবুও এই অধ্যায়ের শেষাংশ এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের 'উদ্বাস্তু-জীবনযন্ত্রণা'কে বোঝার চেষ্টা করবে, যেখানে অবশ্যই নারী উদ্বাস্তুদের সংগ্রাম বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হবে।

চতুর্থ অধ্যায় **"মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন":** যেকোনো বাস্তুচ্যুতি (displacement) ও উদ্বাস্তু (refugee) সংক্রান্ত আলোচনায় উদ্বাস্তু আগমনের পরবর্তী প্রসঙ্গ অবশ্যই তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন (relief and rehabilitation) ব্যবস্থা। এই অধ্যায়ে প্রথম অংশে স্বাভাবিকভাবে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা অগ্রসর হবে। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মনোভাব স্পষ্ট করা হয়েছে, এই অধ্যায়ে সরকার দ্বারা বিভিন্ন কালপর্বে আগত উদ্বাস্তুদের শ্রেণিকরণ অনুসরণ করে সেই মোতাবেক ভিন্ন ভিন্ন কাল পর্যায়ে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা হবে। যা এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য ও প্রাসঙ্গিক। এর সঙ্গে এই দুই জেলার বিভিন্ন থানায় সরকারি, সরকার অনুমোদিত, জবরদখল ও প্রাইভেট উদ্বাস্তু কলোনিগুলির পরিচয় দেওয়া হবে।

অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচনায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা এই দুই জেলার কোথায় কোথায়, কত সংখ্যায় আশ্রয় গ্রহণ ও বসতি স্থাপন করেছিল তা পরিসংখ্যানসহ তালিকার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। অধ্যায়ের প্রথমাংশের আলোচনায় এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অধ্যায়ের তৃতীয়াংশের আলোচনায় এই দুই জেলায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাদের জীবিকা নির্বাহ, নিজস্ব ক্ষমতা ও যোগ্যতার বলে পেশার নির্বাচন, বিভিন্ন পেশায় তাদের নিযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে আলোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে তারা কতটা পূর্ববঙ্গে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পেশাকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা এই পেশার পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছিলেন তাও আলোচনা করা হবে। বিভিন্ন দশকে এই দুই জেলার উদ্বাস্তুদের পেশার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন এসেছিল কিনা তেমনটা হয়ে থাকলে বিভিন্ন পেশায় জীবিকা নির্বাহ করার ক্ষেত্রে সুযোগ ও সমস্যাগুলি কি ছিল তা অনুসন্ধান করা হবে। উদ্বাস্তু কর্মীদের মধ্যে পেশাগত দশকীয় পরিবর্তন তাদের রুচি-পছন্দ ও কোন বিশেষ ঝোঁকের প্রতি ইঙ্গিত করছিল বিভিন্ন পরিসংখ্যানের সাপেক্ষে তার বিশেষণ করা হবে। পুরুষের পাশাপাশি এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তু নারীদের পেশাক্ষেত্রে অবস্থান, অংশগ্রহণ ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই অবস্থানের পরিবর্তন, তাদের অর্জিত দক্ষতা, পেশা নির্বাচনে তাদের রুচি ও পছন্দের প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে বিশেষ নজর থাকবে।

পঞ্চম অধ্যায় **"মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাব":** ইতিহাসে যেকোনো গণস্থানান্তর ও অভিবাসনের ঘটনায় প্রাথমিকভাবে সেই স্থানের স্থানীয় অধিবাসী ও আগত অভিবাসীদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হলেও পরবর্তীকালে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই পক্ষের পারস্পরিক আদান-প্রদানের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তা হতে পারে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক, রাজনৈতিক যেকোনো পরিসরে। এই দুই শ্রেণির মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি, রুচি, ভাবধারা, দক্ষতা, শৈলী সব মিলে তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় এক নতুন সমাজের চিত্র পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। একইভাবে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমনে প্রাথমিকভাবে যে স্থানাভাব, খাদ্যাভাব, কর্মসংস্থানের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব, চিকিৎসাক্ষেত্র, পানীয় জল, রাস্তাঘাট ইত্যাদির অপর্যাপ্ততা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতোই এই দুই জেলার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেছিল, তেমনি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এই সকল মানুষদের হাত ধরেই কিভাবে আবার গ্রামের প্রসার, নগরায়ন, নতুন নতুন জনপদের আত্মপ্রকাশ, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে বিকাশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদিতে অগ্রগতি চোখে পড়তে থাকে। তার প্রতি আলোকপাত করা হবে এই অধ্যায়ে। বর্তমান গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্নগুলির বেশিরভাগেরই উত্তর ধারণ করে সন্দর্ভের পরিনতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই অধ্যায়। উপরিউক্ত প্রসঙ্গসকল অনুসরণ শেষে; পশ্চিমবঙ্গের দুই মুসলিম-প্রধান জেলা মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমনে 'সংখ্যাগুরু-অভিবাসী' বা 'সংখ্যাগুরু-উদ্বাস্তু সহাবস্থান'এর যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেই সহাবস্থান প্রকৃতপক্ষে কতখানি সম্ভব হয়েছে বা কোন পথ ধরে এই জেলা দুটির সংখ্যালঘু উদ্বাস্তু জনগণের সামাজিক আত্তীকরণ ঘটেছে তা

বর্তমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র সমীক্ষা মারফত প্রাপ্ত সরাসরি তাদের মুখনিঃসৃত অভিজ্ঞতাসমূহের সাপেক্ষে পর্যালোচনা করা হবে। পাশাপাশি অপর একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন, উদ্বাস্তু আগমনে এই দুই জেলার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি কোন পথে মোড় নিয়েছিল তার অনুসন্ধান করা হবে।সবশেষে উপসংহারে বর্তমান গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও নব উন্মোচিত প্রাপ্তিগুলি আধৃত রয়েছে।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৪৭-এর দেশভাগের ফলে ভারতবর্ষের দুই প্রান্তে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে নতুন করে যে ইতিহাস চর্চার সূচনা করেছিল তার মূল দুটি শাখার একটি হল পাঞ্জাবকেন্দ্রিক ও অপরটি পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক উদ্বাস্তু ইতিহাস আলোচনায় বিভিন্ন জেলাভিত্তিক, সামাজিক শ্রেণি ও লিঙ্গভিত্তিক গবেষণাগুলি হয়েছে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা, মালদা ও মুর্শিদাবাদের উদ্বাস্তু ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস এই বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভ। এই গবেষণার সময়কাল ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হলেও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিসরে এই গবেষণার আলোচ্য বিষয়বস্তুর সম্যক ধারণা পেতে ১৯৪৭ পূর্ববর্তী ১৯৭১ পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনার সূত্র টানা হয়েছে, যদিও ১৯৪৭-১৯৭১ এই সময়কালকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হল।

প্রথম অধ্যায়ঃ- দেশভাগঃ প্রস্তুতি ও পরিণতিতে মালদা ও মুর্শিদাবাদ।

ভূমিকাঃ

১৯৪৭ সালের ৩-রা জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লর্ড মাউন্টব্যাটেন একটি প্রস্তাব পেশ করেন যা 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনা অনুসারে ভারত বিভাজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং ১৮-ই জুলাই Indian Independent Act বা 'ভারতের স্বাধীনতা আইন' পাস হওয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের বিভাজনের বিষয়টি পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল। মাউন্টব্যাটেনের পরবর্তী কাজ ছিল বাংলা ও পাঞ্জাবের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের জন্য দুটি সীমানা কমিশন গঠন করা। বাংলা সীমানা কমিশনের চারজন সদস্য ছিলেন চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিজন কুমার মুখোপাধ্যায়, আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরাম এবং এম এ রহমান এবং কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ।[1] এই চারজন বিচারক প্রতিনিধিত্ব করছিলেন দুটি প্রধান দলের; কংগ্রেস পরিচালিত 'কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি' এবং 'মুসলিম লীগ'।[2] এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল মাত্র ছয় সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে দুই দেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা টানা। ১২-ই আগস্ট র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল এবং ঠিক হয় ১৪ ও ১৫-ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তানকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেওয়া হবে।[3] র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে যে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, ভাইসরয় পর্যন্ত স্বীকার করে বলেন যে সেটি নিশ্চিতভাবে উভয় দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে নিদারুণ ক্ষোভের উদ্রেক করবে।[4] এই বিভাজনের ফলে পশ্চিম-পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষেরা পূর্ব পাঞ্জাব তথা ভারতে চলে আসতে এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা পশ্চিম-পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। অন্যদিকে, পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে চলে আসতে এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।[5] এটা পরিষ্কার যে ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি কোনো সমাধান এনে দিতে পারেনি, যদিও দেশভাগকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয় এবং তার দরুন নবগঠিত এই দুই দেশকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় হতে হয়েছিল। আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় দেশভাগের কারণ হিসেবে প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ সরকারের 'Policy of Divide and Rule'কে দোষারোপ করা

---

[1] *Reports of the Bengal and Punjab Boundary Commission (Radcliffe Award)*, Government of India, New Delhi, 1958, pp. 1-4.

[2] *Partittion Proceedings*, vol-iv, pp. 29-115.

[3] Bidyut Chakrabarty, *The Partition of Bengal and Assam, 1932–1947,* (London and New York: Routledge Curzon, 2004), pp. 156-68.

[4] Tan Tai Yong and Gyanesh Kudaisya, *The Aftermath of Partition in South Asia*, (London and New York: Routledge, 2000), pp. 81-85; জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন: বাংলা ও ভারত, ১৯৪৭-৬৭,* আবু জাফর অনূদিত, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০), পৃ. ২১-২২।

[5] Tan and Gyanesh, *The Aftermath of Partition in South Asia*, pp. 90-97.

হলেও তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জাতীয়তাবাদী নেতাদের দিকেও অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছিল। ১৯৪৭ সালের ১৭-ই আগস্ট র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের ঘোষণার পর অনেকেই ভেবেছিলেন যে সব সমস্যার সমাধান হয়ত হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আজও কিছু সমস্যা রয়েই গেছে।

১. ১ সলতে পাকানোঃ দড়ি টানাটানি প্রতিযোগিতাঃ

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ৩-রা জুনের (১৯৪৭) পরিকল্পনা অনুসারে, Bengal Legislative Assembly ভেঙে দুটি দল তৈরি করা হয়েছিল। একদিকে প্রতিনিধিত্ব করছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার নির্বাচিত সদস্যরা এবং অন্যদিকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার নির্বাচিত সদস্যরা। উদ্দেশ্য ছিল, যেকোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যদি প্রদেশ ভাগের পক্ষে ভোট দেয় তাহলে বাংলাকে ভাগ করা হবে।[6] ২০-ই জুন তারা ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে মিলিত হয় এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার প্রতিনিধিরা বাংলা ভাগের পক্ষে, অন্যদিকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার প্রতিনিধিরা বাংলা বিভাজনের বিপক্ষে ভোট প্রদান করেছিলেন।[7] এইভাবে সরকারি ঘোষণা জারি হওয়ার মাত্র ১৭ দিনের মাথায় দেশ বিভাজনের অপ্রতিরোধ্য পরিণতির সিদ্ধান্তে সীলমোহর পড়ে।

বাংলা ভাগ করাকে কেন্দ্র করে Bengal Provincial Muslim League-এর ভেতরে আবার বিভাজন তৈরি হয়েছিল। এই Bengal Provincial Muslim League- এর মধ্যে একদিকে ছিলেন হোসেন সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং অন্যদিকে ছিলেন খাওয়াজা নিজামুদ্দিন। মুসলিম লীগকে এই মতপার্থক্য প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ, বাংলা বিভাজনের উপর আগ্রহ ছিল শুধুমাত্র নিজামুদ্দিনের পার্টির, সেটাও খুব অল্প। অন্যদিকে সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আব্দুল হাসিম দুজনই চেয়েছিলেন 'ঐক্যবদ্ধ ও সার্বভৌম বাংলা', যা ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের থেকেই স্বাধীন থাকবে। তাতে স্থানীয় অগ্রগণ্য কংগ্রেস নেতা শরৎ বোস সমর্থন জানিয়েছিলেন।[8] জানা যায়, বাংলাকে উত্তর-পশ্চিমের মুসলিম প্রদেশগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দী আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। স্বাধীন বাংলা গঠনের জন্য ১৯৪৭ সালের ২৬-শে এপ্রিল তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গেও দেখা করেন।[9] এই একই উদ্দেশ্যে ওই বছর

---

[6] *Partittion Proceedings,* vol-i, p. 2.

[7] The Mountbatten Viceroyalty Announcement and Reception of the 3 June Plan 31 May-7 July 1047, in N. Mansergh and P. Moon (eds.), *Constitutional Relations between Britain and India: The Transfer of Power 1942-7, Vol-XI,* London, 1982, p. 536.

[8] Leonard A Gordon, *Brothers Against the Raj: A Biography of Indian Nationalists Sarat and Subhas Chandra Bose,* (New Delhi: Viking Penguin, 1990), pp. 576-88; Bidyut Chakrabarty, The 1947 united Bengal movement: A thesis without synthesis, *The Indian Economic and Social History Review* 30 (4), 1993, pp. 467-88; শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশী থেকে পার্টিশান,* (কলকাতাঃ ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৩), পৃ. ৫৩৪-৩৬।

[9] The Mountbatten Viceroyalty Formulation of a Plan, 22 March-30 May 1947, in N. Mansergh and P. Moon (eds.), *Constitutional Relations between Britain and India: The Transfer of Power 1942-7, Vol-X*, London, 1983, pp. 448-49.

১২-ই মে শরৎ বসুর বাড়িতে হওয়া আলোচনা সভার ভিত্তিতে, ২০-মে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য গঠনের দলিল স্বাক্ষরিত হয়ছিল, যাতে সাক্ষর করেন আবুল হাসেম ও শরৎ বসু।[10] "কিন্তু বাংলার বাতাবরণ সাম্প্রদায়িক হওয়ার কারণে অধিকাংশ হিন্দুরাই মনে করেন যে এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল এক বৃহত্তর পাকিস্তান গড়ে তোলা যার মধ্যে আর্থিক দিক দিয়ে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতা শহর অন্তর্ভুক্ত থাকবে"।[11] যদিও তৎকালীন বঙ্গের গভর্নর বাংলাকে অখন্ড রাখার জন্য কিরণশঙ্কর রায়কে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে যৌথ মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন কিন্তু কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ কোনো পক্ষেরই অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গরাজ্য গঠনের প্রস্তাবে সম্মতি ছিল না। কারণ এক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলিম সব পক্ষই তাদের বিপরীত সম্প্রদায়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন।[12] এমনকি মহাত্মা গান্ধীও অখন্ড বঙ্গরাজ্য গঠনের পরিকল্পনা সমর্থন করেননি। এর কারণ হিসাবে তিনি প্রার্থনাসভায় জানান যে, নেহেরু ও প্যাটেলের কাছে বর্ণহিন্দু ও তপশিলিদের মধ্যে বিভেদ ঘটানোর অভিযোগ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন।[13] আবার এমনও দেখা যায় কংগ্রেস সমর্থক আশরাফুউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বিভাজনের বিরোধিতা করেছিলেন, নিজামুদ্দিনের পার্টির লোকজনও বাংলা বিভাজনের বিরোধিতা করেছিলেন, তবে তারা সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন।[14]

বাংলা বিভাজনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক আরো জোরালো হতে থাকে, যখন প্রশ্ন ওঠে বাংলাকে কীভাবে বিভাজন করা যেতে পারে তা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রাজর্ষি বিশ্বাস তার *'বঙ্গ সীমান্ত'* গ্রন্থে সারা বিশ্বে পরিলক্ষিত চার ধরনের সীমান্তরেখার কথা উল্লেখ করেছেন। নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত দ্বারা নির্ধারিত প্রাকৃতিক সীমান্তরেখা; ধর্মগত, জাতিগত, ভাষাগত প্রাধান্য দ্বারা নির্ধারিত সাংস্কৃতিক সীমান্তরেখা; প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় চরিত্রের দ্বারা নির্ধারিত মিশ্র সীমান্তরেখা এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সরলরেখার দ্বারা নির্ধারিত জ্যামিতিক সীমান্তরেখা।[15] বাংলার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ কর্তৃক ভাগীরথী ও ব্রাহ্মণী নদীকে এবং কংগ্রেস কর্তৃক ভাগীরথীর পরিবর্তে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীকে দুইবঙ্গের সাধারণ সীমানা ধার্য করা করার উভয় প্রস্তাবই খারিজ হয়ে যায়। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই যেকোনো একটি সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা এমন ভাবে বন্টিত হচ্ছিল যে তাদের সীমানার ভুল দিকে অবস্থান করতে হত।[16] শুধু এই নদী-নির্ভর ভৌগোলিক সীমা অবলম্বনের প্রশ্নই নয়; বিতর্ক শুরু হয় কিসের ভিত্তিতে বিভাজন হবে অর্থাৎ কোন প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে (administrative unit)

---

[10] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* (কলকাতাঃ দে'জ, ২০০৪), পৃ. ৯২।

[11] L A Gordon, *Brothers Against the Raj*, pp. 576-88

[12] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* পৃ. ৯১।

[13] *The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol-88,* The Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, New Delhi, pp. 103 & 109.

[14] Hamidul Huq Chowdhury, *Memoirs,* (Dhaka: Associated Printers Ltd, 1989), pp. 118-19.

[15] রাজর্ষি বিশ্বাস, *দেশভাগে বঙ্গসীমান্তঃ ভারত-পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক,* (কলকাতাঃ গাঙচিল, জানুয়ারি ২০২৩), পৃ. ২১।

[16] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* পৃ. ১০৭-০৮।

বিভাজনের ইউনিট ধরে এগোনো হবে এই প্রশ্নেও। সীমানা কমিশনের সদস্যদের কাজ চালানোর সুবিধার জন্য তৎকালীন বাংলার সরকার, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্দেশ অনুসারে অখন্ড বাংলাকে জেলাওয়ারি ভাগ করেছিলেন।[17] কাজ শুরু হলে বোঝা যায় বিভাজনের ইউনিট হিসেবে জেলা খুব বড় ইউনিট হয়ে যাচ্ছে। বিকল্প হিসেবে মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত প্রশাসনের ক্ষুদ্রতম বিভাগ মৌজা বা গ্রামের ইউনিয়নগুলিও ইউনিট হিসেবে ভীষণ ক্ষুদ্র হওয়ায় এবং নির্ভুল সরকারি পরিসংখ্যান ও প্রয়োজনীয় মানচিত্রের অভাবের শর্তে বাতিল করা হয়।[18] আবার প্রাকৃতিক নিয়মেই সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসংখ্যার অসম বন্টনের ফলে একটি বা দুটি থানায় মুসলিম জনগণের অতিঘনত্ব কোনো কোনো মহাকুমার অমুসলিম জনঘনত্বকে খর্ব করবে এই আশঙ্কায় মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রস্তাবিত 'মহকুমা'কে বিভাজনের ইউনিট হিসেবে মেনে নিতে কংগ্রেস অস্বীকার করে। উল্টোদিকে থানাওয়াড়ি বিভাজনের কংগ্রেসের বিকল্প প্রস্তাব মুসলিম লীগ নাকচ করে দেয়।[19] যদিও পরবর্তীকালে দেখা যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে সীমানা কমিশন এই থানাকে ইউনিট ধরেই এগিয়েছিলেন কারণ ভারত সরকারের জনগণনায় থানাওয়াড়ি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা ভাগের ক্ষেত্রে ৩-রা জুনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই প্রথম এবং প্রধান বিতর্ক তৈরি হয়েছিল কলকাতার দখল নিয়ে। উভয় পক্ষই নিজের নিজের যুক্তি দেখিয়ে কলকাতাকে দখলে রাখতে চেয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিস্তীর্ণ পশ্চাৎভূমির মুখে একমাত্র প্রবেশপথ হিসেবে কলকাতার অপরিসীম গুরুত্বের কথা ভেবে মুসলিম লীগ সমগ্র কলকাতাকে পূর্ববঙ্গের মধ্যে রাখতে চেয়েছিল। অন্যদিকে 'বাংলার প্রাণকেন্দ্র' কলকাতাকে কোনভাবেই কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভাসহ অন্যান্য দলগুলি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভাবতেই পারিনি। বাংলা প্রদেশের অর্থনীতিতে কলকাতা শহরের অপরিসীম গুরুত্বের কথাটি মাথায় রেখে বাংলার গভর্নর বারোজ কলকাতাকে 'মুক্ত নগরী' বা 'ফ্রি সিটি' হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেনকে। মুসলিম লীগও এই প্রস্তাব সমর্থন করে কলকাতা শহরকে 'মুক্ত বা আন্তর্জাতিক অঞ্চল' বলে গণ্য করার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এই অসঙ্গত প্রস্তাবে রাজি হননি।[20]

মুসলিম লীগের দাবি ছিল একটা বিশাল অঞ্চলকে পূর্ববঙ্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। তাদের যুক্তি ছিল বাংলা জনসংখ্যার অনুপাতে একটা মোট রাজস্বের অংশ হিসেবে সমগ্র কলকাতা নগরসহ কলকাতার পশ্চিম দিকের এলাকাগুলিকে যুক্ত করা। এর পেছনে তারা কারণ দেখিয়েছিল যে জুট মিল, সামরিক-ঘাঁটি, অস্ত্র-কারখানা, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ও রেললাইন ইত্যাদি পূর্ব বাংলার অর্থনীতি, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ এবং প্রতিরক্ষার জন্য

---

[17] *Partittion Proceedings,* vol- vi, p. 2.

[18] Ibid, p. 32.

[19] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* পৃ. ১০৫-০৬।

[20] তদেব, পৃ. ৯৪।

অপরিহার্য ছিল। এমনকি মুসলিম লীগ হুগলি ও ভাগীরথী নদীর পূর্বদিকের সমস্ত অঞ্চলকেও দাবি করেছিল। যার ফলে বাংলার হিন্দু-জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগই পূর্ববঙ্গে চলে যাচ্ছিল (দ্রষ্টব্য মানচিত্র-১)।[21]

মানচিত্রঃ- ১ মুসলিম লীগ দ্বারা প্রস্তাবিত বৃহত্তর পূর্ববঙ্গ।



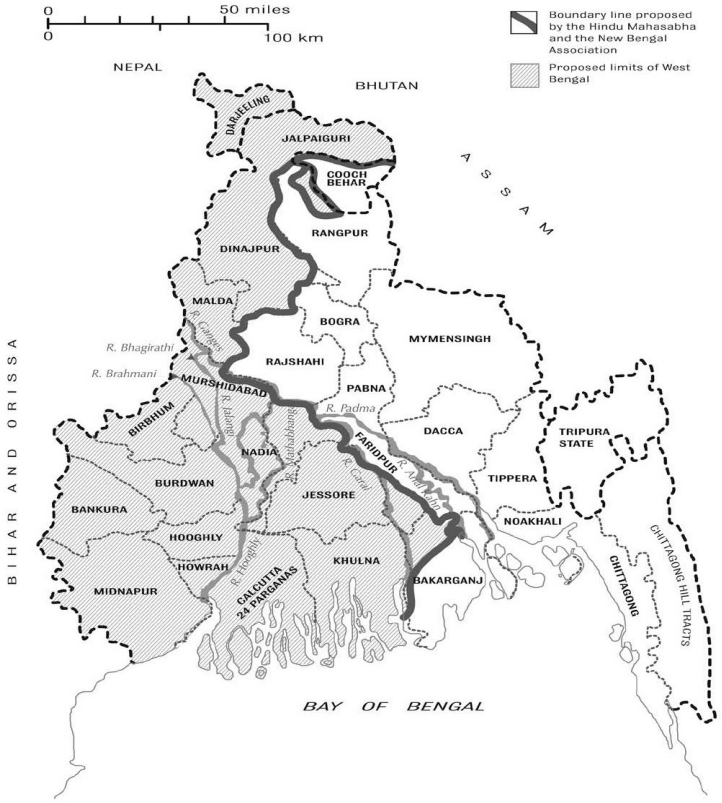
(Joya Chatterji, Partition Legacies, p. 68)

অন্যদিকে Hindu Central Co-ordinance committee বা হিন্দু কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির অন্তর্গত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সীমানা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্য তৈরি হয়। এই কমিটি গঠিত হয়েছিল Congress, Hindu Mahasabha, Indian Association ও New Bengali association-এই চারটি রাজনৈতিক দল নিয়ে। এই কমিটিতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রেসিডেন্ট এবং জে.বি. কৃপালিনী চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। হিন্দু মহাসভা এবং নিউ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন এগারোটি হিন্দু

[21] Joya Chatterji, "The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-1952', *Modern Asian Studies*, 33, (1), 1999, pp. 195-213.

সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, খুলনা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি এবং দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা মালদা ও মুর্শিদাবাদ, এছাড়াও নদিয়া, ফরিদপুর ও দিনাজপুরের একটা বিরাট অংশ এবং রংপুর ও রাজশাহী জেলার নির্বাচিত কিছু থানা পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির দাবি করেছিল। এর ফলে বাংলার মোটামুটি ৫৭ শতাংশ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হচ্ছিল (দ্রষ্টব্য মানচিত্র-২)।[22]

মানচিত্রঃ-২ হিন্দু মহাসভা এবং নিউ বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ।



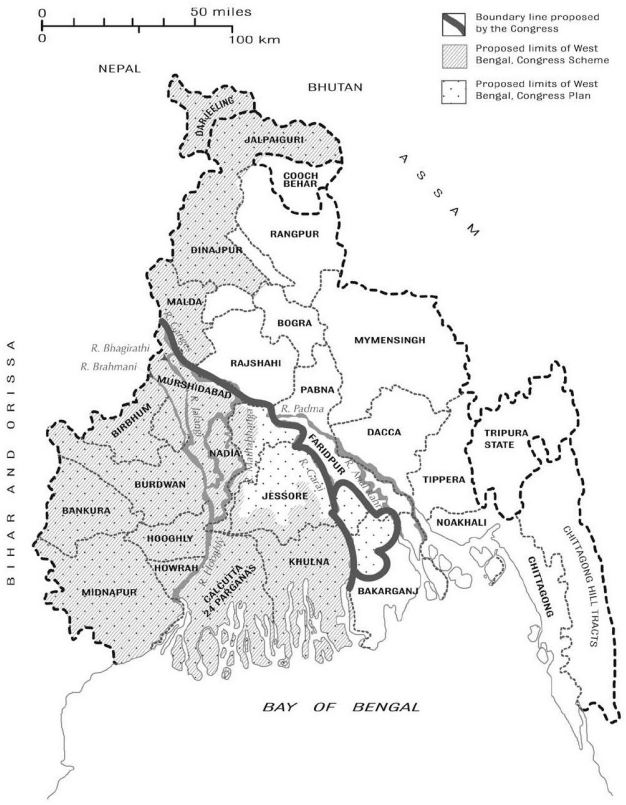
(Joya Chatterji, Partition Legacies, p. 71)

বাংলা বিভাজনের বিতর্কে কংগ্রেসের প্রতিনিধি, আইনজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্ত একেবারেই অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেন। তিনি জানতেন, ৪৬ শতাংশ জনসংখ্যার জন্য ৫৭ শতাংশের ভূখণ্ডের দাবি সীমানা কমিশনের কাছে টিকবে না। যা দাবি করা হচ্ছে তাতে যদি কোনো যৌক্তিকতা না থাকে তবে তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তিনি দুটি পরিকল্পনার কথা বলেন একটি- 'Congress scheme' বা 'কংগ্রেস অভিপ্রায়' যা পার্টির বেশিরভাগ সদস্যের দাবি ছিল এবং দ্বিতীয়টি হল 'Congress plan' বা 'কংগ্রেস পরিকল্পনা'। এরমধ্যে 'কংগ্রেস পরিকল্পনা', 'কংগ্রেস অভিপ্রায়' এর তুলনায় পরিমিত ছিল। নিম্নে প্রদত্ত মানচিত্রে বিষয়টি দেখানো হল (দ্রষ্টব্য

[22] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন*, পৃ. ৩১।

মানচিত্র-৩)।[23] কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য শ্রীগুপ্তের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে, কংগ্রেস এককভাবে তার দুটি বিকল্প এবং হিন্দু মহাসভা ও নিউ বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে তাদের স্মারকলিপি বাংলা সীমানা কমিশনের কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।[24]

মানচিত্রঃ-৩ কংগ্রেস দ্বারা প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ ।



(Joya Chatterji, Partition Legacies, p. 77)

বাংলা ভাগ করাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে দর কষাকষি করতে দেখা যায়। শুধুমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তরপূর্ব ও পূর্ব অংশ, অর্থাৎ অখন্ড বাংলা প্রদেশের চরম প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চলগুলি নিয়ে কোনো বিতর্ক হয়নি। যার মধ্যে ছিল বর্ধমান বিভাগের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমান এই পাঁচটি জেলা, ঢাকা বিভাগের ঢাকা ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা এই

[23] তদেব।

[24] তদেব, পৃ. ৩৩।

সাতটি জেলা।[25] এগুলি ছাড়া অবশিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগ যেমন রাজশাহী বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগ, শহর কলকাতা, চা উৎপাদনকারী অঞ্চল দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীকেন্দ্রিক অঞ্চল নদীয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ, সংলগ্নতা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে দিনাজপুর জেলা, পার্বত্য-চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নমঃশূদ্র-প্রধান খুলনা, যশোর, ফরিদপুর জেলা। এছাড়াও খুলনা শহরের সঙ্গে রেল যোগাযোগের জন্য সাতক্ষীরা, হিন্দু 'জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী ঘাঁটি' হিসেবে বরিশাল, বাঙালি হিন্দুর সাংস্কৃতিক পীঠস্থান (শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান) হিসেবে কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন দুটি গ্রাম প্রভৃতির দাবিতে একদিকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, অন্যদিকে পশ্চিম ও পূর্ব দুই পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে অন্তত এক হাজার মাইল ব্যবধান থাকার জন্য সামরিক নিরাপত্তার কারণে অস্ত্র নির্মাণ কারখানার অঞ্চল ইছাপুর ও কাশীপুর, বেঙ্গল আসাম রেল যোগাযোগের জন্য কাঁচরাপাড়া, নৈহাটি স্টেশন, তিস্তা নদীর জল নিয়ন্ত্রণের জন্য দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি, যোগাযোগ ও সংলগ্নতার প্রশ্নে পার্বত্য-চট্টগ্রাম প্রভৃতির দাবি জানিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সম্মুখ সমরে নেমে পড়ে।[26] প্রায় প্রতিটি জেলার থানা পর্যায়, এমনকি গ্রাম পর্যায়েরও অন্তর্ভুক্তি নিয়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে প্রবল তর্কাতর্কি চলতে থাকে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি প্রশ্নে, প্রতিক্ষেত্রেই তারা তাদের ভিন্ন ভিন্ন যুক্তিতে দুটি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছিলেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির প্রতিনিধি রাজনৈতিক দল হিসেবে মুসলিম লীগ এককভাবে কর্তৃত্ব বজায় রাখলেও, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির প্রতিনিধি হিন্দু সমন্বয় কমিটির দলগুলি যথা কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ও নিউ বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন খুব শীঘ্রই বাংলা প্রদেশের বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত করতে নিজেদের আলাদা আলাদা যুক্তি ও আলাদা আলাদা দাবির ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এমনকি এই প্রধান দলগুলির মধ্যেও মতবিরোধের জেরে একাধিক মতাবলম্বী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।[27] সীমানা নির্ধারণকে প্রভাবিত করে এমন সমস্ত প্রশ্নে এই রাজনৈতিক দলগুলি কোনো সমঝোতায় আসতে পারেনি একথা র‍্যাডক্লিফ তার রোয়েদাদেও উল্লেখ করেছিলেন।[28] বাংলা প্রদেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ, জেলা, থানা, রেলপথ, নদীপথ, চাষের জমি, শিল্পাঞ্চল প্রতিটি ক্ষেত্রে দুই পক্ষের দড়ি-টানাটানির এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, সেই সময় উদ্ভূত কিছু প্রধান প্রশ্নসমূহ র‍্যাডক্লিফ তার রোয়েদাদেও উল্লেখ না করে পারেননি। সেগুলি ছিল নিম্নরূপ;-

(১) কলকাতা শহর কোন রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করা ঠিক ছিল? অথবা কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে শহরটিকে দুটি রাজ্যের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব ছিল কি?

---

[25] *Reports of the Bengal and Punjab Boundary Commission,* p. 5; লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* পৃ. ১০০।

[26] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* পৃ. ১০২-০৪; জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ৩৪।

[27] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ৩-৪৪।

[28] *Reports of the Bengal and Punjab Boundary Commission,* p. 5

(২) যদি কলকাতা শহরকে সম্পূর্ণরূপে কোনো একটি রাজ্যের হাতে হস্তান্তর করতে হয়, সেক্ষেত্রে কলকাতা শহর ও বন্দরকে বাঁচাতে নদীয়া জেলার নদী ব্যবস্থা বা কুলটি নদীর ওপর নিয়ন্ত্রণের বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য দাবি গুলি কি কি?

(৩)আমাদের নীতিমালাকে খুব বেশি লঙ্ঘন না করেই, গঙ্গা-পদ্মা-মধুমতি নদীর তীরের আকর্ষণ কি যশোর ও নদীয়া জেলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের ঘনত্বের জোরালো দাবিকে প্রতিস্থাপন করতে পারত?

(৪) যশোর জেলা নিয়ন্ত্রণকারী রাজ্য অপেক্ষা ভিন্ন কোনো রাজ্যের হাতে কি খুলনা জেলাকে অর্পণ করা যেত?

(৫) মালদা ও দিনাজপুর জেলার অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের উল্লেখযোগ্য অংশ পূর্ব-বাংলায় বরাদ্দ করা কি ঠিক হত?

(৬) দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রে কোন রাজ্যের দাবি প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল? যেখানে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির মুসলিম জনসংখ্যা ছিল জেলার মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ২.৪২ শতাংশ ও ২৩.০৮ শতাংশ, কিন্তু যা কোনো দিক দিয়েই বাংলার কোনো অমুসলিম এলাকার সঙ্গে সংলগ্ন নয়?

(৭) পার্বত্য-চট্টগ্রামকে কোন রাজ্যের অন্তর্গত করা উচিত ছিল? যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশ, কিন্তু চট্টগ্রাম জেলাকে নিয়ন্ত্রণকারী রাজ্যের চেয়ে ভিন্ন রাজ্যের অধীনে কি একে রাখা যেত?[29]

১.২ মালদা-মুর্শিদাবাদের ভারতভুক্তি নিয়ে টানাপোড়েনঃ

দেশভাগের সময় মালদা এবং মুর্শিদাবাদ উভয় জেলাই ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। মালদায় ৫৪.২৮ শতাংশ এবং মুর্শিদাবাদে ৫৫.৫৬ শতাংশ মুসলিম বসবাস করতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে উভয়ের জেলারই পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। এমনকি বাংলা ভাগ হওয়ার আগে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্দেশ অনুসারে, কাজ চালানোর সুবিধার জন্য একটা সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৪১ সালের সেন্সাস মোতাবেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ষোলটি জেলার তালিকাতে এই দুইটি জেলাও ছিল।[30] কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই ষোলটি জেলাই যে পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়বে এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কারণ কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে, রায়দানের ক্ষেত্রে সংলগ্নতার (contiguity) বিষয়টি অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন মুসলমানপ্রধান এবং পরস্পর সংলগ্ন অমুসলিম অঞ্চলগুলি যাতে একত্র সন্নিবেশিত হতে পারে সে বিষয়ে খেয়াল রাখার কথা এবং এর পাশাপাশি

[29]Ibid.

[30] *Partittion Proceedings*, vol-vi, p. 8.

'Other Factors' অর্থাৎ 'অন্যান্য বিষয়' এর প্রতিও বিবেচনা করার কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছিল।[31] পরবর্তীকালে যখন প্রশাসনিক বিভাগ ও বিভিন্ন জেলাগুলির ভারতীয় ডোমিনিয়ানে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তখন সংলগ্নতার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ পক্ষের তরফ থেকে মালদা জেলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলা হয়। বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই, ১৯৪৭ সালের ১-লা জুন মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জাতীয় বঙ্গ সম্মেলনের এক সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী জাতীয় বঙ্গের প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগ ও জেলাগুলির সঙ্গে মালদা জেলার কিছু অংশ দাবি করেন।[32] এরপর ১০-ই জুন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে একটি লেখা প্রকাশিত হয়, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বাংলা প্রদেশের কোন কোন অংশ বা কতটা পরিমাণ অংশ দাবি করা উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। সেই আলোচনায় সমগ্র মালদা জেলাকেই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল।[33] হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলির পক্ষ থেকেও সমগ্র মালদা জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ওঠে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে মালদার কালিয়াচক থানাটিকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য মুসলিম লীগ দাবি তুললে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পার্শ্ববর্তী দুটি হিন্দু ব্লকের সংলগ্নতা বজায় রাখার জন্য থানাটিকে একই ব্লকে রেখে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়।[34] এরপর কমিশনের হিন্দু সদস্যদের পৃথক রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে সমস্ত অঞ্চল দাবি করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল মালদার নাচোল, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর এই পাঁচটি থানা বাদে অবশিষ্ট দশটি থানা।[35] কংগ্রেসের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাতেও রাজশাহী জেলা সংলগ্ন মালদা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে'র পাঁচটি থানা দাবি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, ওই পাঁচটি থানা বাদ দিয়ে মালদা জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। এর লক্ষ্য ছিল সমগ্র জেলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার শতকরা হার কমিয়ে আনা। যদিও পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই জেলার যে অংশ দাবি করা হয়েছিল তার মধ্যেও চারটি থানা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, যার মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া, খড়বা থানা তিনটি জেলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ও হিন্দু পরিবেষ্টিত। জেলার পূর্বে অবস্থিত পাকিস্তান সংলগ্ন চতুর্থ থানা কালিয়াচকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল "ভাগীরথী নদীর জোয়ারপুষ্ট এই থানার ওপর কলকাতা বন্দর আংশিকভাবে নির্ভরশীল ছিল"।[36] শুধু তাই নয়; দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে কালিয়াচক থানাটি (কালিয়াচক১ ও ২) ছিল সমগ্র মালদা তথা উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। কালিয়াচক থানাটি পূর্ববঙ্গে চলে গেলে, সমগ্র মালদা জেলা ও তার পেছনে সমগ্র উত্তরবঙ্গের সঙ্গে

---

[31] *Reports of the Bengal and Punjab Boundary Commission,* p. 4.

[32] *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৬-ই জুন ১৯৪৭।

[33] *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১০-ই জুন ১৯৪৭।

[34] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* পৃ. ৯৮ ও ১০১।

[35] তদেব, পৃ. ১০৭।

[36] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ৪৩।

দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে যেত। অবশেষে কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের পরিকল্পনার অনুরূপেই মালদা জেলাকে দুই দেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।[37]

মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে, জেলাটিকে ভারত ডেমিনিয়ানের অন্তর্গত করার জন্য সংলগ্নতায় প্রশ্নটি ছাপিয়ে আরো যে দুটি বিষয় জোরালো হয়ে উঠেছিল তা হল বাংলার সংস্কৃতি ও নদী ব্যবস্থা। এজন্য নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভাগাভাগি করার প্রস্তাবকে অনেকে মেনে নেননি। পূর্বোল্লিখিত ১৯৪৭ সালের ১-লা জুনে মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় বঙ্গ সম্মেলনে এই জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার সপক্ষে বলা হয় মুর্শিদাবাদ বরাবরই সংস্কৃতিসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সেই সম্মেলনে সীমানা নির্ধারণের সময় শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও ভৌগোলিক সংলগ্নতার বিষয়গুলিই নয় বরং পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিষয়টিও ভেবে দেখার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল।[38] সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলা প্রদেশের নদী ব্যবস্থা বা River System-এর বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অখণ্ড বাংলার প্রধান কিছু নদীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য কংগ্রেসের তরফ থেকে মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার গুরুত্ব বুঝে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জেলা দুটিকে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবি জানানো হয়েছিল। এই দাবির পিছনে কংগ্রেসের যুক্তি ছিল যে, কলকাতা বন্দরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হুগলি নদীর নাব্যতা বজায় রাখতে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবহমান ভাগীরথী, জলঙ্গি ও মাথাভাঙ্গা নদীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা প্রয়োজন, যার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সমগ্র মুশিদাবাদ, নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য।[39] 'কংগ্রেসের পরিকল্পনা'র মানচিত্রে প্রদর্শিত এই সকল থানা ছিল গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীর জটিল প্রবাহের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যা নদী ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও জলনিষ্কাশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাজেই 'কলকাতা-নির্ভর' পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের জীবনে মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্তির একটা বিশাল বড় গুরুত্ব ছিল। যার কারণে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং নিউ বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন-এই চারটি পার্টি মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব বুঝে তারা যে কোনো কিছুর বিনিময়ে এই জেলাকে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি ছিল।[40] এমনকি তারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনা জেলাকে যে কোনো মূল্যে মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে বিনিময় করতে প্রস্তাব দিয়েছিল।[41] পূর্ববঙ্গে আবার খুলনা জেলার কংগ্রেস কমিটির লোকেরা অভিযোগ দায়ের করেন যে খুলনার সঙ্গে মুর্শিদাবাদকে যেন বিনিময় করা না হয়। কিন্তু সীমানা কমিশনের দুই হিন্দু সদস্য বিজন কুমার

---

[37] *Reports of the Bengal and Punjab Boundary Commission*, pp. 1-5.

[38] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৬-ই জুন ১৯৪৭।

[39] File no. E/0 320.954 B 436 b, Boundary demarcation, Bengal/1947?_/., National Library, Kolkata; Tan and Gyanesh, *The Aftermath of Partition in South Asia*, p. 80; লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* পৃ. ১০৩।

[40] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ৩১।

[41] তদেব, পৃ. ৪৪।

মুখার্জি ও চারুচন্দ্র বিশ্বাস বিচারকদ্বয় পরিষ্কারভাবে তা প্রত্যাখান করে দেন।[42] অবশ্য এর একটি বিরূদ্ধ মতও ছিল।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশভাগের জন্য সমর্থন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে, কংগ্রেসের সহায়তায় কলকাতায় গড়ে ওঠা ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কমিটি কর্তৃক ১৯৪৭ সালের মে মাসে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায়, পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রস্তাবিত সীমানা নিয়ে মতবিরোধের জেরে কমিটির বিভাজনের কথা উল্লেখ করা হয়। যার একটি অংশ ন্যাশনাল বেঙ্গলি ইউনিটি কমিটি নামের আত্মপ্রকাশ করে। কংগ্রেসের থেকে ভিন্ন মত পোষণকারী শক্তিশালী ও ক্ষুদ্র এই গোষ্ঠী 'কংগ্রেসের পরিকল্পনা'য় দাবিকৃত পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে আরো বেশি ক্ষুদ্র ও দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাজ্য চেয়েছিল। (এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও সেক্রেটারি ছিলেন হুগলি কংগ্রেসের সেক্রেটারি অতুল্য ঘোষ।) এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা নদীয়া, যশোর ও মুর্শিদাবাদকে, সুদূর উত্তরের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংকে এবং সংলগ্নতার কারণে মালদা ও দিনাজপুরকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করা।[43] ন্যাশনাল বেঙ্গলি ইউনিটি কমিটি মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব না বুঝেই শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য জেলাটির ভারতভুক্তিতে রাজি ছিল না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না থাকায় এই প্রস্তাব ধোপে টেকে নি। অবশেষে র‍্যাডক্লিফ, কংগ্রেসের দেওয়া পরামর্শ মেনে নিয়ে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা এবং মালদা ও নদিয়া জেলার কিছু অংশকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তার বিনিময়ে খুলনা পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতীয় ডোমিনিয়নে অন্তর্ভুক্তিতে মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াসিফ আলী মির্জার ভূমিকাও অনস্বীকার্য্য। এই জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি জোরালো সওয়াল করেছিলেন। এমনকি তিনি দেশভাগের পূর্বে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভারত ভাগের বিরোধিতাও করেছিলেন। ওয়াসিফ আলী মির্জার সক্রিয় উদার মনোভাব থাকার ফলে মুর্শিদাবাদে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয়নি। এছাড়াও এই জেলার ভারতভুক্তিতে কংগ্রেস দলের রেজাউল করিম ও আব্দুস সামাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।[44] এইভাবে বহু তর্ক-বিতর্কের পর মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা দুটি কমিশনের সিদ্ধান্তে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলেও বিতর্ক এর পিছু ছাড়েনি। এর প্রধান কারণ কমিশনের এই রায় ঘোষণার দিন ধার্য করা হয়েছিল ১৭-ই আগস্ট। ফলে ১৫-ই আগস্ট স্বাধীনতা দ্বিবসের দিনে এই দুই জেলার মানুষজন বুঝতে পারেন নি, তারা কোন দেশের নাগরিক। এমনকি ১৯৪৭ সালের ১৫-ই ও ১৬-ই আগস্ট মালদা ও মুর্শিদাবাদ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।[45] কারণ ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনার

---

[42] joya chatterji, *The Fashioning of a Frontier*, pp. 216-25.

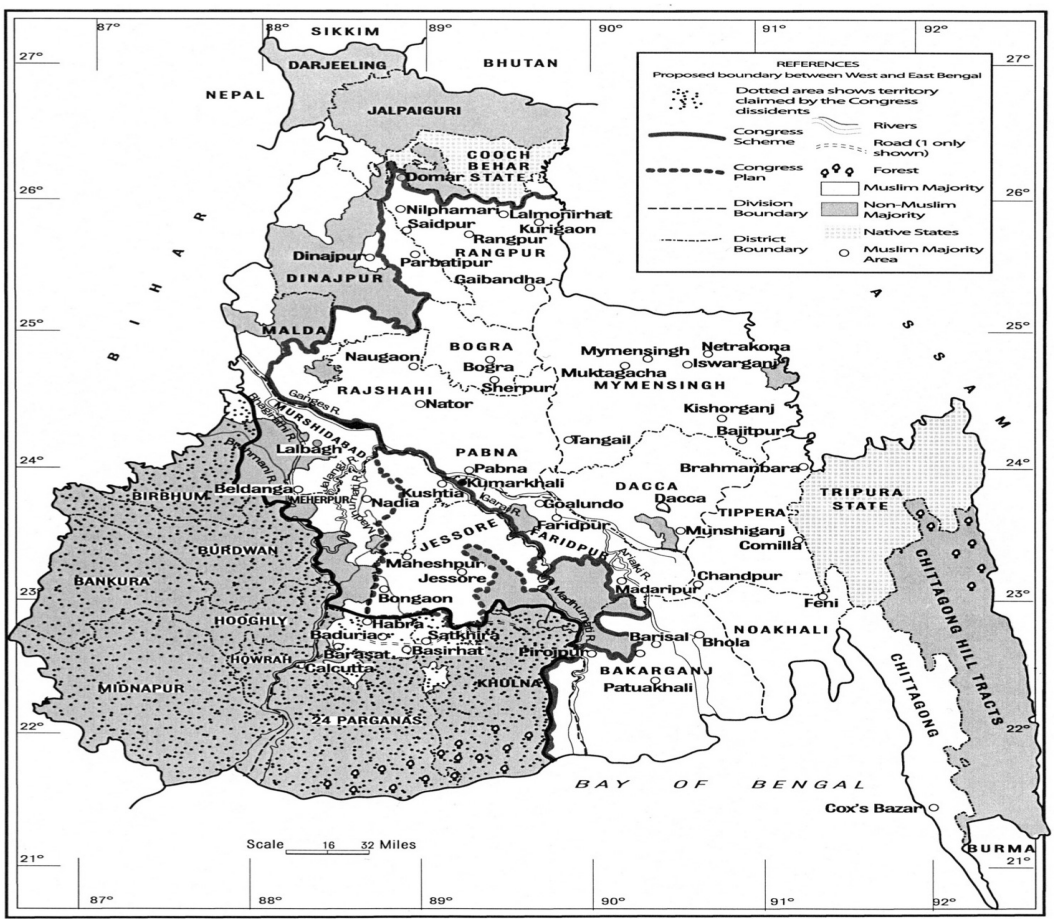
[43] Ibid, p. 44.

[44] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* পৃ. ৯১।

[45] *Partition Proccedings*, vol-vi.

জন্য অখণ্ড বাংলার যে ১৬টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল তার মধ্যে মালদা-মুর্শিদাবাদও ছিল। এই দুই জেলা ছিল মুসলিম সরকারের অধীনে। যার কারণে ১৫-ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিনে এই জেলা দুটির বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে পতাকা উত্তোলন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়েছিল এবং জয় ধ্বনি ও স্লোগান দেওয়া হয়েছিল।[46] ১৭-ই আগস্ট র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে এই জেলা দুটির ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলে ঘোষিত হলে আবার সেখানে ভারতের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মানচিত্রঃ-৪ বিভিন্ন মতালম্বী কংগ্রেস দ্বারা প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ।



(জয়া চ্যাটার্জী, দেশভাগের অর্জন, পৃ. ৪৫)

১.৩ চূড়ান্ত পরিণতিঃ র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদঃ

ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে এক মাসের রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধের শেষে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে বাউন্ডারি কমিশন অবশেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ১২-ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড লেখার কাজ শেষ করে

[46] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৬-ই জানুয়ারি, ২০১৬।

তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যটনের হাতে সেই রায় তুলে দেন।[47] যদিও জনগণের জ্ঞাতার্থে এই রায় প্রকাশ করা হয় ১৭-ই আগস্ট ১৯৪৭। মাত্র চার পাতার মধ্যে নবগঠিত দুটি প্রদেশের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যায়। কমিশনের এই রায় অনুযায়ী সমগ্র চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ রাজশাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের খুলনা জেলা পূর্ববঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে, সমগ্র বর্ধমান বিভাগ এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত সমগ্র কলকাতা, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ জেলা, রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত সমগ্র দার্জিলিং জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অবশিষ্ট নদিয়া, যশোর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদহ জেলা নবগঠিত দুটি প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে নদীয়া জেলার মোট এগারোটি থানাসহ (খাকসা, কুমারখালি, মীরপুর, কুষ্টিয়া, আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, গাঙ্গীন, দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর এবং মেহেরপুর) মাথাভাঙা নদীর পূর্ব-তীরবর্তী দৌলতপুরের কিছু অংশ পূর্ববঙ্গের ভাগে বরাদ্দ করা হয়েছিল। অন্যদিকে, দিনাজপুর জেলার নয়টি থানা (রায়পুর, ইটাহার, বংশীহরি, কোশমন্ডী, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদসহ এবং কালিয়াগঞ্জ) উত্তর-দক্ষিণ মেন রেল লাইনের পশ্চিমদিকে বালুরঘাট অঞ্চলের কিছু অংশ, তেতুলিয়া, পচাগড়, কোদা, দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম;-এই পাঁচটি থানা ছাড়া সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা এবং কোচবিহার জেলার দক্ষিণ দিকবর্তী এলাকা ও সেই সঙ্গে গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ এবং ভোলাহাট-এই পাঁচটি থানা বাদ দিয়ে সমগ্র মালদা জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।[48]

সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অখন্ড বাংলার মোট আয়তনের শতকরা ৩৬.২০ ভাগ জমি ও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৫.১৪ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে এবং শতকরা ৬৩.৮০ ভাগ জমিসহ ৬৪.৮৬ শতাংশ জনসংখ্যা পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর ফলে মোট মুসলমান জনসংখ্যার ১৬.০৬ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও ৮৩.৯৪ শতাংশ পূর্ববঙ্গ এবং মোট অমুসলমান জনসংখ্যার ৫৮.২২ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ এবং ৪১.৭৮ শতাংশ পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত হয়। এই হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক অনুপাত দাঁড়ায় ৭৪.৯৯% অমুসলমান ও ২৫.০১% মুসলমান এবং পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে এই অনুপাত হয় ২৯.১৭% অমুসলমান ও ৭০.৮৩% মুসলমান।[49] কংগ্রেসের প্রস্তাবিত গাইড-লাইন অনুযায়ী র‍্যাডক্লিফ চেষ্টা করেছিলেন যে মুসলিম জনসংখ্যা ও হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান রেখে বাংলার বিভাজন করতে।[50]

---

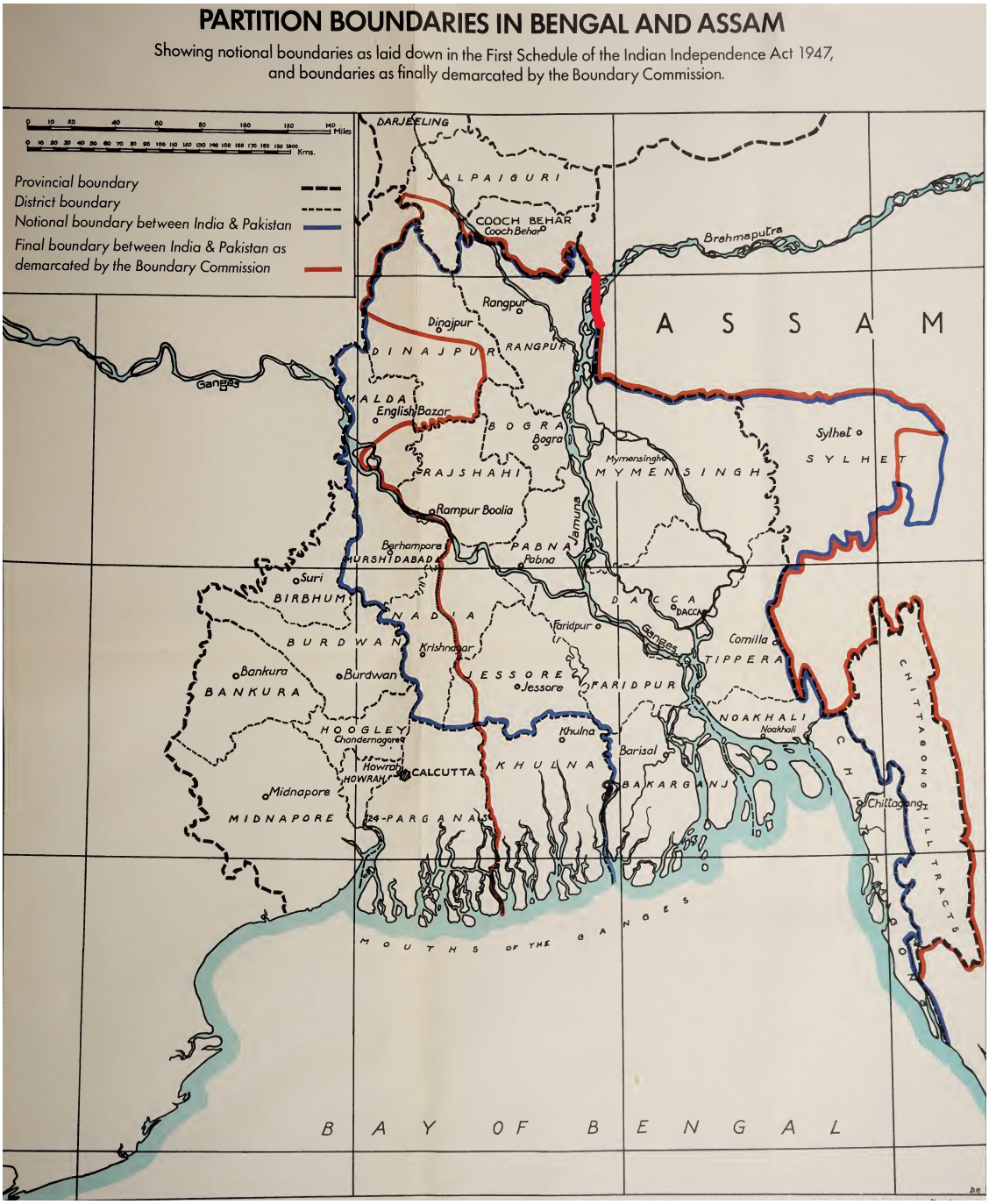
[47] *Reports of the Bengal and Punjab Boundary Commission*, pp. 1-4.

[48] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৯-ই আগস্ট, ১৯৪৭।

[49] Ibid.

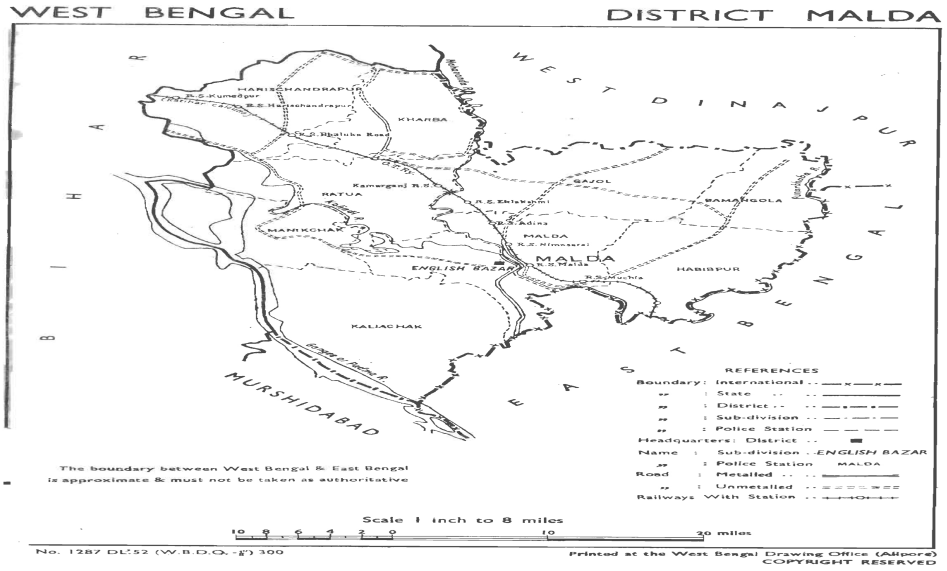
[50] Mechanics of partition-এ কংগ্রেস কর্তৃক নির্ধারিত গাইড লাইনে বলা হয়েছিল- "In other words, the partition must be so effected that there may be as many non-Muslims as possible in West Bengal, and as many Muslims as possible in East Bengal." (*Partition proceedings* ,vol vi, p. 30)।

মানচিত্রঃ-৫ বাউন্ডারি কমিশন দ্বারা চিহ্নিত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চূড়ান্ত সীমান্তরেখা।



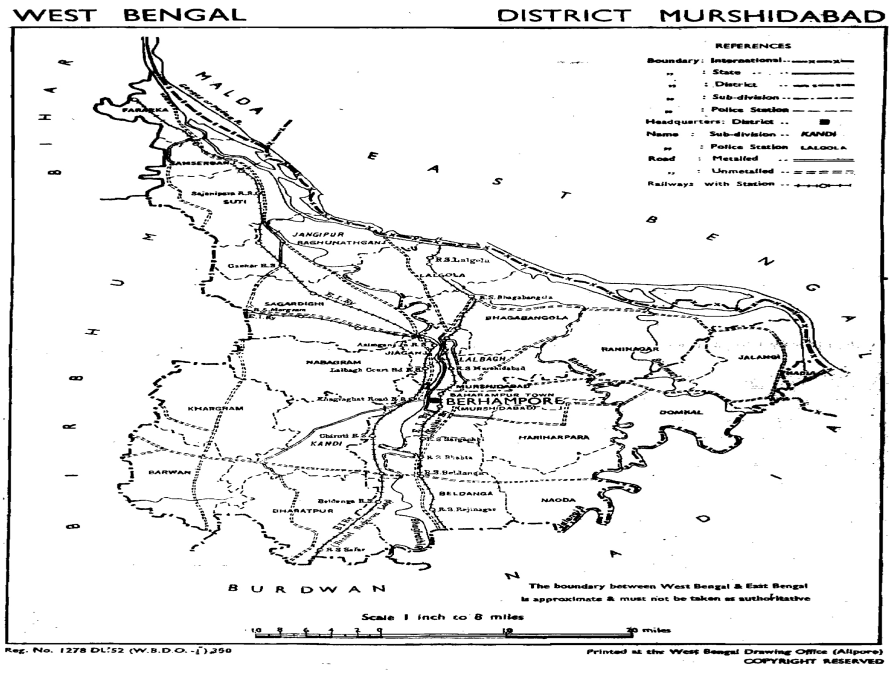
(The Mountbatten Viceroyalty Prines, Partition and Independence 8 July-15 August 1947 in N.Mansergh and P.Moon (eds.), *Constitutional Relations between Britain and India: The Transfer of Power 1942-7, Vol-Xii*, London, 1983)

মানচিত্রঃ-৬ বিভাজন-পরবর্তী মালদা জেলা



Malda census, 1951

মানচিত্রঃ-৭ দেশভাগ-পরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলা



Murshidabad census, 1951

মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে রোয়েদাদে র‍্যাডক্লিফ সীমান্তরেখার যে বর্ণনা দেন তা ছিল নিম্নরূপ-

''বালুরহাট-পাঁচবিবি, বালুরঘাট-জয়পুরহাট, বালুরঘাট-ধামাইরহাট, তপন-ধামাইরহাট, তপন-পত্নীতলা, তপন-পোরসা, বামনগোলা-পোরসা, হাবিবপুর-পোরসা, হাবিবপুর-গোমস্তাপুর, হাবিবপুর-ভোলাহাট, মালদা-ভোলাহাট, ইংলিশবাজার-ভোলাহাট, ইংলিশ-বাজার-শিবগঞ্জ, কালিয়াচক-শিবগঞ্জ থানাগুলির মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে এই লাইনটি অগ্রসর হবে এবং মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যবর্তী সীমানা গঙ্গানদীর সঙ্গে যেখানে মিলিত হয়েছে, সেই পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

এরপর মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলা, রাজশাহী- মুর্শিদাবাদ জেলা ও রাজশাহী-নদিয়া জেলার মধ্যবর্তী সীমানা হিসাবে গঙ্গানদীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই লাইনটি ঘুরে নদিয়ার উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে গঙ্গানদী থেকে মাথাভাঙা নদীর সূচনা হয়েছে সেই পর্যন্ত সীমারেখা টানা হবে এবং এই জেলার সীমারেখা দ্বারাই পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা নির্ধারিত হবে, গঙ্গানদীর গতিপথের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক থাকবে না।''[51]

র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ ঘোষণা হওয়ার পর এই ত্রুটিপূর্ণ রোয়েদাদের বিরুদ্ধে অনিবার্যভাবে উভয়পক্ষের মধ্যে অভিযোগ, পাল্টা-অভিযোগের তরজা শুরু হয়ে যায়। যে সমস্ত অভিযোগগুলি উঠেছিল তার একটি ছিল, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থানাগুলি পূর্ববঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানাগুলির পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হওয়া। এর মধ্যে প্রধান অভিযোগ ছিল খুলনা জেলার প্রতি অবিচার। অনেকের অভিযোগ ছিল, মুর্শিদাবাদের দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট খুলনা জেলার এর সঙ্গে বিনিময় কখনোই ন্যায্য হয় নি। এমনকি এও জানা যায়, খুলনা জেলার মানুষরা পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে ১৫-ই আগস্ট খুলনার অনেক বাড়িতে ভারতীয় পতাকা তোলা হয়েছিল।[52] একইভাবে জলপাইগুড়ির দক্ষিণাঞ্চলের পাঁচটি থানা, বিশেষত হিন্দু-প্রধান পাটগ্রাম থানাটি পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত হলে কিছু হিন্দুদের মধ্যে তিক্ততা ফুটে উঠে।[53] আবার উল্টোটাও দেখা যায়। মুসলিম-প্রধান মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তি লীগ-সমর্থক মুসলিমদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। আবার খুলনা, যশোর ফরিদপুর, বরিশাল, নোয়াখালীর ঘনসন্নিবিষ্ট নমঃশুদ্র অধ্যুষিত বিশাল অঞ্চল পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়ায় অসন্তোষ বাড়তে থাকে। এই সিদ্ধান্তের জেরে খুলনাসহ বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়েছিল।[54] আবার নদীর ওপর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে খুলনার বিনিময় হলে মুসলিম লীগ অনুরূপে তিস্তা নদীর প্রধান পোষণ ক্ষেত্র (catchment area) হিসেবে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে অধিকতর সন্নিহিত দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা দুটি দাবি করছিল, কিন্তু রোয়েদাদে তা প্রত্যাখাত হলে লীগ নেতারা অসন্তুষ্ট হয়।[55] আর একটি অভিযোগ ছিল বেশিরভাগ কৃষি-প্রধান জমি পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়া। পূর্ববঙ্গে ৩৯.১১ মিলিয়ন (৬৪.৮৪%) জনগণের জন্য ৩৬,৮২১ বর্গ মাইল চাষযোগ্য জমির বিপরীতে পশ্চিমবঙ্গে ২১.১৯ মিলিয়ন (৩৫.১৪%) জনগণের জন্য ১৭,৯৬৩

---

[51] *Reports of the Bengal and Punjab Boundary Commission,* p. 5.

[52] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২২-ই আগস্ট, ১৯৪৭।

[53] তদেব।

[54] তদেব।

[55] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* পৃ. ১০৩ ও ১০৪।

বর্গ মাইল চাষযোগ্য জমি দেওয়া হয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন।[56] অনুরূপে কলকাতা শহরসহ পাটকল ও অন্যান্য শিল্প কারখানাগুলি, চা উৎপাদনকারী অঞ্চল দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হওয়ায় পূর্ববঙ্গের লোকজন অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বাংলার গভর্নর বারোজের ভবিষ্যৎবাণী,- "কলকাতাসহ সমগ্র শিল্পাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হলে "দ্বিধা-বিভক্ত পূর্ববঙ্গ প্রদেশটি একটি গ্রাম্য বস্তি (rural slum) তে পরিণত হবে" এরই প্রতিফলন দেখতে পান পূর্ববঙ্গের নেতারা।[57] অপর একটি অভিযোগ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বন্দোবস্ত নিয়ে কংগ্রেসের ক্ষোভ ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৬-ই আগস্টে গভর্নরের সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ সম্পর্কে আলোচনায় নেহেরু অভিযোগ করেন যে এই অঞ্চলের বিলি-বন্দোবস্ত করা র‍্যাডক্লিফের পক্ষে আদৌ সমীচীন হয় নি।[58] এছাড়া শ্রীহট্ট জেলার পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়া নিয়েও অভিযোগ ছিল । কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি থানায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংলগ্ন শ্রীহট্ট জেলার দুটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থানাকে 'মুসলিমবেষ্টিত হিন্দুপকেট' বলে চিহ্নিত করে পূর্ববঙ্গে ঠেলে দেওয়ায় ঘোর বিরোধ বাঁধে।[59]

১.৪ জনজীবনের র‍্যাডক্লিফ লাইনের দরুন নানা সমস্যাঃ

র‍্যাডক্লিফ লাইনটিকে যদি প্রশাসনিক দলিলপত্র থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেখা হয়, তাহলে অন্য দৃশ্য নজরে আসে। র‍্যাডক্লিফ লাইনের দ্বারা শত শত মাইল কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পৃথক করা হয়েছে তা বেশিরভাগই কৃষিজমির অন্তর্ভুক্ত। যার ফলে গ্রামীণ সমাজের এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষকে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই লড়তে হয়েছে দিনের পর দিন। সীমান্তের উভয় পারের মানুষদের ক্ষেত্রে প্রায় একই চিত্র দেখা গেছে। তাদের বাড়ি থেকে সীমান্ত পার হয়ে চাষের জমি যাওয়া ও চাষ করা ফসল নিয়ে আবার সীমান্ত পার হয়ে আসার সময় বিভিন্ন বাধাঁর সম্মুখীন হতে হয়। এমন ঘটনারও নজির রয়েছে যে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীর গুলিতে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। জয়া চ্যাটার্জি তার গ্রন্থে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার এক হিন্দু ভাগচাষীর দুর্ভোগের কথা বলেন। যেখানে সীমান্ত পার হওয়ার সময় তার এক জোড়া বলদ ওপারের বাহিনীরা কেড়ে নেয়, যা কখনো সে ফিরে পায়নি। কোচবিহার ও রংপুর, মালদাহ ও রাজশাহী এবং নদীয়া ও কুষ্টিয়া জেলাগুলির মধ্যে প্রায় উভয় পারের পুলিশদের দ্বারা গ্রামবাসীদের বহু জিনিস বাজেয়াপ্ত হয়, কখনো বা উভয় পারের গ্রামে প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা জানা যায়। এমনকি ১৯৫০ সালের মে মাসে এক সপ্তাহে ২৫০ টি গবাদিপশু চুরি হয়েছিল।[60]

---

[56] তদেব, পৃ. ১১৫।

[57] তদেব, পৃ. ৯১।

[58] *Transfer of Power, vol-xii* pp. 737-40.

[59] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* পৃ. ১১৭।

[60] joya chatterji, *The Fashioning of a Frontier*, pp. 225-31.

বাংলা বিভাজনের পূর্বে সীমান্তবর্তী সকল এলাকাগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে পারিবারিক, ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক ইত্যাদি প্রয়োজনে দৈনন্দিন যাতায়াত ছিল। এমনকি বাংলা বিভাজন হওয়ার পরও বেশ কয়েক বছর ধরে এই অবাধ যাতায়াত চলতে থাকে। কিন্তু সীমানা তৈরির ফলে তারা বহুভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সীমানা কমিশন সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের কর্মভূমিতে তথা কর্মজীবনেও সীমারেখা টেনে দেয়। যারা সীমান্তের খুব কাছাকাছি বসবাস করতেন, দেখা গেছে সীমান্তের ঠিক ওপারে কিছু দূরে তাদের বড় বাজার বসত। দেশভাগের পর তারা আগের মতো সীমান্ত পারের বাজারে যেতে পারত না; শুধু সীমারেখার কারণে। ওপার বাংলার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা দেখা যায়। যেমন রাজশাহী শহরের কাছাকাছি গ্রামগুলিতে শাক-সবজি, আলু, বেগুন, বিভিন্ন ডাল ইত্যাদি উৎপাদন হত না অনাদিকাল থেকে। বহুকাল থেকেই মুর্শিদাবাদের পদ্মা নদীর দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামগুলি থেকে রাজশাহীর বাজারে জিনিসপত্র পাঠানো হত। মুর্শিদাবাদে প্রচুর পরিমাণে এই ধরনের ফসলচাষ হওয়ার ফলে রাজশাহীর তুলনায় দাম অনেক কম হতো। মুর্শিদাবাদের গ্রামবাসীরা রাজশাহীতে গিয়ে শাক-সবজি বিক্রি করে উপার্জন করত। কিন্তু দেশভাগের পর পদ্মা নদীতে বর্ডার লাইন তৈরি হওয়ার ফলে মুর্শিদাবাদের এই অঞ্চলের আর্থিক অবস্থা ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। অনেকে যখন বাংলা বিভাজনের পর বাধ্য হয়ে আগের কারবার করার চেষ্টা করে তখন তাদের অনেকের জিনিসপত্র রাস্তায় চুরি হয়ে যেত বা কখনো আবার সীমান্তের উভয় দিকেই বাহিনী দ্বারা তারা শারীরিক ভাবে নিগৃহীত হত। এরকম ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে।[61] এছাড়াও বাংলার বিভাজনে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরেছিল। আরো একটা বড় ক্ষতি হয়েছিল তা হল দেশভাগের সময় উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। মালদা থেকে কলকাতা যেতে হলে বিহারের রাজমহল দিয়ে যেতে হত যা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তাছাড়া মুর্শিদাবাদের একেবারে উত্তরপ্রান্তে ফারাক্কায় গঙ্গা নদী অবস্থিত হওয়ার ফলে জলপথ ছাড়া উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব ছিল না। বাংলা ভাগের ঠিক পরেই আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশের সাথে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য 'Indian Tea Planters Association' রেল লাইন যুক্ত রোডের পরিকল্পনা দিয়েছিল সরকারকে এবং সরকার গুরুত্বের সঙ্গে সেটা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছিল।[62]

মালদা ভাগের বলিঃ

দেশভাগের প্রভাব বাংলার সেই সমস্ত জেলার উপর সব থেকে বেশি পড়েছিল যেসমস্ত জেলাগুলিকে কাঁটাতারের বেড়া দ্বিখন্ডিত করেছিল। উত্তরবঙ্গের মালদা জেলাও এমন একটি জেলা। এই জেলার শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর এই পাঁচটি থানা দেশভাগের ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত হলে

[61] Ibid.

[62] Joya Chatterji, *Partition's Legacies,* (Delhi: Suny Press, 2021), pp. 103-5 & 415-17.

পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাওয়া মালদা জেলাকে অনেক বড় মাশুল গুনতে হয়। প্রধানত এই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপরে গভীর প্রভাব পড়েছিল। নদীপথ, রেলপথ, সড়কপথ তিনটিই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়াও বিভাজনের ফলে বড় আঘাত এসেছিল মালদা জেলার অর্থনীতিতে। মালদা জেলার প্রসিদ্ধ কাঁসা ও পিতল শিল্প, রেশম শিল্প, বস্ত্র শিল্প, ধান, আম এবং পাট চাষ সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই সকল সম্পদ সংক্রান্ত আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যও বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য মার খায়, কৃষিজাত পণ্য ঠিকঠাকভাবে বাজারজাত করতে না পারায় চাষবাসেও এর প্রভাব পড়ে।

বিভাজনের আগে অবাধে ব্যবহৃত হতো এমন কিছু নদীপথ, রেলপথ ও সড়ক পথগুলি যেগুলি মালদা ভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেগুলি হল,- মালদা জেলার টাঙ্গন-পুনর্ভবা নদীগুলি ছিল পূর্ববঙ্গের সঙ্গে এই জেলার যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম। বিভিন্ন মরশুমে মরশুমি ফসল-বোঝাই করে নৌকাগুলি নদীপথে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার উদ্দেশ্যে রওনা দিত। শীতের সময় টাঙ্গন এবং পূর্ণভবা নদী দিয়ে ধান-বোঝাই নৌকা রপ্তানির জন্য বেরিয়ে পড়ত। আবার আমের মরশুমে ঢাকা এবং পূর্ব বাংলার অন্যান্য অংশ থেকে ইংরেজ বাজারের বিপরীতে অবস্থিত ঘাটগুলিতে অসংখ্য বড়ো বড়ো নৌকা লেগে থাকত।[63] রেল সংযোগের ক্ষেত্রে, ১৯২৯ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-আব্দুলপুর ব্রডগেজ অংশের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। পূর্বতন মালদহ জেলার সবচেয়ে দক্ষিণে অবস্থিত আমনুরা স্টেশনকে নতুন লাইনের জংশন করা হয়েছিল। "গোদাগাড়ী-লালগোলা" রুটে মালদা থেকে কলকাতা যেতে যত সময় লাগত তার থেকে দেড় ঘন্টা আগেই নতুন এই রুটে মালদা থেকে কলকাতা পৌঁছানো সম্ভব হত"।[64] এই জেলার প্রধান ডাকযোগের সড়কটি নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, পুরাতন মালদা, গৌড়, ইংরেজবাজার, গাজোল, দিনাজপুর প্রভৃতির মধ্যে সংযোগ সাধন করত। এর প্রধান শাখাগুলি কানসাট থেকে গোমস্তাপুর এবং মানকাসা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর একটি রাস্তা ইংরেজবাজার থেকে ভোলাহাট এবং নবাবগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বতন মালদা জেলার পূর্বাংশের যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান তিনটি রাস্তার একটি নবাবগঞ্জ থেকে গোমাস্তাপুর হয়ে রোহনপুর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। রাজশাহী জেলার সীমান্তে পার্বতীপুরে এটি বিভক্ত হয়ে তৃতীয় প্রধান সড়কের সাথে মিলিত হয়েছিল। এই সড়কটি জেলার পূর্ব দিক ধরে চলে যাওয়া গোদাগাড়ী-দিনাজপুর-দার্জিলিং সড়ক এবং আমনুরায় নবাবগঞ্জের সাথে সংযোগ স্থাপন করতো।[65] উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় এই সড়কটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

---

[63] M. O. Carter, *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Malda, 1928-1935*, Bengal Govt. Press, Alipore, 1938, p. 12.

[64] Ibid.

[65] Ibid, p. 13.

দেশভাগের আগে সমগ্র মালদা জেলা জুড়ে খাল বিল ও জলাশয়ের ধারগুলিতে বোরো ধানের চাষ হত। গোমস্তাপুর, মালদা ও হাবিবপুর থানায় সবচেয়ে বেশি বোরো ধানের চাষ হত। ভোলাহাট থানাতেও বিশালাকায় ভাটিয়া বিলের ধারে ধারে অনেক একর জমি জুড়ে বোরো ধানের চাষ হত। পরবর্তীকালে এই গোমস্তাপুর এবং ভোলাহাট থানা পূর্ব-পাকিস্তানে পড়ে গেলে এই জেলায় বোরো ধানের উৎপাদন কমে যায়। এছাড়াও শিবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর ছিল অবিভক্ত মালদার বৃহৎ আউশ ধান-উৎপাদনকারী এলাকা। এই শিবগঞ্জ থানার জমিগুলি দ্বি-ফসলি এলাকা হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হত। দেশভাগের ফলে মালদা জেলার ইক্ষুচাষ ব্যাহত হয়। সমগ্র মালদা জেলায় মাত্র ১৫৯৪ একর জমিতে আখ চাষ করা হত, যেটি মূলত কালিয়াচক এবং শিবগঞ্জ থানাধীন।[66] শিবগঞ্জ থানাটি পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্গত হলে মালদা জেলার আখ উৎপাদন কমে যায়।

ভারত তথা বিশ্বের দরবারে আমের জন্য সুখ্যাতি অর্জনকারী মালদা জেলার সর্বাধিক আম উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি থানা ভোলাহাট এবং গোমস্তাপুর পড়ে যায় পূর্ব-পাকিস্তানে।[67] ১৯৬৯ প্রকাশিত মালদা জেলার গেজেটিয়ার অনুসারে সেই সময় এই জেলা থেকে রপ্তানিকৃত প্রধান দ্রব্য ছিল আম। অবিভক্ত মালদার প্রায় সমগ্র আমই রপ্তানি করা হত প্রধানত কলকাতা এবং পূর্ব-বাংলায়, তার মধ্যে বেশিরভাগটাই যেত পূর্ববঙ্গে। এমনকি দেশভাগের পরেও ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানই ছিল মালদা থেকে রপ্তানিকৃত আমের প্রধান বাজার।[68] পূর্ববঙ্গ মালদায় উৎপাদিত আমের একটি বিরাট বাজার হিসেবে কাজ করত। এই জেলার প্রাক্তন সেটেলমেন্ট অফিসার এম.ও. কার্টারের অভিজ্ঞতা অনুসারে "আমের মরসুমে রেলওয়ে প্লাটফর্মগুলিতে প্রচুর পরিমাণে আম ভর্তি ঝুড়ি থিকথিক করত। মহানন্দা ও কালিন্দি নদীতে প্রায় ৫০০ মণ করে আম-বোঝাই নৌকার সারি পূর্ববঙ্গে ফসল নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করত"। ডিলারদের বেশিরভাগই ছিলেন পূর্ববঙ্গের ব্যবসায়ী; এছাড়াও পূর্ববঙ্গে প্রচুর দালালরাও জড়িত থাকতেন মালদার এই আমের ব্যবসায়।[69] মালদায় খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদা, রোহনপুর, নবাবগঞ্জ এবং হায়াতপুর। এদের মধ্যে শেষের তিনটি চলে যায় পূর্ব-পাকিস্তানে। এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে প্রায় আড়াই লক্ষ মণ আমন ধান রপ্তানি করা হত। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে মটর এবং সর্ষেও রপ্তানি করা হত। পটল, বেগুন, শসা ইত্যাদি সবজিও রাজশাহীতে রপ্তানি করা হত।[70] মালদার জেলার গেজেটিয়ারে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই জেলার "প্রধান পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি এখন পূর্ব-পাকিস্তানে"।

---

[66] Ibid, p. 31.

[67] Jatindra Chandra Sengupta, *West Bengal District Gazetteers: Malda Gazetteer,* (Calcutta, December 1969), p. 88.

[68] Ibid, p. 131.

[69] M. O. Carter, *Final Report on Malda*, pp. 23-25.

[70] Malda Gazetteer, pp. 129-30.

হান্টারের স্ট্যাটিস্টিকাল একাউন্ট অনুসারে, মালদা জেলা কাঁচা রেশম ও রেশম সুতো উৎপাদনে বেশ সমৃদ্ধ ছিল, যার পেছনে ছিল ইউরোপীয় ও স্থানীয় মূলধন। এই মূলধনের বেশিরভাগটাই ছিল রাজশাহীর মেসার্স ওয়াটসন অ্যান্ড কোম্পানির।[71] মালদার রেশম শিল্পের প্রধান বাজার ছিল আমামিগঞ্জ হাট। দেশভাগের ফলে এটি পূর্ব-পাকিস্তানে পড়ে যায়। ক্রেতারা প্রতিবেশী জেলাগুলি থেকে এই মূল্যবান দ্রব্যের জন্য আসত যার মধ্যে একটা বড় অংশ আসত রাজশাহী থেকে। এই আমামিগঞ্জের হাটে রেশমকে কেন্দ্র করে প্রতি হাটবারে তখনকার দিনে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার বিকিকিনি হত। এর থেকেই অনুমান করা যায়, মালদা ভাগ এই শিল্পের কত ক্ষতি করেছে। আমামীগঞ্জ ছাড়াও ভোলাহাটে রমরমিয়ে রেশমের ব্যবসা চলত। এখানে একটি রেশমের কারখানাও ছিল।[72] ১৯২৫-২৬ সালে রেশম শিল্পের বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত লোকদের একটি জনগণনা করা হয়েছিল, যেখানে দেখা গেছে ১৮,৩২৪টি পরিবার রেশম পোকা পালনের সঙ্গে যুক্তছিলেন, তার মধ্যে বেশিরভাগই কালিয়াচকের, এরপরে স্থান ছিল ইংরেজ বাজার এবং ভোলাহাটের।[73] এর পাশাপাশি লাক্ষা উৎপাদনকারী এক বিশাল অঞ্চল পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যায়, যার মধ্যে ছিল শিবগঞ্জ এবং নবাবগঞ্জ থানা। গঙ্গাতীরের এই দিয়ার অঞ্চলের মৃত্তিকায় বালির ভাগ বেশি ছিল, যা প্রচুর পরিমানে বাবুল এবং কুল গাছের উৎপাদনের জন্য সহায়ক ছিল। পাকুড়, পিপুল এবং ডুমুর গাছেও লাক্ষা চাষ হয়, তবে মালদা জেলাতে এই চাষ মূলত কুল ও বাবুল গাছেই সীমাবদ্ধ ছিল।[74]

বাংলার কুটির শিল্পের ওপর ১৯২৯ সালে প্রকাশিত একটি সার্ভের রিপোর্ট অনুসারে পিতল ও কাঁসা শিল্পের বণর্না প্রসঙ্গে পাওয়া যায়, মালদা জেলায় যে সমস্ত অঞ্চলে পিতল এবং কাঁসার জিনিসপত্র তৈরি হত তার বেশিরভাগ জায়গাই পূর্ব-পাকিস্তানে পড়ে যায়। সর্বাধিক কারিগরদের পাওয়া যায় নবাবগঞ্জ থানায় যেটি বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানে অবস্থিত। এই নবাবগঞ্জ থানায় কাঁসা শিল্পের একটি বড় কেন্দ্র ছিল।[75] নবাবগঞ্জ থানা পূর্ব-পাকিস্তানের চলে যাওয়ায় সবথেকে বড়ো ক্ষতি হয়েছিল পিতল শিল্পের। পিতল-নির্মিত দ্রব্যের বাণিজ্য মূলত নবাবগঞ্জ থেকে (পূর্ব-পাকিস্তানে) পরিচালিত হত, পিতলের জিনিসপত্র বেশিরভাগ এই নবাবগঞ্জেই প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হত। পিতল এবং কাঁসার জিনিসপত্র উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাইরে রপ্তানি করা হত। মালদা জেলা ভাগ হওয়ার সবথেকে বড় ক্ষতি এই নবাবগঞ্জ থানার পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যাওয়া। কারণ নবাবগঞ্জ ছিল এই জেলার

---

[71] W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal, Vol-IX*, Districts of Murshidabad and Pabna, London, 1876, p. 96.

[72] Ibid, p. 101; M. O. Carter, *Final Report on Malda*, pp. 18.

[73] Ibid. p. 21.

[74] Ibid. p. 25; *Malda Gazetteer*, 1969, p. 110.

[75] W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, p. 99; *Malda Gazetteer*, 1969, p. 11o.

একটি বানিজ্যকেন্দ্র।[76] জেলার সর্বমোট তিনটি শহর তথা পৌরঅঞ্চলের মধ্যে নবাবগঞ্জ একটি, এটি অবিভক্ত মালদার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এর অবস্থান জেলার দক্ষিণে মহানন্দা নদীর পূর্বতীরে। এই জেলার সেটেলমেন্ট অফিসার এম ও কার্টারের মতে, "জেলার তিনটি পৌরসভার মধ্যে নবাবগঞ্জের প্রশাসন সবচেয়ে দক্ষ এবং শহরের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে এই শহরের উন্নয়ন এবং গুরুত্ব বৃদ্ধির সদিচ্ছা লক্ষণীয়ভাবে বিরাজমান"। নবাবগঞ্জ শীতকালীন চালের একটি দুর্দান্ত বাজার ছিল। শহরের উত্তর ও পূর্ব দিকের সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে গাড়িতে করে এই বাজারে চাল পাঠানো হত। এমনকি দিনাজপুর এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চল থেকেও চাল বোঝাই গাড়ি আসত। জেলার দক্ষিণাঞ্চলের শিবগঞ্জ, কালিয়াচক এবং নবাবগঞ্জ থানা থেকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট নবাবগঞ্জে বাজারজাত করা হত।[77]

মালদা ভাগের ফলে অবিভক্ত মালদার বাজার এবং বাণিজ্যও বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। অবিভক্ত মালদা জেলার বাণিজ্য মূলত নদী পথের মাধ্যমে পরিচালিত হত। এই জেলার রেশম, আম, লাক্ষা প্রধান রপ্তানিকৃত পণ্য হলেও, এর পাশাপাশি ধান, চাল, তৈলবীজ, পাট ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হত। মালদা ভাগের পরে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যাওয়া প্রধান প্রধান বাজারগুলি হল, মহানন্দা ও পূর্ণভবার সঙ্গমস্থলে রোহনপুর; জেলার একেবারে দক্ষিণে মহানন্দার উপর চাঁপাই-নবাবগঞ্জ। এছাড়াও ছিল নাচোল, ভোলাহাট আমামিগঞ্জ ও কানসাটের হাট। এর মধ্যে রোহনপুর বাজারটি ছিল জেলার সব থেকে বড় বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম একটি। ধান ও চাল রপ্তানির ক্ষেত্রেও এটি ছিল অন্যতম বৃহৎ একটি কেন্দ্র। পূনর্ভবা নদীপথে রোহনপুর থেকে মালদা জেলার সর্বাধিক চাল রপ্তানি করা হত।[78] এই বাজার সম্পর্কে কার্টারের বর্ণনায় পাওয়া যায়, "ধান কাটার পর সোমবার মূল-হাট দিবসে বিশ থেকে ত্রিশ মাইল দূর থেকে শত শত গাড়ি বাজারে আসে এবং রাতভর বাজারে জড়ো হয়। ভিড় এত বেশি হয় যে বাজারে যাওয়ার পথগুলি প্রায়শই বন্ধ হয়ে যায়। স্থলযানের পাশাপাশি, পূর্ণভবা নদীপথ দিয়ে ধান-বোঝাই নৌকাগুলি আসে। নৌকাগুলি জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দিনাজপুর জেলার কিছু কিছু অংশে উৎপাদিত পণ্য নিয়ে আসে।" রোহনপুরে একটি রেলওয়ে স্টেশন থাকা সত্ত্বেও, বাণিজ্যের সিংহভাগ নদীপথেই পরিচালিত হত। আংশিক স্টিমার ও আংশিক নৌকার মাধ্যমে এখানকার পণ্যগুলি গঙ্গা ও মহানন্দার নদীপথে ঢাকা, ফরিদপুর, রাজমহল, পূর্ণিয়া, বিহার ও অন্যান্য এলাকাগুলিতে পাড়ি জমাত। এক একটি জলযান প্রায় ৫০০ মণ পর্যন্ত বোঝাই করা থাকত। রোহনপুরের এই বাজারে মাসিক চাল ও ধানের বিক্রি এতটাই বেশি ছিল যে সেই মূল্য বালিয়া-নবাবগঞ্জ এবং আইহোর বাজার দুটিতে মিলিতভাবে বার্ষিক বিক্রির মূল্যের তুলনায় খুব একটা কম ছিল না। এখানে একটি চাল কল থাকার কারণে রপ্তানিযোগ্য চালের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে

[76] W. W. Hunter, p. 101.

[77] M. O. Carter, *Final Report on Malda*, pp. 14.

[78] W. W. Hunter, p. 103.

বেশি। সমগ্র জেলা থেকে স্টিমারের মাধ্যমে ৪১৩৬৪ মণ চাল রপ্তানি করা হত, যার সিংহভাগই রপ্তানি করা হত এই রোহানপুর থেকেই। চাঁপাই-নবাবগঞ্জে ধান ও চালের একটি বড় বাজার ছিল, যেখানে বরেন্দ্রভূমির সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল থেকে গাড়িতে করে পণ্য আসত। বেশিরভাগ ধান স্টিমারে করে গঙ্গার ওপারে বিহারে পাঠানো হত। এটি রবিশস্যেরও একটি বিরাট বাজার ছিল। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জের কিছু কিছু অংশ থেকে আসত পাট। পিতল এবং কাঁসার বাসনপত্র তৈরিরও ব্যবসা ছিল, যা সরাসরি এই বাজার থেকে রপ্তানি করা হত। প্রতি রবিবার করে নাচোলে একটি বড় হাট বসত। সেই হাটে চাল এবং ডাল ছিল প্রধান কৃষিজাত পণ্য। এর সঙ্গে এখানে একটি গরুর হাটও বসত। কৃষিকাজের সরঞ্জাম, পিতল এবং মাটির জিনিসপত্রও বিক্রি হত। জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত অন্যান্য বাজারগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আমামিগঞ্জের হাট। সেখানে রেশমের বিশাল বড় হাট বসত। এছাড়াও ছিল কানসাটের হাট, যা আট বা দশ মাইল দূর থেকে মানুষকে আকর্ষণ করত। ভোলাহাটে উল্লেখযোগ্য ছিল রেশম ও ডেয়ারি বাজার।[79] শুধু জলপথই নয় রেলপথেও প্রচুর জিনিসপত্র আদান-প্রদান হত। তারমধ্যে রোহনপুর এবং নাচোল রেল স্টেশন থেকে জেলার সর্বাধিক পরিমাণ ধান রপ্তানি করা হত। প্রচুর পরিমাণে চালও রপ্তানি করা হত এই দুটি স্টেশন থেকে।[80]

পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যাওয়া এই সকল বাজার ও বিপণন কেন্দ্র হাতছাড়া হওয়ায় মালদা জেলার অর্থনীতিতে কতটা গভীর প্রভাব পড়েছে তা মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। পাশাপাশি, মালদা জেলার বেশ কিছু জিনিস যেমন পূর্ব-পাকিস্তানে রপ্তানি করা হত তেমনি পূর্ব-পাকিস্তান থেকেও বেশ কিছু জিনিস মালদায় আমদানি করা হত, যা দেশভাগের পর বন্ধ হয়ে যায়। যেমন, বর্তমান মালদার ইংরেজ বাজার থেকে অবিভক্ত বাংলার পূর্ণিয়া জেলায় আখ রপ্তানি করা হত। বারিশাল থেকে আসত নারকেল এবং সুপারি-বোঝাই নৌকাগুলি। ছোলা এবং ডালের বিনিময়ে এই পণ্যগুলি বিক্রি করা হত।[81]

মালদা জেলার বিপরীতে বিভাজিত না হওয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় র‍্যাডক্লিফ লাইনের দরুন সমস্যাগুলি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। মালদা জেলার ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় র‍্যাডক্লিফ লাইন জেলার অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প, হাট-বাজার, আমদানি-রপ্তানি, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এই সবকিছুই কাঁটাতারের বেড়া দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। সড়ক পথ এবং রেল পথে মুর্শিদাবাদে যোগাযোগ ছিল কলকাতাসহ বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলির সঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তৎকালীন বিহার রাজ্যের সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে রেল বা সড়কপথে যোগাযোগ ছিল না। গঙ্গানদী মুর্শিদাবাদ জেলাকে উত্তরে মালদা জেলা থেকে ও পূর্ব সীমানা বরাবর পূর্ববঙ্গের

[79] Ibid, pp. 16-18.

[80] Ibid, p. 18.

[81] Ibid, p. 17.

রাজশাহী জেলা থেকে পৃথক করে রেখেছে; যার কারণে অবস্থানগত ভাবেই নদীপথ ছাড়া পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে যোগাযোগের উপায় তেমন ছিল না। গঙ্গা এবং পদ্মা নদী দ্বারা স্টিমারের মাধ্যমে জলপথে বর্তমানে বাংলাদেশের গোয়ালন্দ পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল মুর্শিদাবাদের।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, মুর্শিদাবাদের বহির্বাণিজ্য চলত মূলত কলকাতার সঙ্গে।[82] সমগ্র মুর্শিদাবাদই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হওয়ায় কেবলমাত্র আমদানি-রপ্তানি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ১৯৫১ এর সেন্সাস থেকে জানা যায়, এই জেলার প্রধান রপ্তানিকৃত পণ্য ছিল রেশম, তুঁত ও ধাতু নির্মিত দ্রব্য; যা কলকাতাসহ সমগ্র বাংলার বিভিন্ন জেলায় রপ্তানি করা হত। রেশম বস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্রেও দেখা যায়; মুর্শিদাবাদ জেলায় উৎপাদিত পণ্যের প্রধান বাজার ছিল মূলত কলকাতা, আসাম, পাঞ্জাব ও মারাঠা রাজ্যগুলি এবং দেশের বাইরে মূলত ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি ও আরব দেশের সাথেও।[83] মুর্শিদাবাদের রেশম বস্ত্রের একটি বড়ো অংশ যেত আসামে যার মধ্যে ছিল মেখলা, মটকার চাদর, 'রেইয়াস', প্রতি বছর পূজোর মরসুমে কলকাতায় পাড়ি দিত বান্ডিল বান্ডিল মুর্শিদাবাদের সিল্ক শাড়ি। এছাড়াও ইউরোপে, 'কোরা', প্রিন্টেড রুমাল এবং গাউন-পিস, তসর ও 'বাফতা' (তুলার সাথে মিশ্রিত তসর) রপ্তানি করা হত। রাঙ্গুনে 'ফুলিকাট রুমাল' এবং 'বনহু' রপ্তানি করা হত। সংযুক্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে মটকা এবং কোরা দিয়ে তৈরি 'মাতিচুর' বা 'চুড়ি' পাঠানো হত, এছাড়াও যেত স্কার্ট এবং পাগড়ি, আরবে 'ধারি', 'চৌকারস' এবং 'মাতরাস' রপ্তানি করা হত। 'চেলি' ও 'কোরা' যেত ভারতের বেশিরভাগ অংশে এবং মটকার ধুতি ও শাড়ি (সাদা এবং চেক) যেত ভারতের সেই সমস্ত অংশে যেখানে মারাঠারা বাস করে।[84] তবে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অংশে মুর্শিদাবাদের তৈরি রেশমের শাড়ি, ধুতি, জোড়, বালুচর, বুটিদার শাড়ি, চেলি, মহিলাদের ব্লাউজ, জ্যাকেট, গাউন-পিস, হাওয়াই শার্টসহ অন্যান্য হাওয়াই বস্ত্র, 'রেখিস', 'চারখানাস', চোগা, চাপকান, কোট, স্কার্ফ, শাল, পাড়ওয়ালা ও পাড়বিহীন রুমাল ইত্যাদি সামগ্রী যেত, যার মধ্যে ছিল পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাও। সেইসময় বিশেষত গরমকালে ধনী বাঙালি ভদ্রলোকেদের কোট, শার্ট, চোগা, চাপকান ইত্যাদি ব্যবহার করার কথা জানা যায়, বিপরীতে মুসলিম ধনী মহিলাদের মধ্যে হাওয়াই শাড়ি পরার প্রচলন ছিল। পূর্ববঙ্গের বেশিরভাগ মুসলিম-প্রধান জেলাগুলিতে এসবের বিশেষ চাহিদা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এছাড়াও বাঙালি ভদ্রলোকেরা আলোয়ান বা মোটা চাদর ব্যবহার করতেন। বাঙালি হিন্দুদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রেশমবস্ত্র ব্যবহার করা হত। পুজোর সময় ধনী ও অভিজাত পুরোহিত, বিয়ের অনুষ্ঠানে পরিবারে পাত্র ও পাত্রীর বাবা, শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানেও অনেকে রেশমের ধুতি ও জোড় ব্যবহার করতেন। বিয়ে, পুজো, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে হিন্দুরা রেশম, তসর, মটকার শাড়ি ব্যবহার করতেন। এছাড়াও ধনী পরিবারের

---

[82] West Bengal District Handbook, *Murshidabad, Census-1951*, p. xxxvii.

[83] Ibid.

[84] *Murshidabad Census-1951*, p. xxxvii

অনেক বিধবা মহিলারা বাড়ির বাইরে বের হলে পাড়বিহীন সাদা রেশমের ধুতি পরতেন। অপেক্ষাকৃত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে মটকার ধুতি এবং শাড়ি ব্যবহারের চল ছিল, মুর্শিদাবাদের তৈরি এই সমস্ত মটকার শাড়ি এবং ধুতি পার্শ্ববর্তী রাজশাহী জেলার তুলনায় কিছুটা মোটা ছিল যা বয়স্ক পুরুষ, বিধবা মহিলারা এবং গ্রামের গরিব পরিবারের মহিলারা পরতেন। আঠারো শতকের শেষের দিকেই বহরমপুর থেকে প্রতি বছর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার সিল্ক রপ্তানি করা হত। এর থেকেই অনুমান করা যায় মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প কতটা সুখ্যাতি অর্জন করেছিল এবং কিভাবে সমগ্র বাংলা জুড়ে রেশমবস্ত্রের চাহিদা মেটাত, যে রেশম বস্ত্রের বিপুলসম্ভার পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতেও পৌঁছে যেত।[85] রেশমবস্ত্রের পাশাপাশি, এই জেলা থেকে শীতের বালাপোষ, হাতির দাঁতের বিভিন্ন কাজ যেমন অলংকার, লাঠি, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, চিরুনি বিভিন্ন ধরনের পশুর মূর্তি বিভিন্ন জীবিকার মানুষের মূর্তি এবং পিতল ও কাঁসার জিনিসপত্র কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করা হত।[86]

এই জেলার পূর্বাংশ অর্থাৎ বাগরি অঞ্চল যেমন এই জেলার পশ্চিমাঞ্চল বা রাঢ় অঞ্চলের চাল উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি থেকে চাল আমদানি করত তেমনি গঙ্গার ওপার থেকে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের চাল উৎপাদনকারী জেলাগুলি থেকেও চাল আমদানি করত।[87] ১৮৭২-৭৩ সালে, ধুলিয়ান প্রায় ১০০,০০০ মণ বা ৩৬৬০ টন চালের ব্যবসা করত, যা আংশিক স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হত এবং বেশিরভাগই আমদানি করা হত দিনাজপুরের রায়গঞ্জ এবং ঢাকার নারায়ণগঞ্জ থেকে।[88] চাল ছাড়া আমদানিকৃত প্রধান পণ্য ছিল তুলা, লবণ, পাট, তৈলবীজ, চিনি, তামাক, শাকসবজি, মশলা ও ঘি এবং প্রধান রপ্তানিকৃত দ্রব্য ছিল নীল, রেশম এবং ডাল। কলকাতা থেকে খালি নৌকাগুলি ফিরে এসে পাট ও চালের পণ্য পরিবহনের জন্য রাজশাহী, পাটনা, দিনাজপুর এবং মালদায় যেত। তুলা, পাট এবং লবণ এই তিনটি আমদানিকৃত দ্রব্য কেবলমাত্র এই জেলার মধ্য দিয়ে কলকাতাসহ অন্যান্য জেলায় প্রেরণ করা হত।[89] গম এবং তৈলবীজ এরকমই দুটি আমদানিকৃত শস্য যা পুনঃরপ্তানি করা হত, মূলত কলকাতায়, এছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে; যার মধ্যে রাজশাহীও ছিল।[90] রেশমের গুটি মালদহ এবং রাজশাহী থেকে আমদানি করা হত।[91] রাজশাহী থেকে মুর্শিদাবাদের গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ধুলিয়ান বাজারে আসত মাষকলাইয়ের ডাল।[92] এই জেলায় উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজ ফসলগুলি মূলত স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হত এবং রপ্তানি করা হত প্রধানত কলকাতায়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের বাণিজ্য ছিল মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক। কলকাতার পরে কৃষিজাত

---

[85] Ibid, p. xxix.

[86] Ibid, p. xxxiv-xxxvi.

[87] W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, pp. 157-58.

[88] Ibid, p. 161-62.

[89] Ibid, p. 158.

[90] Ibid, p. 161.

[91] Ibid, p. 157.

[92] Ibid, p. 160.

পণ্যগুলি বেশিরভাগ চলে যেত উত্তর-পশ্চিমে, বিহারের সাহেবগঞ্জ ও অন্যান্য এলাকায়।[93] কাজেই র‍্যাডক্লিফ লাইনের দরুন এই জেলার অর্থনীতি খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। যদিও পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি থেকে যে সকল দ্রব্য আমদানি করা হত সাময়িকভাবে তার কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয়।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুব একটা প্রভাবিত না হলেও, র‍্যাডক্লিফ লাইনের দরুণ এই জেলার সীমান্ত এলাকায় প্রশাসনিক কাজকর্ম ও জনজীবন বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে। সমস্যা ছিল মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার মধ্যবর্তী গঙ্গা নদীর বুকে সৃষ্ট চরগুলো নিয়ে। বাস্তবের মাটিতে না পৌঁছে; কেবলমাত্র কাগজ, কলম ও মানচিত্র নিয়ে একটি ঘরের মধ্যে বসে কলমের আঁচড়ে দুই দেশের মধ্যে টানা বিভাজন রেখা আদতে পরিস্থিতিকে কতটা জটিল করে তুলেছিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও পূর্ববঙ্গের রাজশাহী জেলা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই দুই জেলাকে পৃথক করেছে গঙ্গা (পদ্মা) নদী। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে স্থলভাগের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ যদিও তুলনামূলকভাবে সহজ কাজ, কিন্তু জটিলতা বৃদ্ধি পায় নদী অববাহিকার মধ্যে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে। এটি একটি ভীষণ জটিল ও দুষ্কর কাজ। নদী অববাহিকায় জলসীমা সারা বছর একরকম থাকে না। শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় ও আর্দ্র বর্ষাকালে নদী অববাহিকায় চরম বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার মধ্যবর্তী গঙ্গা (পদ্মা) নদীর অববাহিকায় শীতকালে, শুষ্ক আবহাওয়ায় নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ার ফলে নিত্যনতুন চরের আবির্ভাব ঘটত। বর্ষাকালে ঐ সকল অঞ্চলগুলি গঙ্গা নদীর জলে ডুবে থাকত, বর্ষা চলে গেলে সেগুলি আবার জেগে উঠত। কখনো কখনো একই চরটি প্রসারিত হয়ে স্বীকৃত সীমানা অতিক্রম করে আবির্ভূত হত, অর্থাৎ চরটি দুই দেশেই অবস্থান করত। সাধারণত এর থেকেই বিরোধের জন্ম হত। কারণ উভয় জেলা-কর্তৃপক্ষ এবং উভয় পক্ষের স্থানীয় জনগণ একযোগে এই নবগঠিত চরগুলিকে তাদের বলে দাবি করত। ফলস্বরূপ প্রতিবছর অনিবার্যভাবে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা, এলাকার প্রশাসনিক কাজকর্ম ও শান্তি বিঘ্নিত করত। এসবের সঙ্গে নদীর গতিপথ পরিবর্তন, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে এক পাড় ক্ষয় ও এক পাড় গঠন ইত্যাদি জটিলতাগুলি নবগঠিত ভূ-খণ্ডগুলির সীমানা নির্ধারণ জটিল করে তুলত। এই সকল বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের সংশোধন ও সংযোজন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'আন্তর্জাতিক সালিশি রোয়েদাদ' প্রতিবেদনে "বাংলার বাউন্ডারি কমিশনের রিপোর্টের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত-সংক্রান্ত বিতর্ক" শীর্ষক রচনায় র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের ব্যাখ্যায় কিছু বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। এ সকল বিতর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের সীমানা-সংক্রান্ত একটি সমস্যা ছিল,- "মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ) জেলা এবং রাজশাহী জেলার মধ্যে সীমানা, যার মধ্যে বিভাগ-পূর্ব মালদা জেলার (পূর্ববঙ্গ) নবাবগঞ্জ এবং শিবগঞ্জ থানা অন্তর্ভুক্ত"। প্রতিবেদন

[93] Ibid, p. 157-68.

অনুসারে, ১৯৪৮ সালের ১৪-ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-ডোমিনিয়ন সম্মেলনে ভারত, পাকিস্তান দুই ডোমিনিয়ন এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কিছু বিষয়ে সম্মত হয় ও বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষর করে। যে চুক্তিতে বলা হয়েছিল, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত উক্ত সীমানা-সংক্রান্ত বিরোধগুলির বিচার এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য এবং সেই অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণের জন্য, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ৩১-শে জানুয়ারী, ১৯৪৯ সালের মধ্যে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা উচিত। 'The undrawn radcliffe line' নিয়ে উদ্ভূত সীমান্ত-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান কল্পে সুইডেনের সুপ্রিম কোর্টের সদস্য অ্যালকোট ব্যাগের নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাইবুনাল গঠিত হয় যেখানে ভারত ও পাকিস্তানের সম্মানীয় সদস্য পদে মনোনীত হন যথাক্রমে মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন জাস্টিস চন্দ্রশেখর আয়ার ও ঢাকা হাইকোর্টের বিচারক মহম্মদ শাহাবুদ্দিন। "The Indo boundary disputes tribunal" নামে পরিচিত এই ট্রাইব্যুনালটি মূলত পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ এবং আসাম-সিলেট সীমান্তের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়, যার মধ্যে একটি সমস্যা ছিল পূর্বোল্লিখিত মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার মধ্যবর্তী সীমানাকে কেন্দ্র করে।[94] র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের ক্ষতিপূরণের জন্য অবশ্যম্ভাবী ছিল এই ব্যাগে আওয়ার্ড।

কমিশনের কাছে জাস্টিস চন্দ্রশেখর আইয়ার প্রস্তাব দেন, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলা দুটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী অংশে ও স্থল অংশের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারণ করতে হবে এক বছরের মধ্যে। যদিও জাস্টিস মহম্মদ সাহাবুদ্দিনের মত ছিল ওই এলাকায় পাকিস্তান যে সীমানার অবতারণা করেছিল তা যুক্তিযুক্ত হলেও, রামপুর-বোয়ালিয়া চরের মধ্যেকার সীমান্ত পরিবর্তন হতে পারে। তবে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের ভৌগোলিক অংশ ব্যতিরেকে পাকিস্তান যে অংশ দিয়ে সীমানা নির্ধারণের কথা বলেছিল, তা মান্যতা দেওয়া হোক। এই নিয়ে বিতর্কের শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান অ্যালগট ব্যাগে মত দেন যে, "এই দুই জেলার মধ্যবর্তী অংশে বিতর্কিত এলাকাগুলির সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে; ১৯৪৭ সালের ১২-ই আগস্ট স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের রিপোর্টে প্রদত্ত মানচিত্রে চিহ্নিত ও রোয়েদাদে বর্ণিত ভূমি-সীমানার সঙ্গে সেই সময় গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহের মধ্যবর্তী প্রবাহের সীমানাটিই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমানা হিসেবে ধরা হবে"। তিনি আরো বলেন,- "যদি এই রেখার সীমানা নির্ধারণ অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে এই অঞ্চলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমানা হবে উপরে উল্লিখিত স্থলভাগের ওপর দিয়ে যে রেখা প্রসারিত হয়েছে এবং সীমানা নির্ধারণের তারিখে (ব্যাগে আওয়ার্ড) নির্ধারিত গঙ্গানদীর মূল প্রবাহের মধ্যবর্তী অংশ অনুসরণকারী সীমানা। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশের তারিখ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কমপক্ষে এক বছরের মধ্যে এই রেখার সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।"[95]

---

[94] *Reports of International Arbital Awards on Boundary disputes between India and Pakistan relating to the interpretation of the report of the Bengal Boundary Commission,* Vol-XXI, United Nations, 26 January 1950, pp. 9-13.

[95] Ibid.

কিন্তু সমস্যা এখানেই থেমে থাকেনি; গঙ্গা নদীর বুকে যখন যখন চরের উদ্ভব ঘটেছে তখনই সেই চরের দখলকে ঘিরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে, ঝামেলা হয়েছে। এমনই কিছু ঝামেলার উল্লেখ পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহাফেজখানার নথিপত্রে। সেখানে দেখা যায় কখনো ভারত সরকার অভিযোগ করত পাকিস্তানের পুলিশ ভারতের সীমানার অন্তর্গত চরগুলিতে ঢুকে পড়ত, ভারতীয় চাষাবাদকারীদের গ্রেপ্তার করত। কখনো আবার পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হত সেই অঞ্চলগুলি পাকিস্তান ডোমিনিয়নের অন্তর্গত, ভারতীয় চাষীরা জোরপূর্বক তাদের অঞ্চলে ঢুকে বেআইনিভাবে চাষাবাদ শুরু করেছে। জোরপূর্বক চরের দখল নেওয়া, জোর করে বা চুরি করে ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া, গরু-বাছুর ও অন্যান্য গবাদিপশু চুরি, অপহরণ, পুলিশ কর্তৃক আটক ইত্যাদি উভয় পক্ষের সাধারণ জনগনকে একেবারে জেরবার করে তুলে ছিল। এরপরে আবার ছিল প্রশাসনিক তৎপরতার অভাব। সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত এবং উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের বুকে দু-একটি বিচ্ছিন্ন স্থানে সংঘঠিত এসকল সমস্যা প্রায়শই অবহেলিত থেকে যেত। যদিও বিভিন্ন সম্মেলনে চর-সংক্রান্ত বহুবিধ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও সীমানা নির্ধারণের জন্য এক দু মাসের সময় বেঁধে দেওয়া হত; কিন্তু প্রায়ই দেখা যেত বছর গড়িয়ে গেলেও সেগুলোর নিষ্পত্তি হত না। অনেকের মতে "নদী সীমান্তের এই অংশের ভৌত সীমানা নির্ধারণ বহু বছর ধরেই একটি অবাস্তব প্রস্তাব"।[96] মহাফেজখানার নথিতে মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলার সীমানা-সনলগ্ন চরগুলিকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে বিতর্কজনিত মোট ছয়টি ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়। নিচে তার উল্লেখ করা হল-

প্রথম ঘটনাঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিযোগ, ১৯৫১ সালের ২৭-শে জানুয়ারি ৯ জন কনস্টেবলসহ একজন পাকিস্তান পুলিশ অফিসার মুর্শিদাবাদের রাণীনগর থানার অন্তর্গত দিয়ার সাহেবনগরের একটি চরে ২৮ জন কর্মরত কৃষককে পাকিস্তান এলাকায় ঢুকে যাওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেন এবং রাজশাহী জেলে আটক করে রাখেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় উক্ত চরটি ভারতের অন্তর্গত। ২-রা ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় "মুর্শিদাবাদ সীমান্তে পাকিস্তানি পুলিশের হানা" শীর্ষক প্রতিবেদনে ওই খবর প্রকাশ করা হয়। ভারত সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার তদন্তের জন্য সময় চায়। ওই বছর ১৫-ই সেপ্টেম্বর পূর্ব-পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে প্রেরিত একটি চিঠিতে এই ঘটনার মীমাংসার কথা জানা যায়। সেই চিঠিতে পূর্ববঙ্গের ডেপুটি সেক্রেটারি পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি সেক্রেটারিকে জানান, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পাকিস্তানি পুলিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্য নয়। কোনো পাকিস্তান পুলিশ ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেনি। বিপরীতে, ২৮ জন ভারতীয় নাগরিক পদ্মা নদী পার হয়ে রাজশাহীর দিকে একটি নবগঠিত চরে অবৈধভাবে প্রবেশ করে ধান চাষ শুরু করে। তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং ফৌজদারি মামলা করা হয়। তাদের সকলেই অভিযোগ স্বীকার করেছে এবং দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। ১৯৫১ সালের

[96] Home Political CR, 2B-31/55, B. Nov 1956 1-3, West Bengal State Archive, Kolkata.

৪ ও ৫-ই মে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত যৌথ সম্মেলনে মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং তিনি নিশ্চিত হন যে চরটি পাকিস্তানের অন্তর্গত হওয়ায় তার কোনো মামলা নেই"।[97]

দ্বিতীয় ঘটনাঃ ১৯৫৩ সালের জুন মাসে মুর্শিদাবাদের এসপি ডিআইজি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি মারফত মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার অন্তর্গত রাণীনগর মৌজার 'চৌহদ্দি' নামক গ্রামে পাকিস্তান পুলিশের দখল নিয়ে জানান। এর ফলে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেন। এর তদন্তের পর ১৯৫৬ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডি.এল.আর.এস. এর স্পেশাল অফিসার জানান ব্যাগে লাইন অনুযায়ী 'চৌহদ্দি' গ্রামটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত;-

"নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ব্যাগে লাইন অনুযায়ী চৌহাদ্দিপাড়া নামক গ্রাম এবং মানচিত্রে চিহ্নিত সীমান্ত চৌকিগুলি পাকিস্তান ভূখণ্ডের অন্তর্গত। যদিও নীল রেখা দ্বারা চিহ্নিত কিছু অঞ্চল বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দখলে রয়েছে।" (It is confirmed that hamlet Chouhaddipara and the Border outposts marked on the trace are well within Pakistan Territory according to the Bagge Line though some of the areas shown in blue hatch are in physical possession of West Bengal)।[98]

তৃতীয় ঘটনাঃ ১৯৫৫ সালের ১২-ই ডিসেম্বর একটি চিঠিতে মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মুর্শিদাবাদ এবং রাজশাহীর মধ্যবর্তী সীমান্তে নবগঠিত চরগুলির সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। চিঠিতে তিনি দুটি চরের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে একটি মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার ঠিক বিপরীতে রাজশাহী জেলার মূল ভূখণ্ডের খুব কাছেই তৈরি হয়েছে। রাজশাহী থেকে সেই চরকে পৃথককারী ছোট, অগভীর জলাশয়টি প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে এবং তার আশঙ্কা অল্প সময়ের মধ্যেই এই চরটি রাজশাহী জেলার সাথে যুক্ত হবে। প্রায় ৫,০০০ বিঘার এই চরটি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলে তিনি দাবি করেছেন কারণ নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের কিছু চাষীরা এই চরের জমিগুলি ইতিমধ্যেই সংস্কার করেছে। একইভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি থানার মধ্যে চাঁদনীচক বি.ও.পি.র পাশে প্রায় ৩ মাইল দৈর্ঘ্য এবং ১ মাইল প্রস্থের একটি খুব বড় চর তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানিদের ধারণা যে এই চরটি আইনত তাদের। একটি ক্ষীণ জলধারা এই চরটিকে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে পৃথক করেছে, যা দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। জল শুকিয়ে এলে এই চরটি মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। মুর্শিদাবাদের ডি.এম আরও জানান "আমরা ইতিমধ্যেই এই চরে একটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করেছি কিন্তু জলঙ্গি থানার বিপরীতের চরটিতে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের জন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি"। তার কথায় "চর দুটি যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ। এবং এই চরগুলির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই বছর চাষের আওতায় আনা যেতে পারে"। এজন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ উভয় সরকারকেই ভারত ও পাকিস্তান ভূখণ্ডের কাছাকাছি অবস্থিত চরগুলিকে যথাক্রমে ভারত ও পাকিস্তান সরকার কর্তৃক দখল করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

[97] Home Political CR, 1B-3/51 PTI, B. AUG 1953 57-73, West Bengal State Archive, Kolkata.

[98] Home Political CR, 2B-24/56, B. JUNE 1957 52-57, West Bengal State Archive, Kolkata.

তার আশা উভয় দেশের স্থানীয় কৃষকদের জন্য এটি একটি সুষ্ঠ সমাধান হবে। তার এই চিঠির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি, পূর্ববঙ্গ সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারিকে চর-সংক্রান্ত সমস্যার নিস্পত্তিজনিত কয়েক দফা প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য পাঠান। সীমান্ত এলাকার শান্তিপূর্ণ প্রশাসন যাতে ব্যাহত না হয় তাই এই বিতর্কের সমাধান হিসেবে উপসচিব উভয় সরকারের হস্তক্ষেপে নিস্পত্তির কথা বলেন। তার প্রস্তাব ছিল, প্রথমতঃ বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে, যখন সীমান্ত অতিক্রম করে উদ্ভূত চরটি সীমানার দুই পাশেই অবস্থান করত, তখন মাটিতে সীমানা নির্দেশক এক ধরণের দৃশ্যমান চিহ্ন অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ প্রতিবছর ডিসেম্বর থেকে শুরু করে বর্ষা শুরুর আগে পর্যন্ত চরের জমি ঘিরে এই মৌসুমী বিবাদের নিস্পত্তির জন্যে বাৎসরিক সীমানা নির্ধারণের জন্য কিছু স্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা; যার মধ্যে জেলার কানুনগোর অধীনে তিনজন সীমানা জরিপকারী থাকবেন। এবং এই জরিপ তথা সীমানা নির্ধারণের কাজটি অবশ্যই পশ্চিম ও পূর্ব উভয় বঙ্গ সরকারের ডি.এল.আর.এস তত্ত্বাবধান করবেন। এর জন্য প্রতিবছর ওই মৌসুমে নদীর পাড়ে অফিসারদের ক্যাম্প করা উচিত এবং যখনই কোন চর জেগে উঠবে তখনই মানচিত্রসহ সুষ্ঠুভাবে তার সীমানা চিহ্নিত করতে হবে।[99] তার এই প্রস্তাবের ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে একটি অর্ডার পাওয়া যায় যেখানে মুর্শিদাবাদ জেলার ডিএমকে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী চর এবং রাজশাহী জেলার ডিএমকে পূর্ববঙ্গের নিকটবর্তী চরটি দখলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[100]

চতুর্থ ঘটনাঃ ১৯৫৫ সালের ৩১-ই ডিসেম্বর একটি চিঠিতে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার এই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিবের কাছে নবগঠিত চর-সংক্রান্ত সমস্যার নিস্পত্তির বিলম্বের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জানা যায়, ওই বছর জানুয়ারিতে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার দয়রামপুর ইউনিয়নের বাজিতপুর, পিরোজপুর, বাখরালি ইত্যাদি মৌজায় নতুনভাবে সংযোজিত চরের দখল নিয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটি বিরোধ দেখা দেয়। মুর্শিদাবাদ এবং রাজশাহীর জেলা প্রশাসকের যৌথ সিদ্ধান্তে স্থির হয়, উক্ত জমির চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণ না করা পর্যন্ত বিতর্কিত জমিটি অনাবাদি থাকবে। কিন্তু পাকিস্তানের লোকেরা চুক্তি লঙ্ঘন করে উক্ত জমি চাষ করে। তিনি চিঠিতে লেখেন,

"আলোচনার সময় আপনি আশ্বাস দিয়েছিলেন.....আপনি এক বা দুই মাসের মধ্যে বিতর্কিত জমিটি চিহ্নিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমাদের অবাক করার বিষয় ও অপূরণীয় ক্ষতির বিষয় হল—প্রায় এক বছর অতিক্রান্ত হলেও সেই সমঝোতা বাস্তবায়িত হয়নি। সীমানা নির্দেশকারী মানচিত্র প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু আমাদের অবাক করার বিষয় হল এখনও পর্যন্ত এর কোনও সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হয়নি.....পাকিস্তানি পুলিশ উক্ত জমিতে টহল দিচ্ছে এবং আমরা ভারতীয় ইউনিয়নের জমির মালিকরা, অসহায়ভাবে দেখছি—পাকিস্তানের লোকজন সেই জমি চাষের প্রস্তুতি নিচ্ছে"। ("During the time of discussion.....you would try your best to have the land in dispute demarcated in a month or two. But to our utter surprise and huge loss nearly a

[99] Home Political CR, 2B-31/55, B. Nov 1956 1-3, West Bengal State Archive, Kolkata.

[100] Ibid.

year has passed with your understanding unimplemented.....a map showing the boundary has been prepared. But to our surprise no concrete shape has yet been given to this.....The Pakistani Police has been patrolling the said land and we the land owners of Indian Union are watching helplessly the men of Pakistan making arrangements to cultivate the said land").

এই চিঠির উত্তরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দুই দেশের ডি.এল.আর.এস. যৌথভাবে ২৭.৪.৫৫ ও ২৮.৪.৫৫ তারিখে যথাক্রমে পিরোজপুর এবং বাজিতপুরের বিপরীতে অবস্থিত চর দুটি পরিদর্শন করেন। ব্যাগে লাইন অনুসারে দেখা যায় পিরোজপুরের বিপরীতের চরটি ভারতের সীমানার মধ্যে এবং বাজিতপুরের বিপরীতে অবস্থিত চরটি পাকিস্তানের সীমানার অন্তর্গত। ডি.এল.আর.এস-এর নোটের ভিত্তিতে এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা উচিত কিনা তা সরকারের কাছ জানতে চাইলে গৃহমন্ত্রক বিভাগ থেকে জানানো হয়, যে বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন এবং সরকারের নির্দেশে না আসা পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনোরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরো উল্লেখ করেন, "ইতিমধ্যে চাষাবাদাধীন এলাকার ফসল এবং নতুন করে চাষাবাদের বিষয়ে পাকিস্তান এবং ভারত উভয় সরকারের পক্ষ থেকে অভিযোগ এবং পাল্টা-অভিযোগ করা হয়েছিল। নবাবগঞ্জ এবং জঙ্গিপুর জেলা প্রশাসক এবং তাদের সার্কেল অফিসাররা এই অভিযোগগুলি তদন্তের জন্য বেশ কয়েকবার বৈঠক করেছিলেন... যতদূর রিপোর্ট পাওয়া গেছে, ফসল মোটেও কাটা হয়নি। ফসলের কিছু অংশ চুরি হয়ে গেছে এবং ফসল কাটার আগেই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জলে ডুবে গেছে"। এরপর আরও তিনমাস পর ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে জানা যায় পূর্ব-পাকিস্তান সরকার মৌসুমী সীমানা নির্ধারণের সিদ্ধান্তে সহমত প্রকাশ করেছে।[101] এই একটি বিতর্কের সমাধান করতে প্রায় দেড় বছর অতিক্রম হয়ে যায়। উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক কর্তা-ব্যক্তিরা বিভিন্ন পলিসি নির্মাণ করতেন, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্তে অজানা আতঙ্কে কালাতিপাত করেছেন সীমান্তের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষেরা। সরকারের টালবাহানার মাশুল গুনতে হত এই সকল প্রান্তিক মানুষদের।

পঞ্চম ঘটনাঃ ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের কাছে এই জেলার সুতি থানার অন্তর্গত নূরপুরদিয়ারের বিপরীতে পদ্মা নদীর ওপরে নবগঠিত একটি চরে পাকিস্তান বর্ডার পুলিশ কর্তৃক ৮টি কুড়ে ঘর স্থাপনের অভিযোগ এনেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন এর প্রতিক্রিয়ায় মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ ব্যাগে লাইন অতিক্রম করে পাকিস্তানের অন্তর্গত চরহাসানপুরের নিকটবর্তী চরটি দখল করেছে। মহাফেজখানার নথিতে এই চিঠির পরেই পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পাঠানো একটি টেলিগ্রাম পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত নারায়ণপুর ও পারকা গ্রামের নিকটবর্তী একটি চর এলাকায় ভারতীয় পুলিশের অনুপ্রবেশ ও জোরপূর্বক স্থানীয় চাষীদের চাষ করা ফসল কেটে নেওয়ার অভিযোগ জানানো হয়েছে এবং এই ঘটনার যৌথ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

[101] Home Political CR, 2B-4/56, B.DEC 195 92-98, West Bengal State Archive, Kolkata.

১৯৫৮ সালের ৮-ই ডিসেম্বর বহরমপুরে রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিতর্কিত চরগুলির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কল্পে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভার কার্যবিবরণী অনুসারে, সেদিন বেশ কিছু সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। যার মধ্যে ছিল, পাকিস্তান সীমানার অন্তর্গত ভারতের দখলিকৃত চর হাসানপুরে উভয় দেশের পুলিশ ক্যাম্প নিয়ে ও চাষাবাদকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, বিতর্কিত চর-বৈদ্যনাথপুরে চাষাবাদ ও ফসল তোলাকে কেন্দ্র করে পাক ও ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে চাপানউতোর, চর-তারাপুর (পাকিস্তান) ও চর-তারাপুর (ভারত) এর মধ্যে পরিখা খনন বন্ধ করার নির্দেশ, এই দুই চরের মধ্যবর্তী 'দামোস' অঞ্চলে বিতর্কের জেরে মাছ ধরায় স্থগিতাদেশ, মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী এই দুই জেলার গরু বাছুর চুরির ঘটনা, হরিমোহন সরকার নামক এক ভারতীয় নাগরিকের অপহরণ এবং হাসিমুদ্দিন গোমস্তা, সের মহম্মদ, নিশু মোহাম্মদ, নাঈব শেখ, শামসুল শান পাইকর, কোলে, দোবে গড়ে, পেপসু গড়ে, সোফার গড়ে, আজব আলী মকবুল, সাফজল, কোবে ওয়াহেব, কালু, শামতুল, সিদ্দিক, আইয়ুব আলী ডক্টর, হামযু দাকাত এবং বেলাল নামক তেরো জন পাকিস্তান নাগরিককে আটক পরীক্ষা করা নিয়ে যৌথ তদন্ত এবং পরিশেষে সীমান্তে উত্তেজনা এড়াতে বি.ও.পি.র সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত। দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় উপরিউক্ত সমস্যাগুলির মীমাংসার জন্য যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[102]

এর দুদিন পর ১৯৫৮ সালের ১০-ই ডিসেম্বর রাজশাহী এবং মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে উক্ত নুরপুরদিয়ারের কাছে নতুন চরে একটি যৌথ সভার আয়োজন হয় যেখানে স্থির করা হয় চরের ঠিক মাঝ বরাবর একটি রেখা টানা হবে, যেটি হবে সীমানা রেখা। এই রেখার উভয় পাশে ত্রিশ গজ জমি 'নো-ম্যানস ল্যান্ড' হিসাবে বিবেচিত হবে। দুই দেশের নাগরিকদের নিজের নিজের দেশের অন্তর্গত চরের অংশবিশেষে আসার এবং জমি চাষ করার অনুমতি দেওয়া হবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা সীমানা নির্ধারণে রাজি হওয়ার পর উভয় পক্ষের বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে এবং এরপর থেকে উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মাঝেমধ্যে অনধিক ছয়জন পুলিশ বা ই.পি.আর.-এর একটি দল টহল দেবে বলে ঠিক করা হয়।[103]

ষষ্ঠ ঘটনাঃ পশ্চিমবঙ্গের আইবি দপ্তর থেকে মে মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার অন্তর্গত চাঁদনী চক বিওপির এবং রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত পঙ্ক ক্যাম্পের মধ্যবর্তী অংশে 'দামোস' এলাকায় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার চর সারঞ্জাদপুরে পাকিস্তানি নাগরিকদের বসবাসকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে গোপন বার্তা প্রেরণ করা হয়। চরের দখল ও পরিখা খনন ইত্যাদি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। গোপন বার্তায় আরো জানানো হয় মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন সীমান্তে টহল বৃদ্ধি করেছে। পরের মাসে অপর একটি গোপন বার্তায় পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া থানার অন্তর্গত পাক বি.ও.পি. মাঝেরদিয়ারের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত

[102] Home Political CR, IB-234/58, B.FEB 1960 129-145, West Bengal State Archive, Kolkata.

[103] Ibid.

একটি চরে পাকিস্তান নাগরিক কর্তৃক চাষাবাদের প্রচেষ্টার কথা জানানো হয় যা মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আটকানো সম্ভব হয়েছে। চরটি দুই দেশেই অবস্থিত, যার কারণে এই চরের মধ্য দিয়ে সীমানা নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে দুপাশে বাঁশের বেড়া ও কিছু পাকা পিলার দেওয়া ছিল, এবং দু'দেশের সীমানার মধ্যবর্তী লম্বা একটি অংশ (নো ম্যানস ল্যান্ড হিসেবে) ফাঁকা পড়েছিল। কিন্তু শুকিয়ে আসা একটি জলধারার মধ্য দিয়ে যে বাঁশের বেড়া ও পাকা পিলারগুলি সীমানা নির্দেশক হিসেবে পোঁতা হয়েছে তার অবস্থান নিয়ে সংশয় আছে। পাকিস্তান পুলিশের এই বক্তব্য সমর্থন করে ই.পি.আর.। ফলে আবারও একটি যৌথ নিরীক্ষা ও ব্যাগে লাইন অনুসারে জরিপের প্রয়োজন পড়ে। ফলস্বরূপ ১৯৫৯ সালের ১৬ই জুন দুই দেশের বি.ও.পি.র প্রতিনিধিরা অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে জমিটি জরিপ করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে দুটি সীমানা নির্দেশক খাঁচার পরিবর্তে একটি খাঁচা ব্যবহার করা হবে। ১৯-শে আগস্ট ১৯৫৯ সালে একটি চিঠির মারফতের পূর্ববঙ্গ সরকার এই সিদ্ধান্তে মান্যতা দেন।[104]

আলোচিত ঘটনাবলীতে একটি সাধারণ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় তা হল; একই চরে একাধিক তদন্ত, একাধিকবার জরিপ ও ততোধিক সীমানা নির্ধারণ, যা সীমান্ত এলাকার সুষ্ঠ প্রশাসনের অনুপস্থিতি, দু-দেশের সরকারের বোঝাপড়ার অভাব এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতাকেই তুলে ধরে। যে কোনো নবগঠিত চরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে সরকার এই গুরুগম্ভীর বিষয়টিকে কতটা লঘু করে দেখেছিল। সংশ্লিষ্ট জেলা আধিকারিক কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিবকে বারংবার একটি বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া প্রমাণ করে তাদের কাছে বিষয়ের গুরুত্ব কতটা ছিল। প্রাথমিকভাবে উভয় দেশের সরকার কর্তৃক নেওয়া কিছু ভুল পদক্ষেপ বিষয়টিকে আরো জটিল করে তোলে। যৌথ জরিপের আগেই চরের দখল নেওয়া, সরকারি (যৌথভাবে) মাপ যোগের আগে নাগরিকদের সেই চরে প্রবেশ করা, চাষাবাদ শুরু করা, জরিপ ও সীমানা নির্ধারণের জন্য তারিখের পর তারিখ ফেলা, চিঠি, পাল্টা-চিঠি, বৈঠক ইত্যাদি সমাধানকে দীর্ঘমেয়াদী করে তোলে। এর পাশাপাশি ভারত সরকার কর্তৃক তার কর্মীদের প্রতি যে চূড়ান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ পেয়েছে তা উপেক্ষা করা যায় না। মালদা জেলার একটি ঘটনায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। মালদা-রাজশাহী সীমান্তের মাঝখানে একটি চরের দখলকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হলে চরটি পুনরায় জরিপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মালদা এবং রাজশাহী এই দুই জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জরিপের দিনক্ষণ নিয়ে যৌথভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তের কপি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিবের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু জরিপের সময় মালদা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এ.এন. ব্যানার্জি জানতে পারেন যে তার সঙ্গে প্রেরিত সীমানা নির্ধারণকারী দলের কাছে কোনো সরকারি নির্দেশও আসেনি এবং সীমানা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কিছুই সরবরাহ করা হয়নি। অথচ তিনি যখন পাকিস্তান থেকে আগত দলটিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন তখন তারা তাদের সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়ে বলে তাদেরকে সবকিছুই সরবরাহ করেছে। সীমানা নির্ধারণের জন্য অবশেষে পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত সেই কাগজপত্রে দ্রুত চোখ বুলিয়ে মালদা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে বিষয়টি বুঝে

[104] Home Political CR, 1B-105/59, B. JULY 1961 203-220, West Bengal State Archive, Kolkata.

নিতে হয় ও পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। পরবর্তীকালে শ্রী ব্যানার্জী একটি চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ করেন। সেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় লেখেন,

"আমাদের সীমান্ত নিরূপণ দলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যিনি বর্তমানে মালদা জেলার বুলবুলচণ্ডীতে অবস্থান করছেন, আমাকে জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালক কর্তৃক সীমা নির্ধারণ কার্য শুরু করার জন্য কোনো নির্দেশ তিনি পাননি এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র তাঁর কাছে সরবরাহ করা হয়নি। পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ দলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, তাঁর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়েছে" ("The Officer-in-charge of our Boundary Demarcation Party at present stationed at Bulbulchandi, Malda district informed me that he had not received any orders from the Director of Land Records and Survey, West Bengal to start demarcation work and had not been supplied with the full set of necessary papers for the purpose. The Officer-in-charge of the Pakistan Boundary Demarcation Party was present and on being asked he intimated that so far as he was concerned, he had been supplied with all necessary papers") ।[105]

শ্রীযুক্ত ব্যানার্জীর কাছে এই পরিস্থিতি কতটা অবমাননাকর, অপমানজনক ও লজ্জার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেদিনের শ্রী ব্যানার্জীর অবস্থা যেন ঠিক ঢাল, তলোয়ার বিহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। মালদা জেলার এই ঘটনা এবং পূর্বে উল্লেখিত চতুর্থ ঘটনাটি সরকারের চূড়ান্ত অবহেলার নিদর্শন তুলে ধরে।

উপরিউক্ত ঘটনা-পরম্পরা থেকে সীমান্ত এলাকাবাসী মানুষদের জীবনযাত্রার টুকরো ছবি ফুটে ওঠে। বিভাজন রেখার দরুন, জমির ভাগ-বাটোয়ারকে কেন্দ্র করে তাদের জীবন যে কতটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দিন-আনা, দিন-খাওয়া এই সকল সাধারণ মানুষ সংসারকে বাঁচাতে পেটের তাগিদে যেটুকু রোজগার করতেন তার সম্পূর্ণটাই ছিল অনিশ্চিত। বসতভিটা থেকে রোজগারের জমি, গরু-বাছুর এমনকি মানুষের জীবনেরও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। উপরন্ত চর এলাকার সারাক্ষণের উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তাদের এক মুহূর্তের জন্য মানসিক শান্তি দেয়নি। আশঙ্কা, আতঙ্কে তাদের দিন গুজরান করতে হত। যেখানে দুই দেশের সরকারের লক্ষ্য ছিল চরগুলিকে তাদের নিজের নিজের দেশের কৃষিক্ষেত্রের আওতায় আনা, সেখানে চর এলাকার এই সকল মানুষদের কাছে এটি ছিল জীবন-মরণ প্রশ্ন। সমকালীন সংবাদপত্রেও সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের জীবনের করুন চিত্র উঠে আসে;- "বর্তমানে নদীপথে জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য অচল। গুরুত্বপূর্ণ লালগোলাঘাট রেলস্টেশন ইহার ফলে অস্তিত্বহীন। জেলার উল্লেখযোগ্য নদী পথগুলি অবরুদ্ধ হওয়ায় হাজার হাজার জেলে মাথায় হাত দিয়ে বেকার হইয়া পড়িয়াছে। সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলি আজ শ্রীহীন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে"।[106] দেশভাগ না হলে দু'দেশের সরকার হয়তো নদীর বুকে কাল্পনিক কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার মিথ্যে চেষ্টায় নিজেদের সর্বশক্তি

[105] Home Political CR, 2B-5/521, B. AUG 1954 666-674, West Bengal State Archive, Kolkata.

[106] *বসুমতী,* ৮-ই জানুয়ারি ১৯৫৯।

নিয়োজিত করত না। চর এলাকার মানুষদের জীবনধারা হয়ত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত। র‍্যাডক্লিফ লাইন এখনো পর্যন্ত এই সকল প্রশ্নকে জিইয়ে রেখেছে।

উপসংহারঃ-

১৯৪৭-এর ১৪ ও ১৫-ই আগস্ট দুই দেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও বাংলা বিভাজনের ফলে কোন জেলা কোন দেশে পড়েছে তখন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে তা নিয়ে অনিশ্চিয়তা রয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার দুদিন পরে ১৭-ই আগস্ট Radcliffe Award ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বাংলার মানুষ তা জানতে পারে। উভয়পক্ষের দরকষাকষির মধ্যে পড়েই র‍্যাডক্লিফ এর নেতৃত্বে সীমানা কমিশনকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছিল। র‍্যাডক্লিফের ঘোষণা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। বহু অনিশ্চয়তার কারণে এই কমিশনের সিদ্ধান্ত অনেক বিতর্কের জন্ম দেয়। আরো অবাক করার বিষয় হল প্রচণ্ড তাড়াহুড়োর মধ্যে দেশভাগের প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করতে সীমানা নির্ধারণের জন্য যে তথ্যগুলি ব্যাবহার করা হয়েছিল, সেগুলি অভ্রান্ত বা নির্ভুল ছিল না।

এই অখন্ড ভারতের বুকে "দেশভাগ" নামক যে অস্ত্রোপচার হয়েছিল তা কোনভাবেই সঠিক হয়নি। জয়া চ্যাটার্জী খুব সুন্দর একটি উদাহরণ টেনে র‍্যাডক্লিফকে শল্যচিকিৎসক ও দেশভাগকে শরীরে অস্ত্রোপচারের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, আমাদের শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে আমরা সেই সমস্যার বিশেষজ্ঞের কাছে চিকিৎসা করার জন্য দ্বারস্থ হই, যাতে আমরা সুচিকিৎসা পেতে পারি। কিন্তু ভারতবর্ষ বা দেশভাগ কোনো বিষয়েই র‍্যাডক্লিফের বাস্তব কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কারণ প্রথমতঃ তিনি কোনো দিনই ভারতে অবস্থান করেন নি। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার কোনো প্রেক্ষাপটও তার জানা ছিল না। তৃতীয়তঃ এই ধরনের সমস্যা সমাধানের পূর্ব কোনো অভিজ্ঞতাই তার ছিল না। একটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হয় যে এই কাজের জন্য তিনি কতটা অনুপযুক্ত ছিলেন। কাশ্মীর, যেটি ভারত তথা সমগ্র পৃথিবীর কাছে 'ভূস্বর্গ' এর তকমা পেয়েছে সেই জম্মু এবং কাশ্মীর সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে র‍্যাডক্লিফ জানান "I was not even aware of Kashmir, I heard about it long after I returned to London"।[107] পরিণতির কথা চিন্তা-ভাবনা না করেই এরকম অনুপযুক্ত এক ব্যক্তির হাতে এত বড় একটি গুরুদায়িত্ব অর্পণ করায় মাউন্টব্যটেনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। শুধু সিরিল র‍্যাডক্লিফকে নির্বাচনই নয়, তার ওপর তড়িঘড়ি দেশভাগের কর্মটি অর্থাৎ দুই দেশের মধ্যে কাঁচি চালানোর কাজটি অতি দ্রুত সম্পাদনের জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে থাকা অবশ্যই উভয় দেশবাসীর কাছে মাউন্টব্যটেনকে কালপ্রিটের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছে। এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায় তৎকালীন বিখ্যাত সাংবাদিক তথা ইউনাইটেড কিংডমে ভারতীয় হাই কমিশনার কুলদীপ নায়ারের একটি গ্রন্থে। সেখানে তিনি মাউন্টব্যাটেন এবং

[107] Kuldip Nayar, *Scoop! : Inside Stories from the Partition to the Present*, (New Delhi: Harper Collins, 2006), p. 35.

সিরিল র‍্যাডক্লিফের সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করেছেন যেখানে মাউন্টব্যাটেনের বিভিন্ন আচরণ এবং কথাবার্তার মধ্যে সত্যতার অভাব, অস্বচ্ছতা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। এর পাশাপাশি তার গ্রন্থে দেশভাগের কাজের জন্য প্রদত্ত সময়ের স্বল্পতা সম্পর্কে র‍্যাডক্লিফের স্বীকারোক্তিও পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নায়ার র‍্যাডক্লিফকে সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করেন,

'আপনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্তরেখা যেভাবে নির্ধারণ করেছেন, তাতে আপনি সন্তুষ্ট? ('Are you satisfied with the way you drew the border lines between India and Pakistan?')

'র‍্যাডক্লিফ উত্তরে বলেন—

'আমার কোনো বিকল্প ছিল না; আমার হাতে সময় এতটাই অল্প ছিল যে এর চেয়ে ভালো কাজ করা সম্ভব ছিল না। আবারও আমাকে যদি একই পরিমাণ সময় দেওয়া হত, আমি ঠিক একই কাজই করতাম। তবে, যদি আমার হাতে দুই থেকে তিন বছর সময় থাকত, তাহলে আমি যা করেছি, তার যে ভালো কিছু করতে পারতাম' (I had no alternative; the time at my disposal was so short that I could not do a better job. Given the same amount of time, I would do the same thing again. However, if I had two to three years, I might have improved on what I did)।[108]

এর থেকে বোঝা যায় দুটি দেশের মধ্যে সীমানার নির্ধারণ করার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কত তাড়াহুড়ো করে সারা হয়েছিল। একে পাঞ্জাব ও বাংলার প্রাদেশিক পরিষদগুলিকে বিভাজনের পক্ষে ভোট দেওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা পালন করতে দেরি হয়েছিল উপরন্ত জুন মাসে যখন র‍্যাডক্লিফ শিমলায় ছিলেন সেই সময় মাউন্টব্যাটেন বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তাকে মনোনীত করেন। 'It was impossible to undertake the field survey in June because of the heat,' এই বলে জুন মাসের প্রচন্ড গরমে জরিপের কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে র‍্যাডক্লিফ জুলাই থেকে এই কাজ শুরু করার জন্য সময় চেয়ে নিলে মাউন্টব্যাটেন তাকে বারংবার বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় জরিপের কাজ শুরু করতে চাপ দিতে থাকেন এবং বলেন এর জন্য তিনি একটা দিনও সময় নষ্ট করতে চান না! এমনকি এই সময় মাউন্টব্যাটেন র‍্যাডক্লিফকে দিনে দুবার করে টেলিফোন করতেন এমনও জানা যায়।[109] শুধু তাই নয়, এরকম এক ব্যক্তির হাতে দেশভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত করার পর মাউন্টব্যাটেন তার সমস্ত দায়দায়িত্ব ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেন। Radcliffe Award প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মাউন্টব্যাটেন হঠাৎ চুপ করে যান। যেখানে র‍্যাডক্লিফ নিজে অ্যাওয়ার্ড লেখার কাজ সম্পূর্ণ করেন ১২ ই আগস্ট, সেখানে মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তর তথা ভারতের স্বাধীনতা দ্বিবসের আগে সেই রোয়েদাদের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন এই ত্রুটিপূর্ণ বন্দোবস্তের জন্য র‍্যাডক্লিফের পাশাপাশি স্বয়ং ভাইসরয়কেও উভয় পক্ষ থেকে দোষারোপ করা হবে, এবং তা হয়েও ছিল। আর এই আশঙ্কা থেকেই পার্টিশন-সংক্রান্ত সব কাজ থেকে তিনি নিজেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। র‍্যাডক্লিফের উপর

[108] Ibid, p. 34.

[109] Ibid, p. 35.

দায়িত্বভার দিয়ে তিনি ইতিমধ্যে করাচি চলে গিয়েছিলেন।[110] শুধু তাই নয় কমিশনের রায় তার কাছে জমা দেওয়ার পরও ভাইসরয় এককভাবে সেটি খুলে দেখেননি।[111]

Radcliffe Award ঘোষণা করা হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৭-ই আগস্ট। যেখানে ১২ তারিখেই ভারত ও পাকিস্তান নবগঠিত এই দুটি দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়ে যায়, সেখানে তা প্রকাশ করা হয় পাঁচ দিন পরে; যখন ভাগ্য নির্ধারণকারী নিয়ামক কোন প্রকার দায় নেওয়ার জন্য সেখানে উপস্থিতই ছিলেন না। ঠিক যেন বারুদের স্তুপে আগুন ধরিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালানো। এখানে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় যে, মাউন্টব্যাটেন ঠিক কি কারণে Radcliffe Award ঘোষণা করতে দেরি করলেন? তার মনে কি কোনো আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে এই ঘোষণা জনগণকে অখুশি করতে পারে?[112] ভোট প্রক্রিয়ায় বিলম্ব, মাউন্টব্যাটেন এর তাড়াহুড়ো, বা তার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন, এসবের পাশাপাশি মাত্র এক মাসের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে এই দেশ ভাগের কার্য সম্পাদনকালীন র‍্যাডক্লিফ তার সহকর্মী, বাউন্ডারি কমিশনের চার সদস্যের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। এই চার সদস্যের কাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি বলেছেন,

"তাঁরা যা করেছিলেন, তা হল—তাঁরা যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন কেবলমাত্র সেই দেশের দৃষ্টিভঙ্গিই উপস্থাপন করেছিলেন। উভয় পক্ষই সর্বাধিক পরিমাণ ভূখণ্ড দাবি করেছিল এবং একে অপরের বিপরীতমুখী যুক্তি উপস্থাপন করেছিল"। ("All that they did, was to put across the point of view of the country they represented. Both sides wanted maximum territory and argued at cross-purposes")।[113]

র‍্যাডক্লিফ যেসকল প্রতিবন্ধকতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তা অবশ্যই ফেলে দেওয়ার নয়, কারণ ভোটের কারণে বিলম্ব বা মাউন্টব্যাটেনের তাড়াহুড়ো আগেই প্রমাণিত; এর পাশাপাশি নিজের নিজের দেশের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় কমিশনের চার সদস্যও নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, এতগুলি প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ থেকে নিজের নামটি কেন প্রত্যাহার করলেন না? এত জটিলতার মধ্যে থেকেও তিনি কেন সরে এলেন না? যেখানে র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড প্রকাশের পর সব থেকে বড় প্রশ্ন উঠেছিল তার বৈধতা নিয়ে। কারণ কমিশনের চার সদস্যের মধ্যে চূড়ান্ত মতবিরোধ থাকা অবস্থায় তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে তার সিদ্ধান্তকে কমিশনের সিদ্ধান্তগুলো চালানোর চেষ্টা করেন। আইন অনুযায়ী এরকম অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে একজন আরবিট্রেটর বা আম্পায়ার বিরোধী সদস্যদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে সালিশীর মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, যা সচরাচর একজন চেয়ারম্যান করতে পারেন না। এমনকি ভারতের সংবিধান প্রণয়নের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডঃ বি.আর. আম্বেদকর ভারতীয় নেতাদের স্মরণ

---

[110] *The Transfer of Power, vol-xii,* p. xI.

[111] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* পৃ. ১১০।

[112] Joya Chatterji, *Partition's Legacies*, pp. 103-5.

[113] Kuldip Nayar, *Scoop,* p. 35.

করিয়ে দিয়েছিলেন সীমান্তে নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকারী সামরিক কর্মকর্তাদের কমিশনের কাজে Assessor বা পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করা উচিত, কিন্তু তার সেই পরামর্শকে উপেক্ষা করা হয়।[114] পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে এমনও বলা হয়েছিল যে; বাউন্ডারি কমিশনের সদস্যগণের মতবিরোধ নিরসনের জন্য তিনি অন্তত তার নিয়োগকর্তাদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করতে পারেন কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করে র‍্যাডক্লিফ নিজের সিদ্ধান্তই অটল থাকেন। অথচ নিয়োগপত্র মোতাবেক তাকে কমিশনের আরবিট্রেটর বা আম্পায়ার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়নি।[115] কিন্তু কমিশনের এখতিয়ার বহির্ভূত কোনোরকম ক্ষমতার প্রয়োগ করার অভিযোগ যাতে না উঠে সেজন্য আগে থেকে বুঝতে পেরে র‍্যাডক্লিফ কৌশল করে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স বিলের তিন ও চার নম্বর ধারা সংশোধন করতে প্রস্তাব দেন; যেখানে বলা হয় মেজরিটি/মাইনরিটি বা কাস্টিং ভোট ইত্যাদি প্রশ্ন না তুলে কমিশনের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তকেই কমিশনের অ্যাওয়ার্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।[116] কারণ দূরদর্শী র‍্যাডক্লিফ আশঙ্কা করেছিলেন যে কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে যে চূড়ান্ত মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তার ফলে কমিশনের অ্যাওয়ার্ডের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে। তার যুক্তি মেনে নিয়ে সরকারও সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন করে এই বিতর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন ওঠার আগেই পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেন। র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। সীমানা কমিশনের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত প্রশ্নে, লোকসংখ্যার অনুপাত, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। কাজের শেষে যদিও র‍্যাডক্লিফ সীমানা নির্ধারণের কাজের জন্য প্রদেয় অর্থের ২০০০ পাউন্ডের চেক ফিরিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন এবং যাওয়ার আগে সীমান্ত নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়[117] তা হয়ত বা কিছুটা তার মনস্তাপ থেকে এবং কিছুটা তার প্রাণনাশের আশঙ্কা থেকে। কিন্তু পরিণতির কথা তোয়াক্কা না করেই ভারত পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও ভবিষ্যৎকে বাজি রেখে কিভাবে তিনি অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বাধ্য ছেলের মতো দুই দেশের মধ্যে অস্ত্রোপচারের দায়িত্বটি পালন করে গেলেন এই প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রশ্ন ওঠে এই দুই দেশের লক্ষ কোটি জনগণের প্রতি তার দায়বদ্ধতা নিয়েও।

দুই বাংলার বেশিরভাগ আমজনতা সীমানা কমিশন দ্বারা ঘোষিত 'Radcliffe Award'-এর সেই নথির ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেননি এবং তারা জানতেন না এই কমিশন কি বা এতে কি আছে? উইলিয়াম ভ্যান স্যান্ডেল যথার্থই বলেছেন "১৯৪৭ সালের আগস্টে, র‍্যাডক্লিফ লাইনের বাস্তবতা এমন একটি জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসে যাদের মতামত চাওয়া হয়নি বা সঠিকভাবে অবহিত করা হয়নি। তথ্যের এই অভাব পরবর্তী

---

[114] *অমৃতবাজার পত্রিকা,* ২২-ই জুলাই ১৯৪৭।

[115] *অমৃতবাজার পত্রিকা,* ২০-ই জুলাই ১৯৪৭।

[116] *Transfer of Power, vol-xii*, pp. 63-66.

[117] রাজর্ষি বিশ্বাস, *দেশভাগে বঙ্গসীমান্ত,* পৃ. ৩০-৩১।

ঘটনাগুলির উপর দীর্ঘ ছায়া ফেলেছিল"।[118] ১৯৪৭ সালের ১৫-ই আগস্ট, ৯৮ শতাংশ অমুসলিম জনসংখ্যাবিশিষ্ট পার্বত্য-চট্টগ্রাম জেলার লোকেরা ভারতীয় ডোমিনিয়ানের অন্তর্গত হয়েছে ভেবে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল। পরবর্তীকালে, পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী আলোচনায় এই ঘটনাগুলিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি জেলার বিশ্বাসঘাতকতার মূল প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।[119] এই একই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ইত্যাদি জেলাগুলির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। স্বাধীনতার প্রায় এক বছর পর সীমান্তের দুই পারে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে খুলনা জেলার বদলে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা পূর্ববঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই গুজবকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের মনে উদ্বেগ তৈরি হয় এবং শেষ পর্যায়ে এটা দাঙ্গাতে পরিণত হয়।[120] জনসাধারণের এই ভোগান্তির জন্য উভয় দেশের সরকারকেই একমাত্র দায়ী করা যায়। কারণ এক বছর পরেও সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষদের মনে কেন প্রশ্ন থেকে গেল কোন কোন জেলা কোন দেশের মধ্যে পড়েছে? উভয় দেশের সরকার এর ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালে ১৪-ই ডিসেম্বর নেহেরু-লিয়াকৎ (আন্তঃ-আধিপত্য) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে সমস্যার সামান্য কিছুটা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছিল। র‍্যাডক্লিফ যখন এর খসড়া তৈরি করেন তখন তিনি মূলত কাগজের উপর ভিত্তি করে, বিভাজনের চিহ্ন হিসেবে বড় নদী ও তার শাখাগুলি অনুসরণ করে এবং থানাকে ইউনিট হিসেবে ধরে মূলতঃ তাত্ত্বিক বিভাজন করেছিলেন। তিনি যদি সশরীরে সীমান্তের এলাকাগুলি পরিদর্শন করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন ব্যবহারিক জীবনে বিভাজনের জমিনের চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এখানে একটা বিশাল বড় ঘটনা হলো যে বাস্তবের মাটিতে থানা বা জেলাগুলির মধ্যে বিভাজনের চিহ্নমাত্র ছিল না। একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায়; প্রশাসনিকভাবে যে বিভাজন বিভিন্ন নথিপত্রে চিহ্নিতকরণ হয়ে থাকে তা মূলত জরিপ ও বন্দোবস্ত মানচিত্রে, কিন্তু সেগুলির বেশিরভাগেই সঠিক তথ্য থাকে না এবং তা বহুদিনের পুরনো হয়ে থাকে। র‍্যাডক্লিফ লাইনের আরো বড় জটিলতা তৈরি করেছিল বাংলা বিভাজনের ক্ষেত্রে দুই ধরনের তথ্যকে ব্যবহার করার জন্য। একদিকে, ভারতের জনগণনা র তথ্য অনুসারে বিবেচনা করার জন্য 'থানা' কে 'ইউনিট' হিসেবে তিনি বেছে নিয়ে ছিলেন। অপরদিকে, বাস্তবে তিনি সীমান্ত নির্ধারণের সময় জরিপ ও বন্দোবস্তের মানচিত্রকে ব্যবহার করেছিলেন; যেখানে দাগ, খতিয়ান, প্লট ইত্যাদি তথ্য মৌজাভিত্তিক মানচিত্রে প্রদর্শিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে দুটোর মধ্যে অনেক সময়ে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলে উভয় দেশে প্রশাসনিকভাবে জটিলতা তৈরি হয়েছিল।[121] কিন্তু সরকারের জন্য হতদরিদ্র জনসাধারণকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। আজও

---

[118] Willem van Schendel, *The Bengal Borderland: Beyond State and Nation in South Asia*, (London: Anthem Press, 2004), p. 48.

[119] Ibid.

[120] Bidyut Chakrabarty, *The Partition of Bengal and Assam*, pp. 163-67.

[121] Joya Chatterji, *Partition Legacies*, pp. 65-82.

ছিটমহলের দিকে নজর দিলে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। দেশভাগের পরিণতি স্বরূপ অখন্ড বাংলা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি, কৃষি-শিল্প কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসা 'দেশভাগ' নামক বিপর্যয় ছিনিয়ে নিয়েছিল মাথার উপর ছাদ, মুখের গ্রাস, পূর্বপুরুষের ভিটে, পরিচিত পরিবেশ, এমনকি পরিচিতিকেও। দেশভাগ-পরবর্তী দাঙ্গা ও অজস্র গৃহত্যাগী, বাস্তুহারা মানুষের ঢেউ 'দেশভাগ'কে বুমেরাঙের মতো হুমকিস্বরূপ ভারত, পাকিস্তান দুই দেশের কাছে ফিরিয়ে দেয়, যাতে ভারতই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলস্বরূপ 'উদ্বাস্তু সমস্যা' নামক ব্যাধি, দেশের ইতিহাস ও বর্তমানের কাল সীমানায় সমাপতন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ- উদ্বাসন, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন ও সরকারি মনোভাবঃ একটি প্রেক্ষাপট।

ভুমিকাঃ

প্রায় দুশো বছরের দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করে স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদনের পরম মুহূর্তে 'দেশভাগ' নামক বিপর্যয় নেমে এসে সীমান্তের দুই পারের লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ে পুনরায় পরাধীনতার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছিল। নিজেদের পরিচিত পরিবেশ, সমাজ, জীবনধারা একটা হ্যাঁচকা টানে সব হারিয়ে বেঁচে থাকার জন্য তারা পরমুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হয়েছিল। তারা 'বাস্তুচ্যুত', 'দেশ-নিষ্ক্রান্ত', 'বিস্থাপিত' নাকি 'উদ্বাস্তু' এই নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তাদের সংজ্ঞায়িত করার তরতাজা হাতে গরম বিষয়টি যখন চায়ের কাপে তুফান তুলছে, তখন এই সকল সর্বহারা মানুষেরা খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, এই প্রাথমিক তিনটি চাহিদা কিভাবে পূরণ হবে তার জন্য ডারউইনের 'অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রাম'-এ যুদ্ধ করছেন। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির নেওয়া সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে সীমানার 'ভুল প্রান্তে' থেকে যাওয়া মানুষগুলো নিজেদের আজন্ম-পরিচিত পরিবেশ, ভিটে-মাটি, জমি-জমা সবকিছু ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন। র‍্যাডক্লিফ লাইনের অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয় 'উদ্বাস্তু সমস্যা'। ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে র‍্যাডক্লিফের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত সকল নথিপত্র আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া যেন বারুদের স্তুপে সাম্প্রদায়িকতার আগুন ধরিয়ে ব্রিটিশ সরকারের ভারত ত্যাগকেই প্রতিবিম্বিত করে। ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যায় ঠিকই, কিন্তু পরিবর্তে রোপন করে যায় এমন কিছু বিষবৃক্ষের চারা, এমন কিছু সমস্যা যার সমাধান সুদূর ভবিষ্যতেও মেলে না। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত নবগঠিত দুটি রাষ্ট্রের বুকে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষের স্রোত আছড়ে পড়তে শুরু করল, যা নিঃসন্দেহে নবগঠিত এই দুই রাষ্ট্রের কাছে ছিল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষগুলি তাদের জীবনের এত বড় একটি সিদ্ধান্ত নিলেন, তা অবশ্যই গভীর অনুসন্ধানের দাবিদার। বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম অংশে ১৯৭১ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কত সংখ্যক উদ্বাস্তু এই রাজ্যে এসেছিলেন তার আলোচনা সাপেক্ষে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ করে চলে আসার কারণসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা, বিভিন্ন গ্রন্থ, লেখালেখির পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন নথিপত্র, প্রতিবেদন, প্রকল্প, সংবাদপত্র, পত্রিকা ইত্যাদি লব্ধ তথ্য থেকে হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

স্বাধীনতার উষা লগ্নে এই সমস্ত মূলোৎপাটিত মানুষের স্রোত যখন এই ভারতবর্ষের বুকে আছড়ে পড়ল; তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের প্রতি কী দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পেশ করেছিল তা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়ার উপরেই নির্ভর করছিল লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষের পরবর্তী জীবন ও প্রজন্ম। অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু আগমনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কোন কোন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি

এই দুই সরকারের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল এবং এই সমস্যা সমাধানে তাদের নীতি-প্রতিক্রিয়া কী ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার মুখ্যক্ষেত্র মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের নিয়ে পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্রে বর্তমান অধ্যায়টি একটি প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ করবে। কারণ, এই দুটি জেলা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নয়, কাজেই উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের চিত্রটি কেমন ছিল তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। সমগ্র রাজ্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ জেলার ক্ষেত্রে অনুসৃত হচ্ছে, নাকি বিশেষ কোনো চরিত্র ফুটে উঠছে তার অনুসন্ধানে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনাগুলি পথ-নির্দেশকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

২.১ পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনের ধারাঃ

পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের আগমন প্রক্রিয়াটি ছিল দীর্ঘমেয়াদী।[1] সময়ের সাপেক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় পটভূমিতে এইসব অগণিত মানুষের বহমান স্রোত-ধারা পশ্চিমবঙ্গের বুকে কখনো কখনো আছড়ে পড়ছে উন্মত্ত সুবিশাল তরঙ্গরূপে, কখনো বা সেই ধারা বয়ে যায় নিস্তরঙ্গে, কিন্তু থেমে থাকে না কখনো। ১৯৪৬-এর ১৬-ই আগস্ট 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামক কুখ্যাত নারকীয় হত্যাযজ্ঞ যে শুধু বাংলা ভাগের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল তাই নয়; এই হত্যাযজ্ঞ দেশভাগের আগে ও পরে বিহার ও অখণ্ড বাংলার বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটায়, যার জেরে কয়েক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন ঘটতে থাকে। 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর পরপর ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালীতে দাঙ্গা হয়, যার ফলে হিন্দুরা পূর্ব-বাংলা থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অভিবাসন শুরু করে। এই দাঙ্গার পাল্টা ১৯৪৬-এর অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিহারেও ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। ১৯৪৬-১৯৪৭ সালের মধ্যে বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং হুগলি জেলার ত্রাণ শিবিরে বিপুল সংখ্যক বিহারি-মুসলমানদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, যারা পরে পূর্ব-বাংলায় চলে যায়। এরপর ১৯৪৭-এর দেশভাগের ঘটনায় বিভিন্ন কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারা মানুষদের অভিবাসন ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত হয়েছিল।[2] ১৯৪৬-১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের বুকে উদ্বাস্তু আগমনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নোয়াখালী ও ত্রিপুরার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নিজাম পরিচালিত হায়দ্রাবাদে ভারত সরকার দ্বারা পুলিশি ব্যবস্থার প্রচলনে পূর্ব-পাকিস্তানে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় ও উদ্বাস্তু আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেবলমাত্র ১৯৪৮ সালেই ৫ লক্ষ ৯০ হাজার উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে এই ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে। এবং উদ্বাস্তু আগমনের প্রথম পর্যায় এখানেই শেষ হয়।

---

[1] Jasodhara Bagchi and Subhoranjan Dasgupta (ed.), *The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India,* (Kolkata: Stree, 2003), p. 2.

[2] *Census of India 1951*, vol-vi, West Bengal, Sikkim and Chandenagore, Part-IA Report, p. 86.

১৯৫০-১৯৫১ এই কালপর্বে দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বাস্তু আগমন ঘটতে থাকে। ১৯৫০ সালে অভূতপূর্বভাবে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু এপার বাংলায় চলে আসে। খুলনা, বরিশালসহ পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল যার প্রধান কারণ। সে সময় প্রায় ১১ লক্ষ ৮২ হাজার উদ্বাস্তু এসেছিলেন। এর পাশাপাশি ছিল নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির বাস্তবায়নের অসারতা। উভয় দেশের সংখ্যালঘুরা যাতে নাগরিক হিসেবে ধর্মনির্বশেষে সমান অধিকার পায় সেই উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে ৮ই এপ্রিল নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই চুক্তিতে বলা হয়েছিল, যারা স্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে অন্যদেশে চলে গিয়েছিল, তারা ফিরে এলে তাদের সম্পত্তি ফেরত পাবে।[3] কিন্তু এই চুক্তি বাস্তবে কোন কাজে আসেনি।[4] চুক্তি অনুযায়ী দুই রাষ্ট্রের উদ্বাস্তুদের নিজ বাসভূমিতে স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকারসহ ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান প্রশাসন পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তার মনোভাব সুনিশ্চিত করতে না পারায় পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের ধারা পুরোপুরি প্রতিহত করা যায় নি।[5]

উভয় দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত কিছু সিদ্ধান্তের জেরে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের তড়িঘড়ি দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়; এরূপ একটি উদাহরণ হল পাসপোর্ট প্রথার প্রবর্তন। ১৯৫২ সালের ১৫-ই অক্টোবরে পাকিস্তান সরকার এককভাবে পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তন করে, ফলে পরবর্তীকালে ভারত সরকারও এই প্রথা প্রবর্তনে বাধ্য হয়। ভারতে আসতে গেলে পাসপোর্ট করতে হবে এই আতঙ্কে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ফলস্বরূপ ১৯৫২-১৯৫৮ কালপর্বে তৃতীয় পর্যায়ের উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয়। পাসপোর্ট প্রথা প্রবর্তনের পাশাপাশি এই সময় পূর্ববঙ্গে আর্থিক অবস্থার অবনতি ছিল হিন্দুদের দেশত্যাগের বিরাট বড় একটা কারণ, সঙ্গে ছিল সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন। ১৯৫২ সালের পর উদ্বাস্তু আগমন অনেকটা কমে এলেও, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হলে এবং ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে ইসলামী সংবিধান গৃহীত হলে পূর্ব-পাকিস্তানে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ ওই সময়ে উদ্বাস্তু আগমন আরও একবার বেড়ে যায়। ১৯৫৭ সাল থেকে আবার উদ্বাস্তু আগমনের ধারা স্তিমিত হতে থাকে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত আগত এই সকল উদ্বাস্তুদের "Old migrants" বা "পুরনো অভিবাসী" নামে অভিহিত করা হয়।[6]

---

[3] *Agreement Between The Govt.s of India and Pakistan Regarding Seurity and Rights of Minorities* (Nehru-Liaquat Agreement) New Delhi, 8 April 1950, pp. 243-248.

[4] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ১০৬-১২৭।

[5] অমলেন্দু দে, *প্রসঙ্গ: অনুপ্রবেশ,* (কলকাতা, বর্ণপরিচয়, ১৯৯৩), পৃ. ৩।

[6] *Manual of Refugee Relief and Rehabilitation, vol-1*, (Kolkata: Govt. of West Bengal, 2001), p. 1.

সারণিঃ-১ ১৯৪৬-১৯৭০ পর্যন্ত কাল-পর্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা

বছর	আগমণের কারণ	মোট সংখ্যা	পশ্চিমবঙ্গে	অন্যান্য স্থানে
১৯৪৬	নোয়াখালী দাঙ্গা	০.১৯	০.১৪	০.০৫
১৯৪৭	দেশভাগ	৩.৪৪	২.৫৮	০.৮৬
১৯৪৮	ভারতের হায়দারাবাদে 'পুলিশ ব্যবস্থা'	৭.৮৬	৫.৯০	১.৯৬
১৯৪৯	খুলনা ও বরিশালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা	২.১৩	১.৮২	০.৩১
১৯৫০	ওই	১৫.৭৫	১১.৮২	৩.৯৩
১৯৫১	কাশ্মীরি আন্দোলন	১.৮৭	১.৪০	০.৪৭
১৯৫২	অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি; সংখ্যালঘুদের উপর; নির্যাতন পাসপোর্ট বৃদ্ধি	২.২৭	১.৫২	০.৭৫
১৯৫৩		০.৭৬	০.৬১	০.১৫
১৯৫৪		১.১৮	১.০৪	০.১৪
১৯৫৫	সাধারণ ভাষা হিসেবে উর্দু ভাষার ঘোষণা করার জন্য উত্তেজনা	২.৪০	২.১২	০.২৮
১৯৫৬	পাকিস্তান ইসলামী সংবিধান গ্রহণ	৩.২০	২.৪৭	০.৭৩
১৯৫৭		০.১১	০.০৯	০.০২
১৯৫৮		০.০১	০.০১	-
১৯৫৯		০.১০	০.০৯	০.০১
১৯৬০		০.১০	০.০৯	০.০১
১৯৬১		০.১১	০.১০	০.০১
১৯৬২		০.১৪	০.১৩	০.০১
১৯৬৩		০.১৬	০.১৪	০.০২
১৯৬৪	হযরত (সাঃ) চুল চুরির ঘটনায় দাঙ্গা	৬.৯৩	৪.১৯	২.৭৪
১৯৬৫		১.০৮	০.৮১	০.২৭
১৯৬৬		০.০৮	০.০৪	০.০৪
১৯৬৭		০.২৪	০.০৫	০.১৯
১৯৬৮		০.১২	০.০৪	০.০৮
১৯৬৯		০.১০	০.০৪	০.০৬
১৯৭০	আর্থিক দুর্দশা ও আগামী নির্বাচন	২.৫০	২.৩২	০.১৮
১৯৪৬-৭০	মোট	৫২.৮৩	৩৯.৫৬	১৩.২৭

(সূত্র: পি.এন. লুথরা, *রিহ্যাবিলিটেশন,* পাবলিকেশনস ডিভিশন, নিউ দিল্লি, ১৯৭২, পৃ-১৮-১৯)

১৯৫৮-১৯৬৩ সময়কালে চতুর্থ পর্বের উদ্বাস্তু আগমন খুব ক্ষীণ ধারায় চলতে থাকে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরে হযরত (সাঃ) চুল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে, উভয় বাংলার বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটতে থাকলে উদ্বাস্তু আগমনের পঞ্চম পর্যায় শুরু হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় ৪ লক্ষ ১৯ হাজার উদ্বাস্তু মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। দাঙ্গা-পরবর্তী উত্তেজনা কমে আসলে উদ্বাস্তু আগমনও কমে যায়। কিন্তু ১৯৭০ সালে পূর্ববঙ্গের আর্থিক দুর্দশা চরমে পৌঁছেছিল এবং আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছিল। পরিনতিস্বরূপ, সেই সময় প্রায় ২ লক্ষ ৩২ হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের

'মুক্তিযুদ্ধ'কে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধের কারণে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিশেষত ২৪ পরগনা, দিনাজপুর, নদীয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, মালদা ইত্যাদিতে ওই দেশের প্রচুর মানুষ সাময়িকভাবে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন।[7] ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় ১ কোটি পূর্ববঙ্গের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তাদের মধ্যে অধিকাংশই আবার প্রত্যাবর্তন করেন।[8] ১৯৬৪-১৯৭১ এই সময়কালে আগত উদ্বাস্তুরা 'নিউ মাইগ্রেন্টস' অর্থাৎ 'নতুন অধিবাসী' নামে পরিচিত। ১৯৪৬-১৯৭০ পর্যন্ত ৫২,৮৩,৩২৪ হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে প্রবেশ করে। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল ৩৯ লক্ষ ৫৬ হাজার উদ্বাস্তু।[9] ১৯৭১-এর সেন্সাস অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট উদ্বাস্তু জনসংখ্যা ৫৮ লক্ষ ৮১ হাজার ৭২৫ জন।[10]

২.২ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে হিন্দুদের চলে আসার কারণঃ

ব্রিটিশ সরকার ও ভারতবর্ষের কিছু রাজনৈতিক নেতাদের মিলিত প্রচেষ্টায় একটিমাত্র ঘোষণায় অখন্ড 'ভারত ভেঙে ভাগ' হয়ে রাতারাতি 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়ছিল। সর্বপ্রথম এর প্রভাব পড়েছিল জনমানবের মনে, তাদের মানসিকতায়। এই ভারতভাগে বলি হতে হয়েছিল পাঞ্জাব ও বাংলাকে। তবে দেশভাগের ঘোষণামাত্রই উভয় বঙ্গের মানুষ পাঞ্জাব প্রদেশের মতো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মেতে ওঠেননি। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসের শুরুতেই অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির দেড় মাসের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে শুধুমাত্র শরণার্থী শিবিরগুলিতেই পশ্চিম-পাঞ্জাব থেকে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৭,২০,০০০ পেরিয়ে গেছিল।[11] ১৯৪৭ সালের ৩রা অক্টোবর প্রাপ্ত সরকারি হিসাব অনুসারে পশ্চিম-পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ১২,৩২,১০০ জন হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষারত ছিলেন।[12] সেখানে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৩,৪৪,০০০ (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। কারণ বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতে, দেশভাগকে কেন্দ্র করে বা দেশভাগের অব্যবহিত পরেই পাঞ্জাবের ন্যায় বড়সড় কোনো দাঙ্গা বাংলায় হয়নি। পূর্ব পাঞ্জাবে দাঙ্গার ভয়াবহতা এতটা ছিল যে একদিকে যখন ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় একদল শিখ বাহিনী মুসলিম মহিলাদের ধরে ধরে ধর্ষণ, অপহরণ, নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানো, হত্যা, পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি পাশবিক খেলায় মেতে উঠেছিল। আবার বর্ডারে উল্টো দিকে পশ্চিম-পাঞ্জাবে একদল মুসলিম শিখদের গুরুদুয়ার পুড়িয়ে দেওয়া, নারীদের ধর্ষণ করা, অসংখ্য শিখদের হত্যা করায় মেতে উঠেছিল।[13] এরকম নৃশংস ও

---

[7] অভিজিৎ দাশগুপ্ত, *বিস্থাপন ও নির্বাসন ভারতের রাষ্ট্র উদ্বাস্তু সম্পর্ক,* (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৮), পৃ. ১৯০।

[8] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন: বাংলা ও ভারত, ১৯৪৭-৬৭,* আবু জাফর অনূদিত, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০), পৃ. ১৭৩।

[9] Ranabir Samaddar, *The Marginal Nation: Transborder Migration from Bangladesh to West Bengal*, (New Delhi: Sage Publications, 1999), p. 205.

[10] অভিজিৎ দাশগুপ্ত, *বিস্থাপন ও নির্বাসন ভারতের রাষ্ট্র উদ্বাস্তু সম্পর্ক,* পৃ. ৩৫।

[11] *The Tribune* , 4th October 1947.

[12] *The Hindustan Times*, 11th October 1947.

[13] H. V. Hodson, *The Great Divine: Britain-India-Pakista*, (London: Hutchinson & Co, 1969), p. 403.

বর্বর চিত্র বাংলার ক্ষেত্রে খুব একটা দেখা যায় নি, অল্প সংখ্যক কিছু দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল তবে তার ভয়াবহতা পাঞ্জাবের দাঙ্গাগুলির তুলনায় অনেক কম ছিল, "প্রাবল্য ছিল ক্ষীন, নৃশংসতাও পশ্চিম পাকিস্তানের মতো ছিল না"।[14] যার কারণে, বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে প্রথম পর্যায়ে আসা উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের একমাত্র কারণ হিসেবে মানতে নারাজ।

সারণিঃ-২ ১৬ই জানুয়ারি, ১৯৫১-এর আগে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আগত হিন্দুদের জনসংখ্যার বণ্টন (শতাংশে)

পূর্ববঙ্গের জেলা(i)	বর্ধমান	বীরভূম	বাঁকুড়া	মেদিনীপুর	হাওড়া	হুগলি	২৪ পরগনা	কলকাতা	নদীয়া	মুর্শিদাবাদ	প. দিনাজপুর	মালদা	জলপাইগুড়ি	দার্জিলিং	কোচবিহার	পশ্চিমবঙ্গে মোট	(i)নং থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগ (শতাংশ)
যশোর	৩.০	০.৯	০.৪	০.৪	১.৯	২.৮	৪১.২	১৩.২	৩৩.০	১.১	০.৪	০.৩	০.৮	০.৩	-	২৯৯৩৯	৭.০
খুলনা	১.৯	০.৩	০.৫	০.৬	৩.৯	২.০	৬৩.৩	১৭.১	৭.৫	০.৯	০.২	০.৭	০.৮	০.১	০.২	২৩৮১৭	৫.৫
ফরিদ পুর	৮.১	০.৭	০.৭	১.৭	৩.৪	৩.৮	২৭.০	২৩.৩	২১.৫	২.৪	০.৭	২.৭	২.৩	০.৬	১.১	৪৯৭৫০	১১.৬
বরিশাল	৮.৭	১.৪	১.৭	১.৯	৬.৭	৩.৭	৩৯.৮	২৫.৫	৬.২	০.৯	০.৫	১.৬	১.০	০.১	০.৩	৪৫৯০২	১০.৭
ঢাকা	৫.৯	০.৫	০.৫	১.৯	৬.৮	৪.৩	২৫.৪	৩০.৩	১১.৮	১.৭	২.৩	০.৫	৪.১	০.৮	৩.২	৭৬৭৩২	১৭.৯
ময়মন সিংহ	৪.৭	১.০	০.৩	১.৯	২.৭	৩.০	১৬.৩	১২.১	৬.৪	১.৮	৫.৮	০.৯	১৩.৯	১.৮	২৭.৫	২৭০৭৮	৬.৩
কুষ্টিয়া	১.২	০.১	০.১	০.৪	০.৪	০.৯	৩.৯	২.০	৮৫.৪	৪.৩	০.৩	০.১	০.৪	০.৪	০.১	৪১৭৬৫	৯.৭
রংপুর	০.৩	০.১	০.১	১.১	০.৩	০.৬	৪.১	৩.১	০.৫	০.১	৪.২	০.২	২৬.৪	৪.৯	৫৪.০	১৯৬৯৫	৪.৬
পাবনা	৩.৭	০.৭	০.৩	১.৪	২.৬	২.২	১৪.৯	১১.৪	২২.২	১৬.৯	১১.১	৪.৮	৪.৫	১.০	২.৩	১৭০৭০	৪.০

[14] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৩২-৩৩।

বগুড়া	০.৬	-	০.৬	০.৯	০.৭	১.৭	১.২	৫.২	৭.১	০.৬	৭২.৫	০.৮	৭.৭	০.৭	৯.৭	৭৬১৫	১.৮
দিনাজ পুর	০.৬	-	-	০.২	০.২	-	১.১	২.১	০.৪	০.২	৭৭.১	০.৬	১৫.৪	২.১	-	১০৭৫২	২.৫
রাজশাহী	১.৮	০.৪	-	০.২	০.৬	০.৯	২.২	২.৭	৬.১	১৮.৭	২৪.২	৪০.৭	১.৪	০.২	০.৭	২৬১০৩	৬.১
নোয়া খালী	২৪.৭	০.৯	০.৫	২.৮	৬.৬	৭.৬	২২.৯	১৫.৯	১৭.৯	১.৭	০.৬	০.৬	১.৬	০.১	-	১৮১৪০	৪.২
ত্রিপুরা	১১.১	০.৯	০.৬	২.৪	৭.১	৪.৫	২৪.০	২৭.৬	১৮.১	১.৭	০.২	০.৭	০.৯	০.৪	০.২	২১১৪৪	৪.৯
চট্টগ্রাম	৭.১	০.৬	০.৭	৭.৭	৯.৬	৪.৫	২৭.২	৪০.৭	৭.৬	১.২	০.৯	০.৫	৭.৭	০.৬	০.৬	৭৯৭৮	১.৮
সিলেট	৮.০	-	-	২.৫	৯.৪	১.৪	২৭.৬	৪৭.৯	৪.৭	৪.৭	-	-	২.৭	-	-	১৬৯২	০.৪
হিল চট্টগ্রাম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০	-	-	-	২১	০.০
মালদা	-	-	-	-	-	৪.৪	+	৮.৭	-	৫৮.৯	১৬.৫	৭.৪	-	-	-	২৮৫	০.১
জলপাই গুড়ি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০	-	-	২৪১৭	০.৬
পশ্চিম পাকিস্তন	১৭.৬			৪.১	১২.৭	-	১৫.৮	৪৫.৭							৪.৫	১০৩৭	০.২
নথিভুক্ত নয়							৩৪.৪	৬৫.৬								৩৪০	০.১
সমস্ত জেলায়	৫.৭	০.৬	০.৫	১.৪	৩.৯	২.৮	২৬.৪	১৭.৭	১৯.৮	৩.৪	৬.৪	৩.৫	৪.৮	০.৮	৫.৩	৪২৯২৭২	১০০.০ (৪২৯২৭২)

(State Statistical Bureau, West Bengal, Report, 1951-Table 1, p.14.)

দাঙ্গা হয়েছিল মূলত নোয়াখালী ও ত্রিপুরার এবং খুলনা ও বরিশালের কিছু অঞ্চলে, কিন্তু ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের স্টেট স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত একটি রিপোর্ট এবং ১৯৫১ সালে বিভিন্ন জেলার আদমশুমারি থেকে প্রাপ্ত দুটি তথ্যই ১৯৪৬-১৯৫১ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতি বছর আগত উদ্বাস্তুদের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায়; কেবলমাত্র ওই সকল দাঙ্গাপ্রবণ এলাকাই নয় বরং সমগ্র পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেই মানুষজন ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসতে শুরু করেন।[15] সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরোর সেই তথ্যে ১৯৫১ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা খুলনা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল মোট উদ্বাস্তু সংখ্যার ৫.৫ শতাংশ, যেখানে ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ও কুষ্টিয়া (নদীয়া) থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭.৯, ১১.৬, ১০.৭ ও ৯.৭ শতাংশ (দ্রষ্টব্য সারণি-২)।[16] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; ওই সমস্ত জেলাগুলিতে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৬০-৬৬ শতাংশের মধ্যে। এরমধ্যে ঢাকা ও বরিশালে দাঙ্গা হয়েছিল। কিন্তু যে জেলাগুলিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুপাত আরো বেশি, যেমন- রংপুর (৭০.৭৯), ত্রিপুরা (৭৫.৪৮), ময়মনসিংহ (৭৬.৫৬), বগুড়া (৮৩.৩৬), চট্টগ্রাম (৭৩.৮০), বাখরগঞ্জ (৭১.৬৩)[17] ইত্যাদি থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ভীষণ কম। সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের ক্ষেত্রে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুপাত যে সমস্ত জেলায় অনেক বেশি, সেই জেলাগুলো থেকে উদ্বাসনের হার আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল, অথচ দেখা যাচ্ছে যেখানে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত কাছাকাছি সেই সমস্ত এলাকা থেকেই বেশিরভাগ হিন্দুরা চলে আসছেন। যা স্পষ্টতই সংখ্যাগুরুর অত্যাচার ব্যতীত অন্যান্য কারণগুলির দিকেও ইঙ্গিত করে।

এই পর্যায়ে যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা গৃহত্যাগ করে এসেছিলেন তারা ছিলেন মূলত সম্পদশালী ও শিক্ষিত। এদের মধ্যে ছিলেন বড় বড় জমিদার, তালুকদার, ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা।[18] চাকরিজীবীরা অপশন দিয়ে ভারতে চলে আসার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি, তাই প্রথম দিকেই এরা দেশত্যাগ করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, প্রথম দিকে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ থেকে আসতে শুরু করেন তাদের তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধ এবং নারীর সম্মানে আঘাত লাগলে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উত্তরপূর্ব ভারতমুখী মানুষের এই স্রোতের কারণ ছিল মূলত মানসিক নির্যাতন। তৎকালীন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক ও পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের মহাধ্যক্ষ, আই.সি.এস. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সঙ্গে তার কথোপকথনে উঠে আসা তিনটি অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে। যেখানে তাদের গৃহত্যাগের উক্ত কারণ দুটি পরিষ্কার হয়। পূর্ববঙ্গে কোনো এক গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান, পেশায় ডাক্তার, দোকানে চাল কিনতে গিয়ে অপর এক মুসলিম ক্রেতার কাছে অপমানিত হন। দোকানে একটি

---

[15] *Report of State Statistical Bureau* (West Bengal), 1951-Table 1, p. 14.

[16] Ibid.

[17] লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* (কলকাতাঃ দে'জ, ২০০৪), পৃ. ৯৭।

[18] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১২৫-২৬।

মাত্র চালের বস্তা অবশিষ্ট ছিল যার দাম তিনি আগেই দিয়েছিলেন। এমন সময় এক মুসলিম মোক্তার চাল কিনতে এসে ওই চালের বস্তাটি দাবি করেন। দোকানদার প্রতিবাদ করলে মুসলিম ব্যক্তিটি "একি হিন্দুস্তান পেয়েছ?" বলে দাম দিয়ে জোরপূর্বক বস্তাটি নিয়ে চলে যান। দেশটি 'পাকিস্তান' বলে দোকানে পড়ে থাকা একটি মাত্র চালের বস্তার ওপর কোনো হিন্দু নাগরিক নয় বরং মুসলমান নাগরিকের অধিকার এ কথার সোচ্চার ঘোষণা সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দু ভদ্রলোকের আত্মসম্মানে ভীষণ আঘাত করে। অপমানিত ভদ্রলোকের কথায় "তারা তো মারধর করেনি...আমার চামড়া একটু পাতলা তাই সেদিন মনে ভারি আঘাত লেগেছিল"।[19] সেদিন দৈহিক আক্রমণ না হলেও আঘাত লেগেছিল তার সম্ভ্রমে, তার মনে এবং এই আঘাত তাদের কাছে ছিল যেন হুমকি স্বরূপ।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল, এক গরিব মুসলিম প্রজার স্থানীয় হিন্দু জমিদারের সঙ্গে 'দোস্তানি' করতে চাওয়া। যে কিনা আগে দেখা হলে দশ হাত দূর থেকে সালাম ঠুকতো সে তার জমিদারের বাড়ি আসে 'দোস্তানি' করতে। 'বাইরে কেন, ভেতরে চলো' বলে একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ে। প্রজা মনে করিয়ে দেয় "কর্তা, এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে। এখন থেকে সমান সমান আমাদের সঙ্গে মিতালি করতে হবে।" বর্ণনাকারী ব্যক্তি উত্তেজনায় আরক্ত মুখে হিরণ্ময় বাবুকে সেদিন বলেছিলেন "কি মশাই এর পরেও কি পাকিস্তানে থাকতে বলেন"।[20] অভিজাত হিন্দু পরিবারের আত্মমর্যাদায় সেদিন আঘাত লেগেছিল তা ভদ্রলোকের কথায় স্পষ্ট। অধস্তন মুসলিমের প্রগলভতার সঙ্গে 'মিতালি' পাতানোর প্রস্তাব তাদের মানসিক শান্তিকে চরমভাবে করা বিঘ্নিত করেছিল। আজন্ম-পরিচিত সমাজে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলিমদের থেকে যে সম্মান-সমীহ পেতে অভ্যস্ত ছিল তার আকস্মিক পরিবর্তনে তাদের গৌরব ক্ষুন্ন হয়। চিরকাল তাদের দেখে যারা মাথা নিচু করে চলত, নিচু গলায় শ্রদ্ধা-সমীহের সঙ্গে কথা অভ্যস্ত ছিল, তারা সদর্পে, সাহসের সঙ্গে উঁচু গলায় তাদের সম্বোধন করলে তাদের আভিজাত্যে আঘাত লাগে, পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মর্যাদা হারানোর শঙ্কাবোধ তাদের মনে জেগে ওঠে। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক ১৯৫১ সালে পরিচালিত এক গবেষণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখান থেকে জানা যায় হিন্দুদের মূল্যবোধ, সামাজিক মর্যাদা, সম্মান যা তারা আগে ভোগ করত তা নষ্ট হওয়া তাদের কাছে অর্থনৈতিক ক্ষতির চেয়েও অনেক বেশি ছিল। সেখানে বলা হয় "তাদের চলে আসার জন্য যা বাধ্য করে তা জীবন ও সম্পত্তির যথেষ্ট নিরাপত্তাহীনতার এবং অকারণ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের অসমর্থতা নয় বরং তাদের লালিত মূল্যবোধ রক্ষায় সম্পূর্ণ হতাশাবোধ...হিন্দু সম্প্রদায় আগে যে সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতো তা নষ্ট হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা পুনরায় লাভ করতে না পারার উপলব্ধি হতাশা সৃষ্টির জন্য একটা শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে- এটা ছিল অর্থনৈতিক ক্ষতি চেয়ে অনেক বেশি।"[21] নদীয়া জেলার ওপর অপর একটি

---

[19] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* পৃ. ৩২-৩৩।

[20] তদেব।

[21] Dr. Biraja Sankar Guha, *Memoir No. 1, 1954, Studies In Social Teasions among the Refugees from Eastern Pakistan,* (Dept. of Anthropology: Govt. of India, Calcutta, 1959), p. viii.

গবেষণায় উঠে আসে পূর্ববঙ্গে সামাজিক অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন ও মুসলিম কর্তৃক হয়রানির কথা। যেখানে টেটসূয়া নাকাতানি নদীয়ার একটি গ্রামের উদ্বাস্তুদের নিয়ে গবেষণায় জানতে পারেন তাদের ওপর দৈহিক আক্রমণ তেমন হয় নি, হলেও তার সংখ্যা নগণ্য বরং তারা মুসলিম কর্তৃক হয়রানির কথা বলেছে। হয়রানি হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন শস্য, গরু, নৌকা চুরি, হিন্দুদের সাথে মুসলিমদের সাহসের সঙ্গে কথা বলা, যাতে তারা অপমানিত বোধ করত, দিনমজুর মুসলিমের ধনী হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেওয়া ইত্যাদি।[22] এই ধরনের বিশ্লেষণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় জয়া চ্যাটার্জীর 'The Spoils of Partition' গ্রন্থে। যেখানে তিনি প্রথম পর্যায়ে ওপার বাংলা থেকে চলে আসার কারণ হিসেবে হিন্দুদের মানসিক অবস্থানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বাঙালির গৃহত্যাগের কারণ হিসেবে আক্রমণ ও হুমকির পাশাপাশি রয়েছে সূক্ষ ধরনের বৈষম্য বা আচরণের পরিবর্তনজনিত অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।[23] লেখিকা তার গ্রন্থে উদ্বাস্তু আগমনের বিভিন্ন পর্ব অনুসারে ও সমাজের শ্রেণিভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে প্রথমত অভিজাত, শিক্ষিত, সম্পদশালী হিন্দুরা প্রচন্ড আত্মসম্মানবোধে ও নারীদের মর্যাদায় আঘাত লাগলে দেশ ছাড়ে। দ্বিতীয়ত সমাজের মধ্যবিত্ত হিন্দু কারিগর শ্রেণি, যারা তাদের পেশার জন্য ওই প্রথম শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকদের উপর নির্ভরশীল তারা তাদের অনুসরণ করে চলে আসে। সব শেষে আসে নিম্ন শ্রেণির কৃষক যারা চরম নির্যাতন ও অসহনীয় কষ্টে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়।[24]

প্রথম পর্যায়ে আসা পূর্ববঙ্গের অভিজাত হিন্দু পরিবারগুলির কাছে পরিস্থিতি আরো অসহনীয় হয়ে ওঠে যখন নারীর মর্যাদা রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত তৃতীয় ঘটনাটি এর সাক্ষ্য দেয়। এক হিন্দু রমণী পুকুর ঘাটে গেলে পুকুরের পাড়ে বিভিন্ন বয়সের কয়েকজন মুসলিম ব্যক্তি রমণীকে ইঙ্গিত করে কটুক্তি করেন। তাদের কেউ বলেন "তোর চাচীর পায়ে খিল ধরে গেছে, উঠতে পারছে না, হাত ধরে নিয়ে আয়"; কেউ আবার ছড়া কাটতে থাকে "পাক পাক পাকিস্তান, হিদুঁর ভাতার মুসলমান" ইত্যাদি।[25] এই তৃতীয় ঘটনার প্রতিফলন পাওয়া যায় ১৯৪৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে। নোয়াখালী থেকে আগত জনৈক শশীভূষণ দত্ত জানান- 'মাঝে মাঝে মুসলমানরা আমাদের বাড়ি এসে শাসিয়ে যেত আর বলত মেয়েদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে দিতে হবে। আমার তিন মেয়ে। এরপর ওখানে আমরা কি করে থাকি'।[26] ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, পূর্ববঙ্গে হিন্দু পরিবারের মেয়েদের মান ইজ্জত রক্ষা করা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে যায়। দৈনিক বসুমতিতে 'উদ্বাস্তু

---

[22] Tetsuya Nakatani, 'Away from Home: The Movement and Settlement of Refugees from East Pakistan in West Bengal, India', *Journal of the Japanees Association for South Asian Studies-12*, 2000, pp. 73-109.

[23] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১২৩।

[24] তদেব, পৃ. ১২৫-১২৯।

[25] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* পৃ. ৩২-৩৩।

[26] *অমৃতবাজার পত্রিকা,* ৮-ই অক্টোবর ১৯৪৮।

মেয়ে' শীর্ষক প্রতিবেদনে একই কথা প্রতিধ্বনিত হয় "পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা সুখের আশায় পশ্চিমবঙ্গে আসেনি। তারা এসেছে সম্ভ্রম বাঁচাতে, প্রান বাচাতে, মাথা উঁচু করে চলার চেষ্টায়। পিতৃপুরুষের ভিটের মায়া পরিচিত প্রাকৃতিক পরিবেশের মায়া, অতিপ্রিয় সামাজিক বন্ধনের মায়া তারা কাটিয়েছে প্রাণের ভয়ে, সম্ভ্রম হানির ভয়ে, মনুষ্যোচিত মর্যাদা দলিত হওয়ার ভয়ে"।[27] নারী হরণ, পুকুর ঘাটে হিন্দু রমনীর প্রতি ধেয়ে আসা খুব কটূবাক্য বা দিনমজুর মুসলিমের ধনী হিন্দুর মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাবে মুসলিমের স্পর্ধা শঙ্কিত করে তোলে হিন্দুদের। কারণ শেষোক্ত ক্ষেত্রে শুধু ধর্মগত পার্থক্যই ছিল না, শ্রেণিগত অসাম্যও ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আভিজাত্যে আঘাত ও নারীর মর্যাদাহানি তাদের ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানে তারা সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারবেনা। তাই দেশভাগের অব্যবহিত পরেই এই সকল কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে আসে। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রথম পর্যায়ে আসা আরও এক শ্রেণির লোকদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা এই ধরনের মানসিক নিপীড়নের ফলে নয় বরং দেশ ভাগ হওয়ার অব্যবহিত পরেই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। তার মতে স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিচালনাদানকারী, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ, শিক্ষিত হিন্দুরা ইসলামী আদর্শে গঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে নিকৃষ্ট নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে থাকতে চাননি। তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতায় তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি ইংরেজ ভারত ত্যাগ করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা তারা পাবে না। স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করা থেকে তাদের বঞ্চিত থাকতে হবে।[28] যে 'ভারত' এর স্বাধীনতার জন্য এত লড়াই সেই 'ভারতের নাগরিক' এই রাষ্ট্রীয় পরিচয় বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে 'আপাতদৃষ্টিতে বিনা কারণেই' তারা দেশভাগের পরেই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসে।

প্রথমদিকে অভিজাত, সম্পদশালী হিন্দুরা দেশত্যাগ করে চলে আসতে থাকলে পূর্ববঙ্গের পাকিস্তানকামী কিছু লোকজন বাকি সংখ্যালঘুদের তাড়াতে বদ্ধপরিকর হয়ে যান। দেশে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরও বাড়াতে তারা সংখ্যালঘুদের কোনঠাসা করতে শুরু করে। এমনকি তাদের উগ্র জাতীয়তাবাদকে চরিতার্থ করতে ভারতে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার, হত্যা, গণপিটুনি, পুড়িয়ে মারা প্রভৃতি মিথ্যে খবর, গুজব রটাতে থাকে। এ সমস্ত খবরে পূর্ববঙ্গে উত্তেজনা ও অস্থিরতা তৈরি হতে থাকে। ফলে কিছু কিছু জায়গায় সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টি হতে থাকে। এরমধ্যে ১৯৪৮ সালে নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদে ভারত সরকার কর্তৃক পুলিশি ব্যবস্থা জারি হলে পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হতে থাকে। বিশেষত খুলনা জেলাটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হলে আগে থেকেই তা উভয় পক্ষের কাছে অস্বস্তি ও অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সংখ্যালঘুদের

[27] *দৈনিক বসুমতি পত্রিকা,* ৩-রা ডিসেম্বর ১৯৫৩।

[28] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* পৃ. ৩৪-৩৫।

ওপর সংখ্যাগুরু কর্তৃক প্রবল উৎপীড়ন শুরু হয়ে যায়। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে অবশ্য একটি অন্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়;

"Steady immigration of Hindus from East Bengal continued up to the end of 1949 when the Government of India's decision to devaluate the rupee, and the Government of Pakistan's decision to uphold the value of the rupee, led to a major economic crisis approaching a dangerous slump in East Bengal. A blind way of reacting to the slump in East Bengal was the touching off of a series of fresh and bloody communal outrages between December 1949 and February 1950 in that State which diverted the popular mind from the impending financial crisis to a new readily understandable engagement". ("১৯৪৯ সালের শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দুদের অবিচ্ছিন্ন অভিবাসন অব্যাহত ছিল, যখন ভারত সরকারের টাকার অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত এবং পাকিস্তান সরকারের টাকার মূল্য বজায় রাখার সিদ্ধান্ত পূর্ব বাংলাকে একটি বড় অর্থনৈতিক সংকটের দিকে পরিচালিত করেছিল যা বিপজ্জনক মন্দার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের এই মন্দার প্রতিক্রিয়ায় একটি হঠকারী উপায় ছিল ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একের পর এক নতুন ও রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক হিংসার সূচনা, যা জনমনে আসন্ন অর্থনৈতিক সংকট থেকে মনোযোগ সরিয়ে একটি সহজবোধ্য ও তাৎক্ষণিক বিষয়বস্তুর দিকে ঘুরিয়ে দেয়।")[29]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ঘটে যাওয়া এই দেশভাগের ঘটনায় অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি শুরু হয়। এক্ষেত্রে দূরদর্শী ভারত সরকার ভারতীয় টাকার অবমূল্যায়ন করলেও পাকিস্তান সরকার টাকার মূল্য একই রেখে দেয়। যার অনিবার্য ফলস্বরূপ পূর্ব-পাকিস্তান চরম আর্থিক সংকটের দিকে এগোতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে সমকালীন আর্থিক দুর্দশা থেকে দেশের জনগণের মনোযোগ সরানোর জন্য ইংরেজ সরকারের 'Divide and Rule' পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি উসকে দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ ১৯৪৯-১৯৫০ সালে খুলনা, বরিশালসহ পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হতে থাকে। পূর্ববঙ্গের কোথাও একটা দাঙ্গা হলে সেই খবর পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছালে পশ্চিমবঙ্গেও পাল্টা দাঙ্গা হত, সেই দাঙ্গার খবর আবার পূর্ববঙ্গে পৌঁছালে সেখানে আবারও দাঙ্গা হত।[30] এইভাবে দাঙ্গার পাল্টা দাঙ্গায় দেশের সাধারণ জনগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ফলে পূর্ববঙ্গে যেখানে যেখানে দাঙ্গা হয়েছে সেই অঞ্চল ছাড়াও আশেপাশের গ্রামগুলিও সংখ্যালঘুশূন্য হতে থাকে।

'প্রান্তিক মানব' গ্রন্থে লেখক প্রফুল্ল চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগুরু মুসলিম কর্তৃক সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক নির্যাতনকে হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ হিসেবে তুলে ধরেন। এর সপক্ষে তিনি হিন্দু পুরুষদের হত্যা, তাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন, অসহায় হিন্দুদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়া, হিন্দু নারীদের পিতা অথবা স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, ব্যবসা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের অসহযোগিতা করা ইত্যাদি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। বিভিন্ন জীবিকার ক্ষেত্রে হিন্দুদের অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার কথাও

[29] *Census of India 1951*, p. 86.

[30] তদেব, পৃ. ৯৮।

তিনি উল্লেখ করেন।[31] সরকারি তথ্যে হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ হিসেবে, পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুর ওপর সংখ্যাগুরু কর্তৃক নির্যাতনের খবরে প্রকাশ পায় খুন, ধর্ষণ, জোর করে অবৈধ চাঁদা আদায় করা, জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ, অগ্নিসংযোগ, হিন্দুদের উপর হামলা, মন্দির ধ্বংস ইত্যাদির ঘটনা।[32] সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায় পূর্ববঙ্গে বহিরাগত মুসলমানরা কুমারখালীতে এসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের গৃহে বলপূর্বক প্রবেশ করেছে এবং তারা বলছে ভারতীয় ইউনিয়ন তাদের উপর অত্যাচার করেছে, যার ফলে তারা পূর্ববঙ্গে চলে এসেছে এবং পাল্টা প্রতিশোধ নিচ্ছে, এই ঘটনায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আতঙ্কে রয়েছে।[33] খবরের কাগজে একটা সংগীতের উল্লেখ পাওয়া যায়-

'নোয়াখালীর অছিলায়
বিহার হল কারবালায়
বিহার হল হিন্দুস্তান
বাঙ্গালা হলো পাকিস্তান
চলে যাও যার যার মোকাম।' [34]

ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষত বিহারের মুসলিমরা যারা অত্যাচারিত হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন তারাই ওই দেশে গিয়ে এইসব ছড়া কাটতেন। শ্রী প্রফুল্ল চক্রবর্তী উল্লিখিত পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক বয়কটের ঘটনার কথা পাওয়া যায় সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে। অমৃতবাজার পত্রিকা সূত্রে পূর্ববঙ্গে ডাক্তার, আইনজীবী, দোকানি, ব্যবসায়ীদের বয়কট করার খবর পাওয়া যায়। এমনকি এও জানা যায় যে কৃষকেরা আর জমিদারদের জমিজমা চাষ করছে না। প্রতিটি হিন্দু দোকানের পাশে মুসলমানদের দোকান গড়ে ওঠার খবরও পাওয়া যায়।[35] ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া ও অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টারদের নেওয়া সাক্ষাৎকারে কুমিল্লা জেলার রামপ্রসাদ জানান- "আমি চাষবাস ও মাছ বিক্রি করে সংসার চালাতাম। কিন্তু মুসলমানরা জমির ফসল কেটে নিয়ে গেছে ও হাটে জোর করে আমার কাছ থেকে মাছ কেড়ে নিয়ে গেছে"।[36] এর থেকে পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগুরু কর্তৃক সংখ্যালঘুর প্রতি অর্থনৈতিক ভাবে অসহযোগিতার ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি ড: প্রতাপচন্দ্র রায় ও নোয়াখালীর একটি গান্ধী শিবিরের ভারপ্রাপ্ত শ্রী অমৃতলাল চ্যাটার্জীর বিবৃতি অনুযায়ী ব্যবসার মন্দা, হিন্দুদের দোকান বর্জন, অধিক আয় ও বিক্রয়ের কর আদায় করা, বস্ত্র সুতার অভাব, নোয়াখালীর দাঙ্গাকারী ও হত্যাকারী সকলের মুক্তি ইত্যাদি তাদের দেশত্যাগের কারণ।[37]

---

[31] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ. ১৩।

[32] তদেব, পৃ. ১৭।

[33] *আনন্দবাজার প্রত্রিকা,* ১৪-ই মার্চ ১৯৪৮; যুগান্তর প্রত্রিকা, ১৪-ই মার্চ ১৯৪৮।

[34] *আন্দবাজার প্রত্রিকা,* ১৬-ই মার্চ ১৯৪৮।

[35] *অমৃতবাজার পত্রিকা,* ৮ ও ২০-ই অক্টোবর ১৯৪৮ ।

[36] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ. ২৩।

[37] Home Political CR, IDM 1192/49 Dec. 1950, West Bengal State Archive, Kolkata.

বিভিন্ন সংবাদপত্রে জোর করে জমি থেকে বেদখল করা, গাছ কাটা, ফল পেড়ে নেওয়া, শস্য কেটে নিয়ে যাওয়া, চুরি, রাহাজানি, জুলুমবাজি, মারধোর প্রভৃতির খবর পাওয়া যায়।[38] পূর্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের খবরে এমনও শোনা যায় যে দেশত্যাগ করে চলে আসার সময় পথে মেয়েদের মূল্যবান অলংকার কেড়ে নেওয়া হত, 'পোটলা পুটলি' আনতে দেওয়া হত না ইত্যাদি।[39] এই সমস্ত তথ্যগুলো থেকে একটি ব্যাপার স্পষ্ট, তা হল পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগুরু কর্তৃক সংখ্যালঘুর উপর বৈমাত্রিকসুলভ আচরণ। যা থেকে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায়, পূর্ববঙ্গ ছেড়ে হিন্দুদের আসার একটি অন্যতম কারণ হল মুসলিমদের নির্যাতন।

সংখ্যাগুরুর অত্যাচারের পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে পূর্ব-পাকিস্তান প্রশাসনের অসহযোগিতা ছিল হিন্দুদের দেশ ত্যাগের আরো একটি বড় কারণ। কখনো প্রত্যক্ষে কখনো বা পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে সরকার নানাভাবে সংখ্যালঘুদের কোণঠাসা করতে থাকে। পাকিস্তান সরকারের অনমনীয় মনোভাবের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানি অর্থের অবমূল্যায়ন না ঘটানোর সিদ্ধান্তের ফলে নবপঠিত দেশটি ক্রমশ অর্থনৈতিক মন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় আসন্ন অর্থনৈতিক সংকটকে কেন্দ্র করে কোনো রকম আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই তা ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টায় দেশের জনগণের মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে এক ধারাবাহিক, রক্তাক্ত, সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ খুলনা, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ায় পাকিস্তান সরকারের নক্কারজনক ভূমিকা আগেই তুলে ধরা হয়েছে। এইভাবে পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত সুকৌশলে তার জনগণদের ব্যস্ত রাখার উপায়টি খুঁজে নিয়েছিলেন। কান্তি বি. পাকরাশি খুব সুন্দরভাবে পাকিস্তান প্রশাসনের ভূমিকা ও আচরণসমূহের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, "পূর্ব-পাকিস্তানের কর্মকর্তারা তাদের দৈনন্দিন প্রশাসনে আরও বিস্ফোরক পদার্থ যোগ করার জন্য অসাধারণভাবে কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন যাতে পূর্ব বাংলার সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ তৈরি হয়"।[40] অমলেন্দু দে তার "প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ" নামক গ্রন্থে, পূর্ববঙ্গ থেকে সংখ্যালঘুদের পশ্চিমবঙ্গে আসার কারণ হিসেবে অন্যান্য কারণের পাশাপাশি মূলত পূর্ব-পাকিস্তান প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভূমিকা, ওই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিরাপত্তা প্রদানে অপারগতা, তাদের বিশ্বাস অর্জনে অকৃতকার্য হওয়া ইত্যাদি তিনি উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি পাকিস্তানের আইন সভায় কয়েকটি সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী আইন পাশ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে বোঝা যায় ওই দেশের সংখ্যালঘুরা কিভাবে প্রশাসনিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন।[41] নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির বাস্তবায়ন করতে না পারা, ওদেশের

---

[38] *আনন্দ বাজার পত্রিকা,* ১৬-ই মার্চ ১৯৪৮; *দৈনিক বসুমতি পত্রিকা,* ১৭-ই মার্চ ১৯৪৮; *যুগান্তর পত্রিকা,* ১৭-ই মার্চ ১৯৪৮।

[39] *দৈনিক বসুমতি পত্রিকা,* ৩-রা ডিসেম্বর ১৯৫৩।

[40] Kranti B. Prakashi, *The Uprooted: A Sociological Study of the Refugees of West Bengal*, (Calcutta: Editions India, 1971), p. 21.

[41] অমলেন্দু দে, *প্রসঙ্গ: অনুপ্রবেশ,* পৃ. ২-৬।

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে পূর্ব-পাকিস্তান প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাবকেই তুলে ধরে। পূর্ব-পাকিস্তান প্রশাসন এ ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি।[42]

সংবাদপত্র সূত্রে প্রশাসনিক অসহযোগিতার কথা জানতে পারা যায়। দৈনিক বসুমতিতে নারী হরণ, সরকারিভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের জেলে আটকানো, বন্দুক বাজেয়াপ্ত করা, ব্যবসা সংক্রান্ত লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করা ইত্যাদির ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়,- একজন ১৫ বছরের বধুকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যাকে যশোরের ঝিনাইদহের মোহাম্মদ হোসেনের ডিআইবি ওয়াচারের নিকট পাওয়া যায়। এই ঘটনায় সরকারি কর্মচারীদের যোগ রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিছু অপহরণকারীকে গ্রেফতার করা হলেও যশোহরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসামিদের জামিনে মুক্তি দিয়ে দেন এমনও উল্লেখ করা হয়েছিল। পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এই জেলাটিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-শূন্য করার জন্য সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি এক ঘৃন্য প্রচেষ্টা চলছে বলে সেখানে অভিযোগ করা হয়। তাই সেখানকার জনগণ পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যাতে করে বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবর্তে কোনো বিচক্ষণ বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়োগ করা হয়।[43]

উপরে উল্লেখিত ঘটনায় স্পষ্ট হয়, সংখ্যালঘুদের রক্ষায় পূর্ব-পাকিস্তান প্রশাসনের সদর্থক ভূমিকা ছিলই না বরং সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়,- "রায়পুরা থানার বিভিন্ন এলাকাতে পূর্ব বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পূর্ব-পাকিস্তান ছাড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। ন্যাশনাল গার্ডেরা বাদ্যব্যান্ডসহ হিন্দু পল্লীর মধ্যে দিয়ে কুচকাওয়াজ করছে এবং নিশুতি রাত্রে 'আল্লাহু আকবার' ও 'হিন্দুরা চলিয়ে যাও' বলিয়া চিৎকার করতে থাকে। হিন্দুরা বাড়িঘর জায়গা জমি বিক্রি করিতে চাইলে ন্যাশনাল গার্ডেরা বাধা দেয়"।[44] পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা সামান্য কিছু জিনিস সঙ্গে নিয়ে গেলেও পথে পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ড তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নেয় তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।[45] সরকারি তথ্য থেকে জানা যায়, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বিশাল সংখ্যক সংখ্যালঘুরা পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের ভূমিকায় আতঙ্কিত হয়ে ভারতে মাইগ্রেট করে চলে আসছে।[46] এমনকি পাবনার ডি.এম. ইমদাদ আলী নাকি মুসলিম গ্রাম উল্লাপাড়াতে এক প্রকাশ্য জনসভায় বলেন যে, "শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের জন্যই এই পাকিস্তান"।[47] এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক মন্তব্য নিঃসন্দেহে উস্কানিমূলক যা কোনো উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তার মুখে অশোভনীয়। এসবের মধ্যে পাকিস্তান প্রশাসনের হটকারিতায় নেওয়া

---

[42] তদেব, পৃ. ৩।

[43] *দৈনিক বসুমতি পত্রিকা,* ১২-ই মার্চ ১৯৪৮।

[44] *আনন্দ বাজার পত্রিকা,* ১৬-ই মার্চ ১৯৪৮; *দৈনিক বসুমতি পত্রিকা,* ১৭-ই মার্চ ১৯৪৮; *যুগান্তর পত্রিকা,* ১৭-ই মার্চ ১৯৪৮।

[45] *Jai Hind*, 12 Mach 1948.

[46] Home Political CR, IDM 1192/49 Dec. 1950, West Bengal State Archive, Kolkata.

[47] Ibid.

কিছু কিছু সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হয়। স্থানীয় অফিসারা পারমিট পদ্ধতি চালু করেছিল, যাতে স্থানীয় অফিসারদের অনুমতি ছাড়া কেউ আসতে না পারে। এমনও নিয়ম করা হয়েছিল যে সংখ্যালঘুরা দেশ ছেড়ে চলে আসার সময় ইনকাম ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স অথবা ডোমিশিল সার্টিফিকেট দিতে হবে।[48]

দেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি পূর্ব-পাকিস্তান প্রশাসনের এহেন ভূমিকায় অনুপ্রাণিত কিছু কিছু অসাধু, সুযোগ-সন্ধানী লোক বা সংগঠনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় যারা এই আবহকে কাজে লাগিয়ে সরকারের নামে সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন চালিয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, জয় হিন্দ পত্রিকায় পাকবাহিনীর নাম করে বহু ভন্ড লোক উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়েছে এমন খবর পাওয়া যায়। তবে পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকার বিবৃতি দিয়ে বলে যে ,"এই ধরনের কোন এজেন্সি আমাদের জানা নেই"।[49] দৈনিক বসুমতির খবরে বলা হয়,- "পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা আসছেন তাদের সহিত আসবাবপত্র আটক করছে 'পাকিস্তান বর্ডার মিলিশিয়া'"। পরে মহাকুমার হাকিম জানান যে 'পাকিস্তান বর্ডার মিলিশিয়া' নামে কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তার কাছে অবগত নয়।[50] অতএব এখানে পরিষ্কার, সরকারের নাম করে দুষ্কৃতীরা বাস্তুহারা মানুষদের সম্পত্তি লুট করছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় একই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়, পূর্ববঙ্গের খুলনা স্টেশনে যাত্রীদের তল্লাশি করে ও তাদের জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করে 'ইস্টার্ন পাকিস্তান বর্ডার মিলিশিয়া' নামে এক এজেন্সি। আবারও পূর্ব পাকিস্তানের সরকার বলে যে "এরকমও কোন সংস্থা আমাদের জানা নেই"।[51] অর্থাৎ এখানেও অবৈধ কিছু সংস্থা উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে জিনিসপত্র লুট করছিল।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই একই ধরনের কিছু ঘটনা প্রমাণ করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কিছু ব্যক্তি বা সংস্থা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এইসব কর্মকাণ্ড করতে থাকে। অতএব উপরিউল্লিখিত ঘটনাগুলি থেকে কয়েকটি বিষয় মনে হতে পারে। প্রথমত, সরকারি কর্মচারীরা হয়ত সরাসরি এই ধরনের কাজ করতে পারবে না বলে অন্য কোনো লোকের সাথে আঁতাত করে এই রকম কাজ করছে। কারণ উভয় দেশেই দুষ্কৃতীদের প্রতি পরোক্ষভাবে সরকার বা পুলিশি সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখানে যদিও সরকার পরিষ্কার করে দিয়েছে তাদের এই ধরনের কোনো সংস্থার কথা জানা নেই। দ্বিতীয়ত, হতে পারে যে কিছু দুষ্কৃতী সরকারকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে এই কাজ করছে। তৃতীয়ত, কেবল মাত্রই নিজেদের আখের গোছাতেই মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের সর্বস্ব লুট করেছে। আবার আনন্দবাজার পত্রিকার এক খবরে পাওয়া যায়, সীমান্তবর্তী আদিবাসীদের অস্থির অবস্থার কথা,- "তারা বাস্তুত্যাগের জন্য এক প্রকার সংকল্প করিয়া রহিয়াছে। পাকিস্তান সীমান্তবর্তী দুটি

---

[48] Home Political CR, 155/50 May 1950, B279-327, West Bengal State Archive, Kolkata.

[49] *Jai Hind*, 12 Mach 1948.

[50] *দৈনিক বসুমতি পত্রিকা,* ১২-ই মার্চ ১৯৪৮।

[51] আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১২-ই নভেম্বর ১৯৪৮।

থানায় অবস্থাপন্ন প্রত্যেক হিন্দুর বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চলিতেছে"। দেশভাগের পরে হিন্দুদের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ করতে থাকলে তারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরে অবশিষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে হয়ত আর অত্যাচার হবে না। তারপরেও একদল মুসলিম এসে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করা, বিভিন্নভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, তাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।[52] এই সমস্ত ঘটনাবলি থেকে এটা বিষয় পরিষ্কার, কাগজপত্রে মাইনরিটি রক্ষার প্রতিশ্রুতি থাকলেও শাসন কার্যে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দৈনন্দিন কর্তব্যে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। একদিকে সংখ্যাগুরুর পীড়ন ও অন্যদিকে প্রশাসনের পেষন পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের এক উভয়সংকটের মধ্যে নিক্ষেপ করে যার কারণে, তারা স্বভূমি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা মনে করে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত তারা 'নিজেদের লোক' দের মধ্যে থাকতে পারবে।

পূর্ববঙ্গের স্থানীয় মুসলিমরা পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারপন্থী ও পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার বিরোধী এই দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল। এরমধ্যে যারা পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারপন্থী ছিলেন তাদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ ছিল। একটি দল ছিল পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থক, এদের মধ্যে ভারত থেকে যাওয়া বিহারিরাও ছিল। এরা বাংলা ভাষার অপসারণ, পশ্চিম-পাকিস্তানের সংবিধান গ্রহণ ইত্যাদি আরোপ করে যেনতেন প্রকারেণ পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তান করতে বদ্ধপরিকর ছিল। অপর দলটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয় বরং বাঁচার তাগিদে, সে দেশে টিকে থাকতে, আতঙ্কে পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ, পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যাবে, পূর্ববঙ্গের এই শ্রেণির মুসলিমরাও পশ্চিম-পাকিস্তান প্রশাসন ও আধা-সেনার অত্যাচার থেকে রেহাই পেত না। পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থকরাই মূলত পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালাত। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি শাসকের মদতপুষ্ট কিছু রাজনৈতিক দল পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার নামে অত্যাচার করত এবং তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে এক প্রকার বাধ্য করত। তারা কখনোই চাইত না হিন্দুরা তাদের দেশে থাক।

পরবর্তীকালে, ষাটের দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নে ওই সমস্ত সরকারপুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির ছত্রছায়ায় গড়ে উঠতে লাগল 'রাজাকার', 'আলবদর', 'আলসামস', 'শান্তি কমিটি' ইত্যাদি দলগুলি। এগুলি ছিল পশ্চিম-পাকিস্তান প্রশাসনের আধা-সামরিক বাহিনী। যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মুক্তিযুদ্ধকে দমন করে পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য করা। এজন্য সরকার তাদের মাসিক ভাতা এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও সাহায্য করত। এর মধ্যে রাজাকার বাহিনী ছিল সবথেকে সহিংস। বিবিসি নিউজ বাংলার একটি প্রবন্ধ অনুসারে; "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যে শব্দটি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ক্ষোভ ও ঘৃণা ছড়িয়েছে এবং এখনও ছড়াচ্ছে,

[52] আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৪-ই মার্চ ১৯৪৮।

সেটি হল 'রাজাকার'' (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।[53] কারণ মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের ধরিয়ে দেওয়া বা হত্যা করার পাশাপাশি দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর তারা অকথ্য অত্যাচার চালাত। কারণ বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্বাধীন বাংলা গঠন করতে পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের অধীনতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা যে লড়াই করেছিলেন তাতে সংখ্যালঘু হিন্দুরাও তাদের সাহায্য করেছিলেন। রাজাকারের হাত থেকে বাঁচতে সেখানকার হিন্দুরা অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় যে যার আদর্শ অনুসারে পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারপন্থী ও এর বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু-মুসলিমের মিলিত বাংলাকামী এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব বাংলার হিন্দু-প্রধান বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘুদের মনে ত্রাস সৃষ্টিকারী এই সমস্ত দলগুলোর অত্যাচারের কাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, 'পাকিস্তান থেকে মালাউন তাড়াও' (হিন্দু হঠাও)। তাদের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে তারা গ্রামের পর গ্রাম পোড়ানো, বাড়িঘর, ক্ষেত-খামার, গরু-ছাগল লুঠ, নারী-ধর্ষণ, মানুষ খুন কিছু বাকি রাখেনি।

চিত্রঃ-১ রাজাকার, আল শামস এবং আল-বদর বাহিনীদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের সময় হত্যাকাণ্ড।



(সুত্রঃ বিবিসি বাংলা)

[53] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* (উত্তর ২৪ পরগণাঃ লিপিকা বিশ্বাস, ২০১২), পৃ. ২৪। পূর্ববঙ্গের নড়াইল কলেজের ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক নবকৃষ্ণ বিশ্বাস তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে; আকবর হোসেন, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যেভাবে গঠন করা হয়েছিল রাজাকার বাহিনী', *বিবিসি বাংলা (অনলাইন),* ১৭-ই ডিসেম্বর ২০১৯, ।

তাদের অত্যাচারের নৃশংস বর্ণনা পাওয়া যায় নবকৃষ্ণ বিশ্বাসের লেখায়। গ্রামে গ্রামে গঠিত পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারপন্থী 'শান্তি কমিটি'র লোকেরা ছদ্মবেশে গোপনে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াত। বিশেষ বিশেষ হিন্দুকে ধরে আনত 'রাজাকারদের রাজা' মোঃ সোলেমানের কাছে। তিনি তাৎক্ষণিক বিচারে যেমনি 'রিলিজড ফর এভার' লিখে দিতেন তেমনি তার নিয়োজিত ঘাতক (জল্লাদ) এসে লোকটিকে হত্যা করত। বিনিময়ে ঘাতক পেত ৫ টাকা। এমনকি মাঝে মাঝে সামরিক বাহিনীর লোক নিয়ে তাদেরই গাড়িতে 'রাজা' যেত 'অপারেশনে'। যাকে ইচ্ছা গুলি করে মারত। লেখকের কথায়, শুধু সংখ্যালঘু নয় সংখ্যাগুরুদের কারো কারো সঙ্গে যদি রাজার কোনো পূর্ব-শত্রুতা থাকত তাহলে তাদেরও ওই একই পরিণতি হত। এ যেন 'রক্তকরবী'র 'রাজা'র রক্তপিপাসু-রূপ। রক্তপিপাসু ঐ রাজার কাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।[54] কিন্তু স্থানীয় মুসলিমরা যারা পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের বিরোধী ছিলেন তারা বিভিন্নভাবে ওদেশের হিন্দুদের সাহায্য করেছেন। আর প্রাণ বাঁচানোর ভয়ে যারা পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারা রাজাকার ও অন্যান্য দলগুলির ভয়ে তারা লম্বা জামা পরতে আর লম্বা দাড়ি রাখতে শুরু করেন। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে, এই লম্বা জামা পরা, লম্বা দাড়ি রাখা আতঙ্কিত এই সকল মুসলিমরা বিপদের দিনে ঊর্ধ্বতনের হুকুম অমান্য করে স্থানীয় প্রতিবেশী বা পরিচিত হিন্দুদের গোপনে, কৌশল অবলম্বন করে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। এরকমই একটি ঘটনা ঘটে পূর্ববঙ্গের নড়াইলের হিন্দু-প্রধান গ্রাম আড়াপাড়ায়।

পূর্ববঙ্গের নড়াইলে ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক নবকৃষ্ণ বিশ্বাস তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে এক রোমহর্ষক কাহিনীর বর্ণনা দেন। 'রাজাকারের রাজা' সোলেমান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে নিয়ে আড়াপাড়ায় তাদের রুটিনমাফিক 'অপারেশনে' গিয়েছিলেন। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক রতন বাবুর সহকর্মী, পার্শ্ববর্তী গ্রামের আইয়ুব আলী সেদিন রতন বাবুর বাড়িতেই ছিলেন। এই আইয়ুব আলী দেশের অবস্থা বেগতিক দেখে সদ্য সদ্য লম্বা জামা পরা ধরেছিলেন। মিলিটারি দেখে রতনবাবু তার বাড়ির পাশে কচুরিপানা ভর্তি পুকুরে নেমে আত্মগোপন করেছিলেন। রতন বাবুর এক শরিকের কিশোর বয়সী ছেলে পালাতে গিয়ে মিলিটারির গুলিতে মারা যায়। আইয়ুব আলীকে দেখে তার ওপর ক্যাপ্টেনের নির্দেশ আসে; "দেখত, কচুরির মাঝে রতন মাস্টার আছে নাকি?" আইয়ুব আলী কচুরিপানার মধ্যে রতন বাবুর চুল দেখে বড় একটি কচুরিপানার ধাপ টেনে তুলে রতন বাবুর মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে রাজার কাছে এসে রিপোর্ট দেন, "খুব খুঁজেছি, কিন্তু পেলাম না"। ঘটনার পরদিন রতন বাবু তার গ্রামের সবাইকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ত্যাগ করে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক নবকৃষ্ণ বাবুর কথায়, "রতনদা বেঁচে গেলেন সহকর্মী আইয়ুব আলীর চেষ্টায়।"[55] অপর একটি ঘটনায় দেখা যায়, খুলনা জেলার দুর্গাপুর গ্রামের জনৈক পঞ্চানন বিশ্বাসের পরিবার যা কিছু সম্বল ছিল সঙ্গে নিয়ে ভিটামাটি ত্যাগ করে ভারতের দিকে রওনা হয়েছিলেন। ওই এলাকার

[54] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* পৃ. ২৮-২৯।

[55] তদেব, পৃ. ২৯।

অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মইদাঁড়ায় নদীতে নৌকা পার হওয়ার সময় ৪-৫ জন মুসলমান এসে হুমকি দিতে শুরু করে "নৌকা ছাড়ার আগে যা আছে বের করো।" তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পেরে পঞ্চানন বিশ্বাসের পুত্রবধূ বলে ওঠেন "আসগর, তুমি এসেছ আমাদের মাল লুঠ করতে?" ঘটনার বর্ণনাকার পঞ্চানন বিশ্বাসের পৌত্র ডক্টর কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস বলেছেন "আসগর চাচা আমাদের খুব পরিচিত এবং হিতাকাঙ্খী ব্যক্তি ছিলেন। আসগর চাচা লজ্জা পেয়ে আমাদের ছেড়ে দিল।"[56] ঘটনাটি প্রমাণ করে মন থেকে না চাইলেও ভয়ে, আতঙ্কে অনেকে পাকিস্তান সরকার বা রাজাকারদের হুকুম তামিল করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের উপরে সংখ্যাগুরু কর্তৃক যে অত্যাচারগুলি হয়েছিল তা সবই ছিল মূলত ত্রাস সৃষ্টিকারী এইসব দলগুলির কার্যকলাপ এবং তাদের ভয়ে ভীত পূর্ববঙ্গের কিছু সাধারণ মুসলিমরাও এতে জড়িত ছিলেন। এদের অত্যাচারেই ১৯৭১ সালের দিকে বেশিরভাগ সংখ্যালঘু দেশত্যাগ করেছিলেন।

এক শ্রেণির উদ্বাস্তুদের পাওয়া যায় যারা কোনো দাঙ্গা বা অত্যাচার, প্রশাসনিক অসহযোগিতা বা নারীর মর্যাদাহানির জন্যে দেশত্যাগ করেননি বরং তারা দেশ ছেড়ে চলে আসেন নিতান্তই তাদের পেশার কারণে। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পূজা-পরব, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-রেওয়াজ ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, বস্ত্র, বাসনপত্র ইত্যাদি নির্মাতাদের পূর্ববঙ্গে কাজের অভাব হচ্ছিল। কারণ, তাদের খদ্দেররা আগেই দেশত্যাগ করেছিলেন। ফলে তারা বুঝতে পেরেছিলেন মুসলিম প্রধান দেশে থেকে গেলে তাদের রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যাবে। সেইজন্য পুরোহিত থেকে শুরু করে ঢুলি, ঢাকি, নাপিত, ডোম, শাঁখারী, কাঁসারী, মালাকার, প্রতিমা প্রস্তুতকারী, দশকর্মা দোকানি, পূজার জন্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্র ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুতকারী, শাঁখা, পলা, নোয়া, অষ্টধাতু প্রভৃতির গহনা প্রস্তুতকারীরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পেশাগুলি বংশানুক্রমিক হয়ে থাকে এবং তাদের এই পেশার সঙ্গে তাদের একটা আত্মাভিমান জড়িয়ে থাকে যার ফলে পূর্বপুরুষের জীবিকা ত্যাগ করে অন্য জীবিকা অবলম্বনে তাদের মানসিক জাড্য কাজ করে। ইউনাইটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া, অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টারদের নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পেশায় ঢুলি, বরিশালের শিশিরবাবু জানান,- "বাবুদের বাড়িতে পুজো বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমাদের কর্মসংস্থানের একমাত্র উপায় ছিল। বাবুরাই চলে এসেছেন আমরা থাকবো কি করে? পূর্ববঙ্গে এখন আমাদের আর কোনো কাজ নেই। সেখানে থাকার অর্থ হল আমাদের মৃত্যু"।[57] তাদের অন্ন সংস্থানের একমাত্র উপায় ছিল বনেদী হিন্দু বাড়িতে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে ঢোল বাজানো, যা তাদের বংশগত পেশা। এইভাবে কিছু নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার যারা বংশানুক্রমিক পেশার জন্য উচ্চবিত্ত বনেদী হিন্দু পরিবারগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল তারা উপার্জনের জন্য এই দেশে চলে আসতে থাকে। অনুরূপ উদাহরণ নোয়াখালীর এক পুরোহিত। অমৃতবাজার

[56] তদেব, পৃ. ৬৩-৬৪।

[57] *অমৃতবাজার পত্রিকা,* ৮-ই অক্টোবর ১৯৪৮।

পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন তার পরিবারসহ সে অভুক্ত থাকে সেজন্য সে কলকাতায় চলে এসেছে।[58] টেটসূয়ার গবেষণাতেও নদীয়া জেলার এক গ্রামের জনৈক উদ্বাস্তুকে বলতে শোনা যায়,- "মুসলিম দেশে আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নাই"।[59] স্পষ্টতই মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানে নিজেদের পেশাগত যোগ্যতাকে ও দক্ষতাকে কাজে লাগাবার উপায় ছিল না এই শ্রেণির মানুষদের। শুধু এক বা দুই জন মানুষ নয়, তাদের এই পেশার ওপর নির্ভর করত সমগ্র পরিবার। তাই পরিবারের কথা ভেবেই অনিবার্যভাবে এই সকল মানুষদের দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গবাসীদের অনেকে পাকিস্তান সরকার ও সংখ্যাগুরুর অত্যাচারে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন কিন্তু তার পাশাপাশি আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে, গুজবে প্রভাবিত হয়ে আরও বেশি সংখ্যক লোক দেশত্যাগ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গবাসীদের দেশ ছেড়ে এপার বাংলায় আসার একটি বড় কারণ হল গুজব ও আতঙ্ক। সরাসরি আক্রমণ বা দাঙ্গার কবলে এরা কেউ পড়েননি। দৃষ্টান্তমূলক কোনো খারাপ অভিজ্ঞতাও এদের হয়নি। গুজবের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়া আতঙ্ক থেকে এরা দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। পরিচিত, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, পাশের গ্রামের মানুষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা যাদেরকে এরা সমর্থন করতেন, অনুসরণ করতেন ইত্যাদিদের দেশত্যাগের কথা শুনে এরাও দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অল্প শিক্ষিত, সাধারণ পরিবারের মানুষেরাই মূলত এর শিকার হন যারা খবরের সত্যতা যাচাই না করেই গুজবে প্রভাবিত হয়ে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশ ছেড়ে চলে আসার পেছনে যে আতঙ্ক কাজ করত কান্তি বি. পাকরাশির '*The Uprooted*,' গ্রন্থেও একাধিকবার তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হিন্দুদের চলে আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "বিশেষ করে যেসমস্ত অঞ্চলগুলি পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেসমস্ত অঞ্চলগুলিতে অস্থিরতা এবং আশঙ্কা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। হিন্দুরা পূর্বের তুলনায় আরও বেশি পরিমাণে প্রশ্নবিদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র ত্যাগ করতে শুরু করে"।[60] তিনি আরো বলেন "পাঞ্জাব দাঙ্গার ভয়াবহ সংবাদ 'পূর্ব-বাংলার হিন্দুদের মধ্যে ইতিমধ্যেই তীব্র আতঙ্ককে আরও বাড়িয়ে তোলে। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ভারত বিভাগের ঘোষণা এবং দেশের কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা এটি গ্রহণের ফলে হিন্দু সংখ্যালঘুরা খুব শীঘ্রই এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায়। তারা পাকিস্তানের প্রস্তাবিত অধিরাজ্য থেকে চিরতরে অভিবাসনের পক্ষে দ্রুত কিন্তু দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়"।[61] উভয় ক্ষেত্রেই কোনো দৈহিক আক্রমণ বা দাঙ্গার কথা বলা করা হয়নি, দেশভাগের ফলে সীমানার ভুল প্রান্তে অবস্থানের দরুন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তারা আতঙ্কগ্রস্ত; সেই কথাই শ্রী পাকরাশির লেখা থেকে উঠে আসে।

---

[58] তদেব।

[59] Tetsuya Nakatani, *Away from Home*, pp. 87-88.

[60] Kranti B. Prakrashi, *The Uprooted*, P. 19

[61] Ibid, p. 20.

একই প্রতিচ্ছবির দেখা মেলে টেটসূয়া নাকাতানির গবেষণাতেও। তার সমীক্ষা অনুসারে নদীয়া জেলার একটি গ্রামে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে মুসলিমদের অত্যাচারে যতজন দেশ ছেড়ে এসেছিলেন তার ঠিক অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ শতাংশ এসেছেন আতঙ্ক বা ভয়ে, যা ওই জেলায় আগত মোট উদ্বাস্তু জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। তিনি তার গবেষণায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশত্যাগের অন্যতম একটি কারণ হিসেবে যা উল্লেখ করেছেন তা হল 'আতঙ্ক' বা 'ভয়'। তিনি বলেছেন,-

"while many people mentioned arson, riots, or violence in different forms, the number of those who actually suffered from such violence was only 9. (যা ওই গ্রামে মোট উদ্বাস্তু জনসংখ্যার ৫ শতাংশেরও কম)। "Other people gave up their home not because of the actual violence they suffered, but because of their fear of suffering it". ("যদিও অনেকেই অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গা বা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার কথা উল্লেখ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন মাত্র ৯ জন। অন্যান্য লোকেরা তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করেছিল প্রকৃত সহিংসতার কারণে নয়, বরং তারা তা ভোগ করার ভয়ে"।)[62]

তার বক্তব্য থেকে বোঝা যায় অন্যান্যদের মুখে অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ও হিংসাত্মক ঘটনার কথা শুনে অনেকে বর্ণনা করেছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই ভুক্তভোগী নন। জয়া চ্যাটার্জীও তার গবেষণায় বাঙালির গৃহত্যাগের কারণ হিসেবে 'আক্রমণের হুমকির' কথা উল্লেখ করেছেন।[63]

বিভিন্ন গবেষণার পাশাপাশি সমকালীন সংবাদপত্রগুলিতে নজর দিলে দেখা যায়, বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে পড়া থেকে মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই আতঙ্কের পরিবেশ তাদের দেশত্যাগের সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড থেকে প্রাপ্ত এক খবরে কিছু পাক এজেন্সির কথা উল্লেখ করে বলা হয় তারা নাকি ঘোষণা করেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর কোনো উদ্বাস্তু প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। এর কারণে পূর্ববঙ্গের মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিবৃতি জারি করে বলেন "এরকম কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় সীমান্তে ট্রেন চালু আছে"। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাক অথোরিটির কাছে বারবার আবেদন করতে থাকে যে, উদ্বাস্তুদের আসতে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়।[64] 'কাস্টমস', 'বৈদেশিক রাষ্ট্র', 'লাইসেন্স', 'পাসপোর্ট' ইত্যাদি শব্দগুলি জনমানুষে গুজব ছড়াতে আরও সাহায্য করে। দেশভাগের পরে, বিশেষত পাসপোর্ট পদ্ধতির প্রচলন সাধারণ মানুষদের মধ্যে আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। কারণ, এর আগে এই দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য কোন পাসপোর্ট প্রয়োজন হত না, মানুষ যে যার নিজের প্রয়োজন মতো যাতায়াত করতে পারত। কিন্তু নতুন করে এই পাসপোর্ট পদ্ধতি দুই দেশের নাগরিকদের মনে আতঙ্ক তৈরি করেছিল। সমকালীন এক সংবাদপত্রে এর সমালোচনা করে দাবি করা হয়, কলমের আঁচড়ে পূর্ব-পশ্চিম ভাগ করে দুই দেশের মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা যায় না, ওদেশ থেকে হিন্দুদের

---

[62] Tetsuya Nakatani, *Away from Home*, p. 87.

[63] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১২৩।

[64] Home Political CR, 1950, 224-225, West Bengal State Archive, Kolkata.

এই দেশে চলে আসতে হবে এবং সেই পথ কণ্ঠকাকীর্ণ থাকবে তা হতে পারে না। — "একথা ভুলিলে চলিবে না যে, বাঙলা বিভক্ত হইলেও, পরস্পর বৈদেশিক রাষ্ট্রের আখ্যান লাভ করিলেও এখানকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন ও ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক সম্পর্ক, বসবাসের ব্যবস্থা ও সংস্থান এমনই পরস্পর জড়াইয়া রহিয়াছে যে, উঠিতে বসিতে, আসা-যাওয়া, আদান-প্রদানের প্রশ্ন অনিবার্য ভাবে দেখা দেয়। সুতরাং একটা কলমের আঁচড়েই পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বৈদেশিক রাষ্ট্রের ব্যবধান সৃষ্টি করা যায় না। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দুকে প্রাণের দায়ে এদিকে আসিতে হইতেছে। অথচ আসার পথ কণ্টকিত রহিয়াছে এবং থাকিবে—ইহা তো হইতে পারে না"।[65]

গুজব ও আতঙ্কের এর পাশাপাশি পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মধ্যে দেখাদেখি চলে আসার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণায় জনৈকা গৃহবধূ স্নেহলতা বিশ্বাসের মুখে অন্যান্যদের দেখাদেখি দেশত্যাগ করে চলে আসার আক্ষেপ ঝরে পড়তে দেখা যায়। মহিলার আক্ষেপ, "আর কীই বা করতে পারতাম? হিন্দুরা তখন বাস উঠিয়ে হিন্দু নদীয়ায় চলে আসতে শুরু করছে, অথচ প্রতিবেশী মুসলমানরা আমাদের থেকে যেতে বলছিলেন। কিন্তু চারিদিকের হাওয়ায় এমন সব গুজব রটেছিল যে, ভয় আর অবিশ্বাস আমাদের পেয়ে বসেছিল।"[66] টেটসূয়া নাকাতানির গবেষণায় নদীয়ার অনেক উদ্বাস্তুকে বলতে শোনা যায়, 'অন্যরা' চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলে তারাও দেশত্যাগ করে। কেউ বা বলে, "জমিদার ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা চলে গেছে। এখন আমার মতো একজন দরিদ্র মানুষ কীভাবে সেখানে একা থাকতে পারে?"।[67] আবার সাধারণ মানুষের পাশাপাশি দেশভাগের আবহে পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু হিন্দু রাজনৈতিক নেতাও এই দেশে চলে আসেন। সমাজে তাদের একটা ভাবমূর্তি থাকায় তাদের অনুসরণ করে তাদের অনুগামী, সক্রিয় কর্মী, ভক্ত এবং সমর্থকদের একটা বড় অংশ দেশ ছেড়ে চলে আসেন। কারণ, সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের একটা বিরাট প্রভাব থাকে। যার ফলে রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও সাধারণ মানুষ, যারা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন; তাদের মনে এই সমস্ত বড় বড় নেতাদের দেশ ছেড়ে চলে আসার ঘটনা রেখাপাত করে ও তারাও প্রভাবিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন। উদাহরণস্বরূপ কংগ্রেসের বহু নেতা এ সময় পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন।[68] পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা দেখা যায়। মুসলিম লীগ দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ায় বহু লীগ নেতা ঝাড়েবংশে পূর্ববঙ্গে চলে যান। পরে তাদের অনুসরণ করে মুসলিম লীগের উগ্র সমর্থকরাও দেশ ছাড়তে থাকে। এই সমস্ত ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণ হয়, সমাজের এক শ্রেণির মানুষের উপর স্বধর্মী, স্বজাতি অন্যান্য মানুষের সিদ্ধান্তের একটা বড় প্রভাব পড়ে যা একটি বড় গণ-স্থানান্তরের কারণ।

---

[65] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৮-ই মার্চ ১৯৪৮।

[66] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, *দেশভাগ-দেশত্যাগ,* (কলকাতাঃ অনুষ্টুপ, ২০২০), পৃ. ১০৪।

[67] Tetsuya Nakatani, *Away from Home*, pp. 87-88.

[68] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১৪৫-৫৫।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন কারণের পাশাপাশি, পূর্ববঙ্গ ছেড়ে হিন্দুদের এই দেশে চলে আসার পেছনে সমকালীন প্রিন্টমিডিয়া বা সংবাদপত্র, পত্রিকাগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ না করলে এই অনুসন্ধান অপূর্ণ থেকে যায়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমাজের দর্পণ গণমাধ্যমই এক বিপুল সংখ্যক জনগণের চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি তথা সিদ্ধান্তকে যেমন প্রতিফলিত করতে পারে তেমনই জনগণকে প্রভাবিতও করতে পারে। আগের আলোচনায় দেখা গেছে, ভারতে দাঙ্গার খবরের জেরে যেমন পূর্ব-পাকিস্তানে দাঙ্গা হয়েছে, তেমনি পূর্ব-পাকিস্তানের দাঙ্গার খবরে এদেশেও তার প্রতিশোধের আগুন জ্বলেছে। খবরের অতিরঞ্জন, সত্যতা যাচাই না করেই মিথ্যা খবর পরিবেশন বিপুল সংখ্যক জনগণের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। রাজশাহীর ইলা মিত্র নামক এক মহিলার ঘটনাকে যদি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে বিষয়টি বোঝা যায়।

১৯৫০ সালের ৫-ই জানুয়ারী, রাজশাহীতে ধানের চাঁদা ও তেভাগা আদায়ের জন্য স্থানীয় সাঁওতালদের সঙ্গে পুলিশের ঝামেলা হয়। এই ঘটনায় কয়েকজন পুলিশ কর্মী মারা যায়। পুলিশ বেশ কিছু সাঁওতাল ও কমিউনিস্টদের গ্রেফতার করে। সাঁওতালদের গ্রামে কিছু মুসলিম ও আনসাররা মিলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ইলা মিত্র নামে একজন বামপন্থী নেত্রীকে মালদা আসার পথে পুলিশ গ্রেফতার করে। এরপর নাচোল পুলিশ স্টেশনে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কিছু পুলিশ ও কাস্টম অফিসার মিলে তাকে ধর্ষণ করে বলে তথ্য সূত্রে জানা যায়। ২১-শে জানুয়ারি তাকে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৯ সালের ৩-রা এপ্রিল ঢাকা হাইকোর্টে 'Section ৩০২/১৪৯ of Pakistan Penal Code' অনুযায়ী, তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষিত হয়।[69] অন্যদিকে ৩১/০১/১৯৫০ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকা রাজশাহীর এই ঘটনা খবরে প্রকাশ করে; যেখানে মহিলার নাম 'লীলা মিত্র' উল্লেখ করে, তাঁকে অত্যাচারে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।[70] পরদিন দৈনিক বসুমতীতে, এই ঘটনায় বেশ কিছু সাঁওতাল পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলাতে আশ্রয় নিয়েছেন বলে একটি খবর প্রকাশিত হয়।[71] আনন্দবাজার পত্রিকার মতো প্রথম সারির সংবাদপত্র এক মহিলাকে মৃত ঘোষণা করেছিল অথচ ঢাকা হাইকোর্টের রেকর্ড অনুযায়ী, তাকে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারি মহাফেজখানার একটা ফাইলে মহিলার নাম 'Sm. Ila Mitra' পাওয়া যায়। এখানে আনন্দবাজার ও পশ্চিমবঙ্গ মহাফেজখানার উল্লিখিত তথ্যের মধ্যে নামের একটা গরমিল রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হল যে, আনন্দবাজার পত্রিকা সেই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করছে। এটা কিন্তু দুই দেশের সংখ্যালঘুদের উপর আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করছিল। পঞ্চম অধ্যায়ে রাজনৈতিক আলোচনায় এই ইলা মিত্রকেই নাচোলে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী হিসেবে দেখা যাবে। কিন্তু সমকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশে এবং সাম্প্রদায়িক

[69] Home Political CR, March 1954, 495-506, West Bengal State Archive, Kolkata.

[70] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৩১-শে জানুয়ারি ১৯৫০।

[71] *দৈনিক বসুমতি পত্রিকা,* ১-লা ফেব্রুয়ারি ১৯৫০।

উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে এরকম একজন নেত্রীর পুলিশি অত্যাচারে মৃত্যুর মিথ্যা খবর প্রকাশ করা শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় দেয় না বরং তা প্ররোচনামূলক। সমাজে এর কি বিরাট প্রভাব পড়তে পারে তার বিন্দুমাত্র চিন্তা এই ঘটনায় প্রতিফলিত হয় না।

সুশীল চন্দ্র নিয়োগী (Ex-members, B.P.C.C & Secretary, Rajshahi District Displaced Persons, Association) একটা রিপোর্টে রাজশাহীর ঘটনাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন; লীগের নেতারা এই জেলার বেশ কিছু হিন্দুদের ঘর-বাড়ি নির্বাচন করে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা মুসলিম উদ্বাস্তুদের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। আরো বলা হয়েছিল যে, হিন্দু ও সাঁওতালদের ঘর-বাড়ি লুঠ করে, পুড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রায় ৩০০ জন হিন্দু ও সাঁওতালদের গ্রেফতার করা হয় এবং ২০০ জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। এখানে ইলা মিত্রকে তিনি 'স্কুল টিচার' বলে উল্লেখ করে বলেছেন তাকে প্রায় ২০ জন পুলিশ ও কাস্টম অফিসার মিলে ধর্ষণ করে, তারপর খুব খারাপ অবস্থায় তাকে রাজশাহীর জেলে পাঠানো হয়।[72] আশ্চর্যের বিষয় হল, বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত ইলা মিত্রের এই ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যেগুলির মধ্যে বেশ ফারাক ছিল। প্রথমত, নামের অমিল এবং দ্বিতীয়ত, পরিচয়। কোথাও বলা হচ্ছে তিনি বামপন্থী দলের নেত্রী যিনি নাকি সাঁওতালদের নিয়ে বামপন্থীদের ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন, অন্যদিকে তাকে স্কুল শিক্ষিকা হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। তৃতীয়ত, একটা তথ্যে বলা হচ্ছে যে ১০ জন পুলিশ ও কাস্টম অফিসার ছিল, অথচ সুশীল চন্দ্র নিয়োগী তার রিপোর্টে ২০ জন পুলিশ ও কাস্টম অফিসারের কথা বলছেন। চতুর্থত, আনন্দবাজার পত্রিকায় ইলা মিত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এইভাবে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে, যা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার পক্ষে যথেষ্ট।

তৎকালীন সংবাদপত্রগুলিতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হত। খবরে বলা হতো হিন্দুদের ধন-সম্পদ, নারীর মর্যাদা বিপন্ন। নারীহরণ ও ধর্ষণ, নরহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি পরিকল্পিতভাবে চলছে। তাই হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পুনরায় ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ করছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ সরকার এক বিবৃতি প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের এই সংবাদপত্রের দাবিকে অস্বীকার করছে। তারা বলছেন, কলকাতার খবরের কাগজে পূর্ববঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ আনা হচ্ছে তা সব সত্য নয়। এর পাল্টা জবাবে আনন্দবাজার পত্রিকা আবার বলছে হিন্দু সমাজের উপর পাকিস্তানি অত্যাচার সম্বন্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের সরকার যে বিবৃতি প্রচার করছেন তাতে মুন্সিয়ানা আছে, কিন্তু সত্যতা নেই।[73] অর্থাৎ সত্য ঘটনা তুলে ধরা বা সম্প্রীতির বার্তা বহন করার বিপরীতে সংবাদপত্রগুলি অভিযোগ ও পাল্টা-অভিযোগে লিপ্ত ছিল। একই রকম উদাহরণ পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রগুলিতেও। ১৩/০৮/১৯৪৮ তারিখে পল্লী বান্ধবে প্রকাশিত হয়,

[72] Home Political CR, B Jan 1952, 93-149, West Bengal State Archive, Kolkata.

[73] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ৯-ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫০।

রাজশাহীর হিন্দুরা মুর্শিদাবাদে গিয়ে সেখানকার মুসলিমদের বিতাড়ণের জন্য উস্কানি দিচ্ছে এবং তারা বলছেন যে পূর্ববঙ্গে তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। একই ধরনের খবর পাওয়া যায় ৩১/০৮/১৯৪৯ তারিখের আজাদ পত্রিকাতে। সেখানে মালদা জেলায় মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে।[74] পশ্চিমবাংলার সরকারের মহাফেজখানায় একটা ফাইলে অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পর্কে একটি তথ্য পাওয়া যায়। যেখানে পূর্ববঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে সে দেশের সংখ্যালঘুদের ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য এবং ভুল খবর ছড়ানোর জন্য এই পত্রিকাকে বন্ধ রাখার কথা বলা হচ্ছে।[75] এখানে দেখা যাচ্ছে উভয় দেশের সংবাদপত্রগুলি নিজের দেশের সংখ্যালঘুদের কথা বাদ দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছে, যেখানে তাদের উচিত ছিল নিজের দেশের সংখ্যালঘু জনগণের প্রতি আরো বেশি দায়িত্ববান হওয়া।

আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায় যেখানে পূর্ব বঙ্গের চট্টগ্রামের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দুদের মন্দির দখলের নোটিশ জারি করা বা না করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াতে দেখা যায়। আনন্দবাজার ও হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড তাদের রিপোর্টারকে চট্টগ্রামে পাঠায় ও সেখানকার ঘটনা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে এবং পরে তারা বলে যে চট্টগ্রামের ডি.এম. হিন্দুদের মন্দির দখলের নোটিশ জারি করেছিলেন। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের The Director of Publicity, East Bengal-এর অফিস থেকে নোটিশ জারি করে বলা হয় যে চট্টগ্রামের ডি.এম. এ ধরনের কোনো নোটিশ জারি করেনি।[76] একই ঘটনা নিয়ে তথ্যের রকমফের পূর্ববঙ্গের জনসাধারণকে স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্ত করে তুলবে এবং দেশেত্যাগ করতে সাহায্য করবে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। যার ফল ভোগ করতে হয় দুই দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে। ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া দেশভাগ ও চতুর্দিকে বিরাজমান সাম্প্রদায়িকতারর আবহে সংবাদপত্রগুলির এরকম অসংযমী আচরণ, সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক খবরের পরিবেশন ও অতিরঞ্জন যে দুই দেশের সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে তার বলাই বাহুল্য। যা স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরা-অনুঘটকের কাজ করে করেছিল।

২.৩ উদ্বাস্তু সমস্যা; পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনে সরকারি নীতি-প্রতিক্রিয়াঃ

পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য যে সরকারি নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল তা ছিল এরকম; কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ করবে, রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রকের অনুমোদন সহকারে যে খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হবে সেই খাতের প্রকল্প পরিকল্পনা করবে এবং সেগুলো বাস্তবায়িত করবে।[77] যদি বরাদ্দ অর্থ সেই বিশেষ আর্থিক বছরের নির্ধারিত খাতে ব্যয় না হয়, তাহলে সেটি কেন্দ্র

---

[74] *পল্লী বান্ধব প্রত্রিকা,* ১৩-ই আগস্ট ১৯৪৮; *আজাদ প্রত্রিকা,* ৩১-ই আগস্ট ১৯৪৯।

[75] Home Political CR, B May 1950, 249-272, West Bengal State Archive, Kolkata.

[76] Home Political CR, B Dec. 1950, 602-622, West Bengal State Archive, Kolkata.

[77] *Estimate Committee Reports* (1959-60), 2nd Lok Sabha, Ministry of Rehabilitation, New Delhi, p. 3.

সরকারকে ফেরত দিতে হবে, অন্য কোনো খাতে সেটি ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না।[78] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিম-পাকিস্তান তথা পশ্চিম-পাঞ্জাব থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার একক দায়িত্বে বিভিন্ন প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে; কারণ উক্ত ক্ষেত্রে, উদ্বাস্তু আগমন প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছিল বিপুল জনবিনিময় পদ্ধতি দ্বারা। পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আগত ৫০ লক্ষ শরণার্থীর বিপরীতে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থী সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ। ১৯৫৯-৬০-এর এসটিমেট কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল,- এই দুটি প্রদেশের অভিবাসনের মধ্যে দুটি প্রধান পার্থক্য হল প্রথমত, "পূর্ব-পাকিস্তান থেকে দেশত্যাগ বন্ধ হয়নি এবং হাজার হাজার অভিবাসী এখনও ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য এই দেশে প্রবেশ করছে"। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বিশাল জনসমুদ্রের প্রায় পুরোটাই পূর্ব-পাঞ্জাব দ্বারা শোষিত হয়েছিল।[79] এ কথা বলার কারণ পূর্ব-পাঞ্জাব থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিমরা দেশত্যাগ করে পশ্চিম-পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, ফলে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গ থেকে যে পরিমাণে সংখ্যালঘু হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন তার তুলনায় খুব কম সংখ্যক মুসলিম দেশত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। ফলে আগে থেকেই পরিপূর্ণ একটি রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত মানুষদের স্থান সংকুলান এবং কর্মসংস্থান উভয় ক্ষেত্রেই সরকারকে বিরাট বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের আগমন মূলত শূন্যস্থান পূরণের সমতুল্য কারণ জমি, বাড়ি ইত্যাদি 'Evacuee property' বা 'শত্রু সম্পত্তি'তে তাদের অধিকাংশের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু আগমন, তৎকালীন বিদ্যমান জনসংখ্যায় অতিরিক্ত সংখ্যা যোগ করে। শুধু তাই নয়, সমগ্র পূর্ব-ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের সিংহভাগই আশ্রয় নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। আবার যে মুসলিম পরিবারগুলি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন তাদের অনেকেই ফিরে এসেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫০-৫১ সালে যে সাত লাখ সংখ্যালঘু মুসলিমরা পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে পাঁচ লাখ আবার ফিরে আসেন।[80]

পাঞ্জাবে উদ্বাস্তু আগমন ছিল আকস্মিক ও স্বল্পমেয়াদী। দাঙ্গার ভয়াবহতা ও নৃশংসতা বাংলার তুলনায় সেখানে অনেক বেশি ছিল, যার কারণে হঠাৎ করে বিপুলসংখ্যক মানুষের জনবিনিময়ের মাধ্যমে দেশান্তর গমনের কাজটি অতিদ্রুত সমাপন হয়। সীমানা পারাপার এরপর থেমে যায়, বাংলার মত দীর্ঘদিন ধরে, কয়েক দশক ধরে চলতে থাকেনি।[81] পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে কত সংখ্যক মানুষ এই দেশে আসবেন, এসে এ দেশের নাগরিক হয়ে থাকবেন এবং কত সংখ্যক মানুষ চিরতরে এই দেশকে বিদায় জানিয়ে চলে যাবেন, এর আগাম আন্দাজ করা বা এর একটি পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। এর পাশাপাশি এদেশ থেকে মুসলিমদের চলে যাওয়ার ফলে যে

[78] দেবযানী ঘোষ ও সায়ক মুখার্জি (সম্পাঃ), *দেশভাগঃ অকথিত ইতিহাস,* (কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০২৩) পৃ.৭৩।

[79] *Estimate Committee Reports* (1959-60), pp. 2-3; Kranti B. Prakashi, *The Uprooted*, p. 23.

[80] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal, Refugee Relief and Rehabilitation Department, August 1956, Govt. of West Bengal, p. 1.

[81] Bagchi and Dasgupta, *The Trauma and the Triumph*, p. 2.

স্থান ও সম্পত্তির শূন্যতাটা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। অর্থাৎ কতজনকে পুনর্বাসন দিতে হবে এবং তার জন্য কতটুকু জমি বা সুযোগ-সুবিধা হাতে রয়েছে তার একটা পরিষ্কার চিত্র সরকারের কাছে ছিল। যেমন, পাঞ্জাবের গ্রামীন এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়া মুসলমানদের বাড়ি, জমি, সম্পত্তিতে পশ্চিম-পাঞ্জাব থেকে আগত ২৫ লাখ উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল।[82] এক্ষেত্রে সম্পত্তির বিনিময় ও অন্যান্য প্রকল্পগুলি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুবিধা ছিল।

উপরি উক্ত সমস্ত ক্ষেত্রে বাংলার পরিস্থিতি ছিল পাঞ্জাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু আগমন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পথে একটা বড় বাধা ছিল, কারণ দেশভাগের ঠিক পরপরই শুরু হওয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা একটি প্রক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া খুব কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।[83] স্বচ্ছ, সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যানের অপ্রতুলতা নিয়ে তৈরি হওয়া একটি সমস্যার অবতারণা করা যায় রনজিৎ রায়ের পর্যবেক্ষণ থেকে;- "পূর্ব-বাঙলা থেকে আগত এবং চেক পোস্টে উদ্বাস্তু হিসাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত মানুষের সংখ্যা ১৯৫৬ সাল অবধি ছিল ৪১.১৭ লক্ষ। ১৯৭০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা ৫২.১৪ লক্ষে দাঁড়ায়। এ ছাড়া বেশ কয়েক লক্ষ পূর্ব-বাঙলার উদ্বাস্তু নিজেদের রেজিস্টিভুক্ত না করেই ভারতে চলে আসেন। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত *'The Story of Rehabilitation*' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এই ধরনের 'অবৈধ বাস্তুত্যাগীর' সংখ্যা 'বিরাট'। এ ছাড়া আছেন পূর্ব-বাঙলার বেশ কয়েক লক্ষ বাঙালি, যাঁরা ১৯৪৭ সালে পূর্বে-ভারতে কাজকর্ম করতেন এবং নিজেদের উদ্বাস্তু হিসাবে রেজিস্টিভুক্ত করেন নি"।[84] বাংলায় আগত উদ্বাস্তুদের যথার্থ পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সেই সময় সরকারের সামনে প্রধান যে অন্তরায়গুলি ছিল সেগুলি হল,- **এক**, কতদিন ধরে কত সংখ্যক উদ্বাস্তুদের সীমানা পার করে আসতে থাকবে তার কোন ধারণাই ছিল না। শুধু তাই নয়, তারা আর ফিরে যাবে নাকি চিরতরে চলে এসেছে তা সরকারের পক্ষে বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। **দুই**, এই দেশ থেকে কত সংখ্যক মানুষ ওই দেশে চলে গিয়েছেন বা যাবেন, যারা গিয়েছেন তারা আবার ফিরে আসবেন কিনা অর্থাৎ তাদের ফেলে যাওয়া জমি সম্পত্তি সম্পর্কে কি নীতি নেওয়া উচিৎ তা স্থির করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর অর্থ দাঁড়ায় ত্রাণ পুনর্বাসনযোগ্য উদ্বাস্তুর সংখ্যা এবং এদেশের মুসলিমদের ফেলে যাওয়া মালিকানাহীন জমি-সম্পত্তি, বাড়ির পরিসংখ্যান দুটোই ছিল ধোঁয়াশায়। **তিন,** পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসন নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, অথচ পশ্চিমবঙ্গ ছিল

---

[82] *Estimate Committee Reports* (1959-60), pp. 2-3.

[83] Kranti B. Prakashi, *The Uprooted*, p. 23.

[84] রনজিৎ রায়, *ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গঃ কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন,* (কলকাতাঃ শঙ্খ প্রকাশন, ১৯৭৭) পৃ. ৯১।

অতি ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। প্রতি বর্গমাইলে ৮০০ জন জনঘনত্ব বিশিষ্ট এই রাজ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মূলত কৃষিনির্ভর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার মতো জমির অভাব একটি প্রধান সমস্যা ছিল।[85]

আরো একটি বিষয় সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল তা হল, উদ্বাস্তুদের আগমনে তাৎক্ষণিক ভাবে সাময়িক ত্রান শিবিরগুলি প্রতিষ্ঠা করে ত্রাণকার্য শুরু হওয়ার পর, উদ্বাস্তু আগমনের ধারা স্তিমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। এরই মধ্যে হঠাৎ করে উদ্বাস্তুদের আগমন বাড়তে থাকলে ত্রান শিবিরগুলি পুনরায় বহাল রাখতে হত বা নতুন করে চালু করতে হত। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বারংবার ঘটতে থাকে, যা পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে। এর ফলে দেখা যায়, সরকার সঠিক পরিকল্পনা করতে, প্রকল্প প্রণয়ন করতে ব্যাহত হচ্ছে ও সরকারি কার্যকলাপ বারবার বাধা পাচ্ছে।

শুধু একদিক দিয়ে বিচার করে বললে উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারটি অবমূল্যায়ন করা হয়। সরকারের সামনে বাধা বা অসুবিধাগুলির পাশাপাশি এই সমস্যার আরো একটি বিচার্য্য বিষয় হল বাংলার উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। উভয় সরকারের অদূরদর্শীতা ও তার সঙ্গে অনুভূতিহীন পেশাদার রাজনৈতিক মনোভাব তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথকে প্রশস্ত করতে পারে নি। যেমন-

প্রথমত: কেন্দ্র সরকার পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমমুখী উদ্বাস্তু প্রবাহ চূড়ান্ত ভাবে বন্ধ করতে চেয়েছিল। ১৯৪৮-এর ১৬-ই আগস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, ডক্টর রায়কে চিঠিতে লেখেন "উদ্বাস্তুরা যদি বিপুল সংখ্যায় চলে আসতে থাকে তবে সেই সমস্যার কোনো যুক্তিসহ সমাধান নেই। তাই যাই ঘটুক না কেন, উদ্বাস্তুদের চলে আসাটা বন্ধ করতে আমি অত্যন্ত ব্যগ্র। আমি এখনো মনে করি উদ্বাস্তুদের চলে আসাটা বন্ধ করার জন্য যে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দু নেতার পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে বলে আমি মনে করি।"[86] আবারও ১২-ই আগস্ট এর একটি চিঠিতে নেহেরু ডক্টর রায়কে লেখেন "প্রথম থেকে আমার এই সুনিশ্চিত ধারনা ছিল যে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা রোধ করার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যদি তারা বিপুল সংখ্যায় চলে আসে তাহলে নিঃসন্দেহে তা বড় রকমের বিপর্যয় নিয়ে আসবে। আমি মনে করি পূর্ববঙ্গে যেসব হিন্দু নেতারা দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন তারা তাদের সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো কর্তব্যই পালন করেননি।...যদি যুদ্ধ করতে হয় তাহলেও শেষ অবধি এই উদ্বাসন বন্ধ করার চেষ্টা করব।"[87] স্পষ্টতই নেহেরু পূর্ববঙ্গের তৎকালীন হিন্দু রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ওই

[85] *Estimate Committee Reports* (1959-60), pp. 2-3.

[86] Saroj Chakrabarty, *With Dr. B. C. Roy and other Chief Ministers: A Record up to 1962,* (Calcutta: Benson's, 1974), p.107.

[87] Ibid, p. 28.

দেশে তাদের সমর্থক ও সর্বোপরি আমজনতার ওপর তাদের দায় দায়িত্বকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। অনেকের মধ্যে এতে উদ্বাস্তুদের প্রতি তিনি তার দায় ঝেড়ে ফেলার একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।[88]

এই সমস্ত নেতাদের অনেকেই হয়ত ব্যক্তিগত স্বার্থে বা সুবিধার্থে বিকল্প হিসেবে উত্তম মনে করে ভারতবর্ষে চলে এসেছিলেন, তারা হয়ত ভেবেছিলেন এ দেশে আরো সচ্ছল ভাবে, খুব ভালোভাবে থাকতে পারবেন কিন্তু তাদের একটা সিদ্ধান্ত জনমানবে যে কি বিরাট প্রভাবিত ফেলতে পারে তা তারা আন্দাজ করতে পারেননি বা সেই দায়বদ্ধতাটুকু সকলে দেখাতে পারেন নি। তারা হয়ত রাজনীতির আলোকে ব্যাপারটিকে না দেখে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশত্যাগ করে এদেশে আসেন কিন্তু তার সেই সিদ্ধান্ত আর ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা গণসিদ্ধান্তে রূপায়িত হয়েছে। এইসব নেতারা গণস্বার্থ বা দলস্বার্থের চেয়েও ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখে এমনটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এসব ক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক জনগণের দেশত্যাগের সিদ্ধান্তে তাদের একটা দায় থেকেই যায়। যদিও তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেননি বলে এ দেশের সরকার উদ্বাস্তুদের 'বিপর্যয়' বলে মনে করবে এমনটাও সমীচীন নয়। বর্তমান গবেষণার জন্য নেওয়া সাক্ষাৎকারে মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলার বহু উদ্বাস্তু এদেশে চলে আসার পেছনে কারণ হিসেবে এটা স্বীকার করেছেন যে, যোগেন মন্ডল ও আরো অন্যান্য প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারা এই দেশে চলে এলে তাদের অনেকেই ওই দেশে থাকতে আর সাহস পাননি।[89] অন্যদিকে সদ্য গঠিত পাকিস্তানের প্রায় ৬০-৭০ লাখ দলিতকে যোগেন মন্ডল, জিন্না সরকারের উপর ভরসা করে আশ্বস্ত করতে পেরেছিলেন। যোগেন মন্ডলের উপর জিন্নার সরকার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু জিন্নার মৃত্যুর পর পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক চিত্র পুরোটাই পাল্টে যায়। জিন্না-পরবর্তী লিয়াকত আলি খান মন্ত্রিসভা, জিন্নার রাষ্ট্রনৈতিক অঙ্গীকার থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। যোগেন মন্ডল তার পদত্যাগ পত্রে জিন্নাহর মৃত্যুর পরবর্তী পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে দায়ী করে দেশত্যাগ করেন।[90]

দ্বিতীয়ত: কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই ধারণা ছিল উদ্বাস্তুরা সাময়িকভাবে এই দেশে চলে এসেছে, ওই দেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তারা আবার নিজের দেশে ফিরে যাবেন।[91] যদিও বাস্তবে সেটা মোটেও হয়নি। পাঞ্জাবের মতো বড় ধরনের কোনো দাঙ্গা বা দাগ কাটার মত নৃশংস ঘটনা সেরকমভাবে পূর্ববঙ্গে খুব বেশি না ঘটায় পূর্ববঙ্গ ছেড়ে হিন্দুদের চলে আসার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করতে সরকার ব্যর্থ হয়। জয়া চ্যাটার্জী যথার্থই বলেছেন, জনমানবের জীবন ও সম্পত্তিতে দৃশ্যমান আঘাত, আক্রমণ বা স্থায়ী ক্ষতি যা পশ্চিম-পাকিস্তানের

---

[88] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ.২৮-৩০।

[89] সাক্ষাৎকারঃ- নিরঞ্জন মিত্র, বয়স-৮৬, পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, মহালন্দি কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ- ২১/১১/২০২২।

[90] আলতাফ পারভেজ, *যোগেন মন্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ,* (ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০২২) পৃ. ৫৫-৫৭।

[91] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ. ২৭।

উদ্বাস্তুদের চিরতরে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে তা পূর্ববঙ্গবাসী উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মতো না হলেও, দেশত্যাগের পেছনে তাদেরও যে যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ছিল এবং তারাও বাধ্য হয়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দেশত্যাগ করে চলে এসেছে তা কেন্দ্র সরকার অনুভব করতে পারেনি। তারা তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যাপার নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিল।[92] ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য মুসলিমদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ এবং বিভিন্ন পুনর্বাসনের জন্য নীতি প্রয়োগ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র কিছু ঋণ প্রদান করে পরবর্তীকালে সেগুলোকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে মুকুব করে দেওয়া ছাড়া পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের অনুরূপ কোনো নীতি গ্রহণ করেননি।[93] পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্র সরকারের এমন দ্বিচারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, ভারতের এই দুই প্রদেশের উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প প্রণয়নে ও ত্রাণের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণে। নেহেরু ও ডক্টর রায়ের চিঠির আদান-প্রদানেও ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৪৯ সালের ১-লা ডিসেম্বর নেহেরুকে লেখা ডঃ রায়ের একটি চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে ১৯৪৮-৪৯, ও ১৯৫০-৫১ দুই বছরে ২৬ লক্ষ উদ্বাস্তুকে যে অনুদান দেওয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেক উদ্বাস্তুর বরাদ্দ মাত্র কুড়ি টাকা, যা পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুতে তুলনায় একেবারেই নগণ্য।[94] এর জবাবি চিঠিতে নেহেরুর বক্তব্য; পশ্চিম-পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণের পরিমাণ হয়ত কম, তবে সেটা পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য নয় বরং তার জন্য দায়ী অনিয়ন্ত্রণমূলক পরিস্থিতির। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, দেশভাগের আগেই চলে আসা ১০ লক্ষের মতো পশ্চিম-পাকিস্তানিকে সরকার কোনো সাহায্য করেনি। তারপর দু মাসের মধ্যে ৫০-৬০ লক্ষ মানুষের ঢল নেমে আসে, সেখানে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু এসেছে ধীরে ধীরে। তিনি আরো উল্লেখ করেন পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে সব হিন্দু ও শিখ বিতাড়িত হওয়ার কথা, তার বিপরীতে তিনি বলেন পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের এক বিরাট অংশ থেকে যাওয়ার কথা। চিঠিতে তার আরো বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে "আপনার ও আমাদের উভয়েরই নীতি হল এই যে; এই ব্যাপারে এমন কোনো নীতি গ্রহণ করা উচিত হবে না, যাতে পূর্ব - পাকিস্তান থেকে সব হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। তাতে ভয়াবহ দুর্দশা সৃষ্টি হবে যার মোকাবেলা করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব হবে না"।[95] অর্থাৎ তিনি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাননি। ভারতের এই দুই প্রদেশেই বিপুল জন-বিনিময় হোক তা তিনি চাননি।

পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের চলে আসাতে পূর্ণচ্ছেদ টানতে এবং এদেশে আগতদের ফেরত পাঠাতে তিনি ওই দেশের সরকারকে 'মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থা' গ্রহণে এবং ওই দেশের হিন্দুদের মনে আস্থা অর্জনে সচেষ্ট হতে আবেদন

---

[92] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১৩৮।

[93] রনজিৎ রায়, *ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গঃ,* পৃ. ৯৮।

[94] Saroj Chakrabarty, *With Dr. B. C. Roy and other Chief Ministers*, pp. 140-142.

[95] Ibid, p. 143.

করেন।[96] ফলস্বরূপ ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসের উভয় সরকার কর্তৃক Inter-Dominion Agreement স্বাক্ষর, যার মূল লক্ষ্য ছিল এই জনস্রোতকে ফেরত পাঠানো।[97] এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের নিরাপদে বসবাস করার জন্য আশ্বস্ত করা এবং পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়া হিন্দু উদ্বাস্তুদের দেশে ফিরে আসার অনুরোধ করা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ১৯৫০ সালে একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বাক্ষরিত হয় "নেহেরু-লিয়াকত প্যাক্ট"।[98] একইভাবে এর দ্বারাও তারা চেয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের নিজেদের দেশে বহাল রাখতে। নেহেরু তাদের এই আসাটাকে ভীষণভাবে প্রতিহত করতে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে তাদের এই দেশে চলে আসাকে নিরুৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন।[99] তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা নিজেরাই এদেশে চলে আসার প্রতি বিমুখ হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এ দেশে আসা মাত্র উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে সরকার ঝাঁপিয়ে পড়েনি। বরং কোনোরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উল্টে মুখ ফিরিয়ে থেকে তাদের বোঝানো হয়েছিল এদেশে এসে তারা বেশি কিছু আশা করতে পারবে না, তাই এদেশে মুসলিমদের ফেলে যাওয়া ঘর-বাড়ি, জমি-সম্পত্তি ইত্যাদি উদ্বাস্তুদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্র সরকারের কৃপণতা দেখা যায়। এদেশে বাংলার ক্ষেত্রে মুসলিমদের সম্পত্তি রক্ষায় কেন্দ্র সরকার যে তৎপরতা দেখিয়েছিল ওই দেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্পত্তির রক্ষায় সে দেশের সরকার কতটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল।[100] এভাবে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকার দরুণ বাংলা উদ্বাস্তুদের প্রতি ঠিক সময়ে ঠিক পরিকল্পনা রূপায়ন করতে ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অপারগ থেকে যায় কেন্দ্র সরকার। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যাবে, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন উদ্বাস্তুর সাক্ষাৎকারে তাদের কেউ কেউ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিভিন্ন সময় পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন। কেউ সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য, কেউ সেখানে আবার বসবাস করার জন্য, কেউ গিয়েছিলেন পরিবারের অন্যান্যদের আনার জন্য কিন্তু তারা পুনরায় এ দেশে চলে আসেন।[101] আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী বা পরিচিত কাউকে না পেয়ে থাকার মত পরিবেশ না পেয়ে আবারও তাদের চলে আসতে হয়। এমতাবস্থায় যখন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায়, তখন ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে পরিকল্পনা করা বা

---

[96] Ibid, p. 144.

[97] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১৩৮।

[98] *Agreement Between The Govt.s of India and Pakistan Regarding Seurity and Rights of Minorities* (Nehru-Liaquat Agreement) New Delhi, 8 April 1950, pp. 243-248.

[99] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১৩৮।

[100] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ. ১৮-১৯; অমলেন্দু দে, *প্রসঙ্গ: অনুপ্রবেশ,* পৃ. ৩।

[101] সাক্ষাৎকারঃ-দয়াল বিশ্বাস, বয়স-৭৭, পেশা-কৃষক, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তাঃ-২৭/১১/২০২২; সাক্ষাৎকারঃ-মন্মথা বালা, বয়স-৬৬, পেশা-গৃহিণী, মালদা, তারিখঃ-১৪/১১/২০২২; সাক্ষাৎকার:-নির্মল সরকার, বয়স-৭৪, পেশা-কর্মহীন, তারাপুর কলোনী, মুর্শিদাবাদ তারিখ:- ২৭/১১/২০২২।

কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য যেটুকু অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল করা হয় তা নিতান্তই অপর্যাপ্ত।[102]

তৃতীয়ত: প্রথম দিকে বাংলায় আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের ব্যাপারটি প্রযোজ্য বলে কেন্দ্র সরকার মনে করে নি, তাদেরকে শুধুমাত্র সাময়িকভাবে ত্রাণের আওতায় আনা হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রকের নির্দেশে রাজ্য সরকার মুর্শিদাবাদসহ অন্যান্য জেলাগুলিতে উদ্বাস্তু শিবির গড়ে তুলতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ মুর্শিদাবাদের সারগাছি নিকটবর্তী মানকরা ক্যাম্প ও জিয়াগঞ্জের আমাইপাড়া, কাঁদির মহালন্দি, বহরমপুর-হরিহরপাড়ার সংযোগস্থল কুমড়োদহ ক্যাম্প ইত্যাদি।[103] পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল উদ্বাস্তু আগমন একটি স্থায়ী প্রক্রিয়া হতে চলেছে এবং এই দেশে আগতদের ও ফিরে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই তখন ত্রাণকার্যের পাশাপাশি পুনর্বাসনের ব্যাপারটিও বিবেচনা করা হল।

চতুর্থত: তৎকালীন রাজ্য সরকার নব্য প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থায় রাজ্য পরিচালনা, আইন শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক সুস্থিরতার প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উদ্বাস্তুদের দেখেছিলেন। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থায় মানবিক বিবেচনার বিষয়টি তাদের কাছে ততটা গুরুত্ব পায়নি। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ তার সংক্ষিপ্ত সময়ের সরকারে অপশন দিয়ে চলে আসা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের দিয়ে বিভিন্ন সরকারি শূন্য পদ পূরণের চেষ্টার মাধ্যমে তাদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিলে উদ্বাস্তু অনুরাগের দোষে তার সরকার অল্প দিনের মধ্যেই পড়ে যায়।[104] ফলে ডক্টর বিধান রায়ের ইচ্ছে থাকলেও দল এবং সরকারের কথা মাথায় রেখে উদ্বাস্তু সমস্যাকে মোকাবিলা করেন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। প্রতিদিন জমতে থাকা অগণিত উদ্বাস্তু মানুষের ঢল থেকে কলকাতা শহরকে মুক্ত করতে, তাদেরকে কলকাতার বাইরে খালি জমিতে সরানো হচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে উদ্বাস্তু কলোনিতে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এর পাশাপাশি আসাম, ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে একত্র হয়ে ডক্টর রায় বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করতে থাকেন অন্যান্য রাজ্যের জনমানবহীন প্রান্তরে কিংবা পতিত জমিতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। কেন্দ্র সরকারকে তিনি চিঠি দিতে থাকেন রাজ্য সরকারগুলিকে চাপ দেওয়ার জন্য যাতে তারা এই রাজ্যেগুলিতে আগত উদ্বাস্তুদের গ্রহণে সম্মত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রক থেকে প্রকাশিত *'The Story of Rehabilitation'*-এ দাবি করা হয় যে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গৃহীত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুনর্বাসনের প্রকল্পে পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা যথেষ্ট পরিমাণে উদ্যম

---

[102] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১৩৮।

[103] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১২-ই মে ১৯৪৮।

[104] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১৩৯।

দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা রাজ্যের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিলেন।[105] তবে রনজিৎ রায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই দাবিকে 'বিরাট মিথ্যা' বলে অভিহিত করেছেন। এর সপক্ষে তিনি যুক্তি দেখান, তৎকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে খতিয়ে দেখা হয় যে সেই অঞ্চলে এমনিতেই জনঘনত্ব এত বেশি ছিল যে সেখানে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হত না।[106] উপরন্তু অন্য রাজ্যের এই সমস্ত ক্যাম্প বা কলোনিগুলিতে চাষযোগ্য জমির অভাব ছিল, যে জমিগুলো ছিল সেগুলো ছিল নিম্নমানের, নীচু জায়গায়, ভালো জলসেচ বা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল না, শহরের সীমা থেকে দূরে, সামাজিক মেলামেশার সুযোগ ছিল না, কোনো কোনো অঞ্চল ছিল ম্যালেরিয়াপ্রবণ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের আঁতুরঘর।[107]

পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যাবে, ভিন-রাজ্যের ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা ছিল স্থানীয় লোকেরা তাদের পছন্দ করছিল না। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি ভিন্ন হওয়ায় তাদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের মেলামেশায় অসুবিধা হচ্ছিল। যার ফলে অনেক উদ্বাস্তু সেই ক্যাম্প বা কলোনিগুলিতে থাকতে পারেননি।[108] তারা সেখান থেকে পালিয়ে অন্যত্র তাদের জীবনধারন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত যে স্থানগুলি মনে করেছেন সেখানে এসে আশ্রয়গ্রহণ করেন। এভাবে তারা মালদা, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে নিজেদের চেষ্টায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন; কেউ বা আত্মীয়র সহায়তায়, কেউ বা নিজের চেষ্টায়, কেউ বা পূর্বে আগত উদ্বাস্তুদের হাত ধরে।[109] সাক্ষাৎকারেও এমন সব তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এমনকি সমুদ্রপারের ম্যালেরিয়াপ্রবণ সুদূর আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কয়েকশো বাঙালি উদ্বাস্তু পরিবারের কলোনি করার পরিকল্পনা করা হয়।[110] এছাড়াও পূর্ববঙ্গের কৃষকদের বিশেষ করে নিম্নশ্রেণির কৃষকদের পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্য প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয়,[111] যা পরবর্তীকালে ভীষণভাবে সমালোচিত হয়।

---

[105] U Bhaskar Rao, *The Story of Rehabilitation*, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1967, p. 147.

[106] রনজিৎ রায়, *ধ্বংসের পথে,* পৃ. ৯২।

[107] Dr. Biraja Sankar Guha, Memoir, p. 4.

[108] সাক্ষাৎকারঃ- নিরঞ্জন মিত্র, বয়স-৮৬, পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, মহালন্দি কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২১/১১/২০২২; সাক্ষাৎকারঃ- তরুণ কুমার ভাওয়াল, বয়স-৬৩, পেশা-শিক্ষক (কাতলাপারা পূর্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়) মহলন্দী কলোনী, মুর্শিদাবাদ তারিখঃ-২১/১১/২০২২।

[109] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal, Ministry of Supply and Rehabilitation, Department of Rehabilitation, Govt. of India, March 1976, p. 6.

[110] Saroj Chakrabarty, *With Dr. B. C. Roy and other Chief Ministers*, p. 111.

[111] Pran Nath Luthra, *Rehabilitation,* (Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India: New Delhi, 1972), p. 25.

বাংলায় সরকারি ক্যাম্প, কলোনিগুলি থেকে উদ্বাস্তুরা কেন ছেড়ে চলে যাচ্ছে তার কারণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালে নিউ দিল্লিতে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। রিপোর্ট থেকে এটা স্পষ্ট যে, পেশাগত দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে যেখানে তাদের পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে সেটি তাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, উদ্বাস্তুরা বেশিরভাগ কৃষক হলেও তাদের যে জমি দেয়া হয়েছে তা কৃষিকাজের পক্ষে অনুপযুক্ত, কোথাও বা জমি কৃষিকাজের সামান্য উপযুক্ত হলেও সেখান থেকে বাজার বা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিতান্তই খারাপ, সবজি চাষে অনভিজ্ঞ শিক্ষিত শহুরে বাবুদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুপযুক্ত মাটিতে, অনুন্নত জলসেচ ব্যবস্থায় উদ্যান পালনে উৎসাহিত করা ইত্যাদি।[112] মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন উদ্বাস্তুদের মুখেও এই ধরনের অভিযোগের কথা উঠে আসে। মুর্শিদাবাদে মহলন্দী ক্যাম্পের বারুজীবি উদ্বাস্তুরা অভিযোগ করেন তাদের জন্য বরাদ্দ পান চাষের জমিতে পান চাষ করা অসম্ভব ছিল। যার কারণে তারা ধান চাষ করতে বাধ্য হন, যে কাজে তারা মোটেও অভিজ্ঞ ছিলেন না।[113]

অন্যদিকে কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, উদ্বাস্তুরা নিজের ইচ্ছায় বেশি সংখ্যায় যেখানে যেখানে পুনর্বাসিত হয়েছিল সেখানে তারা নিজেদের কর্মসংস্থানের ও জীবনধারণের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। রিপোর্টে উল্লেখ পাওয়া যায় তারা বড় বড় শহরের কাছাকাছি, নিকটবর্তী কারখানা, বাণিজ্যিক ফার্মে বা অফিসে লাভজনক কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। সামান্য ব্যবসা বা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা থেকে শুরু করে তারা নিজেদের ভাগ্যের চাকা গড়িয়ে ছিল। যেগুলি অধিকাংশই ছিল কলকাতার আশেপাশের এলাকায়, যেমন ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরে।[114] পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখা যাবে এই একই কারণে মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলার বহু উদ্বাস্তু এই দুই জেলায় আসার পূর্বে তাদের অন্যান্য কোন সরকারি ক্যাম্প, কলোনি, দণ্ডকারণ্যগুলিতে থাকার কথা বলেছেন, যেখানে তারা থাকতে পারেননি। এমন অনেক উদ্বাস্তু আছেন যারা প্রথমে অন্যান্য জেলায় আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু উপযুক্ত মনে করেন নি ও পরে নিজেদের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় রসদ পেয়ে এই দুই জেলায় বসতি স্থাপন করেন। নিজের ভিটে-মাটি পরিত্যাগ করে সর্বস্বান্ত হয়ে চলে আসা উদ্বাস্তুদের দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল এদেশের সরকারের এত নির্মম, অমানবিক মুখ তাদের দিতে পারে শুধু বঞ্চনা। মালদার দয়ালচন্দ্র মজুমদার কথায় "আমি উদ্বাস্তু হিসেবে বলছি সকল উদ্বাস্তুর মনের কথা আমাদের কেউ চায় না, ওই দেশও না এই দেশও না। আমরা যেখানেই থাকি, যেখানেই যাই সেখানেই পাই শুধু অবহেলা।"[115]

---

[112] *Report of the Committee of Ministers for the Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal*, Govt. of India Press, Calcutta, 1954, pp. 9-10, cited জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১৪৫-১৪৬।

[113] সাক্ষাৎকারঃ- নিরঞ্জন মিত্র।

[114] *Report of the Committee of Ministers*, 1954, p. 12.

[115] সাক্ষাৎকারঃ- দয়ালচন্দ্র মজুমদার, বয়স-৬৫, পেশা-বিড়ি শ্রমিক, মালদা, তারিখঃ- ২০/০২/২০২৩।

পঞ্চমত: ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে সরকার-প্রতিষ্ঠিত উদ্বাস্তু কলোনি ও জবরদখল কলোনিগুলির প্রতি সরকারের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ফলে এই দুই ধরনের কলোনির উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলিও পৃথক ছিল। সরকার প্রতিষ্ঠিত কলোনিগুলি অবশ্যই বেশি গুরুত্ব পেত। পরবর্তীতকালে এই দৃষ্টিভঙ্গের পরিবর্তন ঘটে ও একই ভাবে উভয় প্রকার কলোনির উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়।[116]

ষষ্ঠত: উদ্বাস্তু ত্রাণ শিবিরগুলিতে আশ্রয়প্রার্থী মানুষদের পুনর্বাসনযোগ্য ও পুনর্বাসন-অযোগ্য এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছিল। সরকার শুধুমাত্র পুনর্বাসন-অযোগ্যদের নিয়ে পার্মানেন্ট লিয়াবিলিটি ক্যাম্প বা পি.এল. ক্যাম্পগুলিকে বহাল রেখে বাকি ত্রাণ শিবিরগুলিকে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই পুনর্বাসন-অযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন মহিলা ও শিশু যাদেরকে দেখাশোনার জন্য কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছিলেন না। নিজেদের পরিবার পরিচালনা করার মতো ক্ষমতা তাদের ছিল না বলে সরকার তাদের পুনর্বাসন পাওয়ার উপযুক্ত মনে করিনি। কাজেই সরকার তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে দীর্ঘদিন এই শিবিরগুলোতে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

উপসংহারঃ

দেশভাগ তথা পশ্চিমবঙ্গের বুকে উদ্বাস্তু আগমনের প্রধান কারণ ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। এই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যা দুই দেশের আপামর জনগণকে ছেয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এতে যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, এই দুই দেশের সাধারণ জনগণের তাদের সেবিষয়ে কোনো হাত ছিল না। তারা ছিলেন বলির পাঁঠা মাত্র। যাদের অঙ্গুলিহেলনে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দুই দেশের আকাশ বাতাসকে ছেয়ে ফেলেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি তেমন হয়নি। যখন কোনো ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা কোনো রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছায় তখন তার মধ্যে সর্বত্র সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এমনকি সে তার অধীনস্থ প্রজাদের দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনের নিয়ন্ত্রক হয়ে চায়। কিন্তু আমজনতা যখনই এর বিরুদ্ধে কথা বলতে যায় তখনই তাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে তাদের পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়। ভারত ছাড়ার আগে ইংরেজরা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের যে বীজটি রোপন করে গিয়েছিল পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকার সেই বীজ থেকে উৎপন্ন চারা গাছটিকে সযত্নে লালনপালন করেছিল।

১৯৪৭-এর দেশভাগে পৃথিবীর বুকে পাকিস্তানের নামক যে রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করেছিল তা জন্মলগ্ন থেকেই ছিল বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ। হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত দুটি খন্ড মিলে গঠিত একটি তাত্ত্বিক দেশের সত্ত্বা কেবলমাত্র সম্প্রদায়গত সাদৃশ্যতার সমীকরণে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। 'পোকায় কাটা' পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যেকার ব্যবধান শুধু ভৌগোলিক দূরত্বই ছিল না; এই ব্যবধান ছিল সংস্কৃতি, রুচি, মানসিকতা, ভাষা,

[116] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, p.11; File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p.4; সুভাস বিশ্বাস, *দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যাঃ প্রসঙ্গ নদীয়া জেলা,* (কলকাতাঃ সোম পাবলিশিং, ২০১৬), পৃ. ১৩১।

পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, জীবন ধারণের ধরণ ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই। একই সঙ্গে স্বাধীনতা প্রাপ্ত এই দুটি দেশ যখন পূর্ণশক্তিতে নিজেদের আত্ম নিয়োজিত করেছে, তখন বাঙালি সত্তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে পূর্ব-বাংলাকে পশ্চিম-পাকিস্তান তার উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তোলার খেলায় মেতে উঠেছিল। বাঙালি সংস্কৃতিকে ভুলুণ্ঠিত করে পশ্চিম-পাকিস্তানের সংবিধান, উর্দু ভাষা ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ বাঙালির উপরে জোর করে আরোপ করার চেষ্টা করছিল। পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের মনোভাব ছিল,- যেমনভাবে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘু হিন্দু এবং শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা সমূলে উৎখাত হয়ে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি ভাবে পূর্ব-পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গ থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুরা দেশত্যাগ করে মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত পাকিস্তানকে খালি করে দিক। বিশেষ করে যখন সেখানে ভারতের বিহার থেকে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত চাকুরীজীবীরা, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলিমরা পূর্ববঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন সংখ্যালঘুদের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের অনমনীয় এবং সহানুভূতিহীন মনোভাব তার আসল চেহারা প্রকাশ করে। শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক সমস্ত রকম নির্যাতনে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের একেবারে জেরবার করে তুলেছিল। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দুই দেশের মধ্যে সংঘটিত হওয়া বিভিন্ন চুক্তি বলবৎ করা, বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও সর্বোপরি প্রশাসনিক কাজকর্ম ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের জনগন সরকারের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার আগেই সেই অতিপরিচিত পুরোনো 'কায়েমিস্বার্থের সাম্প্রদায়িকতা'র অস্ত্রে সুকৌশলে দেশের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তান সরকার। দেশভাগের পর কয়েক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের বুকে চলতে থাকে উদ্বাস্তু আগমন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে তাদেরকেও বাংলাদেশের মানুষ ইংরেজের মতোই ছুড়ে ফেলেছিল। কিন্তু বইতে থাকে অন্তহীন চোরা স্রোত। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের একটি বড় অংশ অত্যাচার বা নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এর পাশাপাশি অনেকেই চলে এসেছিলেন আক্রমণ বা অত্যাচারের ভয় বা আতঙ্ক থেকে, গুজবে প্রভাবিত হয়ে। অনেকে এসেছিলেন পেশার প্রয়োজনে। এক শ্রেণির উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন ব্যক্তিগত পছন্দ থেকে নিজেকে লোকেদের মধ্যে থাকার আশায়, চাকরির সুবাদে। আর একটি অংশ এসেছিলেন সাম্প্রদায়িক অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে বাঁচতে। শেষের দুটি ক্ষেত্রে আগত উদ্বাস্তুরা আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ভালো ভালো প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং এরা প্রথম দিকেই দেশত্যাগ করে এসেছিলেন।

তবে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে এসেই তাদের দুর্দিন শেষ হয়ে যায়নি। ভারতের দুই প্রদেশের উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্র সরকার মনোভাব, এবং সর্বোপরি বাংলার উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারের মনোভাবে তাদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি বা সহমর্মিতা প্রকাশ পায়নি। উদ্বাস্তুরা কোন পরিস্থিতিতে নিজেদের দেশ, আজন্ম পরিচিত পরিবেশ, পূর্ব-পুরুষের ভিটেমাটি ও সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে এই দেশে বন্যার ঢেউ-এর মতো চলে আসছে তা একবার বিবেচনার প্রয়োজন মনে করেনি সরকার। উদ্বাস্তু সমস্যা পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম নয় আগেও ইউরোপীয় দেশগুলিতে ঘটতে দেখা গেছে। Liisa H. Malkki রিফিউজি শিবিরগুলিকে অন্যভাবে দেখার

কথা বলেছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে রিফিউজি শিবিরগুলিকে শুধুমাত্র 'Place of Refuge' হিসেবে দেখলে হবে না, সেগুলিকে অন্যদের দেখা উচিত 'Devise of Power' হিসেবে। Malkki তার যুক্তির স্বপক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ Post-war ইউরোপের প্রসঙ্গ টেনে উল্লেখ করেছেন যে, ইউরোপের দেশগুলিতে উদ্বাস্তুদের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ উদ্বাস্তুদের বিষয়টি শুধুমাত্র মানবিকতার নজরেই দেখে নি বরং তাদেরকে দেখা হয়েছিল সামরিক সমস্যা রূপেও। তিনি আরও বলেছেন, উদ্বাস্তু শিবিরগুলিকে পরিদর্শনযোগ্য করে, প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক দক্ষতায় শিবিরের বন্দীদের শ্রেণিকরণ, পৃথকীকরণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সহানুভূতিশীল মন নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো তো দূরে থাক, পশ্চিমবঙ্গে নিত্যদিন জমতে থাকা উদ্বাস্তুদের জটলা সরিয়ে ফেলতে সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। স্বাধীন 'শিশু-রাষ্ট্র' ভারত, দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে সর্বহারা, ভিঠে-ছাড়া বাঙালি উদ্বাস্তুদের সম্মানজনক কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা, নির্ভরতার প্রতি সুবিচার করতে পারে নি।

বর্তমান অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনাগুলি থেকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পর্যায়ভিত্তিক আগমন, দুই দেশের সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কারণ ও সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী অধ্যায়ে বর্তমান গবেষণার মুখ্য ক্ষেত্র মালদা ও মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ উদ্বাসন; মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমন ও তাদের জীবন-সংগ্রাম।

ভূমিকাঃ

সিরিল র‍্যাডক্লিফের অস্ত্রোপচারে আংশিকভাবে মালদা ও সম্পূর্ণভাবে মুর্শিদাবাদ এই দুই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার ভারতীয় ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্তি প্রথম থেকেই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ, যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আগেই বর্ণিত হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে সংঘটিত হওয়া দেশভাগ যে উদ্বাস্তু সমস্যার সূত্রপাত ঘটায় সেই সংক্রান্ত আলোচনায় সীমান্তের নিকটবর্তী ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের এই দুই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে আকর্ষণের দাবিদার। সীমান্তের 'ভুল প্রান্তে' থেকে যাওয়া মানুষগুলির একটা অংশ দেশত্যাগ করে, সীমানা পেরিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের এই দুই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাকে তাদের ভবিষ্যতের ঠিকানা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন যা সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক একটি ঘটনা। 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' দাঙ্গার পর নোয়াখালী-ত্রিপুরার দাঙ্গা, বিহারের দাঙ্গা, দেশভাগের ঘটনা, হায়দ্রাবাদের ঘটনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে কিভাবে দুই দেশের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা আগের অধ্যায়ের আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে। এর মধ্যে আবার পাকিস্তানে অর্থের অবমূল্যায়ন না ঘটানোর সিদ্ধান্তে অটল থাকা এবং সেই থেকে আসন্ন আর্থিক সংকটের দিক থেকে নজর ঘোরানোর জন্য খুলনা-বরিশালের দাঙ্গাকে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। এসবের ফলে দুই দেশে দাঙ্গা ও পাল্টা-দাঙ্গা, শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় পরিণত হয়েছিল।[1] এই পরিবেশে উভয় দেশের সংখ্যালঘু জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল, যার ফলে দেশভাগের পর উভয় দেশের সংখ্যালঘু জনগণের মধ্যে দেশ ছাড়ার একটা প্রবণতা শুরু হয়। হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ নিয়ে আগের অধ্যায়ের সবিস্তার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কাহিনীতে তার প্রতিফলন কতটা বা কিভাবে ঘটেছিল; বর্তমান অধ্যায়ে তার পর্যালোচনা করা হবে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের সাধারণ কারণগুলি ছাড়াও এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষত্ব ছিল কিনা তাও অনুসন্ধান করা হবে। অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে পূর্ববঙ্গ থেকে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন দশকে আসা উদ্বাস্তুদের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হবে। তৃতীয় এবং সর্বশেষ অংশে উদ্বাস্তু জীবনের চালচিত্র, তাদের জীবন-সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হবে।

৩.১ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কারণঃ

পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশত্যাগের কারণ হিসেবে অন্যান্য কারণগুলি সরিয়ে রেখে প্রথমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাকিস্তান প্রশাসনের ভূমিকা ও সংখ্যাগুরু কর্তৃক অত্যাচারের কথায় আসা যাক। বর্তমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষায় পূর্ববঙ্গ থেকে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের সাক্ষাৎকারে অত্যাচারী হিসেবে তারা স্পষ্টভাবে তিনটি শ্রেণির দিকে আঙুল তুলেছিলেন; অত্যাচারের ক্রম অনুসারে তারা হল প্রথমেই পশ্চিম-পাকিস্তান প্রশাসন, দুই: বিহারি-মুসলিম ও

[1] *Census of India 1951,* vol-vi, West Bengal, Sikkim and Chandenagore, Part-IA Report, p. 86.

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে যাওয়া অত্যাচারিত সংখ্যালঘু মুসলিম, তিন: পূর্ববঙ্গবাসী পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের উগ্র সমর্থক। যদিও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অভিযুক্তরা উভয়েই পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের উগ্র সমর্থক ছিলেন তবুও তাদের এই জন্য আলাদা করা হল যে, তারা প্রাথমিকভাবে তাদের অবস্থানগত কারণে দুটি ভিন্ন দেশের নাগরিক ছিলেন। এছাড়া তাদের পৃথক রাখার আরো একটি কারণ হল, চতুর্থ একটি পক্ষ থেকে তাদের আলাদা করা, যে পক্ষ নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে এই দুই জেলায় আসা উদ্বাস্তুদের কোনো অভিযোগ ছিল না; বরং তারা দাবি করেন, এই শ্রেণির কাছ থেকে বিভিন্ন সময় তারা বিভিন্ন সাহায্য পেয়েছিলেন। সেই চতুর্থ পক্ষটি হল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পরিচিত স্থানীয় মুসলিমরা। পূর্ব-পাকিস্তান প্রশাসন কোনো দিনই ওদেশের সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তার মনোভাব সুনিশ্চিত করতে পারে নি এবং তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাও অর্জন করতে পারে নি।[2] বরং তারা নিজেদের দেশের সংখ্যালঘুদের দেশ থেকে উৎখাত করতে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির বাস্তবায়নের অসারতা, আইনসভায় কিছু সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী বৈষম্যমূলক আইন পাশ করা[3], নোয়াখালী-ত্রিপুরার দাঙ্গাকারীদের ছেড়ে দেওয়া, সংখ্যালঘু নির্যাতনে অভিযুক্ত মুসলিমদের ছেড়ে দেওয়া[4], পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগ এবং মিথ্যা অভিযোগে সংখ্যালঘুদের ফাঁসানো ও গ্রেপ্তার করা[5] ইত্যাদি পরোক্ষভাবে প্রশাসনিক অত্যাচারের পাশাপাশি তারা সরাসরি সংখ্যালঘু অত্যাচারের পথে হাঁটতেও দ্বিধা বোধ করেনি। আর যারা এই পাকিস্তান সরকারের অন্ধ ভক্ত, অন্ধ সমর্থক ছিল তারা তাদের উগ্র-জাতীয়তাবোধ থেকে পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের মুখে পাকিস্তান সরকারের প্রতি ক্ষোভ ঝরে পড়তে দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন তাদের ওপর কিভাবে অত্যাচার হয়েছিল তা সাক্ষাৎকারে অনেকেই বলেছেন। তারা বলেছেন পশ্চিম-পাকিস্তান মিলিটারির গুলিতে কিভাবে সামনে থেকে ঝাঁঝরা হয়ে যেত স্বধর্মীরা।[6] এমনকি নিরাপত্তা দেওয়ার নাম করে পাটের গুদামে আশ্রয় দিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিরা হিন্দুদের কুপিয়ে খুন করত ও নালায় ভাসিয়ে দিত বলে জানা যায়।[7] বাড়ি-ঘর, গ্রাম, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পোস্ট অফিস ইত্যাদি সরকারি কার্যালয়গুলি পোড়ানো, মেয়েদের অপহরণ করে তুলে নিয়ে যাওয়া, খুন, ডাকাতি, শস্য চুরি করা, গরু-বাছুর চুরি করে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির অভিযোগ পাওয়া যায়।[8] তাদের সবার বক্তব্যেই একটি বিষয় এক, তা হল পশ্চিম-পাকিস্তানি মিলিটারির বিরুদ্ধে তাদের ঠিকরে পড়া ক্ষোভ। একটা দেশের প্রশাসন হিসেবে দেশের নাগরিকদের প্রতি তারা যে নক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছিল তা

---

[2] অমলেন্দু দে, *প্রসঙ্গ: অনুপ্রবেশ,* (কলকাতা, বর্ণপরিচয়, ১৯৯৩), পৃ. ৩-৬; প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ২১-২৪।

[3] অমলেন্দু দে, *প্রসঙ্গ,* পৃ.৩।

[4] Home Political CR, IDM 1192/49 Dec. 1950, West Bengal State Archive, Kolkata.

[5] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ. ২১-২৪।

[6] সাক্ষাৎকার:-নির্মল সরকার, বয়স-৭৪, পেশা-কর্মহীন, তারাপুর কলোনী, মুর্শিদাবাদ তারিখ:- ২৭/১১/২০২২।

[7] সাক্ষাৎকার:-রাধাশ্যাম নন্দী, বয়স-৮১, পেশা-অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বই লেখক ও যাত্রাশিল্পী, মহলন্দী কলোনী, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২১/১১/২০২২।

[8] সাক্ষাৎকারঃ-নীলকান্ত বিশ্বাস, বয়স-৭৬, পেশা-কৃষক ও ঘরামি, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখ:- ২৭/১১/২০২২।

ইতিহাসে বিরল, এবং তারা প্রত্যেকে একবাক্যে তা স্বীকার করেছেন। পূর্ব-পাকিস্তানে সমস্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাবি ও সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার জন্য ওদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা দ্বিধাহীন চিত্তে তাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ওদেশের হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য স্পষ্ট ভাবে তাদের কাঠগোঁড়ায় তুলেছেন।[9]

পাকিস্তানি সামরিক এবং আধা-সামরিক বাহিনী, রাজাকার, আলবদর, আলতামাশ, শান্তি কমিটি ইত্যাদির হাড়হিম করা অত্যাচারের ঘটনা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তারা কিভাবে সরকারের অস্ত্রশস্ত্র এবং সরকারি গাড়িগুলি ব্যবহার করে গ্রামে গ্রামে অপারেশনে যেত এবং অত্যাচার করত তাও বর্ণনা করা হয়েছে।[10] তাদের এই সব অত্যাচার চরমে পৌঁছায় ষাটের দশকের শেষের দিকে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে। এমনকি শরণার্থীরা যখন দেশ ছেড়ে নৌকা করে ভারতের পথে রওনা দিত তখনও রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি দলগুলি তাদের আসার পথে নানা রকম অত্যাচার করত। জনৈক ডঃ কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস শৈশবে তার পরিবারের হাত ধরে যখন পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে এ দেশে আসছিলেন তখন হঠাৎ দেখেন তাদের নৌকায় মুখে চোঙ লাগিয়ে ঘোষণা করা হল,- "যত ব্যাটাছেলে আছে সবাই নদীর পাড়ে নেমে হিন্দু, মুসলমান আলাদা লাইন করে দাঁড়াও" অনেক পুরুষ মানুষ প্রাণের ভয়ে শাড়ি পরে নৌকায় থেকে গিয়েছিল। ডক্টর বিশ্বাস বলেন,- "আমাদের দুজন নারী বেশ ধারণকারী পুরুষকে গুলি করে মেরে লাশ দুটো জলে ফেলে দিল। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছি, "মা, ওরা আমাদেরও গুলি করে মারবে"। নদী দিয়ে প্রচুর লাশ ভেসে যাচ্ছে। অথচ নৌকার মাঝি-মোল্লারা সব মুসলমান। হিন্দুরা সব দেশ ছেড়েছে। নদীগুলোতে শুধু নৌকা আর নৌকা। কখনো আবার তারা নৌকাকে উদ্দেশ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাত। বেশ কয়েকজন করে মারা যেত। নৌকা ছেড়ে তারা সুন্দরবনের আশেপাশে জঙ্গলগুলিতে পালিয়ে যেত প্রাণের ভয়ে অথচ সেই জঙ্গলেও আছে বাঘের ভয়, কি করুন দৃশ্য"।[11] এরকম ভাবেই রাজাকারের হাত থেকে বাঁচতে ডক্টর কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাসের নৌকার সহযাত্রীরা ঝাঁপিয়ে সুন্দরবনের নেমে গা ঢাকা দিলে ডঃ বিশ্বাস ও তার দিদি, তার পরিবারের লোকজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পূর্ব-পাকিস্তানে রাজাকার ও অন্যান্য দলগুলির অত্যাচারে ষাটের দশকে এইভাবে প্রচুর সংখ্যালঘু দেশত্যাগ করে এসেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, মুর্শিদাবাদ জেলায় সাময়িকভাবে আশ্রয়গ্রহণকারী এক উদ্বাস্তু একই সাক্ষ্য দেন,- "আমরা এমন এক সময় পূর্ব-পাকিস্তান ছাড়তে বাধ্য হই যখন পাক আর্মি তাদের অনুচর বা সহযোগী রাজাকারদের নিয়ে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি থেকে উৎখাত করার জন্য গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সংখ্যালঘুদের দোকানপাট লুটপাট করছে, বাড়ি-ঘর শ্মশান করে ফেলছে, সশস্ত্র রাজাকারেরা এখানে সেখানে মানুষ হত্যা করছে, তখন চরম অসহায়ের মত ভারতের দিকে যাত্রা করলাম"।[12]

---

[9] সাক্ষাৎকারঃ-নির্মল সরকার, মুর্শিদাবাদ। "পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার হিন্দু-মুসলিম বিভাজন তৈরি করল"।

[10] দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৯৮-১০১।

[11] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* (উত্তর ২৪ পরগণাঃ লিপিকা বিশ্বাস, ২০১২), পৃ. ৬৪।

[12] তদেব, পৃ. ৭৭।

এই সমস্ত ঘটনাগুলো থেকে অনুধাবন করা যায়, সমালোচনা বা পরাজয় কোনোটারই ভয় পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের ছিল না। তারা ভাবতেই পারেনি তাদের উগ্র দমন নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং দেশ স্বাধীন করবে। কারণ, পাকিস্তান সরকার এ ব্যাপারে বিহার থেকে যাওয়া সংখ্যালঘু মুসলিমদের পাশে পেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া সংখ্যালঘু মুসলিমরাও অনেকে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে এই দুই জেলায় আসা উদ্বাস্তুরা 'পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার' এর পরে সব থেকে বেশি যাদের দোষারোপ করেছেন তারা হলেন এদেশের সংখ্যালঘু মুসলিমদের বিশেষত বিহারিদের। পূর্ববঙ্গবাসীর কাছে 'বিহারি' নামটাই আতংকের জন্য যথেষ্ট ছিল। 'বিহারিরা আসছে' শুনলে সবাই যে যার জিনিসপত্র ফেলে এদিক-ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে যে যেদিকে পারতেন ছুটতে শুরু করতেন।[13] আগের অধ্যায়ে দেখা গেছে, নোয়াখালী দাঙ্গার পর বিহারের দাঙ্গায় বিহারের অত্যাচারিত সংখ্যালঘু মুসলিমদের একটা বিরাট অংশ পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিল।[14] পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার ওপর একটি গবেষণাতেও হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগের একটি কারণ হিসেবে "বিহারি নামের অবাঙালি মোহাজেরদের ভূমিকা" বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মোল্লা আমির হোসেন, তার গবেষণায় বলেন, উর্দুভাষী বিহারিরা সরকার ও মুসলিম লীগের বিশেষ আনুকূল্য লাভ করেছিল এবং সরকারি ছত্রছায়ায় খুলনার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানায় অগ্রাধিকার পেয়েছিল। এরা সংখ্যায় নেহাত কম ছিল না। ১৯৫১ পর্যন্ত সমগ্র খুলনার জনসংখ্যার ৩.৭৩ শতাংশ ছিল শুধু বিহার থেকে আসা মুসলমানরা। এরা ভারতের বিভিন্ন দাঙ্গায় সেখানকার হিন্দুদের দ্বারা লুণ্ঠনের শিকার হয়ে ও উৎখাত হয়ে ওদেশে গিয়েছিল। তাই বাঙালিদের প্রতি বিহারিরা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠে ও নির্যাতনমূলক মনোভাব ও কর্মকাণ্ডে তারা নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিল। এরা বাঙালি-চেতনা বিরোধী সকল কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। এদের কলোনিগুলি সন্ত্রাসী কাজের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। হিন্দুদের বাড়ি-ঘর দখল, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ কোনো কিছুই বাদ ছিল না।[15] সরকার ও বিহারিদের এই যোগসাজশের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মালদার উদ্বাস্তু বাসুদেব বিশ্বাসের কথাতেও, তিনি বলেন- "পাকিস্তান সরকার বিহারিদের জন্য কলোনি করা হবে বলে ভালো ভালো জায়গাগুলো পূর্ববঙ্গের লোকেদের এমনকি পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া বাঙালি মুসলিম উদ্বাস্তুদেরও দিত না"।[16] এর পিছনে যে মনোভাবটা কাজ করছিল জনৈক উদ্বাস্তুর কথায় তার ব্যাখ্যা, "তারা Refugee হয়ে ভারত ছেড়ে ওই দেশে গেছে, তাহলে হিন্দুরা কেন পাকিস্তানে থাকবে?"।[17] তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল,- 'মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান ও হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্তান'। যদিও পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দুরাও এমনটা মনে করতেন, যা তাদের দেশত্যাগের একটি অন্যতম কারণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মালদা জেলার রবীন্দ্রনাথ সরকারকে দেশত্যাগের কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন,

---

[13] তদেব, পৃ. ৩৬।

[14] দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৮৩।

[15] মোল্লা আমীর হসেন, *হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ (১৯৪৭-৭১): খুলনা,* (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৮), পৃ. ৮১-৮২। মোল্লা আমির হোসেন, যিনি বাংলদেশের খুলনা গভমেন্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ।

[16] সাক্ষাৎকারঃ- বাসুদেব বিশ্বাস, বয়স-৬৮, পেশা-মুদি, মালদা, তারিখঃ- ২৭/১১/২০২২।

[17] সাক্ষাৎকারঃ নিরঞ্জন মিত্র, বয়স-৮৬, পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, মহালন্দি কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ- ২১/১১/২০২২।

"এটা হিন্দুস্থান ওটা পাকিস্তান, তাই হিন্দুস্থানে যেতেই হবে"।[18] নাকাতানি তার গবেষণায় নদীয়া গ্রামের উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কারণে ভিত্তিতে যে কয়টি ভাগে ভাগ করেছিলেন তার মধ্যে একটি ভাগ ছিল 'two countries for two communities"।[19] দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত খবরেও যশোরে বিহারি আশ্রয়প্রার্থীদের উপরে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দোষারোপ করেতে শোনা যায়,[20] যা বর্তমান গবেষণার সাক্ষাৎকারলব্ধ তথ্যকে সমর্থন করে।

এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিন্দুদের দ্বারা উৎখাত, বিতাড়িত হয়ে যাওয়া মুসলমানরা পূর্ববঙ্গে গিয়ে হিন্দুদের বাড়ি-ঘর দখল করতে থাকে[21] এবং বিহারিদের হাত শক্ত করতে থাকে। গবেষক সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তার "দেশভাগ-দেশত্যাগ" বইয়ে তুলে ধরেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা কিভাবে হিন্দুদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৫০ সালের পূর্ব-বাংলার খুলনায় জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে কলকাতায় তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। হাওড়া ও অন্যান্য কয়েকটি জেলার গ্রামাঞ্চলেও মুসলমানদের উপর হামলা ও আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটতে থাকে। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে মুর্শিদাবাদের মুসলমানরা আক্রান্ত হয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে মুসলমান বস্তিতে বোমা ছোড়া হয়, আগুন লাগানো হয়, লুটপাট হয় বেশ কিছু দোকান। সেখানে একজন ছুরিকাহত হন, ৫৬ জন আহত হন। কলকাতার মুসলমান বস্তিগুলোর ওপর এই রকম একতরফাভাবে আক্রমণ চলতেই থাকে। হাওড়ায় বহু মুসলমান বস্তি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও বিক্ষিপ্তভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করা হয়। ধুবুলিয়ায় হিন্দু উদ্বাস্তুরা একের পর এক মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ, হাজার হাজার মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। নদীয়া, চব্বিশ পরগনার সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে অসংখ্য মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গে চলে যান।[22] এই সমস্ত উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গে গিয়ে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি থেকে উৎখাত করে নিজেদের পুনর্বাসিত করেন। স্বাভাবিকভাবেই যা বিহারিদের প্রতিশোধ স্পৃহার জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। এই হিংসা-প্রতিহিংসার পালাবদলে অনুঘটকের কাজ করে সংবাদমাধ্যমগুলি। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিস্থিতিকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা বেঁধে হিন্দু নির্যাতিত হয়, পশ্চিমবঙ্গে তার খবর পৌঁছালে হিন্দুদের দ্বারা মুসলমান আক্রান্ত হয়, সেই খবর আবার পূর্ববঙ্গে পৌঁছালে ব্যাপক হারে হিন্দু নিপীড়ন শুরু হয়। এইভাবে দুই বাংলায় প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে।[23] এই সমস্ত দাঙ্গা এবং পাল্টা-দাঙ্গার খবর কিভাবে সংবাদ মাধ্যমগুলি

---

[18] সাক্ষাৎকার:-রবীন্দ্রনাথ সরকার, বয়স-৮৩, পেশা-কৃষক ও বামকর্মী, মালদা, তারিখঃ-২০/১০/২০২২।

[19] Tetsuya Nakatani, 'Away from Home: The Movement and Settlement of Refugees from East Pakistan in West Bengal, India', *Journal of the Japanees Association for South Asian Studies-12*, 2000, pp. 87-89.

[20] দৈনিক বসুমতি পত্রিক, ১২-ই মার্চ ১৯৪৮।

[21] সাক্ষাৎকারঃ-যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নওদাপাড়া, মুর্শিদাবাদ, cited মননকুমার মণ্ডল (সম্পাঃ), বাংলার পার্টিশন-কথাঃ উত্তর প্রজন্মের খোঁজ, প্রথম খণ্ড, (কলকাতাঃ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০২০), পৃ. ১৫৮।

[22] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, *দেশভাগ-দেশত্যাগ,* (কলকাতাঃ অনুষ্টুপ, ২০২০), পৃ. ৮১-৮২।

[23] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৭০।

অতিরঞ্জিত করে পরিবেশন করত তা পূর্ব অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[24] এই পটভূমিকে সুন্দর ভাবে কাজে লাগায় বিহারি-মুসলিমরা। পাশাপাশি তারা পেয়ে যায় সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন।

পাকিস্তান সরকার ও বিহারি-মুসলিমরা মিলিতভাবে পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের মগজ ধোলাই করত। 'মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত দেশ পাকিস্তান' থেকে 'মালাউন (হিন্দু) হটাও' রব তুলেছিল। পূর্ববঙ্গের আদিনিবাসী এই সকল মুসলিমরা কেউ উৎসাহিত হয়ে, কেউ কেউ আবার ভয়ে তাদের হুকুম তামিল করলেও এই দুই পক্ষের আক্রমনের ধরণে পার্থক্য ছিল। কারণ মালদা মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুরা ওদেশে মানুষ খুন, সামনে থেকে গুলি করে মারা, ছোরা চালিয়ে দেওয়া, কুপিয়ে ফেলা, অগ্নিসংযোগ, ঘরের মেয়ে-বউদের অপহরণ, ধর্ষণ ইত্যাদি নৃশংস রক্তাক্ত ঘটনাগুলির জন্য পাকিস্তান মিলিটারি, প্যারামিলিটারি, রাজাকার বাহিনী ও বিহারিদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের আদিনিবাসী মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ ছিল, ফসল চুরি করা, গরুর বাছুর চুরি করে নিয়ে যাওয়া, হিন্দু মেয়েদের কটূক্তি করা, বিয়ে করতে চাওয়া, বাড়িঘর লুট করা, ইত্যাদি।[25] পৈশাচিক কর্মকাণ্ডগুলি পূর্ববঙ্গের মুসলিমরা করেছে বলে তারা কোথাও দাবি করেননি। এ থেকে একটা বিষয়ে পরিষ্কার পশ্চিম-পাকিস্তান প্রশাসন কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে পূর্ববঙ্গ থেকে সংখ্যালঘুদের তাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওদেশের বাঙালি-মুসলিমদের মধ্যে ততটা উগ্রতা বা মরিয়া মনোভাব ছিল না। তাদের এই আচরণের জন্য এই দুই জেলার উদ্বাস্তুরা বলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই এগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে করত, আবার অনেকে করতে প্রাণের ভয়ে, দেশে টিকে থাকতে, বেঁচে থাকতে।[26] তারা অনেকটা প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বতনের হুকুম-তামিল করত। তাই তাদের আক্রমণের ঝাঁঝ পশ্চিম-পাকিস্তান প্রশাসনের সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি। অবশ্য উগ্র-জাতীয়তাবাদী পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার সমর্থকদের কথা আলাদা। এই দুই জেলার উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গে তাদের অত্যাচারের ঘটনার বর্ণনার পাশাপাশি এ কথাও বলেছেন যে পশ্চিম-পাকিস্তানি সরকার গরীব মুসলিমদের লেলিয়ে দিত,[27] তারা তাদের ভুল বোঝাত।

পূর্ববঙ্গে পড়ে থাকা নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেশত্যাগের কাহিনীটি একটু অন্যরকম। তারাই ছিলেন পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। দেশ ভাগের অব্যবহিত পরেই তারা দেশত্যাগ করে চলে আসেন নি। নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও ওই দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের মতোই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের

---

[24] দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১০৩-১০৭।

[25] "পূর্ববঙ্গের অরিজিনাল মুসলিমরা রায়টের জন্য দায়ী ছিল না, বিহারের যারা চাকরি করতো তারাই ওদেশে গিয়ে রায়টিং কেসগুলো করে। আর দিয়াড় (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে যাওয়া মুসলিমরা অভিযোগ, ইত্যাদি করলে ঝামেলা হয়"- সাক্ষাৎকারঃ- নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ। "এদের থেকে গিয়ে ওই দেশে কারা যেন আগুন দেয়"- সাক্ষাৎকারঃ-দয়াল বিশ্বাস, বয়স-৭৭, পেশা-কৃষক, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তাঃ-২৭/১১/২০২২। "এদেশ থেকে গিয়ে লোকেরা বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল"- সাক্ষাৎকারঃ- সুষমা জর্দার, বয়স-৬৩, পেশা-গৃহিনী, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ- ২৭/১১/২০২২।

[26] সাক্ষাৎকারঃ-নির্মল সরকার, মুর্শিদাবাদ; নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* পৃ. ২৯।

[27] "পশ্চিম পাকিস্তান মিলিটারি তাদের বলত, হিন্দুদের বাড়িতে লুট কর"- সাক্ষাৎকারঃ-নির্মল সরকার, মুর্শিদাবাদ।

সমীহের চোখে দেখত এবং দূরত্ব বজায় রাখত। তবে তাদের মনে এই নিয়ে কিছু আক্ষেপও ছিল। সাক্ষাৎকারে বহু নমঃশূদ্র মানুষের মুখে এই আক্ষেপ ঝরে পড়ে। রাধাশ্যাম নন্দীর কথায় "এই যে তুমি এলে তোমাকে দরজা খুলে বসতে না দিয়ে গাছের তলায় বসিয়ে ভাঙা কাপে চা খেতে দিলে তোমার মনে তিক্ততার সৃষ্টি হত না? ওই দেশে আমাদের ব্রাহ্মণ সমাজ আমাদের এরকম করে রেখেছিল। তাদের ছিল টাকার গরম এবং জাতের গরম। মৌলবাদী হিন্দু-মুসলিমরা ভেদাভেদের জন্য দায়ী"।[28] একই কথা প্রতিধ্বনিত হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের অবসরপ্রাপ্তকর্মী, নিরঞ্জন মিত্রের সাক্ষাৎকারে। তার কথায় "কুলিন বাঙাল সমাজপতি, সবার সঙ্গে বিয়ে হত না। কুলীনরা না খেলে আর কেউ খাবে না। হুকার পাইপ আলাদা ছিল"।[29]

ক্রমে সামাজে প্রচলিত ধর্ম-বর্ণের বিভাজন এই গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সমাজের এই বিভেদমূলক আচরণের সুযোগ নেয় বহিরাগত, ভিন্ন সংস্কৃতির, (বিহারি) অত্যাচারিত মুসলিম সম্প্রদায়। একদিকে বিহারি-মুসলিমরা স্থানীয় মুসলিমদের বোঝাতে থাকে হিন্দুরা এদেশ ছেড়ে চলে গেলে তাদেরই লাভ। তারা বোঝাতে থাকে হিন্দুরা চলে গেলে তাদের জমি-সম্পত্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ, পদমর্যাদা সবই করায়ত্ত করা যাবে। অন্যদিকে এর পাশাপাশি তারা আবার নমঃশূদ্র ও নিচুবর্ণের হিন্দুদের মন্ত্রণা দিতে থাকে যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অধীনে তাদের জীবনে জুটেছে শুধু লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর অপমান।[30] সামাজিক এই বিভেদকে কাজে লাগিয়ে আখের গোছাতে থাকে বিহারি-মুসলিম ও পূর্ব-পাকিস্তান মিলিটারি। পূর্ববঙ্গকে তারা পশ্চিম-পাকিস্তানের আদলে তার একটি উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এজন্য নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে তারা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উস্কানি দিতে থাকে। ফলস্বরূপ যোগেন মন্ডল, পিয়ার ঠাকুর ইত্যাদি নেতাদের ছত্রছায়ায় সংঘটিত হতে থাকে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা।[31] স্থানীয় মুসলিম ও নিম্নবর্ণের হিন্দু, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে 'ম্লেচ্ছ' নামে পরিচিত এই দুই শ্রেণিকে পাকিস্তান সরকার ও বিহারি-মুসলিমরা প্রতিনিয়ত প্ররোচিত করতে থাকে, যার ফল প্রকাশ পায় তাদের ব্যবহারের আকস্মিক পরিবর্তন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, গরিব মুসলিম প্রজার হিন্দু জমিদারকে সমস্থানীয় জ্ঞান করে সম্বোধন, বাড়ির অন্দরে প্রবেশ করা, বনেদি হিন্দু বাড়ির মেয়েদের বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেওয়া, বা পুকুর ঘাটে কটূক্তি করা ইত্যাদি যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।[32] পাশাপাশি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের তাতে বাধা না দেওয়া, তাদের সঙ্গে বা অব্যবহিত পরে এদেশে চলে না আসা[33] বা তাদের নিস্পৃহ থাকার ঘটনা ইত্যাদি।

---

[28] সাক্ষাৎকার:-রাধাশ্যাম নন্দী, মুর্শিদাবাদ।

[29] সাক্ষাৎকার:-নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ।

[30] সাক্ষাৎকার:-রাধাশ্যাম নন্দী, মুর্শিদাবাদ।

[31] আলতাফ পারভেজ, *যোগেন মন্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ,* (ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০২২) পৃ. ৫৫-৬৩; সাক্ষাৎকার:-নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ।

[32] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* পৃ. ৩২-৩৩।

[33] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন: বাংলা ও ভারত, ১৯৪৭-৬৭, আবু জাফর অনূদিত,* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০), পৃ. ১২৩-২৯।

তবে স্বল্পকালের মধ্যেই তারা বিহারিদের এই চক্রান্ত বুঝতে পারে। কারণ বিহারিরা ছিল সমগ্র বাঙালি জাতি ও বাঙালি সংস্কৃতির বিরোধী। এরা শুধু হিন্দু বিদ্বেষীই ছিল না বাঙালি বিদ্বেষীও ছিল। মোল্লা আমির হোসেন তার গবেষণায় দেখিয়েছেন "বাঙালি মুসলমানদেরকে এরা খাঁটি মুসলমান মনে করত না তাদেরকে হিন্দু ঘেঁষা মনে করত। যদিও এরা নিজেরা ধর্মকর্মে মনোযোগী ছিল না, তাদের চোখমুখে ঘাতকের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হত। শুধু হিন্দু নিধন নয়, বাঙালি নিধনও তাদের লক্ষ্যে ছিল। যার কারনে ১৯৬৪ সালে এরা দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি করে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যাগুলিতে এরা জড়িত ছিল"। লেখক এর কথায় "পাক বাহিনী বিহারিদেরকে বিভিন্ন বধ্যভূমিতে জহ্লাদের দায়িত্বে নিয়োগ করে এবং তারা সে দায়িত্ব যথারীতি পালন করে"।[34] উদাহরণস্বরূপ, 'রাজাকারের রাজা'র নিয়োজিত জল্লাদের কথা আগের অধ্যায়েই পেশ করা হয়েছে। এই পাকবাহিনী ও উর্দুভাষী বিহারিদের চক্রান্ত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতেই পূর্ববঙ্গের স্থানীয় মুসলিমরা মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যান। একইভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বুঝতে পারেন তারা চক্রান্তের শিকার। সাক্ষাৎকার দানকারী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কিছু উদ্বাস্তুর কথায়, "পরে অবশ্য তারা বুঝতে পারে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে তাদের অবস্থান কোনো উন্নতি হয়নি। তখন তাদের অবস্থা ছিল ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো"।[35] স্বজাতিরা দেশত্যাগ করেছে, চারপাশে সংখ্যাগুরু মুসলিমদের রবরবা, দেশে আর্থিক অনটন; এই পরিস্থিতিতে তারাও ওই দেশ ছেড়ে পাড়ি দেয় পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশ্যে।

তবে সব স্থানীয় মুসলিমরাই যে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করেছিল এমনটা মোটেও নয়। বেশিরভাগই তাদের সমর্থন করেন নি। কারণ ইংরেজরা চলে গেলেও পশ্চিম-পাকিস্তান সরকারের স্বেচ্ছাচারী শাসন, তাদের পরাধীন ভারতে ইংরেজ আমলের দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছিল। যারা পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করেনি তারা নানাভাবে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সাহায্য করেছেন এবং তারা চেয়েছেন তারা যেন সে দেশে থেকে যান এবং মিলিত প্রচেষ্টায় তারা হিন্দু-মুসলমানের স্বাধীন বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং এনেওছিলেন।[36] মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুরা, ওদেশে থাকাকালীন মুসলিমের কাছ থেকে যে আক্রমণ ও অত্যাচার এসেছিল একথা যেমন বলেছেন, তেমনি আবার তাদের পরিচিত স্থানীয় মুসলিমদের কাছ থেকে তারা বিভিন্ন উপকার বা সাহায্য পেয়েছিলেন একথাও স্বীকার করেছেন। এরা ছিলেন পূর্বোল্লিখিত সেই চতুর্থ পক্ষ। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সাক্ষাৎকারে তারা যেভাবে এদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন তা উল্লেখ না করলে তাদের সাক্ষাৎকারের প্রতি অবিচার করা হয়। তাদের বক্তব্য অনুসারে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যখন পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার, ওদেশে বসবাসকারী তাদের সমর্থক এবং এই দেশ থেকে বিতাড়িত মুসলিমদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ তখন স্থানীয় মুসলিমরা তাদের পাশে থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কেবলমাত্র একজন দুজন নয়, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনী ও উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকার সাক্ষাৎকার দানকারী উদ্বাস্তু নরনারীরা বর্ণ-শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকলের কণ্ঠে এই একই

---

[34] মোল্লা আমীর হসেন, *হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ (১৯৪৭-৭১): খুলনা,* (ঢাকা: সুবর্ণ, ২০১৮), পৃ. ২৯৫।

[35] সাক্ষাৎকার:-রাধাশ্যাম নন্দী, মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকার:-নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ।

[36] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* পৃ. ২৪ ও ৭৭।

কথা প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায় বারবার। পাকিস্তান সরকার, রাজাকার বাহিনী, ও বিহারি-মুসলিমদের অত্যাচারে দেশ ছাড়ার সময় স্থানীয় পূর্বপরিচিত বাঙালি মুসলিমদের সহায়তার কাহিনী অনেকেরই মুখে শোনা যায়। এই সমস্ত মানুষেরা রাজাকারের অত্যাচার থেকে প্রতিবেশী হিন্দুদের রক্ষা করতে নিজেদের ঘরে তাদের আশ্রয় দিয়ে, গোপনে পালাতে সাহায্য করেছিলেন। আশ্রয় দেওয়া, পরিচয় গোপন করা, ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখার পাশাপাশি পানাহারের ব্যবস্থা করা, চাল, ডাল, আলু, তেল, বাসনপত্র, জ্বালানি ইত্যাদি দিয়ে রান্না করে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া এই সব নানা প্রকারের সাহায্য তারা স্থানীয় বা পরিচিত বাঙালি মুসলিমদের থেকে পেয়েছেন তা অকুণ্ঠে স্বীকার করেছেন।[37] শুধু তাই নয় যারা দেশত্যাগী, তাদের পথের খাবার রসদ, চাল-ডাল-আলু ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছে।[38] এমনকি প্রাণে বাঁচানোর উদাহরণও পাওয়া যায়।[39]

মালদার বাসুদেব বিশ্বাস জানান "পাকিস্তান সরকার হিন্দু-মুসলিম উভয়ের উপরে অত্যাচার করত, বিহারিরা হিন্দুদের আইডেন্টিফাই করে অত্যাচার করত। গ্রামের মুসলিমরা ভালো ছিল, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল। আমাদের উপর অত্যাচার হলে মুসলিমরা বাধা দেয়, কিন্তু রুখতে পারেনি। গ্রাম ছেড়ে কিছুদিন লুকিয়ে ছিলাম তখন সঙ্গে ছাতু ছিল, কিন্তু জল ছিল না। মুসলিম বাড়িতেই আশ্রয় পেলাম; বাটি, জল পেয়ে খেলাম"।[40] এই জেলার অপর এক উদ্বাস্তু, জগবন্ধু বালা নিজস্ব অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে বলেন মিলিটারিরা ওনাদের ভিটে পুড়িয়ে দিয়ে আক্রমণ করলে প্রতিবেশী মুসলিম তাদেরকে সপরিবার নিজের বাড়িতেই আশ্রয় দেন। আশ্রয় দেওয়ার জন্য সেই মুসলিম পরিবারের উপর চাপ আসে। "তখন আজিমুদ্দিন 'মামা' (এতটাই ভালো সম্পর্ক ছিল যে মামা বলে সম্বোধন করতেন) আমাদের পোড়া ভিটেতেই আমাদের সঙ্গে এসে থাকলেন"।[41]

এই বক্তব্যের সমর্থনে ওপর একটি গবেষণায় প্রাপ্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায় তা হল, এপার বাংলার নদীয়া জেলার করিমপুরের উদ্বাস্তু মুসলমানেরা নাকি পূর্ববঙ্গে গিয়ে বিলমারিয়া গ্রামে হিন্দুদের বাড়ি দখল করে থাকার চেষ্টা করে। তখন পার্শ্ববর্তী বাথানবাড়ি গ্রামের মুসলমানেরা বিল মারিয়া গ্রামের হিন্দুদের বাড়ি পাহারা দিত। হিন্দুদের বিরুদ্ধে অত্যাচার রুখতে পদক্ষেপ হিসেবে তারা ভারত থেকে আগত মুসলমানদের গ্রামে ঢোকার রাস্তা থেকে সরাসরি জেলা সদরের শরণার্থী ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিত। তারা বলত

---

[37] সাক্ষাৎকার:- কালোন সরকার, বয়স-৬৭, পেশা- গৃহিণী, মালদা, তারিখঃ-১৫/১০/২০২২; সাক্ষাৎকার:- শান্তি রঞ্জন সরকার, বয়স-৭০, পেশা-চাষী, প্রাইভেট টিউটর, সক্রিয় বাম কর্মী ছিলেন, মালদা; সাক্ষাৎকার:- প্রকাশ সরকার, বয়স-৭০, কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ১৪/১০/২০২২। সাক্ষাৎকার:- নির্মল সরকার, মুর্শিদাবাদ।

[38] সাক্ষাৎকারঃ- শান্তি রঞ্জন রায়, বয়স-৭২, পেশা- কৃষক ও সক্রিয় বাম কর্মী, মালদা, তারিখঃ- ১৫/১০/২০২২; সাক্ষাৎকার:- কালোন সরকার, মালদা; সাক্ষাৎকার:- প্রকাশ সরকার, মালদা; সাক্ষাৎকার:- নির্মল সরকার, মুর্শিদাবাদ।

[39] উদাহরণস্বরূপ মালদায় আগত চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের দাবি, "বাবাকে আক্রমনের হাত থেকে বাঁচায় (মুসলিম প্রতিবেশী) কালু মন্ডল"। সাক্ষাৎকার: -চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, বয়স-৬৭, পেশা- কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ১৫/১০/২০২২।

[40] সাক্ষাৎকারঃ- বাসুদেব বিশ্বাস, বয়স-৬৮, পেশা-মুদি, মালদা, তারিখঃ- ২৭/১১/২০২২।

[41] সাক্ষাৎকারঃ- জগবন্ধু বালা, বয়স- ৮৩, কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ১৫/১০/২০২২।

"হিন্দু মুসলমানরা একসঙ্গে গ্রামে থাকবে, কোনো ভয় নেই।"[42] অবশ্য এজন্য পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলিমরা, যারা পাকিস্তান প্রশাসনকে সমর্থন করেননি তাদের অনেক খেসারতও দিতে হয়।[43] মুর্শিদাবাদ জেলার এক উদ্বাস্তু জানান,- "পাকিস্তান সরকার হিন্দু, মুসলিম উভয়ের ওপর অত্যাচার চালাত"।[44]

মুর্শিদাবাদে সাময়িকভাবে আশ্রয় নেওয়া অপর এক উদ্বাস্তু তার আত্মজীবনীতে নিজস্ব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি ও তার গ্রামের লোকজন যখন গৃহত্যাগ করে পশ্চিম দিকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তখন পথে ছিল রাজাকার ও বিহারিদের আক্রমণের ভয়। সেইসময় আক্রমণ হতে পারে এমন একটি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় জনৈক ভদ্রলোক লেখকের সামনে এসে কোনো ভূমিকা না করেই বলেন 'আমাকে যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলুন। ওই সোজা পথে গেলে বিপদ হতে পারে।" যশোর ব্যাঙ্কে কর্মরত সেই মুসলিম ভদ্রলোককে চিনতে পেরে তাকে বিশ্বাস করে লেখকদের দলটি তার বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ভদ্রলোক লেখকদের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনাদের বিপদের আশঙ্কা নেই। আপনারা থাকুন, আমি একটু নামাজ পড়ে আসছি"। যদিও সেই ভদ্রলোক নামাজ পড়ে ফিরে আসেননি, কিন্তু পরিবর্তে একটি কিশোর ছেলে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে তাদের ঘরের সামনের বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে পাহারা দিতে লাগলো। লেখক এর বর্ণনায়,- "বৃষ্টিতে তার পা দুটো ভিজে যাচ্ছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। সে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল "আপনাদের ভয়ের কিছু নেই, আমাদের কাছে ৭০টা রাইফেল আছে"। ভোর হওয়া পর্যন্ত সে বারান্দার সিড়িতে পা রেখেই বসেছিল। পরের দিন খবর পাওয়া যায় দুটি রাজাকার গুলিতে মারা পড়েছে"। লেখক পরে জানতে পারেন যারা তাদের সেই রাতে মৌলবী সাহেবের বাড়িতে নিরাপত্তা দিয়েছিল তারা মুক্তিফৌজের একটি অগ্রগামী দল। মুক্তিযুদ্ধ ফেরত বাহিনীর কাছ থেকে তারা গোলাবারুদ পায়। তারা এই ভাবেই শরণার্থীদের সাহায্য করে থাকে এবং বিচ্ছিন্নভাবে রাজাকার বাহিনী ও শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে তৎপরতা চালায়।[45]

ঠিক যেন এই ঘটনার প্রতিফলন মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তু কালোন সরকারের কথাগুলি,- "একজন আক্রমণ করত, অন্যজন সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করত।"[46] এ প্রসঙ্গে তিনি পরিচিত মুসলিম ওসমান, খলিল, মুন্না এদের নাম করে বলেন স্থানীয় মুসলিমরা খুব সাহায্য করেছিল। একই কথা শোনা যায় মালদার শান্তিরঞ্জন সরকারের কথায় "ওদেশে হিন্দুদের ওপর যেমন আঘাত, অত্যাচার এসেছে; তেমনই মুসলিমরা যতদূর সম্ভব তাদের সহযোগিতাও করেছে", যার কারণে তিনি পুনরায় পূর্ববঙ্গে ফিরে গেলে তার মুসলিম

[42] সাক্ষাৎকারঃ- যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[43] মালদার উদ্বাস্তু জগবন্ধু বালার অভিজ্ঞতা "আওয়ামী লীগ না ছাড়ার জন্য পাকিস্তান মিলিটারি এক মুসলিমকে গুলি করে মারে"। সাক্ষাৎকারঃ- জগবন্ধু বালা।

[44] সাক্ষাৎকারঃ বাসুদেব বিশ্বাস, মালদা।

[45] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* পৃ. ৩৬-৩৮।

[46] সাক্ষাৎকারঃ-কালোন সরকার, মালদা।

বন্ধুরা তাকে দেখে বলে,- "আয় ভাই, ঘরে আয়"।[47] মুর্শিদাবাদের রাধাশ্যাম নন্দীর চোখে দেখা অভিজ্ঞতা; "হিন্দুবিদ্বেষী বহিরাগত মুসলমান হিন্দুদের ঘর পোড়াচ্ছে, স্থানীয় মুসলমানরা আগুন নেভানোর জন্য জল ঢালছে।"[48]

একই দেশে বসবাসকারী হিন্দুদের চলে আসাটা পূর্ববঙ্গের স্থানীয় বাঙালি মুসলিমরা কখনোই চাননি, যার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে। দেশত্যাগ করে যাতে হিন্দু প্রতিবেশীরা না যায় তার জন্য আশ্বাস দিয়েছে।[49] মুর্শিদাবাদের তারাপুর কলোনির নীলকান্ত বিশ্বাসের মুখে শোনা যায় তাদের অভিন্ন হৃদয় মুসলিম পরিবার বা মুসলিম বন্ধুর বিচ্ছেদ কাতর সম্ভাষণ, বা মালদার শান্তি রঞ্জন রায়ের মুখে শোনা যায় দেশ ছেড়ে না যাওয়ার জন্য তার মুসলিম প্রতিবেশীর অশ্রু সজল আর্তি।[50] এই প্রসঙ্গে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে পরিবেশিত তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যায়; যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে পড়ে যাওয়া দিনাজপুরের এক মুসলিম আরদালি তার বাবুর (লেখক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়) দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় ট্রেনের দরজার সামনে বুকে করাঘাত করে অঝোরে কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে "হায় আমার সায়েব চলে গেল, আর আসবে না। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না সায়েব। এই দুঃখ কোথায় রাখবো?"।[51]

অনেকের মুখে এও শোনা যায় যে, তারা যখন পুনরায় বাংলাদেশে ফিরে যান, তখন তাদের জমিজমা, গরু বাছুর যা কিছু স্থানীয় মুসলমানদের কাছে রেখে এসেছিলেন সেগুলি তারা সযত্নে তাদের হাতে তুলে দেয়।[52] মুর্শিদাবাদের শংকর বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা, "জমি-সম্পত্তি যেমনভাবে রেখে এসেছিলাম তেমনই ফিরে পাই"।[53] শুধু তাই নয় এই জেলার নির্মল সরকার, তার এক পরিচিত পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়ে মুসলিম পরিবারের কাছে রেখে আসা সোনার লকেট ফিরে পেয়েছেন এমন কথাও জানান।[54] আবার অনেকে যারা ওদেশে ফিরে গিয়েছিলেন তারা বলেছেন; আগেকার মুসলিম প্রতিবেশীরা অনেকে আবার নিজে থেকেই নিজেদের চাল-ডাল-আলু ইত্যাদি দিয়ে তাদের বলেন যে "তোমরা খাও, বেঁচে থাকো"।[55]

---

[47] সাক্ষাৎকারঃ-শান্তি রঞ্জন সরকার, মালদা।

[48] সাক্ষাৎকার:-রাধাশ্যাম নন্দী, মুর্শিদাবাদ।

[49] সাক্ষাৎকার:-শঙ্কর বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[50] সাক্ষাৎকার:-শান্তিরঞ্জন রায়, বয়স-৭২, পেশা-কৃষক ও সক্রিয় বামকর্মী, মালদা, তারিখঃ-১৫/১০/২০২২; সাক্ষাৎকারঃ-নীলকান্ত বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[51] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* পৃ. ১৮।

[52] সাক্ষাৎকারঃ-দয়াল বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকারঃ-নীলকান্ত বিশ্বাস, বয়স-৭৬, পেশা-কৃষক ও ঘরামি, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখ:- ২৭/১১/২০২২; সাক্ষাৎকারঃ-প্রকাশ সরকার, মালদা। মালদার কালোন সরকারের পরিবারকে তার প্রতিবেশীরা আসার সময় বাধা দিয়েছিলেন, তাদের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার সিদ্ধান্ত শুনে তারা বলেছিলেন, "তোমরা যাও, তোমাদের জমিজমায় আমরা হাত দেব না"। সাক্ষাৎকারঃ-কালোন সরকার, মালদা

[53] সাক্ষাৎকারঃ- শংকর বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[54] তিনি নিজেও তার পরিচিত মুসলিম প্রতিবেশীর কাছে গরু-বাছুর ইত্যাদি রেখে আসার কথা বলেছিলেন, যা ওদেশে ফিরে যাওয়ার পর তারা ফেরত পেয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারঃ-নির্মল সরদার, মুর্শিদাবাদ।

[55] সাক্ষাৎকারঃ-লক্ষণ সরকার, বয়স-৬৬, পেশা-কৃষক, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২৭/১১/২০২২।

সংখ্যাগুরুর অত্যাচার ও প্রশাসনিক নির্যাতন ছাড়াও পূর্ব অধ্যায়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশত্যাগের যে বিবিধ কারণগুলো আলোচনা করা হয়েছে; সেগুলো মালদা মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ গুজব, দেখাদেখি চলে আসা, সংখ্যাগুরুদের আচরণগত পরিবর্তন, পেশার প্রয়োজন ইত্যাদি। এসবের পাশাপাশি এই দুই জেলায় আসা উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষ বিশেষ কিছু অন্যান্য কারণও ছিল। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র-সমীক্ষায় সাক্ষাৎকার থেকে বিস্তারিত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মালদা মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তু জনগণকে তাদের আসার কারণের ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হল;-

দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী ও মুসলিমদের অত্যাচারে দেশত্যাগকারী: বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে এই শ্রেণির উদ্বাস্তুদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তাদের অভিমত নিয়ে বিষদে আলোচনা করা হয়েছে। অগ্নি-সংযোগ, জোর করে বাড়ি দখল করা, পাকিস্তান মিলিটারির সামনে থেকে গুলিতে মৃত ইত্যাদি এনারা নিজেদের চোখে দেখেছেন।[56] যারা দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন মূলত পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার, পাকিস্তানি মিলিটারি, প্যারা মিলিটারি বাহিনী, রাজাকার, আল বদর ইত্যাদি পূর্বোক্ত দলগুলি, বিহারি ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া কিছু মুসলিমরা এর জন্য দায়ী। সেই দাঙ্গার সঙ্গে স্থানীয় মুসলিমদের প্রত্যেকেই জড়িত ছিল না।[57] দেশত্যাগের কারণ প্রসঙ্গে তারা সাক্ষ্য দেন, "এদেশ থেকে গিয়ে লোকেরা বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের গ্রামে একটা বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। গরু বাঁধা থাকলে খুলে নিয়ে চলে যেত, মেয়ে থাকলে নিয়ে চলে যেত"।[58] কেউ বলেন, "পাটের গুদামে আশ্রয় দেওয়ার নাম করে কেটে নালায় ভাসিয়ে দিত। লোকেরা বুঝতে পারত না, ভাবত পুলিশে জায়গা দিচ্ছে নিশ্চয়ই বাঁচব"।[59] আবার কেউ বলেন, "দেশ ছাড়ার কারণ সরকার বিপক্ষে গেছে। মিলিটারি ও বিহারি কলোনি ও বিহারি ক্যাম্পের লোকেরা মিলে পাঁচ-সাতটা গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে। ওখানকার মুসলিমদের সঙ্গে কোনোদিন গন্ডগোল হয়নি, ডাক্তার হওয়ার সুবাদে সবার বাড়ি যাওয়া আসা ছিল"।[60] এই শ্রেণির উদ্বাস্তুরা সংখ্যায় মালদায় দ্বিতীয় স্থানে ও মুর্শিদাবাদে চতুর্থ স্থানে।

পরোক্ষভাবে দাঙ্গার সাক্ষ্য বহনকারী ও আক্রমণের ভয়ে দেশত্যাগকারী: এরা নিজেরা কখনো দাঙ্গার মুখোমুখি হননি, নিজের চোখে কাওকে খুন বা জখম হতে দেখেননি, রক্তারক্তি, মারামারি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ আক্রমণের মুখে পড়েননি। এরা কেউ কেউ আত্মীয়র মুখে বা পাশের গ্রামে দাঙ্গার কথা শুনেছেন। কেউ আবার ওপার

---

[56] সাক্ষাৎকারঃ- ফ্যালানি বিশ্বাস, বয়স-৭১, পেশা- গৃহিনী, মালদা, তারিখঃ-১৫/১০/২০২২।

[57] "হিন্দু প্রধান গ্রাম ছিল, মুসলিমরাও অল্প কিছু ছিল; কিন্তু তারা কোন অসুবিধা করেনি"- সাক্ষাৎকারঃ-নীলকান্ত বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ। "আমাদের বাড়ির চারপাশে হিন্দুরাই থাকবে, মুসলিমরা থাকত অনেক দূরে। মুসলিম পরিবারগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল গ্রামের মুসলিমরা কোন ক্ষতি করেনি"- সাক্ষাৎকারঃ- সুষমা জর্দার, বয়স-৬৩, পেশা-গৃহিনী, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২৭/১১/২০২২।

[58] সাক্ষাৎকারঃ- সুষমা জর্দার, মুর্শিদাবাদ।

[59] সাক্ষাৎকার:-রাধাশ্যাম নন্দী, মুর্শিদাবাদ।

[60] সাক্ষাৎকারঃ- শঙ্কর বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

বাংলা থেকে পরে আসা লোকেদের মুখে দাঙ্গার কথা শুনেছেন। এরা আক্রমণের ভয়ে দেশত্যাগকারী।[61] উদাহরণস্বরূপ মালদার অভিমন্যু টিকাদার বলেন, "আমি নিজের চোখে দাঙ্গা হতে দেখিনি, তবে শুনেছি অমুক জায়গাতে দাঙ্গা হয়েছে।"[62] একইভাবে এই জেলার শান্তিরঞ্জন রায় বলেন, "পশ্চিমা-বিহারিরা ঢাকায় প্রচুর দাঙ্গা করত শুনেছি, বহু লোক একসাথে চলে আসছিল, তাই ভয়ে আমরাও চলে আসি"।[63] এদের সংখ্যাটা মালদায় তৃতীয় স্থানে এবং মুর্শিদাবাদে "দুর্ভিক্ষ ও আর্থিক দুরবস্থার কারণে দেশত্যাগকারী" উদ্বাস্তুদের সঙ্গে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে।

নারীর সম্মানহানি ও আত্মমর্যাদায় আঘাত পেয়ে দেশত্যাগকারী: আগের অধ্যায়ে এদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরা তাদের পরিবারের নারীদের সম্মানে আঘাত লাগলে অথবা সমাজে তাদের পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সম্মানে আঘাত লাগলে, অধস্তন বা অন্যান্য মুসলিমদের আচরণগত পার্থক্যে দেশত্যাগ করেন।[64] এই শ্রেণির লোকেদের মুখে শোনা যায়;- "মুসলিমরা ওই দেশে মুনিষের কাজ করত, পরে তারাই আবার গলা তুলে কথা বলত।"[65] কেউ বলেন,- "যারা বাড়িতে খেটে খেত তাদের চোখরাঙানিতে দেশছাড়া"।[66] আবার কারো কথায়,- "যারা আমাদের হয়ে খাটত, খেত তারাই আমাদের উপরে কথা বলত", "কম বয়সি মেয়েদের নিয়ে চলে যেত" ইত্যাদি।[67] এসবের পাশাপাশি কিছু আচরণগত ব্যাপারও ছিল যেমন,- "ওদেশের মুসলিমরা ভালো চোখে দেখত না"।[68] এই উদ্বাস্তুরা মূলত ১৯৪৭-এর পরপরই চলে আসেন। ইনাদের মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রে চাকরিতে অপশন দিয়ে এই দেশে চলে আসার উপায় ছিল বলে আসাটা আরো সহজ হয়। মালদায় এই শ্রেণির উদ্বাস্তুরা সংখ্যায় "পদ্মা-ভাঙনে দেশত্যাগকারী" উদ্বাস্তুদের সঙ্গে যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থানে এবং মুর্শিদাবাদে চতুর্থ স্থানে।

প্রভাবিত হয়ে ও দেখাদেখি চলে আসা উদ্বাস্তু: এই দুই জেলায় বসবাসকারী উদ্বাস্তুর সিংহভাগই এই শ্রেণিতে পড়েন। এরা দেখাদেখি, লোক-মুখে শুনে, অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেশ ছাড়েন।[69] তাদের বেশিরভাগের মুখেই শোনা যায়,- "সবাই এসেছে, তাই আমরা এসেছি"।[70] সাক্ষাৎকারে এই দুই জেলায় বসবাসকারী বহু উদ্বাস্তুর মুখে শোনা যায় তৎকালীন যোগেন মন্ডল নামক বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে

---

[61] Tetsuya Nakatani, *Away from Home*, p. 88; সাক্ষাৎকারঃ-কালোন সরকার, মালদা।

[62] সাক্ষাৎকারঃ- অভিমুন্য টিকাদার, বয়স-৮১, পেশা-কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ১৪/১১/২০২২।

[63] সাক্ষাৎকার:- শান্তিরঞ্জন রায়, মালদা।

[64] দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৮৯-৯১; জয়া চ্যাটার্জী, দেশভাগের অর্জন, পৃ. ১২৪-২৬; হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, পৃ. ৩২-৩৩; সাক্ষাৎকার:- বকুল রানী, বয়স-৬৪, পেশা- গৃহিনী, মালদা।

[65] সাক্ষাৎকার:- শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, বয়স-৭০, পেশা- কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ২৯/১০/২০২২।

[66] সাক্ষাৎকারঃ অজিত হালদার, বয়স-৫৮ পেশা-গ্রন্থাগারিক, ধূসড়িপাড়া কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখ:-২১/১১/২০২২।

[67] সাক্ষাৎকারঃ- ফ্যালানি বিশ্বাস, বয়স-৭১, পেশা- গৃহিনী, মালদা, তারিখঃ-১৫/১০/২০২২।

[68] সাক্ষাৎকারঃ- সুবোধ কুমার বিশ্বাস, বয়স,- ৮১, পেশা-কৃষক, বৈষ্ণবনগর, মালদা, তারিখঃ-২০/১০/২০২২।

[69] Tetsuya Nakatani, Away from Home, pp. 87-89; দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১০৩-১০৪।

[70] সাক্ষাৎকারঃ-নারায়ণ হালদার, বয়স-৭৪, পেশা- দর্জি, ধুসরিপাড়া কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তাঃ-২১/১১/২০২২; সাক্ষাৎকারঃ-মাধব হালদার, বয়স-৬৫, পেশা-জেলে, ধুসরিপাড়া কলোনি, মুর্শিদাবাদ; তাঃ-২১/১১/২০২২; সাক্ষাৎকারঃ-কমল হালদার, বয়স-৭১, পেশা-জেলে, ধুসরিপাড়া কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তাঃ-২১/১১/২০২২।

চলে এলে পরবর্তীকালে তারা ও তাদের অনুগামীরা অনেকেই দেশ ছেড়ে এপার বাংলায় চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন।[71] আবার তারাপুর কলোনির দয়াল বিশ্বাসকে দেশ ত্যাগের কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, ফরিদপুর জেলার "গোয়ালন্দ সাব ডিভিশনের লোকেদের আসা দেখে আসা"।[72] একইভাবে দেশভাগের পর পরই অন্যান্যদের দেখাদেখি চলে আসা মালদা জেলার এক উদ্বাস্তু তাদের দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে জানান, "এদেশে কেউ থাকছে না"।[73] পূর্ব বাংলার বরিশাল থেকে মুর্শিদাবাদে আগত প্রাক্তন পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মী নিরঞ্জন মিত্র জানান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ডক্টর বিধান রায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের জন্য ১৬টা স্টিমার পাঠিয়েছিলেন।[74] সে সময় বড় বড় স্টিমারগুলো দেখে যাদের কোনোদিন দেশত্যাগের ইচ্ছা ছিল না, তারাও অন্যদের দেখাদেখি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে সেই স্টিমারে চেপে পড়েন।[75] মালদা, মুর্শিদাবাদ উভয় জেলাতেই এই উদ্বাস্তুরা সংখ্যায় সর্বাধিক।

দুর্ভিক্ষ ও আর্থিক দুরবস্থার কারণে দেশত্যাগকারী: এই শ্রেণির উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগের বক্তব্য, "খাবার নেই, খাব কী? বাঁচব কীভাবে? বাঁচতে হবে তো। তাই এদেশে আসা"।[76] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেশভাগোত্তর পূর্ববঙ্গে আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। এর কারণ ছিল পাকিস্তান সরকারের টাকার মূল্য একই রাখা, যা ভারত সরকার করেনি। ইতিপূর্বেই এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।[77] প্রথমদিকে মালদা জেলায় চলে আসা ভবানী মণ্ডল বলেন "বাবারা ওদেশে থেকে যে পরিমাণ টাকা পয়সা আনতে পেরেছিলেন, তৎকালীন সময়ে তা এদেশের তিনগুণ"। অথচ কালক্রমে পূর্ববঙ্গে টাকার মূল্য কমতে থাকে। শেষের দিকে যারা আসেন তাদের একটা বড় অংশ কর্মসংস্থানের অভাব ও চরম আর্থিক দুরবস্থার কবলে পড়েন।[78] অনেক উদ্বাস্তু যারা পূর্ববঙ্গ থেকে এই দেশে এসেছিলেন তারা অনেকেই পুনরায় ওই দেশে বসবাস করার উদ্দেশ্যে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওখানকার আর্থিক পরিস্থিতি এবং দুর্ভিক্ষের কারনে দ্বিতীয়বার এই দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন।[79] মালদায় এই শ্রেণির উদ্বাস্তুরা ছিলেন সবচেয়ে কম সংখ্যক ও মুর্শিদাবাদে "পরোক্ষভাবে দাঙ্গার সাক্ষ্য বহনকারী ও আক্রমণের ভয়ে দেশত্যাগকারী" উদ্বাস্তুদের সঙ্গে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থানে।

---

[71] সাক্ষাৎকারঃ নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ।

[72] সাক্ষাৎকারঃ-দয়াল বিশ্বাস, বয়স-৭৭, পেশা-কৃষক, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তাঃ-২৭/১১/২০২২।

[73] সাক্ষাৎকারঃ-চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, মালদা।

[74] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, পৃ. ১০১।

[75] সাক্ষাৎকারঃ নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ।

[76]সাক্ষাৎকার:- নয়নতারা সরকার, বয়স- ৬৫, পেশা-গৃহিণী, তারাপুর কলোনী, মুর্শিদাবাদ, তারিখ:- ২৭/১১/২০২২; সাক্ষাৎকার:- নির্মল সরকার, মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকার:দয়াল বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[77] দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৯৩।

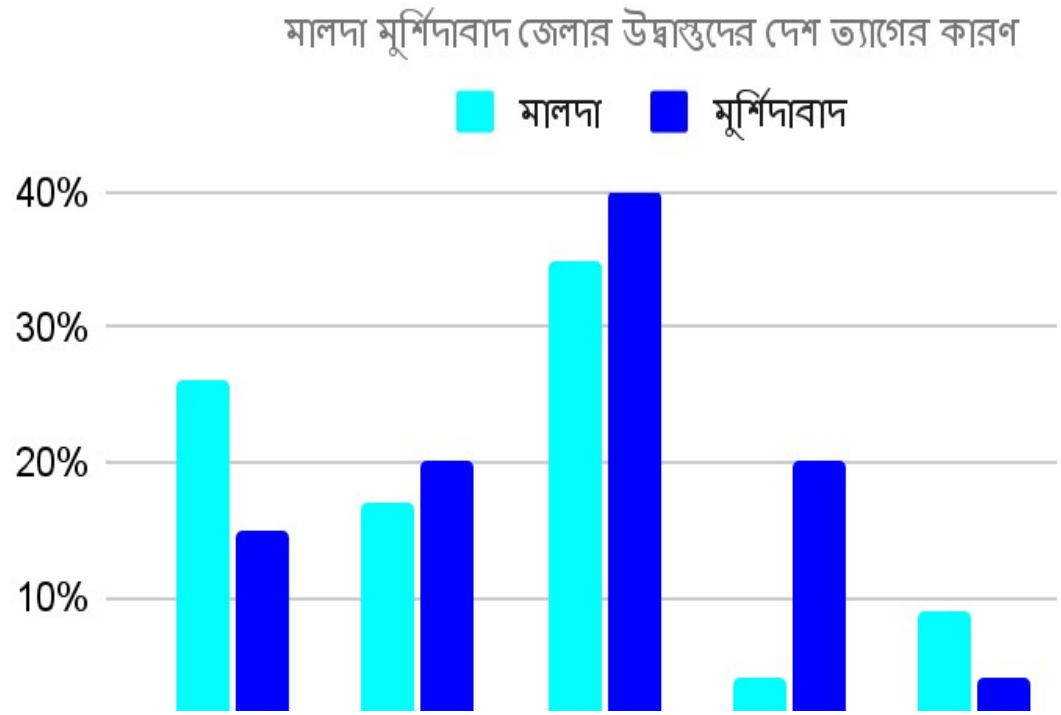
[78] সাক্ষাৎকার:-ভবানী মণ্ডল, বয়স-৬৭, পেশা-কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ২০/১০/২০২২।

[79] সাক্ষাৎকারঃ-বলরাম সরকার, বয়স-৭০, পেশা-কৃষক, মালদা, তারিখঃ-২৯/১০/২০২২; সাক্ষাৎকারঃ-মন্মথা বালা, বয়স-৬৬, পেশা-গৃহিণী, মালদা, তারিখঃ-১৪/১১/২০২২; সাক্ষাৎকারঃ-নির্মল সরকার, মুর্শিদাবাদ।মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকার:- শান্তিরঞ্জন রায়, মালদা।

পদ্মা ভাঙনে দেশত্যাগকারী: এদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও উপেক্ষনীয় নয়। বাংলাদেশে পদ্মা নদীর শাখা-প্রশাখা জালের মতো বিস্তৃত। নদীর ধর্ম অনুযায়ী এক পাড় ভাঙ্গে তো অন্য পাড় গড়ে। পদ্মা নদীর তীরে বসবাসকারী স্বভাবতই কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী মানুষ পদ্মানদীর ভাঙনের সঙ্গে সমকালীন দেশভাগের আবহ ইন্ধন যোগালে তারা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসাটা ভালো মনে করেন।[80] টেটসুয়া নাকাতানি গবেষণাতেও নদীয়া জেলায় আসা উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের একটি কারণ হিসেবে নদীর ভাঙ্গন বা বন্যাকে উল্লেখ করা হয়েছে।[81] এদের দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল নদী ভাঙ্গনে বাড়ি যখন ছাড়তেই হবে তখন পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়াই ভালো। এরা মূলত ভালো ভবিষ্যৎ কল্পনা করে এ দেশে এসেছিলেন।

সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কারণগুলি নিচের স্তম্ভচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল। স্তম্ভচিত্র দ্বারা স্পষ্ট হয় কত শতাংশ লোক কী কারনে দেশ ছেড়ে এই দুই জেলায় এসেছিলেন।

চিত্রঃ- ১



ক্যাটাগরি-১: দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী ও মুসলিমদের অত্যাচারের দেশত্যাগকারী।
ক্যাটাগরি-২: পরোক্ষভাবে দাঙ্গার সাক্ষ্য বহনকারী ও আক্রমণের ভয়ে দেশত্যাগকারী।
ক্যাটাগরি-৩: প্রভাবিত হয়ে ও দেখাদেখি চলে আসা উদ্বাস্তু।
ক্যাটাগরি-৪: দুর্ভিক্ষ ও আর্থিক দুরবস্থার কারণে দেশত্যাগকারী।
ক্যাটাগরি-৫: নারীর সম্মানহানি ও আত্মমর্যাদায় আঘাত পেয়ে দেশত্যাগকারী।
ক্যাটাগরি-৬: পদ্মা ভাঙনে দেশত্যাগকারী।

[80] সাক্ষাৎকার:-চিত্ত বিশ্বাস, বয়স-৬৭, পেশা- কৃষক, মালদা, তারিখঃ-১৫/১০/২০২২; সাক্ষাৎকার:-প্রকাশ সরকার, মালদা; সাক্ষাৎকার:-রবীন্দ্রনাথ সরকার, মালদা।

[81] Tetsuya Nakatani, *Away from Home*, p. 81.

প্রসঙ্গত, বর্তমান গবেষণার সমর্থনে টেটসূয়া নাকাতানির নদীয়া জেলায় পূর্ব-বাংলা থেকে হিন্দুদের চলে আসার কারণ অনুসন্ধান নিয়ে প্রকাশিত তথ্য উল্লেখ করা হল।

সারণি-১, নদীয়ার একটা গ্রামের উদ্বাস্তুরা কেন পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছিল (লক্ষ্য হিসেবে)

পলায়নের কারণ	**পরিবারের সংখ্যা**
মুসলিম কর্তৃক হয়রানি	৮২
আক্রমণের ভয়	৪১
তারা মনে করে অথবা তাদেরকে বলা হয় যে পাকিস্তান মুসলিমদের জন্য এবং ভারত হিন্দুদের জন্য	২৩
কারণ সবাই পালিয়ে গিয়েছিল	১৬
প্রকৃত আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত	৯
ব্যবসা / লেখাপড়া	৭
বন্যা / নদী ভাঙ্গন	৫
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা	৩

(Tetsuya Nakatani*, Away from Home*, p. 88.)

৩.২ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণঃ

মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুরা যে কয়েকটি কারণে এই জেলা দুটিকে আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ হল সংলগ্নতা (contiguity), যা সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনের একটি অন্যতম শর্ত ছিল।[82] বাংলা ভাগ হওয়ার আগে মালদা ও মুর্শিদাবাদ, এই দুটি সীমান্তবর্তী জেলার একেবারে সংলগ্ন প্রতিবেশী জেলা ছিল রাজশাহী। এটি মুর্শিদাবাদের ঠিক পূর্বে এবং পূর্বতন মালদার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। মালদা জেলার উত্তর-পূর্ব জুড়ে ছিল প্রতিবেশী দিনাজপুর জেলা। এছাড়াও রাজশাহী জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ সংলগ্ন জেলা পাবনা, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া থেকে মালদা ও মুর্শিদাবাদের দূরত্ব খুব বেশি নয়। এর মধ্যে কুষ্টিয়া জেলাটি রাজশাহীর দক্ষিণে হওয়ায় মুর্শিদাবাদের বেশি কাছে অবস্থিত।

আগের অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজার-হাট, আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সড়কপথ ও নদীপথের মাধ্যমে এই প্রতিবেশী জেলাগুলোর সঙ্গে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় ছিল। আগেই বলা হয়েছে, বাংলা ভাগের সাথে সাথে মালদা জেলাও ভাগ হয়েছিল। এই জেলার পাঁচটি থানা (গোমস্তাপুর, নাচোল, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ) পূর্ববঙ্গে পড়ে যাওয়ার

[82] *Reports of the Bengal and Punjab Boundary Commission (Radcliffe Award),* Government of India, New Delhi, 1958, pp. 1-6.

ফলে ওই পাঁচটি থানার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তহারা মানুষেরা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মালদা জেলাকেই তাদের আবাসস্থল হিসাবে পেতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। একইভাবে রাজশাহী এবং দিনাজপুর জেলার লোকেরাও পূর্ব পরিচিতি ও সংলগ্নতার কারনেই মালদা মুর্শিদাবাদ জেলাকেই আপন করে নিতে চেয়েছিলেন। এর প্রতিচ্ছবি দেখা যায় ১৯৫১ সালের এই দুই জেলার জনগণনা; পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সর্বাধিক উদ্বাস্তুরা এই সমস্ত জেলাগুলি থেকেই এসেছিলেন। ১৯৫১ পর্যন্ত মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগই এসেছিলেন রাজশাহী জেলা থেকে। ওপার বাংলা থেকে মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যার বিচারে রাজশাহীর পরেই ছিল ফরিদপুর, পাবনা, দিনাজপুরের স্থান; মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে এই ক্রম ছিল রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুর (দ্রষ্টব্য সারণি-৭ ও ৮)। ১৯৫১ সালের জনগণনার এই তথ্য পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে এই দুই জেলায় আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই ভৌগলিক সংলগ্নতাকেই প্রমাণ করে। এই সমস্ত জেলাগুলি থেকে দর্শনা, গেদে ইত্যাদি মালদা ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত সংলগ্ন প্রবেশপথগুলি কাছে হওয়ায় তারা এই দুই জেলাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[83]

ভৌগোলিক সংলগ্নতা থাকার এক অবশ্যম্ভাবী ফল হল পরিচিতি। কাছাকাছি অবস্থিত অঞ্চলগুলির মধ্যে যোগাযোগ বজায় থাকার জন্য মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় বংশগত ও বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু--বান্ধব ইত্যাদি পরিচিত মানুষের সান্নিধ্য ও আশ্রয় পূর্বোল্লিখিত পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির বাস্তহারা মানুষদের মনে নিরাপত্তার বোধ সঞ্চার করে। যার কারণে অনেক উদ্বাস্তু, যারা অন্যান্য প্রবেশপথ দিয়ে সীমানা পার করে এসেছিলেন; তারাও বিভিন্ন উদ্বাস্তু ত্রাণশিবির বা দণ্ডকারণ্য ঘুরে তাদের আত্মীয়দের কাছেই আবার ফিরে এসেছিলেন। বর্তমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকারে এমন অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়, যারা আত্মীয়তার সুবাদে এই দুই জেলাকে আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেন।[84] মুর্শিদাবাদের অজিত কুমার হালদারের মতো অনেকের কথায় "মুর্শিদাবাদে আসার কারণ অনেকে আছেন তাই" অর্থাৎ এই দুই জেলায় অনেকের পূর্বপরিচিত, আত্মীয়-পরিজন বা জ্ঞাতি ভাইয়েরা অবস্থান করতেন।[85] পরিচিত মানুষের আশ্বাসে অনেকেই এই দুই জেলাকে বেছে নিয়েছিলেন।

ভৌগোলিক সংলগ্নতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা আরো একটি বিষয় হল ভৌগোলিক পরিবেশের সাদৃশ্য। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা দুটি নদী-নালা, খাল-বিল, জলাশয় পুষ্ট জেলা। একই অক্ষরেখায় পাশাপাশি অবস্থিত জেলাগুলি আবহাওয়া, জলবায়ু, নদীবিধৌত মৃত্তিকা, গাছপালা ইত্যাদি একই প্রকৃতির। তাই পরিচিত পরিবেশে বসতি স্থাপনের জন্য, পূর্ববঙ্গের এই জেলাগুলি থেকে সরাসরি পশ্চিমে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা দুটি তাদের কাছে একটি নির্ভয়যোগ্য আশ্রয় হিসেবে মনে হয়। মালদা জেলায় আগত বিনয়কৃষ্ণ বাবুর বক্তব্য, এই দুই জেলায় যেমন "কিছুটা ডাঙা ভূমি বা উঁচু জমি আছে তেমনি আবার

[83] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* পৃ. ৪২।

[84] সাক্ষাৎকার:-ভবানী মণ্ডল, মালদা; সাক্ষাৎকারঃ- ফ্যালানি বিশ্বাস, মালদা; সাক্ষাৎকারঃ-মন্মথা বালা, মালদা।

[85] সাক্ষাৎকারঃ-কমল হালদার, মুর্শিদাবাদ।

এই জেলা দুটির কিছুটা অংশ নিচু এলাকা, জলাভূমিরও অন্তর্গত"।[86] পূর্ব-পাকিস্তানের রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর ও চট্টগ্রামের কিছু অংশ ডাঙ্গা বা উচু এলাকায় হওয়ার কারণে সীমান্তবর্তী জেলা যেমন মালদা জেলার হাবিবপুর, বামনগোলা ও গাজোল থানায় উঁচু ভূমি বিশিষ্ট অংশে স্থানীয় মুসলমানদের সাথে জমি-বাড়ি বিনিময় করে এইসব অঞ্চলে আসার সুযোগ পেয়েছিল।[87] যার ফলে রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুরের স্থলভাগের মানুষেরা এখানে যেমন নিজেদের পরিবেশ খুঁজে পেয়েছেন তেমনি আবার এই সকল জেলার মাকড়সার জালের মতো বিস্তৃত পদ্মা নদীর শাখা-প্রশাখা নদী তীরে বসবাসকারী মানুষেরা তাদের পরিচিত পরিবেশ, নৌকানির্ভর জীবন, গঙ্গার পলিবিধৌত জমি ইত্যাদিতে ফেলে আসা পুরনো জীবনকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

নদী-নালা, জলাশয়ের আধিক্যর কারণে এই মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলা পূর্ববঙ্গের হাজার হাজার মৎস্যজীবী পরিবারকে টেনে এনেছিল পেশার তাগিদে। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় যথাক্রমে ৬২ ও ৬৮ রকমের মাছের তালিকা পাওয়া যায়। ১৯৫১ এর জনগণনাতে এবং এই দুই জেলা জুড়ে শহর ও গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর মাছের বাজার বসত বলেও জানা যায়।[88] গঙ্গার নতুন পলি মাটি চাষের পক্ষে খুব উর্বর, তাতে আকৃষ্ট হয়ে একই রকম ভাবে বহু কৃষিজীবী পরিবার মালদা ও মুর্শিদাবাদে এসে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। তাই চাষের সঙ্গে যুক্ত ও জেলে সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুদের আধিক্য এই দুই জেলায় দেখা যায়। নতুন দেশে এসে তারা তাদের পরিচিত, পূর্বপুরুষের পেশাকে আঁকড়ে ধরে জীবীকা নির্বাহ করতে চেয়েছিলেন। পেশার প্রয়োজনেই এসেছিলেন নবাবগঞ্জের কাঁসা ও পিতলের কারবারীরা, রাজশাহীর রেশম শিল্পীরা, শিবগঞ্জের চাষীরা, ভোলাহাটের বোরো ধান চাষীরা।[89] এছাড়াও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শাঁখারী, কাঁসারী, পুরোহিত, ঢাকি, দর্জি, মালাকার প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার উদ্বাস্তু মানুষদের এই দুই জেলায় দেখা যায়। তবে গম্ভীরা শিল্পের সঙ্গে জড়িত বহু মানুষ ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায়, মূলত মালদায় চলে আসেন। গম্ভীরা অবিভক্ত মালদার এক ঐতিহ্যবাহী শিল্প। এ নিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।[90] গম্ভীরা শিল্পের সঙ্গে নৃত্য শিল্পী, মুখোশ প্রস্তুতকারী, মন্ডপসজ্জাকারী, গান লেখক, গায়ক, বাদ্যকার ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত এক বিরাট সংখ্যক মানুষ পূর্ববঙ্গে কাজ হারাতে বসেছিলেন। কারণ দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে পড়ে যাওয়া অংশগুলিতে যে গম্ভীরা হত তাতে কোনো দেবদেবীর চরিত্র, তাদের মুখোশ বা মূর্তি, বাজনা, মন্ডপসজ্জা ইত্যাদি কিছু স্থান পায়নি। 'নানা, নাতি' চরিত্রের মধ্যে কোনো রকম সাজসজ্জা বা আড়ম্বর ছাড়াই সেগুলি

---

[86] সাক্ষাৎকারঃ-বিনয়কৃষ্ণ বোস, 'মালদা জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক, পাকুয়াহাট, মালদা, তারিখঃ- ০৯/০৮/২০২৩; বিনয়কৃষ্ণ *বোস, মালদা জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস,* (পাকুয়াহাটঃ নিউ সেন প্রিন্টার্স, ২০১৮), পৃ. ১০।

[87] তদেব।

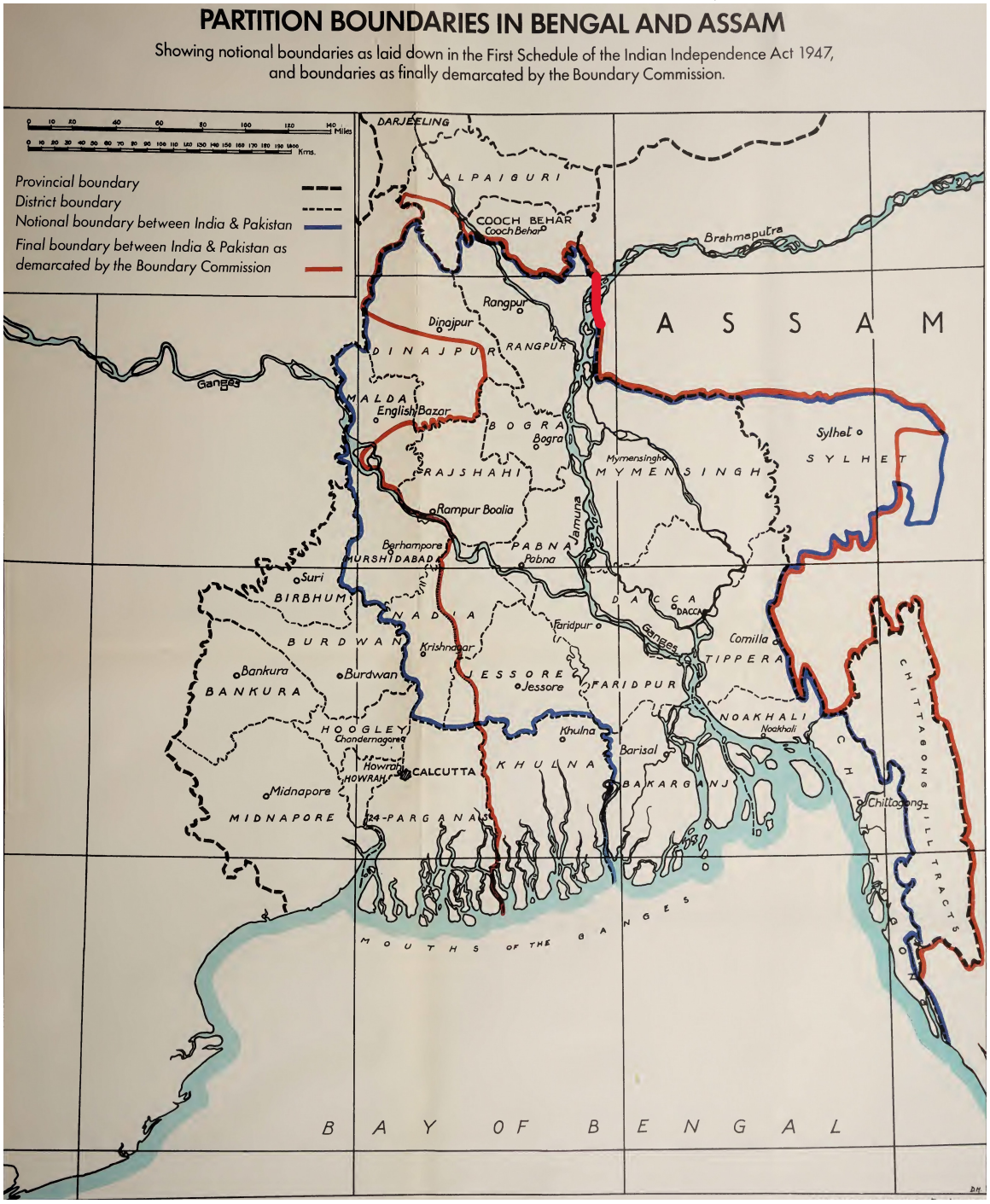
[88] West Bengal District Handbook, *Malda, Census-1951* pp. Xii-lxii; Birendra Kumar Bhattacharya, *West Bengal District Gazetteers: Murshidabad,* (Calcutta, March 1979), pp. 133-34; Jatindra Chandra Sengupta, West Bengal District Gazetteers: *Malda Gazetteer,* (Calcutta, December 1969), p. 94.

[89] প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৬১-৬৫।

[90] পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২৫১-২৬৪।

পরিবেশিত হত।[91] যার ফলে সাবেকি গম্ভীরার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই মালদায় চলে আসেন।

মানচিত্র- ১ বাউন্ডারি কমিশন দ্বারা চিহ্নিত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চূড়ান্ত সীমান্তরেখা।



(The Mountbatten Viceroyalty Prines, Partition and Independence 8 July-15 August 1947 in N.Mansergh and P.Moon (eds.), *Constitutional Relations between Britain and India: The Transfer of Power 1942-7*, Vol-Xii, London, 1983)

[91] ঋষি ঘোষ, "এপার-ওপারের গম্ভীরাঃ বিস্মৃতির অতলে কিংবদন্তি গম্ভীরা শিল্পী সুফি মাস্টার" রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২), পৃ. ১২৫-৩০।

মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম একটি কারণ হল, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ক্রমবর্ধমান চাপে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির স্থানাভাব ও কর্মসংস্থানের অভাব। অগণিত উদ্বাস্তু মানুষের স্রোতে যখন ২৪ পরগনা, নদীয়া, কলকাতার শহরতলী, উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ইত্যাদি সীমান্তের নিকটবর্তী জেলাগুলি নাজেহাল, তখন সরকারের পক্ষ থেকে মালদা ও মুর্শিদাবাদের কিছু খাসজমির কথা ঘোষণা করা হয়। অমনি এই দুই জেলায় উদ্বাস্তু মানুষের ঢল নামতে শুরু করে। মালদা জেলার জনৈক উদ্বাস্তুর কথায় "এই দুই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে রেলের খাস জমি, সরকারি খাস জমি, খাস তালুক ইত্যাদি ছিল।[92] স্থানীয় প্রশাসন যখন এই খাস জমি উদ্বাস্তুদের ব্যবহারের জন্য ঘোষণা করল তখন হাজারে হাজারে উদ্বাস্তুরা এখানে সুলভে জমি পাবার উদ্দেশ্যে চলে এল।[93] পরবর্তীকালে ইউসিআরসি গঠিত হলে দণ্ডকারণ্য ফেরত বহু উদ্বাস্তু পরিবারকে এই দুই জেলার খাস জমিতে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে এই দুই জেলায় সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনির সারণি প্রদর্শন করা হয়েছে যেগুলির প্রায় নব্বই শতাংশের বেশিই ভেস্টেড ল্যান্ড, খাস জমিগুলিতে গড়ে উঠেছিল ।[94] সাক্ষাৎকারে বহু উদ্বাস্তু এই দুই জেলায় খাস জমির খবরে তাদের চলে আসার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই দুই জেলার উদ্বাস্তুদের সিংহভাগই খাসজমির খবর পেয়ে এই জেলায় এসেছিলেন।[95]

শুধু খাস জমি নয় মালদা, মুর্শিদাবাদ নদীর তীরবর্তী হওয়ায় এই দুই জেলার চর গঠনের একটি প্রাকৃতিক সুবিধা ছিল। প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা গেছে, শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়ায় নদীর জল শুকিয়ে এলে প্রায়ই নিত্যনতুন চরের আবির্ভাব উদ্বাস্তু পরিবারগুলির বসবাস ও চাষাবাদের সমস্যা মেটাত। যার ফলে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলায় আশ্রয় নেওয়া বহু উদ্বাস্তু পরিবার নতুন চরের আবির্ভাবের খবর শুনে এই জেলা দুটিতে চলে আসতেন। মালদা জেলার উদ্বাস্তু সত্য রঞ্জন বিশ্বাস এই জেলার এরকমই একটি চরে এসে চাষাবাদ ও বসবাস শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, "চরে আসার একমাত্র কারণ হল জমি সস্তা, ফসল ভালো হয়। ঘাসপাতও প্রচুর হয়, বিক্রি করে দুই পয়সা আয় হয়। কর্ম করলে বাঁচা যাবে তাই চরে আসা"।[96] এই জেলার অপর এক উদ্বাস্তু ভবানী মন্ডল বলেছেন, "চরের কারণে পেঁয়াজ, রসুন, ধান, পাট ভালো হয় তাই

[92] মালদা জেলায় যে ৩৮টি জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ৩৩টি কলোনিই রেল ও রাজ্য সরকারের খাস জমিতে গড়ে উঠেছিল (*Manual of Refugee Relief and Rehabilitation,* pp. 93-94)। মুর্শিদাবাদ জেলায় গড়ে ওঠা ১৩টি কলোনির মধ্যে ১০টিই গড়ে উঠেছিল ভেস্টেড ল্যান্ডের উপড় (*Manual of Refugee Relief and Rehabilitation*, p. 76)।

[93] সাক্ষাৎকারঃ-নীলকান্ত বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[94] পরিশিষ্ট-৩, সারণি-৯ ও ১০।

[95] সাক্ষাৎকারঃ- অভিমন্যু টিকাদার, বয়স-৮১, পেশা-কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ১৪/১১/২০২২; সাক্ষাৎকারঃ-সুবল চন্দ্র সরকার, বয়স-৬৬, পেশা- কৃষক, মালদা; সাক্ষাৎকারঃ- সুবোধ কুমার বিশ্বাস, মালদা; সাক্ষাৎকার:-ভবানী মণ্ডল, মালদা; সাক্ষাৎকারঃ- জগবন্ধু বালা, মালদা।

[96] সাক্ষাৎকারঃ-সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, বয়স-৮১ পেশা- কৃষক, মালদা, তারিখঃ-২৯/১০/২০২২।

এখানে আসা"।[97] শান্তিরঞ্জন সরকারের জ্যাঠামশাই-এর হাত ধরে কিভাবে এই জেলার একটি চরে উদ্বাস্তু মানুষদের জনপদ গড়ে উঠেছিল তা নিয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।[98]

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বারুজীবী বা পান চাষী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে বারুজীবী স্কিম নিয়েছিলেন, তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার আয়েসবাগ ও মহালন্দীতে দুটি কলোনি ছিল।[99] যা নিঃসন্দেহে বারুজীবী পরিবারগুলির কাছে এক অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত অসংখ্য বারুজীবী পরিবার এই বারুজীবী স্কিমের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় চলে এসেছিলেন। সরকারি পুনর্বাসন স্কিমে চাষীদেরকে দশ বিঘা ও পান চাষী অর্থাৎ বারুজীবীদের দুই বিঘা করে চাষের জমি দেওয়া হত। বারুজীবী উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানতে পারা যায় তারা তাদের পূর্বপুরুষের পেশাকে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে চাষের ক্ষেত্রে ১০ বিঘা জমির পাশে পান চাষের ক্ষেত্রে দুই বিঘা জমি দেওয়া হলেও তারা নিজেদের নামের পাশে 'চাষী' শব্দটি না লিখে 'বারুজীবী' লেখাটা বংশমর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। ফলস্বরূপ তারা মাত্র দুই বিঘা জমি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন ও মুর্শিদাবাদে চলে আসেন।[100]

৩.৩ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন দশকে উদ্বাস্তু আগমনের পরিসংখ্যানঃ

মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলা দুটি সীমান্তবর্তী হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য সীমান্তবর্তী জেলার (নদীয়া ,২৪ পরগনা, দিনাজপুর, কোচবিহার, হুগলি) তুলনায় এখানে উদ্বাস্তু আগমনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এর কারণ জেলা দুটির অর্থনৈতিক অবস্থা বহিরাগতদের খুব একটা আকর্ষণ করার মতো ছিল না। অপর কারণটি হল, অন্যান্য সীমান্তবর্তী জেলা থেকে যে পরিমাণ মুসলিম পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছেন এই দুই জেলার ক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটা অনেক কম (যেমন নদীয়া জেলা থেকে সংখ্যালঘু হওয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু মানুষ চলে গিয়েছিলেন)। মুসলিমদের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করে চলে আসা বা ফাঁকা জমি, বাড়ি ইত্যাদি পাওয়ার আশা এই দুই জেলার ক্ষেত্রে কম ছিল। কাজেই এই দুই জেলায় উদ্বাস্তু আগমন আলোচনার পূর্বে তৎকালীন মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার পরিস্থিতি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

মালদা জেলা ছিল কৃষিপ্রধান জেলা। গঙ্গা নদীর উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় এই জেলার দক্ষিণাংশ ছিল নদীর পলিবিধৌত সমতলভূমি যা চাষাবাদের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। এই মাটি ছিল খুবই উর্বর। জেলার উত্তর অংশের জমিতে বছরে দুবার ফসল ফলত।[101] যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অবস্থিত জেলাগুলি থেকে এই জেলায় চাষাবাদের জন্য বহু লোকজন আসত। এছাড়াও মালদা রেশম শিল্প, বস্ত্রবয়ন

---

[97] সাক্ষাৎকার:-ভবানী মণ্ডল, মালদা।

[98] সাক্ষাৎকার:-শান্তি রঞ্জন সরকার, মালদা।

[99] *Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal, Ministry of Supply and Rehabilitation,* (New Delhi: Department of Rehabilitation, 1974), pp. 3-4 & 11.

[100] সাক্ষাৎকারঃ- তরুণ কুমার ভাওয়াল, বয়স-৬৩, পেশা-শিক্ষক (কাতলাপারা পূর্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়) মহলন্দী কলোনী, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২১/১১/২০২২; সাক্ষাৎকার:-নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ।

[101] Malda, Census-1951 p. 2.

শিল্প ও আমের জন্য বিখ্যাত ছিল।[102] যার ফলে ১৯ শতকের গোড়ার দিকে বহু অভিবাসী এই জেলায় আসত। ১৯০১-১৯৫১ পর্যন্ত মালদায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি সারণি-২-এ প্রকাশ করা হল-

সারণি:-২ ১৯০১-১৯৫১ পর্যন্ত প্রতি দশকে মালদা জেলার জনসংখ্যার শতকরা পরিবর্তন

স্থান	১৯৪১-৫১	১৯৩১-৪১	১৯২১-৩১	১৯১১-২১	১৯০১-১১
মালদা জেলা	+১১.০	+১৭.২	+৫.০	-১.৮	+১৫.৭
সদর মালদা	+১১.০	+১৭.২	+৫.০	-১.৮	+১৫.৭
ইংলিশবাজার	+১২.৪	+১৯.৯	+১০.৭	-১৪.৫	+৪.৬
কালিয়াচক	+১৬.৪	+১৮.১	+৪.৩	-৪.২	+১১.২
মালদা	+১০.১	+১১.১	-৬.৫	-৪.৯	+১৬.৪
হাবিবপুর	+৩৮.০	+৬.৮	+৩.৩	-৪.৯	+১৬.৪
রতুয়া	+১২.৫	+২০.০	+৫.৮	-৪.২	+২২.৯
মানিকচক	+১৯.৮	+১৪.৭	+২.৩	-৪.২	+২২.৯
খরবা	-২.৫	+২৩.৩	+৩.৮	-২.৩	+১৬.৪
হরিশ্চন্দ্রপুর	+১.২	+২১.০	+১৫.০	+২৫.৯	+১৯.৯
গাজোল	-০.৩	+৯.৫	+১.৯	+২.৭	+২০.৯
বামনগোলা	+১০.৩	+১৫.৪	+১.০	+২.৭	+২০.৯

(*Malda, Census-1951*, p.xvi.)

ক্রমে এই অভিবাসী আগমন মালদা জেলাকে সম্পৃক্ত করতে থাকে এবং স্থানসংকুলানে সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। ১৯০১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে মালদা জেলায় আগত অভিবাসীদের সংখ্যা সারণি-৩-এ দেওয়া হল-

সারণি:-৩ ১৯০১-১৯৫১-এ রাজ্য থেকে এবং রাজ্যের বাইরে মালদায় অভিবাসন এবং দেশত্যাগ

সাল	১৯৫১	১৯৪১	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
প্রকৃত জনসংখ্যা	৯৩৭৫৮০	৮৪৪৩১৫	৭২৯৪৪০	৬৮৬১৭৪	৬৯৮৫৪৭	৬০৩৬৪৯
অভিবাসী সংখ্যা	৮২৫০৭	২২৯৫২	৩০৪৬৪	৪৩০১০	৫৫৪২৭	১০৭৪১

(*Malda, Census-1951* p.xvi.)

[102] Ranabir Samaddar, *The Marginal Nation: Transborder Migration from Bangladesh to West Bengal,* (New Delhi: Sage Publications, 1999), p. 169.

মালদা জেলার জনগণনা অনুযায়ী ১৯৫১ সালে আগত ৮২ হাজার অভিবাসীর মধ্যে ৬০,১৯৮ জন এসেছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে।[103] বাকি ২২ হাজার এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য জায়গা থেকে যা ১৯৪১ সালে আগত অভিবাসী সংখ্যার কাছাকাছি। মালদা জেলায় অভিবাসী আগমন ১৯১১ পর্যন্ত বাড়তে থাকে এবং সর্বোচ্চ ৫৫ হাজারে পৌঁছায় পরবর্তী দশকগুলিতে সেটা কমতে কমতে যথাক্রমে প্রায় ৪৩ হাজার, ৩০ হাজার এবং ২২ হাজারে পরিণত হয়, যা মালদা জেলার জমির লভ্যতা ও উৎপাদনশীলতার সম্পৃক্তিকে নির্দেশ করে। এইভাবে চাষযোগ্য জমি কমতে থাকা, কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার হ্রাস, পাশাপাশি এককালের বিখ্যাত বস্ত্রবয়ন ও রেশম শিল্পের অবনতি, বড় ধরনের কোনো শিল্প, বাণিজ্য না থাকা, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, খুব কম মাথাপিছু আয় ইত্যাদির জন্য মালদা জেলার প্রতি অভিবাসীদের আকর্ষণ দিন দিন কমাতে থাকে।[104]

উদ্বাস্তু আগমনের প্রাক-লগ্নে মুর্শিদাবাদ জেলার পরিস্থিতিও প্রায় একই রকম ছিল। ১৮৭২-১৯৭১ এই সময়কাল বিবেচনা করলে দেখা যায় এই শতকে রেশম চাষ ও রেশম শিল্প, বয়ন শিল্প, হাতির দাঁতের কাজের শিল্প, ব্রাশ ও বেলমেটাল শিল্প ইত্যাদিতে ধস নামতে শুরু করে। রেলের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন আছেন তারা বেশিরভাগই নিযুক্ত হতেন বাইরে থেকে। ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরিতেও একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও বাগড়ি অঞ্চলে ভাগীরথী অন্যান্য নদীর পলি জমার ফলে বড় বড় বিলগুলি ছোট অগভীর জলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল; ফলে মৎস্য চাষ এবং কৃষি এই দুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[105] মুর্শিদাবাদ সীমান্তবর্তী হওয়া সত্ত্বেও এই জেলায় পূর্ববঙ্গের কৃষকদের না আসার অনীহা ছিল। কারণ মুর্শিদাবাদ এমন একটি জেলা, যার অর্থনীতি ১৯ শতকের শেষ দিক থেকে অর্থাৎ গঙ্গার প্রবাহ পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ার ফলে খারাপ হয়ে পড়ে এবং আর্থিকভাবে হ্রাস পায়। এমন কি দেশভাগের আগেও পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার ও মুর্শিদাবাদ এই জেলাগুলিতে কেউ কাজ করতে আসত না।[106] এখানে অর্থ উপার্জনের সুযোগ ছিল নিতান্তই সামান্য। যা ছিল তা হল রাইস মিল শিল্প, বেলডাঙ্গায় চিনি শিল্প; যদিও এটি এক দশকের বেশি চলে নি, বেলডাঙার ইটভাটা শিল্প; এটি আবার মরসুমি, সব সময় এর জন্য নয় এবং এতে স্থানীয় শ্রমিকরাই বেশি যোগদান করে থাকেন। শুধু সুতি, ঔরঙ্গাবাদের বিড়িশিল্পে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হত। এছাড়া এখানে বড়ো ধরনের কোন শিল্প বা বাণিজ্য গড়ে উঠতে দেখা যায় নি।[107] পরিকাঠামো ও মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে মালদা জেলার মতো মুর্শিদাবাদ জেলাও পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে পিছিয়ে পড়া জেলার তকমা পেয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের দেশভাগে পশ্চিমবঙ্গের বুকে যখন অগণিত উদ্বাস্তু মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ে তখন মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলাতেও উদ্বাস্তু আগমন ঘটে। বর্তমান গবেষণার সময় কাল যেহেতু দেশভাগ

[103] Malda, Census-1951 p. 72.

[104] Ranabir Samaddar, The Marginal Nation, p. 169.

[105] Murshidabad Gazetteer 1979, p. 93.

[106] জয়া চ্যাটার্জী, দেশভাগের অর্জন, পৃ. ১৩৩।

[107] Murshidaba Gazetteers, 1979, p. 93.

থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত, তাই ১৯৫১, ১৯৬১ ও ১৯৭১ সাল বিশেষে জনগণনা অনুযায়ী মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তু সংখ্যার তুলনামূলক পরিসংখ্যান সারণি-৪-এ প্রকাশ করা হল।

সারণি-৪ ১৯৫১-১৯৭১ পর্যন্ত বিভিন্ন দশকে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমন

সাল	মালদা	মুর্শিদাবাদ
১৯৫১	৬০,১৯৮	৫৮,৭২৯
১৯৬১	৬৪,৪৭৪	৬৪,৮৬২
১৯৭১, মার্চ	৬৯,২০২	৭৫,৩০৮
১৯৭১	১,২৭,৫০০	১,৩৫,০০০

(*Malda, Census-1951,* p.79; *Murshidabad, Census-1951*, p.108; *Malda Census-1961*, p.lxviii; *Murshidabad, Census-1961,* p.93; অভিজিৎ দাশগুপ্ত, *বিস্থাপন ও নির্বাসন ভারতের রাষ্ট্র উদ্বাস্তু সম্পর্ক,* পৃ.৩৫)

১৯৫১ সালের জনগণনা থেকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুদের সংখ্যার বিচারে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার স্থান যথাক্রমে নবম ও দশম স্থানে। মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা অংশ সরাসরি মালদা জেলায় প্রবেশ করেছেন আর বৃহত্তর অংশটি অন্যান্য জেলা থেকে মালদায় এসেছিলেন। কারণ ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে রেল যোগাযোগ ছিল মূলত পেট্রোপোল, ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ, নদীয়া জেলার দর্শনা, বানপুর ইত্যাদি মারফতে। কাজেই উদ্বাস্তুরা এ সমস্ত বর্ডার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করার পর প্রাথমিকভাবে নদীয়া, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ সহ অন্যান্য জেলার সরকারি ক্যাম্পে অবস্থান করার পরে অন্যান্য জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায় পৌঁছেছিলেন।[108]

১৯৪৬-১৯৫১ পর্যন্ত প্রতিটি বছরে মালদায় যে উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন তার একটি পরিসংখ্যান সারণি-৫-এ দেওয়া হল। প্রথম দিকে মালদায় যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন তার মধ্যে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত মোট ১৫,৯৭১ জন। যাদের উদ্বাসনের প্রধান কারণ কোনো বড় ধরনের দাঙ্গা নয় বরং ভয় এবং সামাজিক অপমানবোধ। হিন্দু ব্যবসায়ীদের প্রতি সংখ্যাগুরুদের অর্থনৈতিক বয়কট ও স্থানীয় মুসলিমদের সঙ্গে আর্থিক বা সামাজিক দূরত্ব বাড়তে থাকা তাদের দেশত্যাগের প্রধান কারণ।[109] এই সময় আসা বেশিরভাগ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন নিয়ে সরকারকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি, কারণ তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গে নিজেদের সম্পত্তি বিনিময় করে বা পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের কাছে নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করে আসতে পেরেছিলেন। অপর এক শ্রেণি ছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায়, যারা বিভিন্ন পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। ডাক্তারি, শিক্ষকতা ও আইনের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা মালদায় এসে তাদের প্র্যাকটিস আবার শুরু করেছিলেন। সরকারি বিভিন্ন পদে আসীন ব্যক্তিরা অপশন দিয়ে চলে এসে সরকারি পদে পুনরায় বহাল হতে পেরেছিলেন। কিছু সংখ্যক মানুষ

[108] বিনয়কৃষ্ণ বোস, *মালদা জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস,* পৃ. ২-৩।

[109] অশোক মিত্র, *তিন কুড়ি দশঃ তৃতীয় খণ্ড,* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আষাঢ় ১৯৬০), পৃ. ৩৩।

ছিলেন যারা অল্প কিছু অর্থ সম্পদ সঙ্গে আনতে পেরেছিলেন তারা মালদায় এসে আত্মীয়ের সহায়তায় ব্যবসাকার্য শুরু করেছিলেন।[110] ১৯৫০ সালের প্রথমদিকে মালদা জেলায় আসা উদ্বাস্তুরা মূলত ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থানরত ক্যাম্প থেকে এসেছিলেন। মালদায় আসা উদ্বাস্তু সংখ্যা সর্বাধিক আকার ধারণ করেছিল ১৯৫০ সালে। ১৯৪৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৫০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৪৯ হাজারেরও বেশি মালদা এসে পৌঁছেছিলেন।[111] যারা ছিলেন মূলত কৃষক, ক্ষেতমজুর অন্যান্য কৃষি কর্মের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক। তাদের বেশিরভাগ ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ যেমন নমঃশূদ্র, সদগোপ ও মাল।[112] এই নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তুদের অবস্থা সব থেকে শোচনীয় হয়। তাদের কাছে জমি ক্রয় করে চাষাবাদ শুরু করা বা বসতি স্থাপন করার সামর্থ্য ছিল না। তারা শিক্ষিত না হওয়ায় অন্যান্য পেশায় যুক্ত হওয়ার সুযোগও ছিল না।[113] যার কারণে তাদের উদ্বাস্তু জীবনের কাহিনী সবচেয়ে দুঃখজনক ও ভয়ংকর ছিল। এই শ্রেণির লোকেদের সব থেকে বেশি পাওয়া যায় বামনগোলা, হাবিবপুর, গাজোল, বৈষ্ণবনগর থানায়।

সারণি:-৫ ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত প্রতিটি বছরে মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা

সাল	উদ্বাস্তুর সংখ্যা		মোট
	পুরুষ	নারী	
১৯৪৬	১০৫	৮৬	১৯১
১৯৪৭	২৩০৭	১৯৭৮	৪২৮৫
১৯৪৮	২৫৩৬	২৬৮৫	৫২২১
১৯৪৯	৩২৩৩	৩০৪১	৬২৭৪
১৯৫০	২২,২৪৩	২০,৯৯২	৪৩,২৩৫
১৯৫১	৪৯৪	৪৯৮	৯৯২
মোট	৩০২১৮	২৯২৮০	৬০,১৯৮

(*Malda, Census-1951*, pp. 72-79.)

১৯৪৬-১৯৫১ এই সময়কালের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও উদ্বাস্তু আগমন সরাসরি যেমন ঘটে তেমনই পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় প্রাথমিকভাবে আশ্রয়গ্রহণ করার পরেও উদ্বাস্তুরা মুর্শিদাবাদ জেলায় আসতে থাকেন। নদীয়া, ২৪ পরগনা ইত্যাদি জেলাগুলির সরকারি ক্যাম্পে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুরা অনেকেই

[110] Ashim Kumar Sarkar, *Changing Profile of A Bengal District Malda, 1932-1953,* (Kolkata: Classique Books, 2008), pp. 71-73.

[111] *Malda, Census-1951,* p. 78.

[112] *গৌড়দূত,* ১৪-ই জুলাই ১৯৫১, cited Ashim Kumar Sarkar, Changing Profile of a Bengal District Malda, p. 73.

[113] Pia Oberoi, *Exile and Belonging: Refugees and State Policy in South Asia,* (New Delhi: Oxford, 2006), p. 64.

পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ জেলায় নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসনের জন্য চলে আসেন। অনেকে আবার উদ্বাস্তু শিবিরগুলি থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যের দণ্ডকারণ্যে থেকে পরবর্তীকালে এই জেলায় এসেছিলেন।[114] **১৯৪৬-১৯৫১** পর্যন্ত প্রতিটি বছরে মুর্শিদাবাদে যে উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন তার একটি পরিসংখ্যান সারণি-৬-এ দেওয়া হল-

সারণিঃ-৬ ১৯৪৬ থেকে **১৯৫১** পর্যন্ত প্রতিটি বছরে মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা

সাল	উদ্বাস্তুর সংখ্যা		মোট
	পুরুষ	নারী	
১৯৪৬	৯৪	১২৯	২২৩
১৯৪৭	৬,০৫৮	৫,৩৭৬	১১,৪৩৪
১৯৪৮	৮,৪৮০	৬,৯৯৫	১৫,৪৭৫
১৯৪৯	৪,৭১৭	৪,৩৯২	৯,১০৯
১৯৫০	১১,৫৯১	১০,৪৯৯	২২,০৯০
১৯৫১	২২৮	১৭০	৩৯৮
মোট	৩১,১৬৮	২৭,৫৬১	৫৮,৭২৯

(West Bengal District Handbook, *Murshidabad, Census-1951,* pp. 111-118.)

উপরের সারণি অনুসারে, মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় **১৯৪৭** এবং **১৯৪৮** সালে। **১৯৪৯** সালে এই আগমন কিছুটা কম হলেও, সর্বাধিক আকার নেয় **১৯৫০** সালে। মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের প্রক্রিয়া দেশভাগের অব্যবহিত পর থেকেই শুরু হয়ে যায়। তুলনামূলকভাবে সমসাময়িক কালে মালদা জেলার ক্ষেত্রে যা ঘটতে দেখা যায় নি (সারণি-৫, ৬ দ্রষ্টব্য)। মালদায় দেশভাগের একেবারে প্রথম দিকে খুব ক্ষীণ ধারায় উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয়। উদ্বাস্তু আগমনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে **১৯৪৯**-এ।

দেশভাগের পরপরই অর্থাৎ **১৯৪৭-৪৮** সালের দিকে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে উদ্বাস্তুরা চলে এসেছিলেন তারা ছিলেন মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবার। এই পর্বে আসা অধিকাংশ উদ্বাস্তু ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। মূলত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, স্বল্প কিছু নমঃশূদ্রও ছিলেন। এরা বেশিরভাগই সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন, যারা চাকরিতে অপশন দিয়ে এই জেলায় পুনর্বাসন পান। আর কিছু ছিলেন বড় ব্যবসায়ী বা সম্পদশালী পরিবার, যেমন রৌপ ব্যবসায়ী, রূপোর জিনিসপত্র তৈরির কারিগর ইত্যাদি। অল্প সংখ্যক বনেদি সম্পদশালী জমিদাররাও এই তালিকায় ছিলেন। এই শ্রেণির সচ্ছল, শিক্ষিত উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন মূলত

[114] সাক্ষাৎকারঃ- তরুণ কুমার ভাওয়াল, মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকারঃ- নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ।

রাজশাহী, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পাবনা, ঢাকা, দিনাজপুর, খুলনা ইত্যাদি জেলা থেকে। দেশভাগের আগে থেকেই ডোমকলের সঙ্গে সড়কপথের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গে রাজশাহী, কুষ্টিয়া ইত্যাদি এলাকার বাণিজ্যিক যোগাযোগ থাকায় স্বাধীনতা-উত্তর কালে ঘোষ সম্প্রদায়ের কিছু পরিবার এই জেলার ডোমকলে চলে এসেছিলেন। তাছাড়াও ১৯৪৬-এ নোয়াখালী দাঙ্গার সময় কিছু মৎস্যজীবী এই জেলায় চলে আসেন।[115] ১৯৪৭-৪৯ এই সময়কালে আগত এই ধরনের উদ্বাস্তুদের সংখ্যাটি হল মোট ১৫,৬৮০ জন (দ্রষ্টব্য সারণি-৬)। ১৯৫০-এর দিকে যারা এই জেলায় এসেছিলেন তারা ছিলেন মূলত নিম্নবিত্ত শ্রেণির। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি শাখা হল মৎস্যজীবী, বারুজীবী, কৃষিজীবী ও কিছু ঘোষ সম্প্রদায়ের মানুষ। মৎস্যজীবীরা এসেছিলেন মূলত পাবনা থেকে, বারুজীবী সম্প্রদায় এসেছেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বরিশাল ঢাকা, রাজশাহী, নোয়াখালী, খুলনা প্রভৃতি জেলাগুলি থেকে। ঘোষেরা এসেছিলেন পূর্ববঙ্গের কুষ্টিয়া, রাজশাহী ইত্যাদি অঞ্চল থেকে। এছাড়াও ছিলেন কিছু দিনমজুর, কৃষির সঙ্গে জড়িত শ্রমিক, ক্ষুদ্র কারিগর ইত্যাদিরা। ১৯৪৯-৫০-এর দিকে স্বল্প কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মী চাকরিতে অপশন দিয়ে, কেউ কেউ আবার চাকরিতে অবসর নেওয়ার পর মুর্শিদাবাদ জেলায় চলে আসেন। তারা মূলত রাজশাহী, খুলনা ইত্যাদি জেলার মানুষ।[116]

এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের কোন কোন জেলা থেকে কত সংখ্যক মানুষ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এসেছেন তার একটি পরিসংখ্যান সারণি-৭ ও ৮-এ পেশ করা হল। ১৯৫১ জনগণনা অনুযায়ী মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে সিংহভাগই এসেছিলেন মালদার পার্শ্ববর্তী রাজশাহী জেলা থেকে (দ্রষ্টব্য সারণি-৭)। ১৯৪৬-১৯৫১ পর্যন্ত প্রতি বছর আলাদা আলাদা ভাবে এবং সর্বমোট সংখ্যার বিচারেও রাজশাহী জেলা থেকেই সর্বাধিক উদ্বাস্তু এই জেলায় এসেছিলেন, কারণ এই রাজশাহী জেলার নব্যপ্রাপ্ত পাঁচটি থানা; গোমস্তাপুর, নাচোল, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ দেশভাগের আগে মালদার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। এছাড়াও বাকিরা ছিলেন পূর্ববঙ্গের রাজশাহী, ফরিদপুর, পাবনা, দিনাজপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার মানুষ। ১৯৪৬-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা খুব কম। ১৯৪৮-এর শেষের দিকে মুলত ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৮০ শতাংশ নমঃশূদ্র, ১০ শতাংশ হালদার, কাপালি, ৩ শতাংশ ঘোষ, দাস, বণিক, সাহা এবং ৭ শতাংশ রাজবংশী ও সাঁওতাল।[117] সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন কিছুটা পরের দিকে। প্রথমদিকে উচ্চবর্ণের সম্পদশালী শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় দেশত্যাগ করেন, চাকরিতে অপশন দিয়ে বা কিছু অর্থ সঙ্গে নিয়ে যারা আসতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে দেশত্যাগে এদের অনুসরণ করেন এই নিম্নবর্ণের হিন্দুরা, তারা এসেছিলেন রিক্ত হস্তে। মালদায় যেহেতু এই নিম্নবর্নের হিন্দুদের সংখ্যাই সিংহভাগ তাই যথার্থই এই জেলায় উদ্বাস্তু আগমন পরের বছরগুলিতে বেশি।

---

[115] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব ও দেশভাগের প্রভাব,* (বহরমপুর: আকাশ, ২০১৮), পৃ. ৮৬-১১৪।

[116] তদেব।

[117] বিনয়কৃষ্ণ বোস, মালদা জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস, পৃ. ৬।

সারণি-৭ ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা।

পূর্ববঙ্গের জেলা	উদ্বাস্তু আগমন						
	১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	১৯৪৬-১৯৫১
কুষ্টিয়া	১	৬	৭	৪	১৭	১	৩৬
যশোর	১	৯৮	৬১	২৩	১৩৮	১	৩২২
খুলনা	১	১২৬	৫৬	৭৯	৫৩৮	২	৮০২
রাজশাহী	১১৩	১৮২৫	২৮৪১	৪৪৯২	৩২৫৪১	৭২০	৪২,৫৩২
দিনাজপুর	১১	১১৮	১৩২	১৩৭	২১৮৭	২৪	২৬০৯
রংপুর	৩	১৬৩	১৩১	৩২	৯৪	৭	৪৩০
বগুড়া	১	১৮১	৮৮	২২	২৮৩	৫	৫৮০
পাবনা	৪	৫৯৫	৭৪৮	৫৬০	১১৩৩	১৬	৩০৫৬
ঢাকা	২৭	৩৫১	৩৪৮	১৩১	৪৫৩	২৪	১৩৪৪
ময়মনসিংহ	৯	১৬৭	১৬৯	৬০	৪৩৯	২০	৮৬৪
ফরিদপুর	৭	২৫৪	২৯০	২৫৬	৩৩৮৪	১১৮	৪৩০৯
বাখরগঞ্জ	২	১৯৩	১৮০	২৪৫	১৬৯৬	২৭	২৩৪৩
ত্রিপুরা	৬	৭৭	৫৮	১১১	৫৭	১	৩১০
নোয়াখালী	৫	৫৯	৩৩	৮৭	১১৩	৪	৩০১
চট্টগ্রাম	-	৫৬	৫৮	১১	৪২	-	১৬৭
সিলেট	-	২	১৫	-	৪	-	২১
অন্যান্য	-	৭	৬	২৪	১১৬	১২	১৬৫
মোট	১৯১	৪২৭৮	৫২২১	৬২৭৪	৪৩,২৩৫	৯৮২	৬০,১৯১

(এছাড়া ৭ জন এসেছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে, *Malda, Census-1951*, pp. 72-79.)

সারণি:-৮ ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা।

পূর্ববঙ্গের জেলা	উদ্বাস্তু আগমন						
	১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	১৯৪৬-১৯৫১
কুষ্টিয়া	৩৫	৯৯২	১৭০৩	১০৭৬	২৮৯৪	২৭	৬৭২৭
যশোর	৫	৫৪৯	৩২৬	২২০	৫৪৯	৪	১৬৫৩
খুলনা	১৩	৬২৭	২৯০	১২৯	৫৪৯	৪০	১৬৪৮
রাজশাহী	৫৮	২৪৫৩	৪৬৯০	২৫৪৬	৮৯২৭	১৬৪	১৮৮৩৮
দিনাজপুর	২	৪৭	৪০	১৮	৪৮	১২	১৬৭
রংপুর	-	১৫৬	১৪১	৫৮	৭৬	১০	৪৪১
বগুড়া	-	১৩১	১৫৫	৭২	১১৭	-	৪৭৫
পাবনা	২২	১৪১৫	৩২০৯	১৮৪৫	৩৬৭৭	২৮	১০১৯৬
ঢাকা	৩	১৩৯১	১১০৪	৯৯৮	১০৮৮	২৭	৪৬১১
ময়মনসিংহ	১৩	৮৩৬	৭৩৬	২৭৫	৪৩৪	১৭	২৩১১
ফরিদপুর	৬	৯৮০	১১০৭	১০০৮	১৬৮৫	৪১	৪৮২৭
বাখরগঞ্জ	১২	৬৪৪	৭১৫	৩৫১	১২৮৮	১৪	৩০২৪
ত্রিপুরা	১৬	৪২৪	৪৭৫	২৯০	২৫৪	২	১৪৬১
নোয়াখালী	২৫	৪৭০	৪৬০	১১৩	৩০২	১	১৩৭১
চট্টগ্রাম	১২	১৭৫	১২৫	৫১	৫৬	৩	৪২২
সিলেট	১	২৭	২৫	১	৩০	-	৮৪
অন্যান্য	-	১০৯	১৭৪	৫৮	১১৫	৮	৪৬৪
মোট	২২৩	১১৩১৪	১৫৩০১	৯০৫১	২১৯৭৪	৩৯০	৫৮,৭২০

(এর বাইরে ৯ জন এসেছিলেন পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে)

(*Murshidabad, Census-1951,* pp. 111-118.)

অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে সারণি-৮ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রত্যেক বছরে আলাদাভাবে এবং সর্বমোট সংখ্যার বিচারে পূর্ববঙ্গের রাজশাহী জেলা থেকে সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় উদ্বাস্তু মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালী দাঙ্গার সময়কালে স্বাভাবিকভাবেই নোয়াখালী থেকে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা রাজশাহীর পরেই। কিন্তু ১৯৪৭ সাল থেকে রাজশাহীর পরে যথাক্রমে পাবনা, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরের স্থান।

তবে প্রথম দিকে পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলা থেকে উদ্বাস্তু আগমনের সংখ্যা বেশি হলেও (দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান) পরের বছরগুলিতে ফরিদপুর থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১-তে এসে ফরিদপুর উদ্বাস্তু আগমনের উৎপত্তিগত জেলা হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। পরবর্তীকালেও এই ফরিদপুর জেলা থেকে অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তুরা আসতে থাকে যা সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে সমর্থন করে। রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া ইত্যাদিতে সম্পদশালী বর্ণ-হিন্দুদের বসবাস ছিল যার কারণে দেশভাগের প্রথম দিকে এরা বেশি সংখ্যায় আসতে থাকে। ফরিদপুর জেলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকের বসবাস বেশি তাই পরের দিকে আসা উদ্বাস্তুরা বেশিরভাগই দেখা যায় ফরিদপুর জেলার মানুষ যা সমগ্র বাংলার উদ্বাস্তু আগমনের সাধারণ প্যাটার্নটি অনুসরণ করে।

মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় এই উদ্বাস্তু আগমন চলতে থাকে পরবর্তী দশকেও। ১৯৬১ সালে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমন সারণি-৯-এ দেখানো হল। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পাকিস্তান থেকে আগত মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বসবাসকারী মোট উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৪,৪৭৪ ও ৬৪,৮৬২; যা ওই দুই জেলার মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৫.৩ শতাংশ ও ২.৮ শতাংশ।[118] অতঃপর দেখা যাচ্ছে ১৯৬১ সালে এই দুই জেলায় উদ্বাস্তু জনসংখ্যা প্রায় সমান। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুর যথাক্রমে ২.১০ শতাংশ ও ২.১১ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় সমান।

সারণি-৯ ১৯৬১ সালে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা

সাল -১৯৬১	মালদা	মুর্শিদাবাদ	পশ্চিমবঙ্গ
পুরুষ	৩৩,৩০৫	৩৪,১০৬	১,৬৭১,৯১৫
মহিলা	৩১,১৬৯	৩০,৭৫৬	১,৩৯৬,৮৩৫
মোট	৬৪,৪৭৪	৬৪,৮৬২	৩,০৬৮,৭৫০

(West Bengal and Sikkim, Vol-xvi, Part-II-C(ii), *Census-1961,* p. 54; *Murshidabad, Census-1961,* p. 93; *Malda, Census-1961,* p. Ixviii.)

১৯৬১ সালের জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুদের এই দুই জেলায় অবস্থানকাল সারণি-১০-এ নির্দেশ করা হল। এর মধ্যে মালদা জেলার ক্ষেত্রে ১৯৫১-১৯৫৫ পর্যন্ত ১৯,৬২৬ জন, ১৯৫৫-১৯৬০ পর্যন্ত ৯,০৪৪ জন এবং ১৯৬০-এর ১-লা মার্চ থেকে ১৯৬১-এর ২৮ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২,১৩৬ জন উদ্বাস্তু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মালদা জেলায় এসেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে, ১৯৫১-১৯৫৫ পর্যন্ত ১৪৯০০ জন, ১৯৫৫-১৯৬০ পর্যন্ত ১৬,৬১৩ জন এবং ১৯৬০-এর ১-লা মার্চ থেকে ১৯৬১-এর ২৮-শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২০০০ জন উদ্বাস্তু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। এইভাবে

[118] *Malda Gazetteers, 1969,* p. 83; *Murshidaba Gazetteers, 1969*, p. 94.

১৯৫১ এর ১-লা এপ্রিল থেকে থেকে ১৯৬১ এর মার্চ মাস পর্যন্ত মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট যথাক্রমে ৩০,৮০৬ জন ও ৩৩,৫৩৩ জন উদ্বাস্তু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন।[119]

সারণি-১০ ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুদের এই দুই জেলায় অবস্থানকাল

জেলা	১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জেলায় বসবাসের সময়			
	১ বছরের কম	১-৫ বছর	৬-১০ বছর	১১-১৫ বছর
মালদা	২১৩৬	৯০৪৪	১৯৬২৬	২৬৬৪৯
মুর্শিদাবাদ	২০১৯	১৬৬১৩	১৪৯০১	২৪৯৯৫

(West Bengal and Sikkim, *Census-1961,* pp. 164-165 & 172-173)

তবে এই দুই জেলার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো একটি বিষয় হল ১৯৫১ পর্যন্ত এই দুই জেলাতেই পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় ষাট হাজারের কাছাকাছি উদ্বাস্তু এসেছিলেন। ১৯৫১-১৯৬১ পর্যন্ত এক দশকে এই দুই জেলাতেই পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি উদ্বাস্তু এসেছিলেন। অথচ এই দুই জেলাতেই ১৯৬১ সালের মোট উদ্বাস্তু জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬৪ হাজার মতো। অর্থাৎ ১৯৫১-১৯৬১ এই এক দশকে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি যথাক্রমে ৪,২৭৬ এবং ৬,১৩৩ (দ্রষ্টব্য সারণি-৪ ও ৬)। স্বাভাবিক জন্ম ও মৃত্যুহার বিবেচনা করলে যা হওয়া উচিত ছিল প্রায় নব্বই হাজারের কাছাকাছি। এর অর্থ দাঁড়ায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সমস্ত উদ্বাস্তুই যে এই দুই জেলায় থেকে গিয়েছিলেন তা নয়। এর প্রমাণ হল সারণি-১০-এ ১১ থেকে ১৫ বছর আগে পর্যন্ত এই দুই জেলায় বসবাসকারী উদ্বাস্তু সংখ্যা যথাক্রমে ২৬,৬৪৯ ও ২৪,৯৯৫ জন। হিসেব অনুযায়ী এরা ১৯৪৬-১৯৫১-এর মধ্যে এসেছিলেন, অথচ ১৯৫১-এর জনগণনা অনুযায়ী উক্ত কালপর্বে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা যথাক্রমে ৬০,১৯৮ ও ৫৮,৭২৯। এর থেকে স্পষ্টতই প্রমাণ হয় ১৯৪৬-১৯৫১-এর মধ্যে আসা সকল উদ্বাস্তুই এই দুই জেলায় থেকে যান নি। জেলা দুটির প্রতিটি থেকে প্রায় ৩০ হাজার সংখ্যক উদ্বাস্তু তাহলে কোথায় গেলেন? এর সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে এক, একটা অংশ পুনরায় পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন। বর্তমান গবেষণার জন্য নেওয়া সাক্ষাৎকারগুলি থেকে জানা যায় অনেকেই পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন ও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন।[120] দুই, একটি অংশ সরকারি পুনর্বাসন ব্যবস্থার অন্তর্গত দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে ভিন-রাজ্যে পুনর্বাসিত হন যদিও সংখ্যাটা অল্প। সাক্ষাৎকার দানকারীরা অনেকেই উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের দণ্ডকারণ্যে থাকার কথা জানিয়েছিলেন।[121] তারা ফিরে এলেও সবাই দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে আসেন নি, কেউ কেউ ওখানেই থেকে গেছিলেন। তিন, অনেকে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় বসতি গড়ে তোলার জন্য বা নিজেদের আত্মীয়র কাছে চলে গিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকার থেকেও এমন তথ্য উঠে আসে।[122] আবার মালদা জেলার ক্ষেত্রে দেখা যায়,

[119] *Malda Gazetteera, 1969,* p. 64; *Murshidaba Gazetteers, 1979,* p. 94.

[120] সাক্ষাৎকারঃ- দয়াল বিশ্বাস মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকারঃ- নির্মল সরকার; সাক্ষাৎকারঃ- মন্মথা বালা মালদা।

[121] সাক্ষাৎকার:-তরুণ কুমার ভাওয়াল, মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকার:-নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ।

[122] সাক্ষাৎকার:- শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, বয়স-৭০, পেশা- কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ২৯/১০/২০২২।

বিভিন্ন জেলা ঘুরে উদ্বাস্তুরা মালদা জেলায় এসে উঠছিলেন পঞ্চাশের দশকে। মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক উদ্বাস্তু যারা এই জেলার বিভিন্ন সরকারি ক্যাম্প ও কলোনি বা চরগুলিতে ছিলেন পরবর্তীকালে তাদের অনেকে মালদা জেলায় চলে যান।[123] উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মালদা জেলার শান্তি রঞ্জন বিশ্বাস যেমন ফারাক্কা ব্যারেজের কাজ শুরু হয় তখন ফারাক্কার চরেই ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মালদায় এসেছিলেন।[124] মুর্শিদাবাদ জেলা থেকেও যে উদ্বাস্তুদের একটা অংশ মালদায় চলে গিয়েছিলেন, জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যটি তারই প্রমাণ। তবে মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে উদ্বাস্তুরা খুব কমই এসেছেন। মুর্শিদাবাদে নদীয়া, ২৪ পরগনা ইত্যাদি জেলা থেকে এসেছিলেন।[125] উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরে বর্তমানে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের বাস্তুহারা মানুষের বসবাস, যারা প্রথমে নদীয়া জেলার বগুলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[126] অনুরুপে জলঙ্গি ব্লকের সাদিয়ানদিয়াড়ে আগত উদ্বাস্তুরা প্রথমে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কলকাতার চারপাশে বস্তি খুঁজতে খুঁজতে ৪-৫ বছরের মধ্যে ১৯৫৯ সালে এই জেলায় এলেন। আবার ১৯৫০-১৯৫২ সালের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত ৫২টি বারুজীবী পরিবার প্রথমে শিয়ালদার প্ল্যাটফর্মে, তারপর নদীয়ার ধুবুলিয়া ক্যাম্পে কিছুদিন কাটিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার আয়েসবাগে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা পেয়ে আসেন।[127] বর্তমান গবেষণা জন্য নেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, সুষমা জর্দার, নয়ন তারা সরকার, নির্মল সরকার এরা প্রাথমিকভাবে নদীয়া জেলায় আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন।[128] ১৯৩১-১৯৭১ পর্যন্ত বিভিন্ন দশকে মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংখ্যা সারণি-১১-এর মাধ্যমে দেখানো হল।

সারণি-১১ মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের জনসংখ্যার পরিবর্তন

ধর্ম/সম্প্রদায়	বিষয়	১৯৩১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
মুসলিম	মোট জনসংখ্যা	৭১,৬১,৫৮২	৯,৪৭,৮১৫	১২,৭৯,২৫৬	১৬,৫৬,৪০৬
	প্রতি দশকে গড় বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	+০.৪১	+১.২২	+৩.৪৯	২.৯৪
	জেলার মোট জনসংখ্যার যত শতাংশ	৫৫.৫৬	৫৫.২৪	৫৫.৮৬	৫৬.৩৩
হিন্দু	মোট জনসংখ্যা	৫,৮৯,৫৫১	৭,৬৫,২১৮	১০,০৯,৪৭০	১২,৭৭,৮৭৩
	প্রতি দশকে গড় বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন	-০.২৮	+১.৪৯	+৩.১৯	+২.৬৬
	জেলার মোট জনসংখ্যার যত শতাংশ	৪৩.০০	৪৪.৫৯	৪৪.০৮	৪৩.৪৬

(*Murshidaba Gazetteers, 1979,* p. 107.)

[123] Ranabir Samaddar, *The Marginal Nation,* p. 171.

[124] সাক্ষাৎকার:- শান্তি রঞ্জন বিশ্বাস, মালদা।

[125] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব,* পৃ-৯১।

[126] তদেব, পৃ. ১১১।

[127] তদেব, পৃ. ৯৮।

[128] সাক্ষাৎকার:- সুষমা জর্দার, মুর্শিদাবাদ। সাক্ষাৎকার:- নয়নতারা সরকার, মুর্শিদাবাদ। সাক্ষাৎকার:- নির্মল সরকার, মুর্শিদাবাদ।

১৯৩১-এর দশকে হিন্দু জনসংখ্যা কমে যায় কিন্তু ১৯৫১-তে তা বেড়ে যায় যা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববঙ্গ থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের আগমনকে ইঙ্গিত করে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই জেলায় হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা দশকীয় পরিবর্তন। ১৯৩১-এ -০.২৮% থেকে ১৯৫১ তে +১.৪১ এবং ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ এই ১০ বছরে এই বৃদ্ধি +৩.১৯ যেটা প্রমাণ করে, এই সমস্ত উদ্বাস্তুরা প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র এসে বিভিন্ন জেলা, ক্যাম্প ইত্যাদি ঘুরে পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ জেলায় এসেছেন।

পঞ্চাশের দশকে আসা উদ্বাস্তুদের অনেকে এমন ছিলেন যারা অবিভক্ত ভারতের সেনাবাহিনী, পুলিশ বা রেলে কাজ করতেন এবং তাদের পরিবার থাকতেন পূর্ববঙ্গে। দেশভাগের পর তারা অনেকে অপশন দিয়ে বা অবসর গ্রহণের পর পাকাপাকি ভাবে মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় চলে আসেন।[129] এই দশকে মালদা জেলায় যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন তারা মূলত তপশিলি ও তপশিলি উপজাতি ভুক্ত, বেশিরভাগই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়, এছাড়াও ছিলেন হালদার, কাপালি, মালো, পাহাড়ি ইত্যাদি। এরা ছিলেন সাধারণত কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী। এরা মালদা জেলাতে এসে নিজেদের পেশাকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে মুর্শিদাবাদে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, স্বল্প কিছু আদিবাসী ও নমঃশূদ্র। এরা ছিলেন মূলত মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী। রাজশাহীর 'হালদার' পদবীযুক্ত মৎস্যজীবীরা এই সময় এসেছিলেন। বরিশাল, নোয়াখালী, ফরিদপুরের বারুজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরাও ছিলেন।

পরবর্তী দর্শক অর্থাৎ ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত হযরত (সাঃ) চুল চুরির ঘটনা ও পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থার অবনতি, দুর্ভিক্ষ এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেও বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু এসেছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু সংখ্যা সারণি-১২-তে দেওয়া হল।

সারণি-১২ ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলা ও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সংখ্যা

সাল -১৯৭১, মার্চ মাস পর্যন্ত	মালদা	মুর্শিদাবাদ	পশ্চিমবঙ্গ
পুরুষ	৩৫,৩৮৩	৩৭,৪৪৭	১,৬৫৫,৪০৮
মহিলা	৩৩,৮১৯	৩৭,৮৬১	১,৪২২,৭৯৪
মোট	৬৯,২০২	৭৫,৩০৮	৩,০৭৮,২০২

(West Bengal, Part-II-D (i), Migration tables, *Census-1971,* pp. 10, 36 & 46)

১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পাকিস্তান থেকে আগত মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৭১-এর মার্চ মাস পর্যন্ত বসবাসকারী মোট উদ্বাস্তু সংখ্যা যথাক্রমে ৬৯,২০২ ও ৭৫,৩০৮; যা ওই দুই জেলার মোট

[129] Monika Mandal, *Settling the Unsettled: A Study of Partition Refugees in West Bengal*, (New Delhi: Manohar Publishers and Distributors), p. 226.

জনসংখ্যার যথাক্রমে ৪.৩% ও ২.৬%।[130] উপরের সারণি অনুসারে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুর যথাক্রমে ২.২৪% ও ২.৪৪% অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের মতোই এই দুই জেলাকে উদ্বাস্তুরা আশ্রয়স্থল হিসেবে সমান ভাবেই পছন্দ করছেন। এই দুই জেলার স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য উদ্বাস্তুদের কোনো একটি জেলাকে অপর জেলার তুলনায় বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে পারেনি। ১৯৭১ সালের জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী; মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুদের এই দুই জেলায় অবস্থানকাল সারণি-১৩-তে নির্দেশ করা হল।

সারণি-১৩ ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুদের এই দুই জেলায় অবস্থানকাল

জেলা	১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জেলায় বসবাসের সময়		
	১ বছরের কম	১-৯ বছর	১০ বছরের বেশি
মালদা	১০৭৫	২৩৬২৫	৪০৩০৫
মুর্শিদাবাদ	১১২৫	২৩১১০	৪৪৯৭০

(*West Bengal, Census-1971,* pp. 100-101 & 128-129)

এর মধ্যে ১৯৬১-১৯৭০ পর্যন্ত মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় যথাক্রমে ২৩,৬২৫ জন ও ২৩,১১০ জন এবং ১৯৭০-এর ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৭১-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যথাক্রমে ১,০৭৫ জন ও ১,১২৫ জন উদ্বাস্তু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মালদা জেলায় আসেন। অর্থাৎ ১৯৬১ থেকে ১৯৭১-এর মার্চ মাস পর্যন্ত এক দশকে মালদা ও মুর্শিদাবাদের জেলায় যথাক্রমে ২৪,৭০০ জন ও ২৪,২৩৫ জন উদ্বাস্তু এসেছিলেন। পঞ্চাশের দশক ও ষাটের দশকে এই সংখ্যাটি ছিল যথাক্রমে ষাট হাজার এবং ত্রিশ হাজারের উপরে। অর্থাৎ এই পর্যন্ত প্রত্যেক দশকে উদ্বাস্তু আগমনের সংখ্যা কমতে থাকে। কিন্তু এর অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক উত্তাল পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গের বহু মানুষ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে সাময়িকভাবে আশ্রয়গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পর থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা এসেছিলেন। যাদের বেশিরভাগ অংশই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে প্রত্যাবর্তন করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা ব্লকের মধুপুর থেকে নবাগত উদ্বাস্তুগণ বাংলাদেশ গঠনের চার-পাঁচ মাসের মধ্যে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।[131] যার কারণে, ১৯৭১-এর শেষের দিকে মালদা ও মুর্শিদাবাদের উদ্বাস্তু জনসংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১ লাখ ২৭ হাজার ও ১ লাখ ৩৫ হাজার (দ্রষ্টব্য সারনি-১৫)। অবশ্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু জনসংখ্যার তুলনায় যা খুব কম। ১৯৭১-এর ১৭-ই সেপ্টেম্বর মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তনকারী আশ্রয় প্রার্থীদের পরিসংখ্যান সারণি-১৪-এ দেওয়া হল-

[130] *West Bengal, Census-1971,* pp. 10, 36 & 46.

[131] সাক্ষাৎকারঃ- শচীন প্রামানিক, গণিত শিক্ষক, cited- ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব,* পৃ. ৯৮।

সারণি-১৪ পশ্চিম বাংলা থেকে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়া উদ্বাস্তুদের মোট সংখ্যা (১৭-ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এর হিসাব)

জেলা	শিবির-নিবাসী উদ্বাস্তুর সংখ্যা	শিবির-বহির্ভূত উদ্বাস্তুর সংখ্যা	মোট
২৪ পরগণা	১৫০১৮৩৪	৫২৫৮৭৭	২০২৭৭১১
নদিয়া	৯৯৯১২০	১২৫০০০	১১২৪১২০
মুর্শিদাবাদ	৩৩৫১২১	১৩৮৮২৬	৪৭৩৯৪৭
মালদা	১৩৪৪৩১	২৬১০১২	৩৯৫৪৪৩
পশ্চিম দিনাজপুর	১৩৬২৬৩৯	৪৪৩৯২৩	১৮০৬৫৬২
দার্জিলিং	৯৩৫৬	১১১৪৭	২০৫০৩
জলপাইগুড়ি	১৮৪৪৫০	৪৯৬৪৯২	৬৮০৯৪২
কোচবিহার	৪৫৪২০৭	৩৫৮৮৮৩	৮১৩০৯০
মেদিনীপুর	১১৬২৭৪	শূন্য	১১৬২৭৪
বাঁকুড়া	৮৯১৬৬	শূন্য	৮৯১৬৬
পুরুলিয়া	৮৯৭৪৬	শূন্য	৮৯৭৪৬
হুগলি	শূন্য	১৪৪৩৩	১৪৪৩৩
বর্ধমান	শূন্য	১০৫৩৫	১০৫৩৫
মোট	৫২৭৬৩৪৪	২৩৮৬১২৮	৭৬৬২৪৭২

(অভিজিৎ দাশগুপ্ত, *বিস্থাপন ও নির্বাসন ভারতের রাষ্ট্র উদ্বাস্তু সম্পর্ক,* পৃ. ১৯০)

সারণি:-১৫ ১৯৭১-এ মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলা এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মোট উদ্বাস্তু সংখ্যা।

রাজ্য /জেলা	উদ্বাস্তু জনসংখ্যা	
	মোট	শতাংশ
পশ্চিমবঙ্গ	৫৮,৮১,৭২৫	-
মালদা	১,২৭,৫০০	২.১৭
মুর্শিদাবাদ	১,৩৫,০০০	২.২৯

(অভিজিৎ দাশগুপ্ত, *বিস্থাপন ও নির্বাসন ভারতের রাষ্ট্র উদ্বাস্তু সম্পর্ক,* পৃ. ৩৫)

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে শেষের দিকে যুদ্ধ শেষ হওয়ায় প্রায় এক কোটি উদ্বাস্তুকে দেশে ফেরানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। বাংলাদেশে উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন ধাপে ধাপে চলতে থাকে। তাদের কাছে থাকা রেশন কার্ড ফেরত দিয়ে 'উদ্বাস্তু প্রত্যাবর্তন কার্ড' সংগ্রহ করতে বলা হয় যাতে করে বাংলাদেশে পৌঁছে তারা আরো ত্রাণ পেতে পারে। ভারত সরকারের তরফ থেকে উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে তাদেরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।[132]

[132] *আনন্দ বাজার প্রত্রিকা,* ১৯-ই ডিসেম্বর ১৯৭১।

৩.৪ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের জীবন-সংগ্রামঃ

আজন্ম পরিচিত নিরাপদ আশ্রয়টি ছেড়ে বেরিয়ে আসার দিন থেকেই উদ্বাস্তু মানুষগুলোর সংগ্রামের জীবন শুরু হয়। এই সংগ্রামের শুরু হয়েছিল, নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র, সামর্থ্য অনুসারে সম্পদ, পথের খাবার ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে ভারতের সীমানা লক্ষ্য করে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর অনন্তকালীন যাত্রা দিয়ে। প্রতিটি নিশ্চিন্ত ভারতবাসী যখন স্বাধীনতার অমৃত স্বাদ অস্বাদন করছেন তখন সীমানার 'ভুল দিকে থেকে যাওয়া' এই সকল মানুষগুলি দিনের পর দিন, মাইলের পর মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করা, দিনের শেষে সন্ধ্যা নামলে কোন গাছতলা, স্কুল, পরিত্যক্ত বাড়িতে সাময়িক আশ্রয়গ্রহণ করা, আবার সূর্য ওঠার সাথে সাথে হাঁটতে থাকা ইত্যাদি; সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছানো অবধি এই রোজনামচায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।[133] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতায় "বয়স্ক পুরুষের মাথায় এবং হাতে জিনিসপত্র বয়স্ক মেয়েদের কোলে শিশু এবং তাদের হাত ধরে হাটবার ক্ষমতা রাখে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে সারি দিয়ে আসতো। পশ্চিমবাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের নানা অংশে এইরকম পায়ে চলা উদ্বাস্তু পরিবারের স্রোত দিনের পর দিন প্রবাহিত হয়েছিল"।[134] পথে ছিল আক্রমণের ভয়, অসুস্থতা, গর্ভবতী মায়েদের প্রসব যন্ত্রণা, কত মানুষের মৃত্যু। এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের মুখে শোনা যায় তারা ফরিদপুর যশোর, বরিশাল, পাবনা, কুষ্টিয়া জেলাগুলি থেকে একসঙ্গে হাজারে হাজারে একটানা কেউ সাত দিন, কেউ এগারো, বারো দিন ধরে হাটতে হাঁটতে এসেছিলেন; 'মাথায় বোঝা, বাচ্চা কোলে' করে এক একদিনে তারা সাত কিলোমিটার, কুড়ি কিলোমিটার করে হাঁটতেন।[135] শরণার্থী মানুষদের এই দুঃসহ যাত্রায় বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত পরিবারের সদস্যরাও থাকতেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা বিভিন্ন বই-এর প্রচ্ছদে স্থান পাওয়া হৃদয়স্পর্শী ছবি তাদের জীবনের বর্ণনাতীত সংগ্রাম ও করুন কাহিনী পরিব্যক্ত করে, তা সে ঘাড়ে করে বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে আসা হোক বা ঝাঁকায় করে বৃদ্ধা মাকে, বা আসন্ন প্রসবা গর্ভবতী মহিলাদেরকে বহন করে নিয়ে আসা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগে সাময়িকভাবে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থী দলের একটি চিত্র নবকৃষ্ণ বিশ্বাসের লেখা গ্রন্থের প্রচ্ছদে পাওয়া যায় যেখানে এক বয়স্ক ব্যক্তি তার প্রৌঢ়া মাকে কাঁধে পিঠে করে নিয়ে আছেন এবং তার তলায় লেখা "মা-কে পথে ফেলে রেখে যাব না"।

উক্ত নবকৃষ্ণ বিশ্বাসও সেই যাত্রায়, তার বয়ঃবৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে আসার পথে তার ঘাড়ের উপর ভর দিয়ে তার বাবাকে নিয়ে আসতে গিয়ে কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, কখনো বা তিনি দল থেকে পিছিয়ে পড়েছেন এসবের বর্ণনা দিয়েছেন। তার আরও অভিজ্ঞতা "আমার বড় মামার ছেলে মতিলালদা তার পরিবার নিয়ে আমাদের সাথে এসেছিল। তার মেয়ে নিভা নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে পঙ্গু। সে প্রাণপনে চিৎকার করে কেঁদে বারবার তার বাবাকে বলছে, "বাবা আমাকে ফেলে তোমরা চলে যেও না"। মতিদার চোখে জল, বৌদি

---

[133] সাক্ষাৎকারঃ- তরুণ কুমার ভাওয়াল, মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকারঃ- শংকর বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[134] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* পৃ. ৯৬।

[135] সাক্ষাৎকারঃ- শঙ্কর বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকারঃ- দয়াল বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকারঃ- তরুণ কুমার ভাওয়াল, মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকার:- কোমল হালদার, মুর্শিদাবাদ।

কাঁদছে। ৩০-৩৫ কেজি ওজনের মেয়ে ঘাড়ে করে আনতে আনতে দাদার ঘাড় ফুলে উঠেছে। মেয়ের আকুল কান্নায় তাকে আবার ঘাড়ে তুলতে হল। হায়রে মায়া! পথে দেখেছি বুড়ো-বুড়ি বসে বসে কাঁদছে তার ছেলেরা তাদের ফেলে নাকি ছেলে মেয়েদের নিয়ে চলে গেছে"।[136] এরকম কতশত দৃশ্য উদ্বাস্তু জীবনের সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

চিত্র-২ "মা-কে পথে ফেলে রেখে যাব না"।

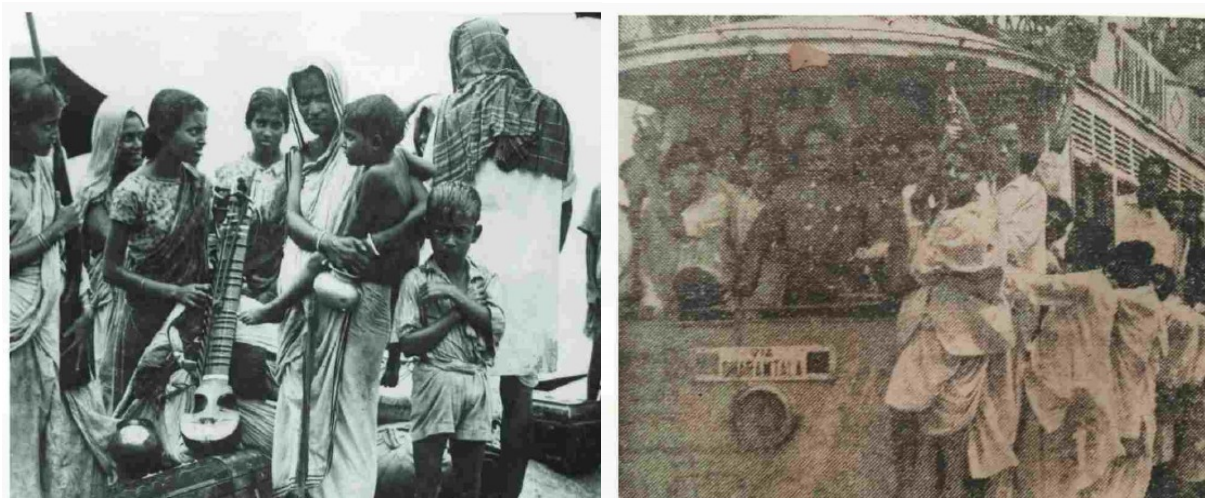


শুধু সীমানা পর্যন্ত পৌঁছানোই নয় সীমান্তে এসে উপনীত হয়ে শুরু হয় তাদের আর এক সংগ্রাম। শিয়ালদা স্টেশন থেকে শুরু করে সীমান্তের বিভিন্ন ইন্টার সেপশন সেন্টারগুলিতে কলেরা ও অন্যান্য রোগের প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ, 'উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় পাওয়ার যোগ্য' সার্টিফিকেট সংগ্রহ ইত্যাদি সেরে ত্রাণ ও পূনর্বাসন দপ্তরে লাইন দেওয়া আর উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় পাওয়ার জন্য স্টেশন চত্তর বা ঐ সমস্ত সেন্টারগুলিতে অপেক্ষা করতে থাকা,- এই ছিল পরিচিত দৃশ্য। অমৃতবাজার পত্রিকায় শিয়ালদা স্টেশনে অবস্থানকারী এ সকল উদ্বাস্তু পরিবারগুলির দুর্দশার করুন চিত্র বর্ণনা করা হয়েছিল, "প্ল্যাটফর্মের কিছুটা জায়গা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। উদ্বাস্তু শিবিরে স্থান না পাওয়া পর্যন্ত এই জায়গাটাই তাদের ঘরবাড়ি। এই অল্প পরিসর জায়গায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে গাদাগাদি করে দিন কাটাচ্ছে। এত মানুষের পানীয় জল সরবরাহের জন্য জলের কল মাত্র তিনটি, মহিলাদের জন্য পায়খানা মাত্র দুটি, পুরুষদের জন্য মাত্র বারুটি"। কেউ অসুস্থ হলে বা মহিলাদের প্রসব যন্ত্রণা উঠলে সাহায্যের কোনো আশা ছিল না। পত্রিকার সাংবাদিক আরও বলেছেন "আমি যখন সাউথ স্টেশনে গেলাম তখন দেখলাম, একজন কঙ্কালসার উলঙ্গ মানুষ হাজার হাজার নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের সিঁড়িতে মলত্যাগ করছে। শুধু তাই নয়, হাজার মানুষের ব্যবহার করা পায়খানা থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে খোলা জায়গায় মানুষ ঘুমাচ্ছে। তিনটি ইট দিয়ে উনুন তৈরি করে আবর্জনা জ্বালিয়ে রাস্তার পাশে রান্না করা খাবার খাচ্ছে"। একসঙ্গে ঠাসাঠাসি করে থাকা এত সংখ্যক উদ্বাস্তুদের চাপে প্লাটফর্মের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছিল; কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়রিয়া, বদহজম, আমাশয় ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন দুর্দিনেও তাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিতে ছাড়েনি কিছু

[136] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* পৃ. ৪২।

সুবিধাবাদী মানুষ। প্ল্যাটফর্মে থাকাকালীন সরকারের পক্ষ থেকে শরণার্থীদের রেশন হিসেবে বিনা পয়সায় চিঁড়ে, গুড় দেওয়া হত। ত্রাণকর্মী সেজে কিছু মানুষ এদের সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। সরকারি বরাদ্দ পাইয়ে দেবে বলে তারা অর্থ ও ডোলের কিছু অংশ দাবি করত। সাপ্তাহিক মাথাপিছু দু টাকা ডোল, শুকনো চিঁড়ে, গুড়ের বরাদ্দের জন্য কাড়াকাড়ি, কল থেকে জল আনার জন্য মারামারি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রাহীনতা, রোগশোক প্রতিমুহূর্তে তাদের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল।[137]

চিত্র-৩ নৌকা ও ট্রেন বোঝাই করে শরণার্থীদের ঢল।



(Partition Horrors Remembrance Day, 14 August 2021, Govternment of India, pp. 34 & 39.)

চিত্র-৪ শিয়ালদা স্টেশনের করুণ চিত্র।



(আনন্দ বাজার পত্রিকাঃ আরও আনন্দ, ৮-ই এপ্রিল ২০২৪ (অনলাইন)।; File No:- G.P.361.5 (1) (5415) w 52 mi, *The Live Again: Millions Came from Eastern Pakistan,* Govt. of West Bengal,1954.; আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১২-ই সেপ্টেম্বর ২০২০ (অনলাইন)।)

এই সকল মানুষদের দুর্দিন এখানেই শেষ হয়নি, শিয়ালদা স্টেশন এবং বিভিন্ন ইন্টারসেপশন সেন্টারগুলি থেকে উদ্বাস্তুদের পরবর্তী ঠিকানা সরকারি ক্যাম্প হিসেবে সেনাব্যারাকের গুদামঘরগুলি বা তাঁবুগুলিতে তাদের মনুষ্যেতর জীবন যাপনের, দিন গুজরানের নীরব সংগ্রাম চলতে থাকে। ব্যারাকের প্রতিটি

[137] *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ৮ই অক্টোবর ১৯৪৮।

ঘরে কুড়িটি করে পরিবার রাখা হত। প্রতিটি পরিবার তাদের জন্য বরাদ্দ জায়গাটুকু পৃথক করার জন্য ভাঙা ইট ও পাথরের টুকরো দিয়ে ঘিরে দিত।[138] সেখানে আড়ালের কোনো প্রশ্নই ছিল না, 'প্রাইভেসি' নামক শব্দটি ছিল সেখানে সোনার-পাথর-বাটি। হাজার হাজার উদ্বাস্তুর জন্য অপর্যাপ্ত এই সমস্ত ব্যারাকগুলিতে স্থানসংকুলান না হলে পুরনো সামরিক তাঁবুগুলিতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের রাধাশ্যাম নন্দীর বর্ণনায় "কিছু লোক ছিল মিলিটারি ক্যাম্পের বিল্ডিং-এ, আমরা বাকিরা ফাঁকা মাঠে বহুদিন তাঁবু টাঙিয়ে ছিলাম। সরকার থেকে ১১-১৫ বান্ডিল টিন দিয়েছিল সেগুলি ছিল মরচে পড়া। তাঁবুর কালো রঙের জন্য প্রচুর গরম লাগত।" দুপুরের প্রচন্ড রোদে অসহ্য তাঁবুর গরমেই তাদের থাকতে হত।[139] জানা যায়, তাঁবুগুলি ছিল ছোট ছোট; এক একটি পরিবারের জন্য এক একটি তাঁবু বরাদ্দ ছিল।[140] কোথাও তাঁবুর আকার একটু বড় হলে সেখানে দশটি পরিবারকে একত্রে রাখা হত। রেজিনগর ক্যাম্পে এরকম ঘটনার কথা শোনা যায়।[141] এই দুই জেলার অনেক উদ্বাস্তু প্রাথমিকভাবে উল্টোডাঙ্গার ত্রাণ শিবিরে ছিলেন; সেখানেও ছিল টিনের ঘর, গরমে প্রচুর অসুবিধা হত।[142] শারীরিক অসুবিধা তো হতই তার সঙ্গে এই পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়ার জন্য ছিল মানসিক কষ্ট। মুর্শিদাবাদ জেলার নীলকান্ত বিশ্বাসের কণ্ঠে এই কষ্টের কথা ঝরে পড়ে "বাড়ি ঘরে থাকা মানুষ তাঁবুর তলে থাকা, দুঃখ তো হতই"। ছিল জলের জন্য হাহাকার। অল্পসংখ্যক টিউবওয়েল সকলের চাহিদা পূরণ করতে পারত না, তার উপরে আবার কিছু সংখ্যক বিকল বা খারাপ হয়ে থাকত।[143] পরবর্তী অধ্যায়ে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত আলোচনায় এই সকল দুরাবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে।

মালদায় আগত জনৈকা বকুল রানী বিশ্বাস রাস্তার জল খেয়ে তার বোনের কলেরায় আক্রান্ত হওয়া ও মারা যাওয়ার করুণ কাহিনী শোনান।[144] মুর্শিদাবাদের নির্মল সরকার বলেছেন "ক্যাম্পে শুধু পাতার মেঝে, চিকিৎসা সবাই পেত না, মেয়েদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা ছিল না"[145] রেজিনগর ক্যাম্পের ক্ষেত্রে শোনা যায়; গর্ভবতী মেয়েদের জন্য কোনো ব্যবস্থাই ছিল না।[146] যার জন্য প্রফুল্ল চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন,- "একটি শান্তিপূর্ণ সুন্দর বাসস্থানের আশায় এই হতভাগ্য মানুষগুলি যে বিপদ সংকুল পথে যাত্রা শুরু করেছিল তা এসে শেষ পর্যন্ত সরকারি ক্যাম্পের অন্ধকার কানা গলিতে থামল। যখন তারা যাত্রা শুরু করেছিল তারা ছিল মানুষ। এখন তারা সরকারি ক্যাম্পের অবয়বী অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে লাগল"।[147] মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত তরুন কুমার ভাওয়াল উল্টোডাঙ্গায় উদ্বাস্তু ত্রান শিবিরে থাকাকালীন

---

[138] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ. ২৬।

[139] সাক্ষাৎকার:-রাধাশ্যাম নন্দী, মুর্শিদাবাদ।

[140] সাক্ষাৎকারঃ-নীলকান্ত বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[141] সাক্ষাৎকার:-নয়নতারা সরকার, মুর্শিদাবাদ।

[142] সাক্ষাৎকার:-তরুণ কুমার ভাওয়াল।

[143] *Estimate Committee Reports (1959-60),* 2nd Lok Sabha, Ministry of Rehabilitation, New Delhi, p. 2.

[144] সাক্ষাৎকার:-বকুলরাণী বিশ্বাস, মালদা।

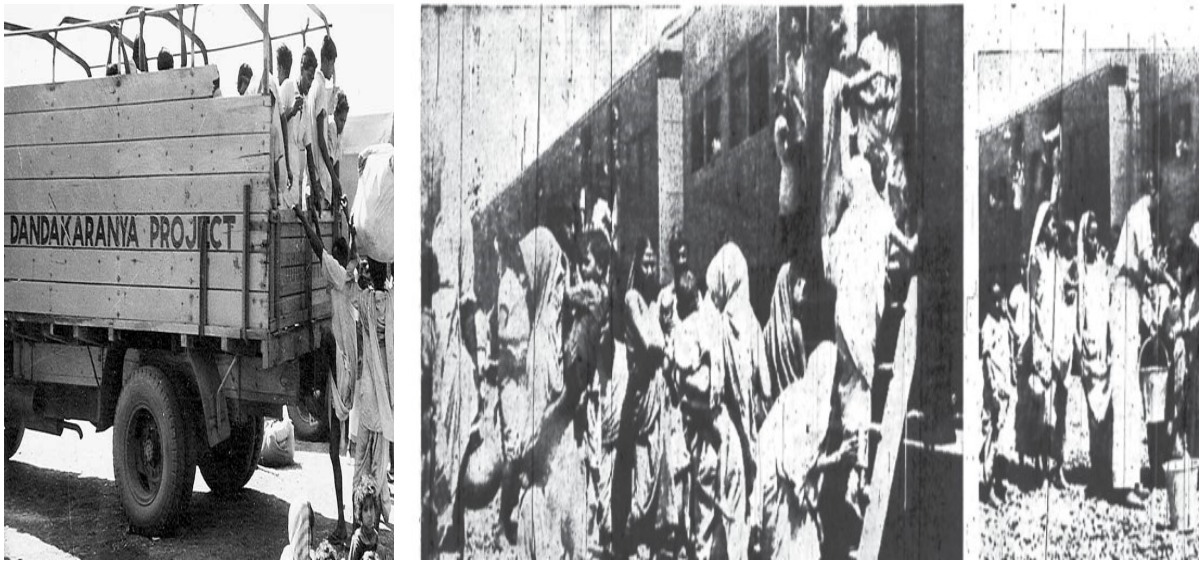
[145] সাক্ষাৎকারঃ-নির্মল সরদার, মুর্শিদাবাদ।

[146] সাক্ষাৎকারঃ- নয়নতারা সরকার, মুর্শিদাবাদ।

[147] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ. ২৬।

ক্যাম্প জীবনের করুণ চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "কেউ মারা গেলে পরিবারের লোক কাঁদত না। কাঁদলে রেশন বন্ধ হয়ে যাবে। পৌরসভা থেকে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে সৎকার করে দিত, কিন্তু কার মৃত্যু হয়েছে ডিক্লেয়ার করা হত না।"[148] এসবের পরেও ছিল আবার ভিন রাজ্যে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিতের জীবনযাপন করার দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন ত্রাণ শিবির থেকে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যে যেমন মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্য, ভুবনেশ্বর ও বালেশ্বরের বিভিন্ন দণ্ডকারণ্যে, এমনকি সুদূর আন্দামানেও পাঠানো হত। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে বিজন প্রান্তরে তারা অধিকাংশই টিকতে পারেননি আবার বাংলায় ফিরে এসেছিলেন। কারণ আগেই বলা হয়েছে, অন্য রাজ্যের এই সমস্ত ক্যাম্প বা কলোনিগুলিতে চাষযোগ্য জমির অভাব ছিল, যে জমিগুলো ছিল সেগুলো ছিল নিম্নমানের, নীচু জায়গায়, ভালো জলসেচ বা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল না, শহরের সীমা থেকে দূরে, সামাজিক মেলামেশার সুযোগ ছিল না, কোনো কোনো অঞ্চল ছিল ম্যালেরিয়া প্রবণ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের আঁতুরঘর।[149] নিরঞ্জন মিত্রের কণ্ঠেও দুর্ভোগের কথা ধরা পড়ে, তারা স্টিমারে করে এদেশে এসে রানাঘাট ক্যাম্পে ছিলেন সেখান থেকে তাদের উড়িষ্যায় পাঠানো হয়, উড়িষ্যায় খাবার বন্ধ হয়ে যায়। সেখান থেকে আবার হাওড়া স্টেশনে সরকারি ত্রাণ শিবিরে উল্টোডাঙ্গা ক্যাম্পে ছিলেন তিন মাস তারপর মুর্শিদাবাদের মহলন্দী কলোনিতে তাদের পুনর্বাসন হয়। মহলন্দী কলোনিতে বসবাসরত উদ্বাস্তু পরিবারগুলির কমবেশি সবারই এরকম অভিজ্ঞতা হয়। এইজন্য বেশিরভাগ শরণার্থীরা ক্যাম্পে থাকতে পারেননি। তারা নিজেদের চেষ্টায়, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সহায়তায় নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

চিত্র-৫ দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে উদ্বাস্তুদের হয়রানির ছবি।



(আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৫-ই সেপ্টেম্বর ২০২২ (অনলাইন)।; Anwesha Sengupta, *'The Railway Refugees: Sealdah, 1950s-1960s,* IDSK, Occasional Paper, March 2017, p.15.)

[148] সাক্ষাৎকার:-তরুণ কুমার ভাওয়াল।

[149] দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ ১১৫; *Report of the Committee of Ministers for the Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal,* Govt. of India Press, Calcutta, 1954, pp. 9-10, cited জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১৪৫-১৪৬।

যে সমস্ত উদ্বাস্তু ১৯৪৭-এর কাছাকাছি সময়ে চলে এসেছিলেন তাদের জন্য যদিও বা কিছু বরাদ্দ ছিল, যারা ১৯৭০-এর কাছাকাছি সময়ে এসেছিলেন তারা কোনোরকম সরকারি সাহায্য পান নি, তাদেরকেও নিজেদের চেষ্টাতেই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। মুর্শিদাবাদে আগত রাধাশ্যাম নন্দীর কথায়, "তারা দু দিক দিয়ে বঞ্চিত, সরকার থেকেও বঞ্চিত, ও দেশে সব ছেড়ে আসায় বঞ্চিত"।[150] ১৯৭০-এর দিকে আসা শরণার্থীদের অবস্থা হয়েছিল সবচেয়ে করুণ। তারা পূর্ববঙ্গে দিনের পর দিন যে অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে এসে সেই পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। তারা অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পেতে ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করতে এসেছিলেন কিন্তু পরিবর্তে কপালে যে দুর্ভোগ ও পাশবিক ব্যবহার জুটেছিল রাতে তাদের কাঙ্খিত পরিত্রাণ মেলে নি। তবে অত্যাচারগুলি এসেছিল অন্য পক্ষ থেকে। মুর্শিদাবাদে সেই সময় আগত শরণার্থীদের ত্রাণশিবির খোলা নিয়ে ভীষণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়। অনেক সংগ্রামের পর ত্রাণশিবির খোলার অর্ডার এলে তারা হাজারদুয়ারির নিকটবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের সশস্ত্র শিখ সৈন্য, আর্মি বোঝাই ট্রাক নিয়ে এসে টহল দিতে থাকেন এবং অফিসারেরা অতিথিভবনের সামনে অবস্থানরত শরণার্থীদের সেই স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তাদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন,- "হুমায়ুন মঞ্জিলে শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। পাকিস্তানের সৈন্য আর রাজাকাররা তোমাদের যা করেছে তার চেয়েও ভয়ানক কিছু করব। মেরে পিঠের ছাল তুলে দেব। চোখের জল আর নাকের জল এক করে দেব। তোমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায় হারিয়ে যাবে তার ঠিক থাকবে না।"[151] শরণার্থীদের প্রতি ভারত সরকারের এমন অমানবিক মুখ সেদিন তাদের ভীষণভাবে বিস্মিত করেছিল, এবং রাজাকারদের স্মৃতি উস্কিয়ে দিয়েছিল। ত্রাণ শিবির যদিও বা গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেই ত্রাণ শিবির থেকে প্রয়োজনীয় তাঁবুর ত্রিপলটুকু সংগ্রহ করতে তাদের নানা তাচ্ছিল্যের সম্মুখীন হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ তাদের অনেককেই বরাদ্দুটুকু চাইতে গিয়ে শুনতে হয়েছিল "এই তো এলেন, দুদিন ভিজুন, নাকের জলে চোখের জলে এক হন, তারপর ওসব পাবেন"। অনেক সময় আবার তাঁবু ফেলার জন্য নির্ধারিত স্থানটি হত জলা এবং স্যাঁতসেঁতে জায়গায়। "মাটি চুঁয়ে জল থৈ থৈ করত। তার মধ্যে দিনের পর দিন থাকা, শোয়া, বসবাস করা ইত্যাদির জন্য ইটের জোগাড়, ছাই-এর ব্যবস্থা ইত্যাদি করতে হত। সেখানে ম্যালেরিয়া কলেরা ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিত"।[152]

শুধু তাই নয়, ত্রাণ শিবিরে থাকাকালীন যে রেশন তাদেরকে দেওয়া হত তাতে বড় পরিবারগুলোর (ছোট বড় মিলে আটজন) এক সপ্তাহ চলত না।[153] ফলে এই সমস্ত পরিবারগুলির কর্মক্ষম পুরুষ সদস্যরা আশেপাশে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু সমস্যা সেখানেও। যারা পূর্ববঙ্গে দিনমজুরি করত তারা কাস্তে হাতে ক্যাম্পের আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু এতে স্থানীয় দিনমজুরদের সঙ্গে তাদের একটা সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। স্থানীয় দিনমজুরদের যুক্তি ছিল, যে বাইরের এত লোক দিনমজুরি

[150] সাক্ষাৎকার:-রাধাশ্যাম নন্দী, মুর্শিদাবাদ।

[151] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* পৃ. ৫৩।

[152] তদেব, পৃ. ৫৪।

[153] তদেব, পৃ. ৫৯।

করতে মাঠে নামলে সরকার কর্তৃক যে মজুরি বেঁধে দেওয়া আছে তার উপর একটা বিরাট প্রভাব পড়বে। তাদের মজুরির পরিমাণ কমে আসবে। ক্যাম্পে আশ্রিত বিদ্বজ্জনেরা তাদের এই যুক্তিটা মেনে নিয়েছিলেন এবং তারা ক্যাম্পের দিনমজুরদের মাঠে যেতে নিষেধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[154] পুর্বোক্ত অধ্যাপক শ্রী নবকৃষ্ণ বিশ্বাস বলেন তার ক্যাম্প-জীবনে একটিমাত্র খদ্দরের জামা ও লুঙ্গি পরেই তাকে টানা নয় মাস কাটাতে হয়েছিল, বৃষ্টিতে ভেজা জামা কাপড় গায়েই শুকিয়েছিল।[155] ক্যাম্পে থাকাকালীন ক্যাম্পের দেওয়া ডোলে সস্তার কুমড়ো খেয়ে শিশুরা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হতে থাকে। এ ব্যাপারে ক্যাম্প কমান্ডান্টকে অনুরোধ করলে তাদের শুনতে হয়, "সরকার আপনাদের যে রেশন দিচ্ছে একে কি বলে জানেন? একে বলে ডোল (dole) অর্থাৎ ভিক্ষা। ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। সুতরাং কথা বলবেন না। যা পাচ্ছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন"।[156] এমনকি দেশভাগের অব্যবহিত পরেই চলে আসা উদ্বাস্তুরাও তাদের ভালো চোখে দেখতেন না। উদাহরণস্বরূপ অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা, "কুর্মিটোলা কলোনির শরণার্থীরা আমাদের ঘৃণা করতেন। তার কারণ তারা মনে করতেন আমাদের মতো পরে আসা শরণার্থীরা কৈ মাছ খাওয়ার লোভে এতদিন নাকি পূর্ব-পাকিস্তানে পড়েছিলাম"।[157] এই সমস্ত নিদর্শনগুলি থেকে তাদের জীবনের করুণ কাহিনী প্রকাশ পায়; ওই দেশে তারা বিধর্মীদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে এদেশে এলেন, বিনিময়ে স্বধর্মীদের কাছ থেকে পেলেন মানসিক যন্ত্রণা। যদিও সবার কপালে এমন দুর্ভোগ জুটেছিল তা নয়।

নিজের চেষ্টায় পুনর্বাসনকারী উদ্বাস্তুদের ভাগ্যেও কম দুর্ভোগ ছিল না। তাদের প্রধান সমস্যা ছিল থাকার মত ফাঁকা জায়গার সন্ধান পাওয়া। ঘন জনবসতিপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তুর চাপে স্থানসংকুলানের অভাব দেখা দিতে শুরু করে। ফলে কোথায় ফাঁকা জমি আছে এ ব্যাপারে উদ্বাস্তুদের সদা-সতর্ক থাকতে হত। কোথাও খাস জমি বা ফাঁকা সরকারি জমির খবর পেলেই তারা সেখানে চলে যেতেন। সরকারের পক্ষ থেকে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় রেলের ফাঁকা জমি, খাস জমি আছে বলে ঘোষণা করা হলে, উদ্বাস্তুরা অনেকে এসেছিলেন। কিন্তু এই দুই জেলায় এসে সেই সব ফাঁকা জমি পেতেও তাদের নানান সমস্যার মুখে পড়তে হয়। উদ্বাস্তুদের লড়াইটা ছিল মূলত স্থানীয় ঘোষ বিরুদ্ধে, এছাড়াও স্থানীয় মুসলিমরাও ছিল। কারণ যে ফাঁকা বা খাস জমির খবর পেয়ে তারা এই দুই জেলায় এসেছিলেন, সেই জমি এতদিন ভোগ করত স্থানীয় ঘোষ, ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা; মালদার কোথাও কোথাও চাঁই, মন্ডল সম্প্রদায়ের মানুষের কথা শোনা যায়। সেই সমস্ত ফাঁকা জমিগুলো মূলত ঘোষেদের গরু, মোষের চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হত। স্বভাবতই তাদের দীর্ঘদিনের দখল ছেড়ে দিতে তারা প্রাথমিকভাবে নারাজ ছিলেন। জমিকে কেন্দ্র করেই এই দুই জেলার ঘোষ এবং মুসলিমদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের বিরোধ বাঁধে। মালদা জেলার ভবানী মন্ডল এর কথায়, "ঘোষেরা বলত, 'বাংলাদেশ থেকে রিফু এসেছে লুটে খেতে। ধর শালাকে, মার

[154] তদেব, পৃ. ৭৩।
[155] তদেব, পৃ. ৫৭।
[156] তদেব, পৃ. ৬৬।
[157] তদেব, পৃ. ৫৪।

শালাকে'। ঘোষেরা মানুষ কুপিয়ে জখম করে গরু নিয়ে গেছে"।[158] একই কথা শোনা যায় এই জেলার সুবোধ কুমার বিশ্বাসের মুখে,- "স্থানীয় মুসলিমরা সরকারি খাস জমি ভোগ করত। উদ্বাস্তুরা এসে ঘরবাড়ি, চাষাবাদ শুরু করলে তারা দেখল, এরা সব দখল করে নেবে। তাই উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ি কেড়ে নিতে লাগল। উদ্বাস্তুরা বহু সংগ্রাম, মারামারি করে ঘর-বাড়ি উদ্ধার করে, দুপক্ষেরই কিছু কিছু করে নিহত হয়। স্থানীয় প্রশাসন খুব সাহায্য করেছিল, মুসলিমরা ভয়ে পালিয়ে গেছিল। স্থানীয় ডিলারের বাবা খুব সাহায্য করেন, তিনি মুসলিমদের শায়েস্তা করতে খাস জমির খবর চাওর করেন, উদ্বাস্তুদের এখানে নিয়ে আসেন"।[159] এই জেলার শান্তি রঞ্জন সরকার স্থানীয় ঘোষ ও মুসলিমদের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, তারা ফাঁকা জায়গা দেখে জমি না কিনেই বসবাস শুরু করেছিলেন, যা ভোগ-দখল করত স্থানীয় ঘোষ এবং মুসলিমরা। "সেই দখল ছাড়া নিয়েই বিপত্তি। স্থানীয় ঘোষেদের সঙ্গে ভালো রকম ঝামেলা বাঁধে কারণ উদ্বাস্তুরা এসে তাদের ভোগ দখল করা ফাঁকা জায়গাতে বসতি গড়ে তুললে তাদের গরু, মোষ চলাচলের জায়গা কমে যাচ্ছিল। জমি দখল নিয়ে মালদার শিবপুরে ঘোষ ও মুসলিমদের সঙ্গে বিবাদ বাঁধে। ষড়যন্ত্র করে, নৌকা ভর্তি লোক এনে তারা আক্রমণ করে, একজন খুন হয়, পুড়ে মারা যায় কিছু লোক। ভবেশ (জনৈক উদ্বাস্তু) ভালোমতো আহত হয়, পরে হাসপাতালে গিয়ে সুস্থ হয়"।

পরবর্তীকালে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বিষয়টি স্বাভাবিক হয়। "প্রশাসন পরামর্শ দিয়েছিল প্রথমে জমি কেনার"। এইভাবে সমস্যার সমাধান হয়।[160] এই সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ ধর্মকে কেন্দ্র করেছিল না সমস্তই ছিল জমি জায়গাকে কেন্দ্র করে। যারা এ সকল জমি ভোগ করত তারাও নিম্ন বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির এবং যারা এখানে আশ্রয় নিতে এসেছিলেন তারাও ছিন্নমূল নিঃসহায় মানুষ। মালদার এক মহিলা উদ্বাস্তু ফ্যালানি বিশ্বাস যেমন বলেছেন "আমি এখানে জমি করে খাই, এখন আপনি এলে আমার অসুবিধা। প্রাথমিকভাবে অসুবিধা হত, হিরণ্ময় বাবু খুব সাহায্য করেছিলেন। ভালো মুসলিমরা আশ্রয় দেয়, সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের মনে ভয় ছিল, মেলামেশা হতে অসুবিধা কেটে যায়"।[161] মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। তারাপুর কলোনির দয়াল বিশ্বাসের কথায় স্থানীয় ঘোষেদের সঙ্গে জমি দখলকে কেন্দ্র করে তাদের সঙ্গে গন্ডগোল হয়। "ধুলিয়ান চরে গন্ডগোল হয়। এখানে আহিরণ ব্রিজের নিচে জমির খোঁজ পেয়ে এসেছিলাম, দালালরা তাঁবু বসিয়ে বলেন, 'তোমরা কাজকর্ম করো, খাও, থাক'। কিন্তু যাদের জমি তারা আপত্তি করে, ঘোষেদের সঙ্গে ঝামেলা বাঁধে, দুজন খুন হয়, নয়ন তারার (জনৈকা উদ্বাস্তু মহিলা) স্বামীকে মারা হয়। এলাকার বিডিও ৫০টি ঘর করে এখানে তারাপুর কলোনি গড়েন"।[162] এই জেলার নীলকান্ত বিশ্বাসও প্রথমদিকে জমি

[158] সাক্ষাৎকার:-ভবানী মণ্ডল, মালদা।

[159] সাক্ষাৎকার:-সুবোধকুমার বিশ্বাস।

[160] সাক্ষাৎকার:-শান্তি রঞ্জন সরকার।

[161] সাক্ষাৎকার:-ফ্যালানি বিশ্বাস।

[162] সাক্ষাৎকার:-দয়াল বিশ্বাসের।

দখল করা নিয়ে স্থানীয় মুসলিমদের সঙ্গে গন্ডগোলের কথা বলেছেন। যদিও তা বেশি দূর গড়ায়নি। পরবর্তীকালে প্রশাসনের সহায়তায় তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটে।[163]

অনেকে আবার জমি জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে স্থানীয় মুসলমানদের সহায়তার কথা স্বীকার করেন। মালদার রবীন্দ্রনাথ সরকার যেমন জানান এই জেলার গফুর মিয়ার কাছ থেকে জমি কিনে চাষবাস শুরু করেছিলেন, গফুর মিয়া তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন বলে তিনি দাবি করেন। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা উচ্চ বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা সরকারি চাকরিতে অপশন দিয়ে চলে এসেছেন বা কোনো পেশার মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন কিংবা সরকারের তরফ থেকে পুনর্বাসিত হয়েছিলেন তাদের হয়নি; যারা সহায়-সম্বলহীন ভাবে এসেছিলেন, দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে অন্য রাজ্যে পুনর্বাসন নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং এই রাজ্যে নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের পুনর্বাসন করতে চেয়েছিলেন তাদের মধ্যেই কারো কারো এই ধরনের অভিজ্ঞতা ঘটে। কারণ, চাকরিতে অপশন দিয়ে চলে আসা সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তোলা হয়। সেখানে রাস্তাঘাট, বাজার, বিদ্যুৎ সরবরাহ, জল সরবরাহ, প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, পূজোর জন্য মন্দির, পুকুর, শ্মশান সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা ছিল। উদাহরণস্বরূপ মুর্শিদাবাদ জেলার মহলন্দী কলোনি, যেখানে বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তরুণ কুমার ভাওয়াল জানিয়েছেন,- "এই কলোনিতে প্রায় ৭০টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয় প্রত্যেক পরিবারকে দলিলসহ দুই বিঘা করে চাষের জন্য জমি ও আটকাঠা করে বাড়ি তৈরি জায়গা দেওয়া হয়। চাষীদের দশ বিঘা করে জমি ও পান চাষীদের দু বিঘা করে জমি দেওয়া হয়েছিল। এখনও সরকারের ১০৫ বিঘা জমি পড়ে আছে, হোম আছে, মডেল স্কুল আছে। একটি গ্রামে থাকতে গেলে যা যা লাগে সমস্ত কিছুই আছে। চার বিঘার উপর বাজার, প্রাইমারি ও হাই স্কুলের জন্য জমি, পার্ক, পুকুর, পরিকল্পনামাফিক রাস্তাঘাট, শ্মশানের জায়গা সরকার সব কিছুই দিয়েছে"।[164]

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক তিনটি চাহিদার মধ্যে বাসস্থানের সমস্যা মিটলেও পরিবারের খাদ্য ও বস্ত্রের যোগানের জন্য তাদের সংগ্রাম জারি থাকে তখনও। প্রধানত কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী এই সকল মানুষেরা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটু একটু করে নিজেদের পরিবারগুলোকে দাঁড় করিয়েছিলেন। যারা টাকা-পয়সা, সোনাদানা সঙ্গে করে কিছু আনতে পেরেছিলেন তাদের অতটা কষ্ট না হলেও যারা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে রিক্ত হাতে এসেছিলেন তাদের লড়াইটা খুবই কঠিন ছিল। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত সেন পরিবারের সন্তান শোভেন্দ্রমোহন সেন ভারতবর্ষ পত্রিকায় জেলায় আগত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে লিখেছিলেন "আশ্রয়প্রার্থীদের কর্মোদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁহারা রিক্ত হইয়া আসিয়াও নিরাশ হন নাই এবং শ্রমের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সকল ধরণের জীবীকাই হৃষ্ট মনে গ্রহণ করিয়াছেন। বহরমপুর সহরে আমরা দেখিয়াছি, বহু ভদ্র সন্তান ও শিক্ষিত শ্রেণীর আশ্রয়প্রার্থী সামান্য মুদীখানার দোকান অথবা তরিতরকারীর দোকান করিয়া উপার্জন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। বহু ভদ্রপরিবারের সন্তান রিক্সাচালনা ও এমন কি চানাচুর বিক্রয় করিয়াও

[163] সাক্ষাৎকারঃ-নীলকান্ত বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[164] সাক্ষাৎকারঃ- তরুণ কুমার ভাওয়াল, মুর্শিদাবাদ।

নিজের জীবীকার উপায় করিতেছেন। তাহাদের এই কায়িকশ্রমের প্রতি নিষ্ঠা কখনই বৃথা যাইবে না। তাঁহাদের এই শ্রমস্বীকার সকলেরই অনুকরনীয়"।[165] তিনি আরও বলেছেন, "দেশ বিভাগের পর কাতারে কাতারে যে সকল ভাগ্যহীন আশ্রয়প্রার্থী এখানে আসিয়াছিল, তাঁহাদের উপস্থিতিতে প্রথমে আমরা আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু কর্মকুশল, উদ্যোগী ও স্বাবলম্বী আশ্রয়প্রার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় শ্রমের দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ভারস্বরূপ চিরকাল থাকিবেন না, পরন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে আশ্রয়প্রার্থীরা অধিকাংশই দেশের সম্পদ হিসাবে গণ্য হইবেন। বহু সাঁওতাল পরিবারও এখানে চলিয়া আসিয়াছেন। আমরা জানিয়াছি যে সেই সকল সাঁওতালগণ কোনো প্রকারের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, পরিবর্তে তাহারা চাহিয়াছেন কর্মের সুযোগ। আত্মনির্ভরশীলতার ইহা এক অপূর্ব নিদর্শন"।[166]

পূর্ববঙ্গের পরিশ্রমী, সঞ্চয়ী এ সকল মানুষেরা তাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির দ্বারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দুই জেলার উদ্বাস্তুদের মুখে তিলে তিলে সঞ্চয় করার ও সম্পদ বৃদ্ধি করার কাহিনী শোনা যায়। তাদের মুখে শোনা সেই সব কাহিনীর দু-চারটি নিচে উল্লেখ করা হল,-

"মুথা ঘাস বিক্রি করে উপার্জন করতাম, ১৪ আনা। ১০০ টাকা জমাতে ছয় মাস লেগে যেত"[167]

"মুথা ঘাস বিক্রি করে, জমি বন্ধক দিয়ে, লোন নিয়ে সংসারের হাল ফেরে"।[168]

"পরের জমিতে চাষ করে, সরষে বিক্রি করে, খেটে, পাঁচ বিঘা থেকে দশ বিঘা পরে পনেরো বিঘা এরকম করে" পরিকল্পনামাফিক ভাবে তারা সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিলেন।[169]

"মাছ ধরে, খেটে খেয়ে, টাকা করে, জমি করেছি, ২৪-২৫ বছর পর; এই দু বছর আগে রেজিস্ট্রি করতে পেরেছি"।[170]

"ওভারটাইম কাজ করতাম, সারাদিন কাজ করে রাতে খাওয়া-দাওয়া করতাম"।[171] এই সমস্ত মানুষেরা সরকারের কাছ থেকে সাহায্য না পেলেও তাদের ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও সঞ্চয়ী মনোভাব তাদের ভাগ্য ফেরাতে সাহায্য করে।

জমি সংক্রান্ত বিবাদের পাশাপাশি এই দুই জেলার উদ্বাস্তুদের আরো একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা হল স্থানীয়রা তাদেরকে 'রিপু' নামে ডাকতেন। উদ্বাস্তুদের কথায় পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা তাদের শত্রু মনে করতেন বলে এভাবে সম্বোধন করতেন। কারো কারো মতে 'রিফিউজি'কে সংক্ষেপে তারা 'রিফু' যা তাদের অনেকেই শোনার ভুলে 'রিপু' মনে করতেন।[172] "পরের বাড়িতে খেটে খাওয়া, তাঁবুর তলে থাকা, মুখের ভাষা নিয়ে

---

[165] শ্রী ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), *ভারতবর্ষ,* অষ্টত্রিংশ বর্ষ–দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম সংখ্যা, পৌষ–১৩৫৭, জ্যৈষ্ঠ–১৩৫৮, পৃ. ৩৪।

[166] তদেব।

[167] সাক্ষাৎকার:-ভবানী মণ্ডল, মালদা।

[168] সাক্ষাৎকার:-ফ্যালানি বিশ্বাস।

[169] সাক্ষাৎকার:-সুবোধকুমার বিশ্বাস।

[170] সাক্ষাৎকারঃ-মাধব হালদার, মুর্শিদাবাদ।

[171] সাক্ষাৎকারঃ-নারায়ণ হালদার, মুর্শিদাবাদ।

[172] সাক্ষাৎকারঃ নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ।

অপমান, রিফিউজি বলে অপমান" এগুলো তাদের স্বাভাবিকভাবেই মানসিক কষ্ট দিত। চাষের কাজ, ঘরামির কাজ করা নীলকান্ত বিশ্বাস বলে চলেন "যেখানে হঠাৎ পাঁচজন কুটুম এলেও কিছু মনে হত না; সেখানে ভবিষ্যৎ ভাবা তো দূর আমাদের চিন্তা থাকত এখন জল খেলাম সকালে কি খাব। পরিস্থিতি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না"। তবু তারা নিজেদেরকে নিজেরাই আশ্বাস দিতেন এই বলে "সবার যা পরিস্থিতি আমারও তাই এটাই আশ্বাস। সবার যা হয় আমারও তাই"।[173]

পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে উদ্বাস্তুদের 'রিপু' 'রিপু' শুনতে হত, অচেনা মানুষের কাছ থেকে এই 'রিপু' ডাক শোনার চেয়েও খারাপ লাগত যখন এই পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী তাদের চেনা-জানা আত্মীয়রা বিপদের দিনে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন। পশ্চিমবঙ্গে আসার পরে শরণার্থীদের যে সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার মধ্যে সবথেকে বেদনাতুর একটি পরিস্থিতি ছিল পূর্ব-পরিচিত বা আত্মীয়র আচরণগত পরিবর্তন, যা নিয়ে কোনো আলোচনা প্রায় হয় না বললেই চলে। অবাক করার বিষয় হল পূর্ববঙ্গে অধস্তন, সংখ্যাগুরুর এই আচরণগত পরিবর্তনের কারণে তাদের অনেকেই দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন। অথচ এদেশে এসে অধিকাংশ শরণার্থীদের কাছে সব থেকে বড় আঘাতটি আসে তাদের পূর্ব-পরিচিত বা আত্মীয়র কাছ থেকে। পূর্ববঙ্গের অনেক স্বচ্ছল ও প্রভাবশালী পরিবারও হঠাৎ করে দেশত্যাগের দরুন বেশি সম্পদ ও সম্বল সঙ্গে করে আনতে পারেননি তাই অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পশ্চিমবঙ্গবাসী আত্মীয়দের বা পূর্ব পরিচিতের উপর সাময়িকভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই সকল আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ দুর্দিনে তাদের সঙ্গে যে রূপ আচরণ করেছিলেন তা তাদেরকে ব্যথিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক শ্রী নবকৃষ্ণ বিশ্বাস যখন এদেশে এলেন, তখন শরণার্থী ক্যাম্পে থাকাকালীন অতি অল্প রেশনে দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া অবস্থায় একদিন কিছু সাহায্যের আশায় বেরিয়ে পড়েন। তিনি বলেন "বহু পরিচিত তার এক 'ঘনিষ্ঠ ভদ্রলোক'-এর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম", যেখানে একাত্তরের আগে প্রায়ই তার যাতায়াত ছিল। যে ভদ্রলোক তাকে একপ্রকার জোর করে বাড়ির ভেতরে টেনে নিয়ে যেতেন...চা টা খাওয়াতেন। "সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন"। তার এই ব্যবহারে অধ্যাপকের আক্ষেপ "শুধু তিনি নয়, পশ্চিমবাংলার সব আত্মীয়-স্বজনের ওই একই মনোভাব। আগে তাদের কাছে আসতাম আত্মীয় হয়ে, তারা আত্মীয়র মত ব্যবহার করতেন। কিন্তু এবার এসেছি শরণার্থী হয়ে। আমরা তাদের কাছে শরণার্থী নই, আমরা ভারত সরকারের কাছে শরণার্থী। তবুও তাদের আশঙ্কা যদি এটা ওটা চেয়ে হঠাৎ তাদের কাছে হাত পেতে বসি তাই তারা আমাদের এইভাবে এড়িয়ে চলতেন"।[174] অধ্যাপকের কোনো এক তুতো দাদার কাছ থেকে এমনই কিছু গিলতে না পারা কষ্ট গলার কাছে দলা পাকিয়ে ছিল। একদিন নিতান্তই আতান্তরে পড়ে দাদার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সেই দাদার আশ্রয়ে থাকা বাবার সঙ্গে বহুদিন পর প্রথম দেখাতেই কুশল বিনিময়ের পর

[173] সাক্ষাৎকারঃ-নীলকান্ত বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[174] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* পৃ. ৫৫।

তার বাবা কোনো ভূমিকা না করেই বললেন,- "তোমার দাদার কাছে টাকা-পয়সা চাইবে না"। অধ্যাপকের কথায়, "আমার বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না"।[175]

নবাগতরা এই এইভাবে ভিন দেশে এসে উদ্বাস্তু পরিচয় নিয়ে সেই দেশের সরকার বা শাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনমতো ত্রাণ ও পুনর্বাসন পেয়ে থাকেন। কিন্তু তাদের সামাজিক আত্তীকরণ বা সামাজিক অন্তর্ভুক্তি একটি ধীর ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। কারণ ছিন্নমূল এইসব মানুষরা শুধুমাত্র তাদের ভিটেমাটিই পেছনে ফেলে আসেন নি, ফেলে এসেছিলেন তাদের পরিচয়ও। আজন্ম একটি পরিবেশে বসবাসের ফলে তাদের মানসিক গঠন এবং একটি অঞ্চলে দীর্ঘদিনের বসবাসে তাদের সামাজিক পরিচিতি ও পরিমণ্ডল কখনোই পুরোপুরি পুনঃস্থাপিত হতে পারে না। পাড়া-প্রতিবেশী, সেই সমাজে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে সমীকরণ দেশ-কালের সীমানা মানে না। যার ফলে নব-প্রতিষ্ঠিত পুনর্বসতিতে তাদের কর্মসংস্থান বা জীবন ধারনের মান একটা জায়গাতে পৌঁছালেও হারিয়ে যাওয়া সামাজিক ইমেজ তারা খুঁজে পান না। নতুন সমাজে তাদের নতুন সম্পর্কের সমীকরণের মাধ্যমে তাদের সামাজিক পরিচিতি বা ইমেজ গড়ে নিতে হয়। যাতে কেটে যেতে পারে কয়েকটা দশক। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতোই মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার হাজার হাজার উদ্বাস্তুদের একই পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল।

৩.৫ উদ্বাস্তু মহিলাদের জীবন সংগ্রামঃ

মুষ্টিমেয় কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নেওয়া সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ আমজনতাকে খোয়াতে হয় মাথার ওপর ছাদ ও পায়ের তলার মাটি। আজন্ম পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার লড়াইটা মোটেও সহজ ছিল না। সেই লড়াই এ যাদের কথা খুব কম পাওয়া যায়,অথচ যাদের নিয়ে আলোচনা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল তারা হল উদ্বাস্তু নারী। বর্তমান গবেষণায় দেখা গেছে উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের উদ্বাস্তু মহিলাদের জীবন সংগ্রামটা ততটা কঠিন ছিল না। কিন্তু মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং একেবারেই নিম্নবিত্ত শ্রেণির উদ্বাস্তু মহিলাদের যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ভিটেমাটি ছেড়ে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, সামান্য সম্বলকে অবলম্বন করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পায়ে হেঁটে সীমানা অবধি আসা দিয়ে তাদের সংগ্রাম শুরু হয়। পথে আক্রমণ, নির্যাতন, পরিবারের সদস্যর বা পরিচিতের মৃত্যু ইত্যাদি কতশত ঘটনার সাক্ষ্য বহন করেন এরা। মুর্শিদাবাদ জেলার তারপুর কলোনির সুষমা জর্দার নামক জনৈকা উদ্বাস্তু মহিলার সাক্ষাৎকারে তিনি পূর্ববঙ্গের বসত-বাড়ি ছেড়ে সীমান্তে আসার সময় এক করুন দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। তাদের মতোই কোনো এক উদ্বাস্তু দল ভিটেমাটি ছেড়ে সীমান্তের দিকে এগোচ্ছিল। সেখানে এক মহিলা তার কোলের শিশুটিকে রেখে মারা যান। ক্ষুধায় কাতর দুগ্ধপোষ্য শিশুটি মৃত মায়ের স্তন্যপান করছিল। মর্মান্তিক দৃশ্যটি দেখে তার গা শিউরে ওঠে। কিন্তু শিশুটিকে সঙ্গে নেওয়ার ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন "নিজেরটা নিয়েই পারেনা কেটা নিবে?"[176] তার কথায় তারা নিজেরাই কি খাবেন, কোথায় থাকবেন কোনো ঠিক নেই; পরের ছেলের দায়িত্ব নেবে কে? তিনি তার চোখে দেখা আরও একটি ঘটনার বর্ণনা দেন।

[175] তদেব, পৃ. ৫৬।

[176] সাক্ষাৎকারঃ- সুষমা জর্দার, মুর্শিদাবাদ।

দেশত্যাগের সময় তাদের প্রতিবেশী সহযাত্রী (শ্বশুর বাড়ির পাশের বাড়ি), ১০ মাসের গর্ভবতী এক মহিলাকে ঝাঁকায় বসিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে কাঁধে করে আনা হচ্ছিল। যন্ত্রণা-কাতর অবস্থায় পথেই তিনি বাচ্চা প্রসব করেন। আশেপাশের সহযাত্রী মহিলারাই তার প্রসব করান রাস্তায়।[177] এই সমস্ত দৃশ্যগুলি উদ্বাস্তু নারীদের জীবনযুদ্ধের করুন কাহিনীকে নীরবে বয়ে চলেছে। তার নিজের জীবনও ছিল সংগ্রামপূর্ণ। দেশ ত্যাগের সময় তিনি তখন নববিবাহিতা। সদ্য-বিবাহিতা নারীর বাবা, মা, ভাই, বোনকে সীমানার ওই পারে ফেলে আসা, ক্যাম্পে থাকা, খেটে খাওয়া ইত্যাদি কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। তার কথায়,- "প্রায় ১০০ বিঘা জমি সম্পত্তির মালিক এমন বাড়ির মেয়ে কোথায় রাজার বউ হয়ে থাকার কথা সেখানে পরের বাড়িতে কাজ করে, টালির ভাটায় কাজ করে খেতে হয়েছে। সংসারকে দাঁড় করাতে হয়েছে।"[178] নারী মনের বেদনার খবর কেউ রাখে না। সুষমার জর্দার স্মৃতি হাতড়ে বলে চলেন "বাড়িঘর, জমি জায়গা, গরু, থালা, বাসনপত্র সব ফেলে আসা। একটা গেরস্থ বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবার, কত কিছুই থাকে। কতটুকুই বা আনতে পারা যায়। প্রিয় জিনিস সব ফেলে আসতে হয়েছে"।

ছেলে, মেয়ে, পরিবারের লোকজন নিয়ে পরনের কাপড়, সোনাদানা, অল্প কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়া, নিরুদ্দেশের পথে। সীমানা পেরিয়ে এই দেশে এসে প্রথমে শিয়ালদা স্টেশন, পরে উদ্বাস্তু ত্রাণ শিবির, কখনো বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনি, কখনো আবার ভিন রাজ্যে দণ্ডকারণ্যে কতশত মহিলাদের দিন গুজরানের অসংখ্য করুণ কাহিনী অন্যান্য উদ্বাস্তু সমস্যার গুরুগম্ভীর আলোচনায় চাপা পড়ে যায়। তাদের সম্ভ্রম ও গোপনীয়তার অভাব, মানসিক, শারীরিক অসুবিধা, অসুস্থতা এই সব কিছু সঙ্গে নীরবে আপোস করাটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। বয়সন্ধির কিশোরী থেকে গর্ভবতী, প্রসবকারিনী, দুগ্ধপোষ্য শিশুর জননীর দুর্দশা আজকের দিনে দাড়িয়ে কোনো নারী কল্পনা করতেও শিউরে উঠবেন। পুনর্বাসনের আশায় শিয়ালদা প্ল্যাটফর্মে থাকাকালীন হাজার হাজার মানুষের সামনে যুবতীদের খোলা জায়গায় স্নান করতে হত, এমনকি ট্রেন থেকে নেমে আসা নিত্য যাত্রীদের ভিড়ের চাপের অন্তঃসত্তা উদ্বাস্তু মহিলা সন্তান প্রসবের ঘটনাও জানতে পারা যায়।[179] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে সাময়িকভাবে আশ্রয়গ্রহণকারী অধ্যাপক নবকৃষ্ণ বিশ্বাস এমনই এক করুণ কাহিনী শোনান। তারা দেশ ছেড়ে ভারতের দিকে আসার পথে একটি সদ্যোজাত পরিত্যক্ত শিশু দেখতে পান। মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মা তাকে ফেলে রেখে চলে যান। বাচ্চাটির নাড়ী তখনও কাটা হয়নি। লেখকের কথায় "বীরগ্রামের এক বৃদ্ধা মহিলা বাচ্চাটিকে ওই অবস্থায় বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যায়। পরে সামনের কোনো বাড়ি নিয়ে গিয়ে নাড়ী কেটে, পরিষ্কার করে, বৃদ্ধার স্তন চুষিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছে বাচ্চাটিকে গরুর দুধ দিয়ে কয়েকদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ওই মহিলা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই বাচ্চাটি মারা যায়"।[180] মালদার বকুল রাণী বিশ্বাস নিজের চোখে তার আসন্নপ্রসবা মেয়ের মৃত্যু দেখেছেন। " বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে ক্যাম্পের মধ্যেই মেয়েটা আমার মরে

[177] তদেব।

[178] তদেব।

[179] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ. ২৫-২৬।

[180] নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* পৃ. ৩৪।

গেল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম"[181] পর্যাপ্ত শৌচাগারের অভাব, গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর আহারের অপর্যাপ্ততা প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবার অভাব ইত্যাদি সবই তাদের উদ্বাস্তু জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাবের তুলনায় বাংলার মহিলাদের জন্য বরাদ্দ তহবিলের স্বল্পতার কথা সমাজকর্মী অশোক গুপ্ত বলেছেন। বাংলা শরণার্থী শিবিরগুলিতে তিনি দেখেছেন মহিলাদের জন্য আলাদা কোনো সুবিধা ছিল না, প্রথম দিকে কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও ছিল না যা তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। অনেক সময় প্রশাসনিক ঔদাসীন্যর জন্য ভুগতে হয়েছে এইসব মহিলাদের। যেমন, উত্তর পাড়া মহিলা ক্যাম্পে ক্যাশ ডোল নেবার সময় অনুপস্থিত মহিলার বরাদ্দ অর্থ টিপসই দিয়ে ক্যাম্পের কর্মীরাই সেই টাকা আত্মসাৎ করতেন।[182] দৈনিক বসুমতি পত্রিকায় "উদ্বাস্তু মেয়ে" শিরোনাম একটা উদ্বাস্তু মহিলাদের করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে এসে সুখের মুখ দেখেনি বলে উদ্বাস্তু মেয়ের মনে খেদ নেই, কারণ সুখের কথা সে ভাবেনি। কিন্তু চরম নৈরাশ্যে তার বুক ভেঙেছে তখন, যখন দুরন্ত শীতে আচ্ছাদনের অভাবে চোখের সামনে কোলের শিশুর মৃতু তাকে অসহায়ভাবে দেখতে হয়েছে; এক বিন্দু ওষুধের অভাবে স্বাস্থ্যবান স্বামী বা উপযুক্ত পুত্রের তিলে তিলে মৃত্যু সে দেখেছে নিরুপায়ভাবে। ভগ্ন বুকের তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে সে ভেবেছে প্রাণের ভয়েই না পালিয়ে আসা! আকস্মিক অপমৃত্যু আর এই তথাকথিত স্বাভাবিক মৃতুতে কি এমন পার্থক্য?"[183] মহিলা উদ্বাস্তুদের এই ধরনের বিশ্লেষণ খুব কম চোখে পড়ে। উদ্বাস্তুদের নানা অত্যাচারের কথা প্রায়ই সর্বত্র আলোচনা হয়ে থাকে সেখানে নারী নির্যাতনের কথা অবশ্য আমরা পাই। কিন্তু একজন নারী কোনো এক পরিবারের শিশুর মা বা কোনো এক পুরুষের স্ত্রী বা কোনো এক মা-বাবার মেয়ে বা একজন নারী হিসেবে তাঁর কি অনুভূতি, তার বিশ্লেষণ তেমন পাওয়া যায় না। তাই উপরে উল্লেখিত বর্ণনাতে একজন মেয়ে, মা ও স্ত্রী একজন নারীর ভূমিকায় এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রায় তার কি অনুভূতি হতে পারে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে অল্প বর্ণনা হলেও আমাদের সামনে দেশত্যাগের নানা দিক ফুটে উঠে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত গবেষক, অধ্যাপক প্রফুল্ল চক্রবর্তী শিয়ালদা স্টেশনের এমন ২৫টি যুবতীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, যারা নিজেদের শরীর বিক্রি করে পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতেন। সেখান থেকে তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার কথা তিনি তার 'প্রান্তিক মানব' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।[184] যারা শিক্ষিত ছিলেন তারা পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিভিন্ন পেশায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে লড়াই চালিয়ে যান। এখানেও তাদের সংগ্রাম করতে হয় কখনো পরিবারের সঙ্গে, তো কখনো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে। কারণ, সেই সময় মহিলাদের শিক্ষাদানের পেশাকে পরিবারগুলি মান্যতা দিলেও ব্যাংকের চাকরি বা অন্যান্য ধরনের চাকরি ক্ষেত্রে তাদের নিরুৎসাহিত করা হত। পরিবারকে বাঁচাতে সংগ্রাম করেই এই সমস্ত স্টিরিওটাইপ গুলিকে ভেঙে চাকরির ক্ষেত্রে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল তাদের।

---

[181] সাক্ষাৎকারঃ-বকুল রানী, মালদা।

[182] নীলা দত্ত, ছিন্নমূলের ডায়েরি, পৃ. ২৬।

[183] *দৈনিক বসুমতি পত্রিকায়,* ৩-রা ডিসেম্বর ১৯৫৩ ।

[184] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ. ৩৩৬-৩৮।

উপসংহারঃ

দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের ১১,৪০,৭৪৯৮ জন সংখ্যালঘুর মধ্যে ১৯৭০ পর্যন্ত ৫২,৮৩,৩২৪ জন দেশত্যাগ করেছিলেন। এর মধ্যে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তু জনসংখ্যার বন্টন সমগ্র রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় খুবই কম, তা এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে উঠে এসেছে। পূর্ব অধ্যায়ে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আগত উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কারণ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে উঠে আসা বিষয়গুলি এই দুই জেলার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য, তা ইতিপূর্বেই স্তম্ভচিত্র সহযোগে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বিষয়ে গবেষণার একমাত্র উৎস ছিল সাক্ষাৎকার। যে সমস্ত প্রাথমিক তথ্য বা উৎসগুলি পাওয়া যায় যেমন জনগণনা, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের বিভিন্ন নথিপত্র এবং পশ্চিমবঙ্গের স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট, মহাফেজ খানার নথিপত্র ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জেলাভিত্তিক, জাতিগত, সম্প্রদায়গত, লিঙ্গগত, আর্থিক স্থিতাবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত বহুবিধ পরিমাণগত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু এত বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের দেশত্যাগের কারণ কোথাও লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। এখানেই গুণগত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং তা সাকার করতে একমাত্র অবলম্বন সেই সমস্ত ভুক্তভোগীদের, ক্ষেত্রবিশেষে তার পরবর্তী প্রজন্মের সরাসরি সাক্ষাৎকার। বর্তমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকারে লক্ষ্য করা গেছে, পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত সাধারণ সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর পাশাপাশি এই দুই জেলায় আসা উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের কারণ হিসেবে কিছু বিশেষ চরিত্র উঠে আসছে। প্রথমত: এই দুই জেলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দুটি চরিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে তা হল, 'আর্থিক দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের কারণে দেশত্যাগ' এবং 'পদ্মা নদীর ভাঙ্গনের জন্য দেশত্যাগ'। এর মধ্যে প্রথমটি পি.এন. লুথরা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।[185] দ্বিতীয়টির সমর্থনে বলা যায়, নদীয়া জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের ওপর সমধর্মী এক গবেষণায় এই একই বিষয়ের (নদী ভাঙ্গন ও বন্যায় দেশত্যাগের ঘটনা) উল্লেখ পাওয়া যায়।[186] সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় লক্ষ্য করা যায়, উদ্বাস্তুদের একটা বড় অংশ, দ্বিতীয়বার, কেউ কেউ আবার তৃতীয়বার পূর্বগঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন, বসবাসের উদ্দেশ্যে, কিন্তু আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় তারা সেখানে থাকতে পারেননি। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে প্রাথমিকভাবে মালদা ও মুর্শিদাবাদে আসা বহু উদ্বাস্তু সুযোগ পেলে ১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে বিভিন্ন সময় আবার ওদেশে ফিরে যান, কিন্তু যাওয়ার পর সেখানে আর থাকতে পারেননি। না থাকার কারণ প্রায় সকলেরই এক, বলেছেন অভাব, দুর্ভিক্ষ। নয়নতারা সরকারের কথায় "ফিরে গেছিলাম কিন্তু শুধু বাড়িটুকুই আছে আর কিছুই নেই খাব কি?"[187] নির্মল সরকারের কথায় "ওখানে গিয়ে খাব টা কি?"[188] দয়াল

[185] Pran Nath Luthra, *Rehabilitation,* (Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India: New Delhi, 1972), pp. 18-19.

[186] Tetsuya nakatani, *Away from home,* pp. 86-89

[187] সাক্ষাৎকার:- নয়নতারা সরকার, মুর্শিদাবাদ।

[188] সাক্ষাৎকার:-নির্মল সরকার, মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বাসের কথায় "কিছু পাওয়া যেত না, খাবারও জুটত না"।[189] নীলকান্ত বিশ্বাস যেমন বলেছেন "ফিরে গিয়ে জমি পেলাম; কিন্তু হাল, গরু, বলদ এগুলোর জন্য তো খরচাপাতি আছে অত টাকা কোথায় পাবেন?"[190]

দ্বিতীয়তঃ আগের অধ্যায়ের বিপরীতে এই দুই জেলার ক্ষেত্রে দাঙ্গা বা সংখ্যাগুরু কর্তৃক অত্যাচারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষীদের তাদের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে পৃথকীকরণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা সরাসরি আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন এবং নিজের চোখে দাঙ্গা সংঘটিত হতে দেখেছিলেন। সাক্ষাৎকারে এই দুই জেলার উদ্বাস্তুরা নিজের মুখে তাদের উপর হওয়া আক্রমণের কথা বর্ণনা করেছেন। পাকিস্তান সরকার, সামরিক বাহিনী, রাজাকার বাহিনী, বিহার থেকে যাওয়া মুসলিমরা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া মুসলিমরা এবং ওই দেশের পাকিস্তানপন্থী মুসলিমরা কিভাবে তাদের বিভীষিকাময় বাতাবরণের মধ্যে ফেলেছিলেন তা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন দিক থেকে আগত আক্রমণ, হয়রানি, ক্ষতি ইত্যাদির বর্ণনাও তাদের জবানিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা নিজে কোন আক্রমণের শিকার হননি বা দাঙ্গার কবলে পড়েন নি, দাঙ্গার কথা অন্য কারও মুখে শুনেছিলেন বা অন্য কারও কাছে আক্রমণ হওয়ার কথা শুনেছিলেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের ফলে এই দুটি শ্রেণিকে আলাদা করা সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয়তঃ যারা ফিরে গিয়েছিলেন তারা সবাই যে না থাকতে পেরে চলে এসেছেন এমনটা নয়। যেমন মুর্শিদাবাদের নীলকান্ত বিশ্বাসের বাবা মা ভাই বোন সবাই ওই দেশেই থেকে যান, ফিরে যাওয়ার পর শুধুমাত্র তিনিই এই দেশে চলে আসেন। ওই জেলার নির্মল সরকারেরও সঙ্গী-সাথীরা সবাই ওই দেশে ফিরে গিয়ে থেকে যান কিন্তু ইনি চলে আসেন। তারাপুর কলোনির দয়াল বিশ্বাসের কথায় তাদের তার পরিচিত বহু পরিবার ওখানকার মুসলিমদের জমি-জায়গা ইত্যাদি দিয়ে এসেছিলেন। তারা পূর্ববঙ্গে ফিরে যাওয়ার পরে সযত্নে সেগুলি মুসলিমরা তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়।[191] যার কারণে সেই পরিবারগুলি ওখানেই থেকে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে আবার তাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজনরাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। দেখা যায় পূর্ববঙ্গে ফিরে গেলে তাদের আত্মীয় পরিজনেরা তাদের যাওয়াটা ভালো চোখে দেখছিল না। এই জেলার শান্তিরঞ্জন সরকার পূর্ববঙ্গে ফিরে গেলে তার এই অভিজ্ঞতা হয়। তিনি ওই দেশে ফিরে গেলে তার জেঠতুতো, খুড়তুতো ভায়েরা সম্পত্তির ভাগ দিতে হবে বলে তার সঙ্গে প্রথমে দুর্ব্যবহার করেছিলেন। মালদা জেলার ভবানী মন্ডলের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির ভরসায় তিনি পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন। "সেখানে আত্মীয়র সঙ্গে জমি নিয়ে ঝামেলা বাঁধে, তাই পুনরায় এই দেশে ফিরে আসা।"[192]

চতুর্থতঃ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার আগত উদ্বাস্তুদের কথা অনুসারে পশ্চিম-পাকিস্তান সরকার, উপনিবেশ হিসেবে পূর্ববঙ্গে তাদের প্রভুত্ব কায়েম করতে দুই ধরনের বিভাজন নীতি নিয়েছিল। এক, তারা ওদেশের

[189] সাক্ষাৎকারঃ-দয়াল বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[190] সাক্ষাৎকারঃ-নীল কান্ত বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[191] সাক্ষাৎকারঃ-দয়াল বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[192] সাক্ষাৎকারঃ নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ; সাক্ষাৎকার:-ভবানী মণ্ডল, মালদা।

সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিরূদ্ধে তাদের সমর্থক মুসলিমদের লেলিয়ে দিয়েছিল। এজন্য তারা উচ্চবর্ণের সম্পদশালী হিন্দুদের জমি সম্পত্তি, সরকারি পদ ইত্যাদির লোভ দেখিয়েছিল। দুই, তারা উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং নিম্নবর্নের হিন্দুদের মধ্যে 'আমরা-ওরা' বিভাজন তৈরি করেছিল। তপশিলি জাতিভুক্ত উদ্বাস্তুদের নিয়ে অপর একটি গবেষণাতেও এই একই কথা উঠে আসে।[193] হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রতি হওয়া অবিচার ও বঞ্চনাকে কাজে লাগিয়েছিল। বিহার থেকে যাওয়া মুসলিমরা এ ব্যাপারে ছিল তাদের ডান হাত।

পঞ্চমত: যে সকল উদ্বাস্তুরা এখানে চলে এসেছিন তাদের পরিবারের সকলেই কিন্তু দেশত্যাগ করে আসেননি। এমনও দেখা গেছে, তাদের পরিবারের একটা শাখা ওই দেশেই থেকে গেছেন। অনেকের বাবা-মা, ভাই-বোন ওই দেশেই থেকে গেছিলেন আবার অনেকের কাকা, জ্যাঠা মামা ইত্যাদিরা ওই দেশে থেকে যান। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বিবাহিত মহিলাদের শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এই দেশে চলে এলেও বাপের বাড়ির লোকেরা সবাই ওই দেশেই থেকে গেছে। কারো ননদ, কারও বোন বিবাহ সূত্রে ওই দেশেই থেকে যায়।[194] অর্থাৎ তাদের সাক্ষাৎকার থেকে উঠে আসছে, সকলেই কিন্তু দেশ ছেড়ে এই দেশে চলে আসাকে বেছে নেয়নি। অধ্যাপক বিশ্বাস পূর্ববঙ্গের সেই সকল মানুষদের মধ্যে একজন যারা শেষ পর্যন্ত মাটি কামড়ে দেশে পড়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আবহে সাময়িকভাবে সপরিবার ভারতে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন (৯ মাস), বাংলাদেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরেই আবার পরিবারসহ দেশে ফিরে যান।

অধ্যাপক বিশ্বাস একা নন, তার মতো কিছু শিক্ষিত মানুষ, বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদিরা গুজবের দ্বারা প্রভাবিত হননি। এরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের সময় তারই সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ক্যাম্পে সাময়িকভাবে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন।[195] তার আত্মজীবনীমূলক রচনা থেকে বোঝা যায়, পূর্ববঙ্গে একটা শ্রেণির শিক্ষিত লোকজন ছিলেন যারা অন্যান্য হিন্দুদের মতো প্রথম দিকেই দেশত্যাগ করে চলে আসেন নি। বিচক্ষণ হওয়ায় তারা ঐ দেশের মানুষদের নাড়ির স্পন্দন পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশের পরিস্থিতি কোন দিকে অগ্রসর হবে, দেশের সংখ্যাগুরু জনগণের মন-মানসিকতা, আচার-আচরণ, কার্যকলাপ, ভাব-গতিক ইত্যাদি থেকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন ওই দেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সকলেই একই মনোভাবের নয়। তাদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য আছে। তার লেখায় পাওয়া যায়, "পাকিস্তানের শাসক চক্র বাঙালিদের সহানুভূতি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে, বাঙালিদের কাছে তারা হয়ে গেছে একটি উপনিবেশিক শক্তি, এই শক্তির বিরুদ্ধে বাঙালিরা জেগে উঠেছে। তাদের একমাত্র নেতা বাঙালি জাতির জনপ্রিয়তার শীর্ষে

---

[193] রাজেশ বিশ্বাস, *পশ্চিমবঙ্গে তফশিলিজাতিভুক্ত উদ্বাস্তুদের সমস্যা ও সংগ্রাম (১৯৪৭-১৯৭১),* পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ, ২০১৭, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১০৯।

[194] সাক্ষাৎকারঃ- সুষমা জর্দার, মুর্শিদাবাদ।

[195] "আমি এবং হরিপদ বিশ্বাস দুজন অধ্যাপক ছিলাম। জ্ঞানদা ছিলেন এম.বি.বি.এস. ডাক্তার। এছাড়াও আরও কয়েকজন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ছিল মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে। তারা হলেন আগদিয়ার অধ্যাপক রণজিত রায় (দর্শন), অধ্যাপিকা মালা রায় (অর্থনীতি), বড়েন্দারের অধ্যাপক বীরেন রায় (ইংরাজী), ইঞ্জিনিয়ার রমেশ রায়। এরা সবাই স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে তাদের চাকুরী জীবন শেষ করেছে। সেদিনের শিশু তরুণ, বরুণেরা এখন নড়াইলের বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক"। নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* পৃ. ৬০-৬২।

অবস্থানরত শেখ মুজিবুর রহমান, তার আহ্বানে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।"[196] তিনি দেখেছেন কিভাবে "পাকিস্তানি বেতার এই স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে আশ্রয় নিল সাম্প্রদায়িকতার"। তার কথায় "কিন্তু আমাদের এলাকার হিন্দু, মুসলিম মিলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করল।"[197] সংখ্যাগুরুদের সকলের কাছ থেকেই আঘাত আসবে এমন নয়। তাদের এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত তারা পূর্ববঙ্গে সাত পুরুষের ভিটের মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। কোনো পরিস্থিতিতেই তারা দেশ ছেড়ে আসার কথা ভাবতে পারেননি। নবকৃষ্ণ বাবুর লেখায় এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ওদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, তাদের চমকে দিয়ে অনেকে তাদেরকে সহযোগিতাও করেছিলেন। এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের মুখেও একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগে উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে, পাকিস্তান মিলিটারি, রাজাকার ও অন্যান্য দলগুলির অত্যাচারের সীমা লাগামছাড়া হলে, নিতান্তই অসহনীয় অবস্থায় বাধ্য হয়ে তারা সাময়িকভাবে দেশত্যাগ করে ভারতের বিভিন্ন জেলায় আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের এই দেশত্যাগ ছিল সাময়িক। এই শ্রেণির লোকেদের মধ্যে, চিরকালের মতো দেশ ছেড়ে চলে এসে ভারতের নাগরিক হওয়ার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি ছিল।[198] পূর্ববঙ্গের এই এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে বসু ভ্রাতৃদ্বয়, সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসেমের অখন্ড বাংলার পরিকল্পনার প্রতিফলন হতে দেখা যায়।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগ করে চলে আসা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই জেলা মালদা ও মুর্শিদাবাদকে আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় ভূ-প্রাকৃতিক, আর্থিক, আত্মিক, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। তবে এই দুই জেলার উদ্বাস্তুদের সরাসরি এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাদের বেশিরভাগই বক্তব্য মাথা গোজার ঠাঁই খোঁজাই তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল। একটা নিরাপদ আশ্রয়, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান, পরিবার প্রতিপালন এসবে তারা এতটাই ভাবিত ছিলেন যে তখন মনে হয়নি কে হিন্দু আর কে মুসলমান। মুর্শিদাবাদের নীলকান্ত বিশ্বাসের সপাট উত্তর "মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবতে পারেন! জাতপাত? মাথা গোঁজার ঠাঁইটাই আসল। ভবিষ্যৎ ভাবা দূর, চিন্তা হত এখন জল খেলাম সকালে কি খাব!"[199] অনেকে আবার বলেন প্রথম দিকে তারা যখন এসেছিলেন তখন জানতেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় তাদের আত্মীয়স্বজন আছে তাই চলে যাওয়ার জায়গার অভাব নেই।[200] মুর্শিদাবাদের শংকর

---

[196] তদেব, পৃ. ২৪।

[197] তদেব, পৃ. ২৪-২৫।

[198] কুর্মিটোলা কলোনির উদ্বাস্তুরা লেখকদের শরণার্থী বলে ঘৃণা করতেন, কারণ তারা কৈ মাছ খাওয়ার লোভে এতদিন পূর্ব-পাকিস্তানে পড়েছিলেন বলে। লেখকের কথায়, "ওদের কথার কোনো প্রতিবাদ করিনি। কারণ, আমরা জানতাম যে আমরা পুনর্বাসিত হওয়ার লোভে পশ্চিম-বাংলায় আসিনি। অবস্থার একটু উন্নতি হলে আমরা আবার দেশে ফিরে যাব। তবে সে দেশের নাম পাকিস্তান নয়, আমাদের দামাল ছেলেরা চেষ্টা সমস্যা করছে পাকিস্তানের জায়গায় 'সোনার বাংলা' কায়েম করতে। তাদের ভরসায় আমরা সব দুঃখ কষ্ট মাথা পেতে নিয়েছিলাম"। নবকৃষ্ণ বিশ্বাস, *ভারতে শরণার্থী (১৯৭১),* পৃ. ৫৪।

[199] সাক্ষাৎকারঃ-নীলকান্ত বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[200] সাক্ষাৎকারঃ-শান্তির রঞ্জন সরকার, মালদার ।

বিশ্বাস খুব সুন্দর করে বলেছেন, "যতক্ষণ বিপদ আছে জাতপাত নাই, বিপদ ফুরালেই যে কে সেই"। অনেকে আবার বলেছেন ফাঁকা জমি কোথায় পাওয়া যায় এটাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে মালদা ও মুর্শিদাবাদে তাদের আগমন।[201] "সবাই নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল, অন্যকে নিয়ে ভাবতে সময়, সুযোগ পাইনি। আমি কি করে খেয়ে পরে বাঁচব সেটাই মেন (main)। কৃষিপ্রধান মানুষ তাই জমির খোঁজ করছিলাম। মালদা, মুর্শিদাবাদকে নিয়ে আলাদা করে কিছু ভাবি নি"।[202] মালদার সত্যরঞ্জন বিশ্বাস বলেছেন, "মুসলিমরা যে আছে সেটা বিষয় নয়, বিষয় হলো সস্তায় জমি পাওয়া যাবে তাই চলে আসি"।[203]

স্বাধীনতার আনন্দে মশগুল দেশবাসীর পাশে শতসহস্র উদ্বাস্তু পরিবারগুলির বর্ণনাতীত সংগ্রামের কাহিনী প্রদীপের নিচের অন্ধকারের মতো আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষত এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে জানা গেছে গৃহত্যাগের দিন থেকে শুরু করে নতুন করে মাথার উপর ছাদ পাওয়া পর্যন্ত তাদের কি ভীষণ জীবনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের জীবনে সেই দুর্বিষহ দিনগুলির উপলব্ধি একমাত্র তারাই ভালোভাবে অনুভব করতে পারবেন যারা ওই দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন। তাদের নীরব কান্না 'সিভিলাইজড' 'প্রাইভেসি' নামক কথাগুলিকে আস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই সকল ছিন্নমূল মানুষদের 'রূপান্তরের যাত্রা' পুনর্বাসনের দিকে চোখ থাকবে।

[201] সাক্ষাৎকারঃ- শংকর বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদ।

[202] সাক্ষাৎকারঃ-সুবলচন্দ্র সরকার, মালদা।

[203] সাক্ষাৎকারঃ- সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, মালদা।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন।

ভূমিকাঃ

উদ্বাসন, অভিবাসনের পর উদ্বাস্তুদের জীবন-সংগ্রামে উত্তরণের কাহিনীই বর্তমান অধ্যায়ের উপজীব্য। উত্তরণের প্রথম ও প্রধান সোপান হিসেবে, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পূনর্বাসনের জন্য সরকার কর্তৃক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা অধ্যায়ের প্রথম অংশে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের আলোচনায়, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুরা এই দুই জেলার কোথায় কোথায় বসতি স্থাপন করেছিলেন বা আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন তা তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়ের সবর্শেষ অংশে পূর্ববঙ্গ থেকে এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুরা কোন কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর্থিক অবস্থার সাপেক্ষে সময়ের সঙ্গে তাদের পেশাগত পরিবর্তন, তাদের আগ্রহ ইত্যাদির গতিপ্রকৃতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন আলোচনা সাপেক্ষে উদ্বাস্তুদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। **প্রথম শ্রেণিঃ** এরা ছিল অবস্থাপন্ন ও উদ্যোগী, নিজেদের সম্পদ ও বুদ্ধির জোরে নিজেদের পুনর্বাসন নিজেরাই করে নিয়েছিলেন। এদের অনেকেই ছিলেন ভূম্যাধিকারী এবং উচ্চবিত্ত, যাদের বেশিরভাগেরই কলকাতায় বাড়ি ঘর ছিল। এরা সরকারের ওপর কোন দিক দিয়েই নির্ভর করে থাকেন নি। **দ্বিতীয় শ্রেণিঃ** এরা অবস্থাপন্ন না হলেও উৎসাহী। এরা মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির। নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টায় পরিত্যক্ত অথবা জনশূন্য বাড়ি ও ফাঁকা জমিতে জবরদখল কলোনি সৃষ্টির কারিগর। এরা নিজেদের কর্মসংস্থান নিজেরা করতে পেরেছিলেন কিন্তু সম্পদের অভাবে আশ্রয় ও অন্যান্য ব্যাপারে সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। **তৃতীয় শ্রেণিঃ** এরা ছিলেন দরিদ্র ও নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর মতো শিক্ষা বা সামর্থ্য কোনটাই এদের ছিল না। এরা মূলত ছিলেন কৃষিজীবী, কৃষির সঙ্গে যুক্ত কারিগর অথবা ছোট ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে অনেকেই নমশূদ্র। এরা নিজেদের কর্মসংস্থান ও থাকা খাওয়া ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই একান্তভাবে সরকারের ওপর নির্ভর করত। এরাই সরকারি ত্রাণ শিবিরগুলিতে আশ্রয় নেয়।[1] এদের পুনর্বাসনই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। এদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দণ্ডকারণ্যে ও ক্যাম্পে থাকতে হয়েছিল।

৪.১ মালদা ও মুর্শিদাবাদের উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাঃ

মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে, মুলত যে বিষয়ে সর্বাগ্রে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন তা হল, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার কর্তৃক গৃহীত ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত পরিকল্পনা, প্রকল্প ও ব্যবস্থাপনা। কারণ, এই দুই জেলা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নয়। কাজেই, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাগুলি নেওয়া

[1] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৭২।

হয়েছিল, মালদা ও মুর্শিদাবাদসহ অন্যান্য সকল জেলাগুলিতে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের জন্যও তা সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। পরবর্তী আলোচনা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে হলেও তা মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গেও সমানভাবে সম্পর্কিত।

উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনার পূর্বে পর্যায়ভিত্তিক উদ্বাস্তু আগমন বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ, বিভিন্ন পর্যায়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সরকারি নীতি গৃহীত হতে দেখা গেছে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে ১৯৭১-এর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত সময়কালে, বিভিন্ন পর্যায়ে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনের ভিত্তিতে আগত উদ্বাস্তুদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বিভিন্ন পর্যায়ের আসা অভিবাসীদের সংখ্যা নিচের সারণিতে দেখানো হল-

সারণিঃ- ১ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আসা অভিবাসী

অভিবাসী	সময়কাল	পশ্চিমবঙ্গে আগত অভিবাসীদের জনসংখ্যা (লাখে)	পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাওয়া অভিবাসী (লাখে)
পুরনো	১৯৪৬-৩১.০৩.১৯৫৮	৩১.৪৭	৩১.৩২
মধ্যবর্তী	০১.০৪.১৯৫৮-ডিসেম্বর, ১৯৬৩	০.৫৫	অজ্ঞাত
নতুন	০১.০১.১৯৬৪-২৫.০৩.১৯৭১	৭.৫৭	৬

(File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, Appendix-iii, p.vi.)

প্রথম পর্যায়: ওল্ড মাইগ্রেন্টস বা পুরনো অভিবাসী। আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত আগত উদ্বাস্তুদের পুরনো অভিবাসী বলা হয়। এই সময় পূর্ববঙ্গ থেকে মোট ৪১.১৭ লাখ উদ্বাস্তু এসেছিলেন, যাদের মধ্যে ৩১.৩২ লাখ পশ্চিমবঙ্গেই ছিলেন। **দ্বিতীয় পর্যায়:** অন্তর্বর্তীকালীন অভিবাসী। ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যারা এসেছিলেন তাদের এই পর্যায়ে রাখা হয়েছে। উদ্বাস্তু আগমনকে নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৫৮ সালের ৩১ শে মার্চের পরবর্তীকালে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য কোনরকম ত্রাণ বা পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ সময় আগত প্রায় ৬১,০০০ উদ্বাস্তুর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন প্রায় ৫৫,০০০ জন। **তৃতীয় পর্যায়:** নিউ মাইগ্রেন্টস বা নতুন অভিবাসী। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৭১ এর মার্চ মাস পর্যন্ত যারা এসেছিলেন তাদের নতুন অভিবাসী বলা হয়। এ সময় পূর্ববঙ্গ থেকে ১১.১৪ লক্ষ উদ্বাস্তু অভিবাসন করেছিলেন, যার মধ্যে ৬ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন। এই সময় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের আলোচনায় যে মিলিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা হল;- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কেবলমাত্র সেই সমস্ত নতুন অভিবাসীদের জন্য বরাদ্দ করা হবে, যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ক্যাম্প গুলিতে যেতে রাজি হবেন। যার ফলে, পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাওয়া এই ছয়

লক্ষ উদ্বাস্তুর ক্ষেত্রে কোনো ত্রান বা পুনর্বাসন সুবিধা প্রযোজ্য ছিল না।[2] এদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম পর্যায়ে আসা অভিবাসী অর্থাৎ পুরনো অভিবাসীদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য।

পুরনো অভিবাসীদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা: নিরবচ্ছিন্ন, পর্যায়ক্রমিক তরঙ্গের আকারে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের ধারা অনুসরণ করে বিভিন্ন কালপর্বে পুরনো অভিবাসীদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থায় কয়েকটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম পর্যায়ের পুরনো অভিবাসীদের (১৯৪৬-১৯৪৯) জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা: দেশভাগের ঠিক পরেই যে সমস্ত শরণার্থী পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাদের কেবলমাত্র ত্রাণের আওতায় আনা হয়েছিল। পূর্বের আলোচনা অনুসারে; দুই দেশের সংখ্যালঘুদের আগমন ও নির্গমন, শরণার্থী সংখ্যা ও এই দেশে তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় তাদেরকে প্রথমে পুনর্বাসনের জন্য বিবেচনা করা হয়নি। হতদরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি উদ্যোগে মুর্শিদাবাদসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তু ত্রাণশিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল; খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও চিকিৎসা এই ন্যূনতম প্রয়োজনীয়, অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলি তাদের প্রদান করা।[3] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে, কেন্দ্র সরকারের অর্থ সাহায্যে ১৯৪৯ পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৫৫টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল। এই ত্রাণশিবিরগুলিতে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নগদ অর্থ ও জীবনধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই দুই ধরনের ত্রাণ সরবরাহ করা হত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে ছিল খাদ্যদ্রব্য, পোশাক পরিচ্ছদ, শীতের কম্বল ও পোশাক।[4] মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই সময়কালে যথাক্রমে ১৫,৯৭১ ও ৩৬,২৪১ জন উদ্বাস্তু এসেছিলেন।[5] এই সময় অবশ্য মালদা জেলায় উদ্বাস্তু আগমন তেমন না হওয়ায় (মুর্শিদাবাদ জেলার তুলনায় অর্ধেকেরও কম) কোনো ত্রাণ শিবির খোলার প্রয়োজনীয়তা জেলা প্রশাসন মনে করেনি।[6] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈন্যদের জন্য প্রস্তুত করা মিলিটারি ব্যারাক ও ছাউনিগুলিকে উদ্বাস্তু শিবিরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে সেনা শিবিরে স্থানসংকুলান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, ফলে সৈন্যদের পরিত্যক্ত তাঁবু দিয়ে সেনা ছাউনির বাইরে ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী ছাউনি তৈরি করা হল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পুরনো অভিবাসীদের (১৯৫০-১৯৫১) জন্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা: ১৯৪৯ এ শুধুমাত্র অসমর্থ্য, অথর্ব পুরুষ সদস্য ও অভিভাবকহীন মহিলা ও শিশুদের জন্য গঠিত পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি বা পিএল ক্যাম্প ছাড়া

---

[2] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, *Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal,* Ministry of Supply and Rehabilitation, Department of Rehabilitation, Govt. of India, March 1976, p. 8.

[3] *Manual of Refugee Relief and Rehabilitation, vol-1,* (Kolkata: Govt. of West Bengal, 2001) p. 1.

[4] দেবযানী ঘোষ ও সায়ক মুখার্জি (সম্পাঃ), *দেশভাগঃ অকথিত ইতিহাস,* (কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০২৩) পৃ. ৭৩।

[5] তৃতীয় অধ্যায়, টেবিল নং- ৫ ও ৬।

[6] অশোক মিত্র, *তিন কুড়ি দশঃ তৃতীয় খণ্ড,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬০), পৃ-৩০।

বাকি ত্রাণ শিবির বন্ধের নির্দেশ দেয় কেন্দ্র সরকার। কিন্তু ১৯৫০-এর দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু আগমন বৃদ্ধি পেলে, সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সরকার বাধ্য হন। এই সময় আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বিরাট আকার ধারণ করলে সেই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র ত্রাণের কথা না ভেবে কেন্দ্র সরকার তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টিও বিবেচনাযোগ্য মনে করে। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই সময়কালে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪২২৭ ও ২২৪৮৮ জন।[7] এই পর্যায়ের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার তিনটি স্তর ছিল। ১. ত্রাণ, ২. পুনর্বাসন ও ৩. সাধারণ ব্যবস্থা। প্রাথমিকভাবে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ শিবিরে নিয়ে গিয়ে ডোল এর ব্যবস্থা করা হত, পরবর্তীকালে তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুত করা হত। ত্রাণ ও পূনর্বাসনের জন্য শরণার্থীদের যথাক্রমে বিভিন্ন ধরনের অনুদান ও ঋণ দেওয়া হত।[8] কিছু 'সাধারণ ব্যবস্থা' (General measures) ছিল যা থেকে উভয়েই উপকৃত হত। চিকিৎসা এবং শিক্ষাকে সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছিল।

তৃতীয় পর্যায়ের পুরনো অভিবাসীদের জন্য (১৯৫২-১৯৫৮) পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা: উদ্বাস্তু আগমন কমতে থাকলে সরকারি তথ্য মাফিক ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে আবার সমস্ত ত্রাণ শিবিরগুলি বন্ধ করা হয়। কিন্তু ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি পাসপোর্ট ও ভিসা চালুর ঘোষণায় পশ্চিমবঙ্গের বুকে আবারও উদ্বাস্তু মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ে। পুনরায় সজীব হয় ত্রাণশিবিরগুলি। তবে এই উদ্বাস্তু আগমনকে প্রতিহত করতে কেন্দ্র সরকার ১৯৫৬ সালে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট কিছু ইস্যু করা শুরু করছিল।[9] মালদা ও মুর্শিদাবাদে এই সময় যথাক্রমে ১২,৭২৬ ও ১৭,৩৬৮ জন উদ্বাস্তু এসেছিলেন।[10] ১৯৫৮-তে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু জনসংখ্যা যথাক্রমে ৭২,৯২৪ ও ৭৬,০৯৭ (দ্রষ্টব্য সারণি-৩)। পূর্বের মতো এই পর্যায়েও উদ্বাস্তুদের জন্য ১) ত্রাণ, ২) পুনর্বাসন, ৩) সাধারণ ব্যবস্থা এই তিনটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তবে এই সময় পুনর্বাসন স্কিমগুলির কিছু হেরফের হয়েছিল। এই সময় পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছিল। এই পর্যায়ে 'সাধারণ ব্যবস্থা'র অন্তর্গত চিকিৎসা ক্ষেত্রে যক্ষারোগীদের কথা চিন্তা করে বিশেষ নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জোর প্রদান করা হয়েছিল।

পুরনো অভিবাসীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার প্রথম দিকে ত্রাণ শিবিরগুলি কার্যকারিতার ভিত্তিতে বিভক্ত ছিল, এগুলি হল রিলিফ ক্যাম্প, ট্রানজিট ক্যাম্প, ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প এবং কলোনি ক্যাম্প। পরবর্তীকালে সবগুলিই কার্যত ত্রাণ শিবিরে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫৭-এর মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমবঙ্গে মোট ক্যাম্পের সংখ্যা দাঁড়ায়

---

[7] তৃতীয় অধ্যায়, টেবিল নং- ৫ ও ৬।

[8] File No:-G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, *Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal,* Refugee Relief and Rehabilitation Department, August 1956, Govt. of West Bengal, p. 12.

[9] *Estimate Committee Reports (1959-60),* 2nd Lok Sabha, Ministry of Rehabilitation, New Delhi, p. 4.

[10] তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, ১৯৫১ সালের সেনসাস অনুযায়ী মালদা ও মুর্শিদাবাদের উদ্বাস্তু জনসংখ্যা যথাক্রমে ৬০,১৯৮ ও ৫৮,৭২৯ (টেবিল-৫ ও ৬) এবং ১৯৫৮ সালে যথাক্রমে ৭২,৯২৪ ও ৭৬,০৯৭।

২১২টি।[11] প্রাথমিকভাবে ত্রাণ বন্টনের কেন্দ্র ছিল রিলিফ ক্যাম্প। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যাদের পাঠানো হবে বলে নির্ধারণ করা হত তাদের ট্রানজিট ক্যাম্পে রাখা হত। যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক কর্মক্ষম পুরুষ সদস্য থাকত তাদেরকে প্রথমেই পুনর্বাসন সাইটে পাঠানো হত এবং সেই পুরুষ সদস্যকে সাইটের উন্নতির কাজে লাগানো হত। সেখানে শ্রমের বিনিময়ে তারা উপার্জন করত। তার সঙ্গে পরিবারের বাড়তি সদস্যদের জন্য দেওয়া হত ডোল। এগুলিকে বলা হত কলোনি ক্যাম্প। কারণ, এগুলি পুরোপুরি কলোনিও নয় আবার পুরোপুরি ক্যাম্পও নয়।[12]

ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পঃ ধীরে ধীরে পুনর্বাসনযোগ্য জমির পরিমাণ কমতে থাকলে ক্যাম্পবাসী সমস্ত উদ্বাস্তুদের দীর্ঘদিন বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত রাখা পুনর্বাসন দপ্তরের পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠল। সমস্যা সমাধানে তখন সরকার-গৃহীত বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজে উদ্বাস্তু পরিবারের সক্ষম পুরুষ সদস্যকে নিয়োগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হল। এখানেও শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ ছিল। এই কাজের উৎসাহ প্রদানের জন্য পারিশ্রমিক ছাড়াও শ্রমিকের পরিবারের জন্য ভর্তুকিরও ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারি প্রকল্পগুলিতে এইভাবে তাদের নিয়োগ করা হল। যেমন,- বাগজোলা ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পে উদ্বাস্তুরা সেচ-খাল খনন করে সেই অঞ্চলের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়াও ছিল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, মোর ল্যান্ড প্রজেক্ট ইত্যাদি। রাস্তা তৈরি, ক্যানেল তৈরি, বাঁধ তৈরি ছাড়াও চাষের কাজে জল নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য খনন কার্যে ও সেচ দপ্তরেও তাদেরকে কাজে লাগানো হল। এগুলোর পাশাপাশি নবাগত উদ্বাস্তুদের তাঁবু তৈরি, ঝুড়ি তৈরি, ইঁট তৈরি ইত্যাদির কাজে লাগানো হত।[13]

এই সমস্ত ক্যাম্পগুলির বাইরেও আরো দুটি ক্যাম্প ছিল। পিএল (Permanent liability) ক্যাম্প ও মহিলা ক্যাম্প। উদ্বাস্তুদের মধ্যে দুটি অংশ এমন ছিল যাদের দীর্ঘকালীন সরকারি সহায়তার দরকার ছিল। তাদের মধ্যে একটি অংশে ছিলেন বার্ধক্যে উপনীত বা ক্রনিক ব্যাধিতে আক্রান্ত, অ-কর্মক্ষম এবং পরিবারের দেখাশোনা করবার মতো কেউ নেই এমন পুরুষ। দ্বিতীয় অংশে ছিলেন অভিভাবকহীন মহিলা ও অনাথ শিশুরা। এই দুই শ্রেণির জন্য বিভিন্ন হোমগুলি দীর্ঘকালের জন্য খোলা রাখা হয়েছিল।[14] পুরনো অভিবাসীদের আগমনের প্রথম পর্যায়ে যে পিএল ক্যাম্প ছিল তার আর একটি পরিবর্ধিত অংশ পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল তা হল মহিলা ক্যাম্প। পিএল ক্যাম্পে মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে অসমর্থ্য, অথর্ব, শারীরিকভাবে অক্ষম বৃদ্ধ পুরুষরাও থাকতে

---

[11] *Estimate Committee Reports (1959-60),* p .6.

[12] Dipak Kumar Sarkar, *Refugee and Migration Problems in West Bengal: Society, Economy and Polity (1947 2000),* Thesis Submitted in 2016 for the Degree of Doctor Philosophy in the Department of History at University of North Bengal, p. 144.

[13] File No:-G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p. 2.

[14] File No:-G.P. 361.5 (5415) In 2 r, pp. 6-7.

পারতেন। কিন্তু মহিলা ক্যাম্পের ক্ষেত্রে কোন পুরুষ সদস্য থাকতে পারতেন না; সেখানে কেবলমাত্র মহিলা এবং শিশুরা থাকতেন। এখানে সবাই ঢুকতেও পারতেন না। ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষর অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হত। ট্রানজিট ক্যাম্প, রিলিফ ক্যাম্প ও কলোনি ক্যাম্পগুলি ছিল প্রাথমিক ত্রান বন্টনের ক্ষেত্র।

এবার দেখে নেওয়া যাক এই পুরনো অভিবাসীদের ত্রাণ, পুনর্বাসনের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পুরনো অভিবাসীদের জন্য যে ত্রাণের ব্যবস্থাগুলি ছিল তা পরিশিষ্ট-৩ অংশে, সারণি-১-এ দেখানো হল। পুরনো অভিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের ১) গ্রামকেন্দ্রিক এবং ২) শহরকেন্দ্রিক এই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে তাদের জন্য আলাদা আলাদা পুনর্বাসন স্কিমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেখানে তাদের জন্য হাজার হাজার একর চাষযোগ্য এবং বাস্তু জমি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন ধরনের ঋণের ব্যবস্থা যেমন জমি কেনার জন্য ঋণ, গৃহ ঋণ, কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও বাণিজ্য ঋণ, অন্যান্য পেশার জন্য ঋণ ইত্যাদি। এর পাশাপাশি চিকিৎসা ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল।[15]

১) গ্রামাঞ্চলে পুনর্বাসনঃ গ্রামকেন্দ্রিক উদ্বাস্তুদের আবার কৃষিজীবী ও অ-কৃষিজীবী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। কৃষিজীবি পরিবারের জন্য চারটি প্রকল্প ছিল। ক) টাইপ প্রকল্প, খ) ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প, গ) বারুজীবী প্রকল্প, ঘ) সবজি চাষ প্রকল্প। অ-কৃষিজীবী পরিবারের জন্য তিনটি প্রকল্প ছিল। ক) টাইপ প্রকল্প, খ) ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প, গ) ইউনিয়ন বোর্ড পরিবর্ত প্রকল্প।

কৃষিজীবি পরিবারের জন্য প্রকল্পসমূহঃ

ক) **টাইপ প্রকল্প:-** সাধারণ টাইপ স্কিম অনুযায়ী, উদ্বাস্তুদের সরকার অধিগৃহীত জমি দেওয়া হত অথবা জমি কেনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ দেওয়া হত। উদ্বাস্তুরা দরদাম করে নিজেরাই জমি কিনত। কিন্তু তারা ঋণ ও অনুদান হিসেবে পুনর্বাসন সহায়তা পেত। ঋণ ও অনুদানের সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল পরিবার পিছু ১৯০০ টাকা। তার মধ্যে ছিল ৫৫৫ টাকা গৃহনির্মাণের জন্য, কৃষিঋণ বাবদ ৬০০ টাকা, জীবিকা নির্বাহের জন্য ছয় মাসের ঋণ এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেচ ও ভূমিসংস্কারের জন্য একর পিছু যথাক্রমে ১০০ ও ৫০ টাকা ঋণ দেওয়া হত। এর মধ্যে ১ মাসের নগদ ডোলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিবার পিছু জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল সরকার অনুমোদিত স্কিমে ২ একর এবং ব্যক্তিগত বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে পৌনে দুই একর।

খ) **ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প:-** ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্পে সরকার, ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ও স্থানীয় স্কুল শিক্ষকদের সক্রিয় সহায়তায় বিভিন্ন মৌজায় উদ্বাস্তুদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পুনর্বাসন দিতে চেয়েছিল। এই প্রকল্পের

[15] File No:-G.P. 361.5 (5415) In 2 r, p. 8.

সাফল্য নির্ভর করছিল স্থানীয় মানুষ ও ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মচারীদের সহযোগিতা ও সাহায্যের ওপর। উদ্বাস্তুরা তা পায়নি। এই প্রকল্প অনুযায়ী জমি কেনার জন্য উদ্বাস্তুদের কোনো ঋণ দেওয়া হত না। পুনর্বাসন-ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা নিজেদের টাকা দিয়ে কেনার মতো জমি খুঁজে পায়নি। এই প্রকল্প পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

গ) **বারুজীবী প্রকল্প:-** বারুজীবী প্রকল্প অনুযায়ী, পানচাষের জন্য উদ্বাস্তুদের গড়ে ২ বিঘা পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও বাস্তু জমি দেওয়া হয়েছিল ৮ কাঠা করে। সেচের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় এই প্রকল্পও ব্যর্থ হয় ।

ঘ) **সবজি চাষ প্রকল্প:-** সবজি চাষ প্রকল্পও বারুজীবী প্রকল্পের মতো ব্যর্থ হয়। এই প্রকল্প ফলপ্রসু হয়নি, কারণ; যাদের এই প্রকল্পে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের অধিকাংশই অকৃষিজীবী নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির এবং তাদের সবজি চাষের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। জমিও সবজি চাষের উপযুক্ত ছিল না, সেচের ব্যবস্থাও ছিল না। কলকাতা থেকে দূরে অবস্থানের জন্য উপযুক্ত বাজারও ছিল না।

অ-কৃষিজীবী পরিবারের জন্য তিনটি প্রকল্প ছিলঃ

ক) **টাইপ প্রকল্প:-** গ্রামীন অ-কৃষিজীবী পরিবারগুলির জন্য এই স্কিম অনুযায়ী সরকার থেকে বাস্তু জমির প্লট দেওয়া হত অথবা নিজেরাই জমি কিনতে চাইলে তার জন্য ঋণ দেওয়া হত। ঋণ বা অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ সীমা ছিল পরিবার পিছু ১৭৭৫ টাকা। এর মধ্যে গৃহনির্মাণ ঋণ ৫০০ টাকা, ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে ঋণ ৫০০ টাকা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঋণ, এক মাসের নগদ ডোল অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও যারা নিজেরা বন্দোবস্ত করে জমি কিনত তাদের প্লট পিছু ৭৫ টাকা করে দেওয়া হত।

খ) **ইউনিয়ন বোর্ড প্রকল্প:-** এই প্রকল্পের স্কিমগুলি টাইপ প্রকল্পের কাছাকাছিই ছিল।

গ) **ইউনিয়ন বোর্ড পরিবর্ত প্রকল্প:-** এই প্রকল্পের স্কিমগুলিও টাইপ প্রকল্পের অনুরূপ। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ অ-কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের এককালীন অ-ফেরতযোগ্য কিছু টাকা (সালামি) প্রদান করে বৃহৎ পতিত জমিগুলিতে তাদের বসতি স্থাপন করানো। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত দীর্ঘসুত্রিতা ও জটিলতা এড়াতে উদ্বাস্তুদের ব্যক্তিগত জমিদারদের জমিতে ভাড়াটে হিসেবে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। এর বিপরীতে যেখানে জবরদখল কলোনিগুলির ক্ষেত্রে সরকারি অধিগৃহীত জমিগুলিতে উদ্বাস্তুরা বসতি স্থাপন করত।[16] গ্রামাঞ্চলে পুনর্বাসনের জন্য যে সমস্ত ঋণগুলি দেওয়া হত সেগুলি পরিশিষ্ট-৩ অংশে, সারণি-২-এ দেখানো হয়েছে।

[16] Ibid, pp. 8-9; প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ২৮-৩০।

2) **শহরাঞ্চলে পুনর্বাসনঃ** শহরাঞ্চলের উদ্বাস্তুরা যাতে নিজেদের চেষ্টায় পুনর্বাসন করতে পারে তাই তাদেরকে একাধিক ঋণ প্রদান করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ তাদেরকে বাস্তু জমি ক্রয়ের জন্য ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ, ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ঋণ, ব্যবসার ক্ষেত্রে ঋণ, পেশার ক্ষেত্রে ঋণ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রকার ঋণ, তাদের পরিমাণ ও কোন কোন ক্ষেত্রে বা কি কি শর্তে সেগুলি প্রযোজ্য তা পরিশিষ্ট-৩ অংশে, সারণি-৩-এ দেখানো হল।

পেশাগত ক্ষেত্রে ঋনঃ গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বিভিন্ন পেশাজীবী উদ্বাস্তু যেমন ডাক্তার, আইনজীবী, কবিরাজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে বইপত্র এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছিল (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-৩, সারণি-৪)।

মালদা জেলার বিভিন্ন গ্রামে বসবাসকারী কৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবারগুলি বেশিরভাগ টাইপ স্কিমের সুবিধা নিয়েছিলেন এবং শহরাঞ্চলে বসবাসকারীরাও বিভিন্ন অনুদান, ঋণ পেয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুরা যেহেতু অধিকাংশই কৃষিজীবী, পান চাষী এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী, সেজন্য তাদের বেশিরভাগ টাইপ স্কিম এবং বারুজীবী স্কিমের সুবিধা পেয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ আয়েসবাগ, মহালন্দী কলোনির প্রত্যেকে বারুজীবী স্কিম নিয়ে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। অধ্যায়ের শেষের দিকে, সারণিসহ এই দুই জেলায় আগত কৃষিজীবী, অ-কৃষিজীবী, বারুজীবী উদ্বাস্তু পরিবারগুলির পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধাঃ পুরনো অভিবাসীদের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য সাধারণ হাসপাতাল, যক্ষা হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঔষধালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। হাসপাতালে শয্যা-সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। নতুন যক্ষা হাসপাতাল, জেনারেল বেড, আউটডোর বিভাগ, যক্ষার চেস্ট ক্লিনিক খোলা হয়েছিল। হাসপাতালে উদ্বাস্তু যক্ষারোগীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সময় আগত উদ্বাস্তুরা বেশিরভাগ অপুষ্টিজনিত কারণে যক্ষায় আক্রান্ত হতেন, তাদের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা ছিল। ক্যাম্পবাসী ও ক্যাম্প বহির্ভূত যক্ষা আক্রান্ত উদ্বাস্তু ও তার পরিবারের জন্য বরাদ্দগুলি পরিশিষ্ট-৩-এ, সারণি-৫-এ দেখানো হল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; এই সময় মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আক্রান্ত যক্ষা রোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫২টি ও ৬২টি।[17] স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য মালদা জেলার মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জেলা জুড়ে নটি মোবাইল মেডিকেল ইউনিটের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়মূলক চিকিৎসার জন্য উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন অঞ্চলে ব্যবস্থা করেছিলেন।[18]

[17] File No:- G.P. 361.5 (5415) 083 w 52, p. 87.

[18] West Bengal District Handbook, *Malda, Census-1951*, p. xI.

শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা: উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেমেয়েদের পঠন-পাঠনের জন্য রাজ্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। প্রত্যেকটি ক্যাম্পে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হয়। এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ ও নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সরকারের তরফ থেকে অনুদান ও ঋণ দিয়ে সাহায্য করা হয়। আগে থেকেই বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্বাস্তু ছেলে-মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত আসন সংযোজন করা হয়, আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, হোস্টেলে আসনসংখ্যা বাড়ানো হয়, দুঃস্থ উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিতে পঠন-পাঠন, বিদ্যালয়ের বেতন, টিউশন ফি, পাঠ্যপুস্তক ক্রয় ইত্যাদি বাবদ বিভিন্ন রকম আর্থিক সহায়তা, যেমন বৃত্তি, অনুদান, ঋণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি সহায়তায় বিভিন্ন ঋণ এবং অনুদানের মাধ্যমে উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বহু উদ্বাস্তু শিক্ষকদের নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৬ সালের রিপোর্ট অনুসারে, ৭০০০ শিক্ষকের মধ্যে ৯৫% ছিলেন পূর্ব থেকে আগত উদ্বাস্তু, যারা সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।[19] শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে বৃত্তি বা অনুদানের ব্যবস্থা ছিল তা পরিশিষ্ট-৩ অংশে সারণি-৬-এ প্রকাশ করা হল।

মালদা জেলার ক্ষেত্রে জানা যায়, শিশুদের শিক্ষার জন্য যাতে করে প্রত্যেক শিশুরা বিনামূল্যে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তা সরকার নিশ্চিত করেছিল। রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়ে কিছু নতুন বিদ্যালয় (উদাহরণস্বরূপ, উমেশচন্দ্র বাস্তুহারা বিদ্যালয়) গড়ে তোলে এবং উপস্থিত কিছু বিদ্যালয়ে উদ্বাস্তুদের পড়ার ব্যবস্থা করে দেয়। ব্যাক্তিগত উদ্যোগেও বেশ কিছু বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল যা পরের অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে। বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত রঞ্জন বিশ্বাস, তাদের উদ্যোগে এরকম একটা স্কুল গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়াও রাজ্য সরকার মালদা কলেজের উদ্বাস্তুদের পড়ার জন্য বেশ কিছু পরিকাঠামোর উন্নতি সাধন করে।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ সম্পর্কে জানা যায়; উদ্বাস্তু ছাত্রদের জন্য ছাত্রসংখ্যা ৩০০ থেকে বেড়ে ৭০০ হয়। হোস্টেলসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ছাত্ররা অধ্যক্ষের কাছে আবেদন করলে, অধ্যক্ষ ও পরিচালন সমিতির তৎপরতায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সামরিক কর্তৃপক্ষকে মেইন হোস্টেল ভবনটি কলেজকে হস্তান্তর করতে অনুরোধ করেন। শুধু তাই নয়; বহরমপুর ইউনিয়ন ট্রেনিং কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয়। এর পাশাপাশি বেতন মকুব, পাঠ্যপুস্তক এর জন্য সাহায্য মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের সর্বস্তরে সহায়তা দান, ওপার বাংলা থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, রাজ্যে নিয়োগ করা এবং বেতন ক্রমে উচ্চ হার দেওয়া ইত্যাদি ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের প্রতি ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ।[20]

---

[19] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, pp. 8-9.

[20] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব ও দেশভাগের প্রভাব,* (বহরমপুর: আকাশ, ২০১৮), পৃ. ৫০।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণঃ উপরে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধাগুলি ছাড়াও বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বহু উদ্বাস্তু যুবক-যুবতী লাভজনক কর্মসংস্থানের সন্ধান পান। উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য জুনিয়র কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। রাজ্য সরকার পুরুষদের জন্য টিটাগর, হাবরা এবং গয়েশপুরে তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মহিলাদের জন্য উত্তরপাড়া, হাবড়ার নারী সেবা সংঘ, উদয় ভিলায় তিনটি আবাসিক ও কিছু অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালনা করত, যেখানে দুই হাজারেরও বেশি ছেলে-মেয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। এছাড়াও টিটাগর, হাবড়া, গয়েশপুর, তাহেরপুর, চাকদা, রূপশ্রী পল্লী, শান্তিপুর বয়ন প্রতিষ্ঠান মিলে পুরুষদের জন্য সাতটি এবং হাবড়া, মিয়ারবার, উদয় ভিলা, টিটাগর ক্যাম্প নম্বর ২ এ মহিলাদের জন্য চারটি মোট ১১টি উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। যেখানে প্রায় দেড় হাজার যুবক-যুবতীর প্রশিক্ষণ পরবর্তী কর্মসংস্থান হয়েছিল। ১৯৫৬ পর্যন্ত বয়ন, সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদি এবং কারিগরি বিদ্যা মিলে ৫০০০ মহিলাসহ প্রায় ২৫,৩৭১ জন যুবক যুবতী প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, যা তাদের উপার্জনের সাহায্য করে। যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ব্যবসা শুরু করেছিলেন সেখান থেকে পরে আবার আরো কিছু উদ্বাস্তু যুবক-যুবতী তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছিলেন।[21]

এর পাশাপাশি প্রচুর ছেলে-মেয়ে অ্যাপ্রেন্টিসসিপ স্কিমে প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। ১৯৬০ পর্যন্ত ১৭,০০০ মহিলাসহ ৪৫ হাজারেরও বেশি উদ্বাস্তু ক্রাফট্সম্যান, সুপারভাইজার ও ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। বিভিন্ন শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্বাস্তুদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকত। অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থ অনুদান দেয়া হত। এগুলি অবশ্য ১৯৬৪-এর পর বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও হোমে বসবাসকারী পরিবারহীন মহিলাদের প্রশিক্ষণসহ কর্মসংস্থানের জন্য জন্য ৩৮টি প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে তারা একই সাথে একই জায়গায় প্রশিক্ষণও পেতেন এবং কিছু উপার্জনেরও জন্য কাজও পেতেন, যা তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলির বেশিরভাগকেই মহিলা হোম সংলগ্ন উৎপাদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ জাপানি প্রযুক্তিবিদদের সহায়তায় গড়ে ওঠা কামারহাটি বাঁশ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। সেখানে ৯০ জন কর্মরত উদ্বাস্তু ছিলেন ৩০০ পরিবারের উপার্জনের মাধ্যম।[22]

শিল্প সংক্রান্ত স্কিম:

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: পুরনো অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ঘনবসতিপূর্ণ উদ্বাস্তু কলোনিগুলির আশেপাশে ছোট থেকে মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার জন্য ১৯৫৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পুনর্বাসন মন্ত্রক শিল্প সংক্রান্ত কিছু স্কিম নিয়ে আসেন। এই স্কিম অনুসারে, বিভিন্ন শিল্পপতিদের আংশিক বা পূর্ণ সরকারি সহায়তায় মাঝারি ধরনের শিল্প গড়ে

[21] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, pp. 6 & 21.

[22] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, pp. 12-13.

তোলার জন্য উৎসাহিত করা হত। পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বাসন মন্ত্রকের সাহায্যে যে সমস্ত ক্ষুদ্র কুটির শিল্পগুলি তখন চালু হয়েছিল সেগুলো হল,- চাল কল, তেল কল, আটা কল, ডাল কল, বেকারি, মিষ্টান্ন দ্রব্য, লজেন্স ও ক্যান্ডি আইসক্রিম, ফলজাত দ্রব্য, নটকোনা, কার্ডবোর্ড বাক্স, প্যাকিং বাক্স, খাম, বই বাঁধাই মুদ্রণ, স্লেট, পেন্সিল, চক, রং, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ওষুধ; বিভিন্ন রাসায়নিক, কীটনাশক, ধূপকাঠি, ন্যাপথলিন, জীবাণুনাশক, এসিড, কালি, পাতিত জল কসমেটিক, কাচের চুড়ি, ইট তৈরি, সিরামিক দ্রব্য, স্টিলের তৈরি বাসনপত্র, সোনা রুপোর দ্রব্য, ধাতব দ্রব্য, জর্দা, সিগারেট, বিড়ি, বোতাম, ডায়াপার, বুনন, সেলাই, হোসিয়ারি, মোজা, জুতো তৈরি, চামড়ার দ্রব্য, প্লাস্টিকের দ্রব্য, রবারের দ্রব্য, ছাতা, ট্যানিং, সাইকেল, দরজা-জানলা, প্লাইউড, আসবাবপত্র, সাইকেলের সিট, ট্রাঙ্ক, সুটকেস, খেলার মার্বেল, কৃত্রিম ফুল, বাঁশের তৈরি জিনিস, মাটির মডেল, ব্যাটারি, রেডিও সেট, মোটরসাইকেল, সাইকেলের বিভিন্ন অংশ, নাট-বোল্ট বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পাইপ, বাদ্যযন্ত্র, তড়িৎ লেপন, দস্তা লেপন নিকেল লেপন, ইলেকট্রিক জিনিসপত্র তৈরি ইত্যাদি।[23]

মাঝারি শিল্প: বিভিন্ন কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের পাশাপাশি ১৯৫৯-এর ১-লা জানুয়ারি পর্যন্ত ১৮টি মাঝারি শিল্প স্কিমের অনুমোদন দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গে। সংশ্লিষ্ট শিল্পের মধ্যে রয়েছে আটটি স্পিনিং মিল, একটি হোসিয়ারি কারখানা, তিনটি প্রকৌশল শিল্প, চারটি হিউম পাইপ কারখানা, একটি চিনিকল, একটি রাসায়নিক কারখানা এবং একটি সেরামিক কারখানা।[24] উদাহরণস্বরূপ; রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গড়ে ওঠা সাতটি টেক্সটাইল মিলের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগ্যে তাদের মধ্যে একটি ছিল, কাশিম বাজারের বেঙ্গল টেক্সটাইল মিল। এর জন্য কেন্দ্র সরকার ৭লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করে। এই মিলে ৬৫৭ জন উদ্বাস্তুর কর্মসংস্থানের কথা বলা হলেও ৪০৩ জন উদ্বাস্তু নিযুক্তির কথা জানা যায়।[25] শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ বা উৎপাদনে নয় উদ্বাস্তুদের হাতে তৈরি এই সমস্ত জিনিসগুলির বাজারে আনার জন্য ও তার থেকে যাতে উদ্বাস্তুরা উপার্জন করতে পারেন সেইজন্য ১৯৫৪ সালে রিফিউজি হ্যান্ডিক্রাফট সেলস এম্পোরিয়াম প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেখান থেকে ১৯৫৬ সালের ৩১-শে মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ দু বছরের মধ্যেই ৩৫ লক্ষ টাকার জিনিস বিক্রি হয় এবং প্রায় ৬০ হাজার টাকা লাভ হয়। যার ফলে, সরকার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে এবং ঘনবসতিপূর্ণ উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকায় বিক্রয় কেন্দ্রের একটি করে শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নেন।[26] রাজ্যের মধ্যে এইসকল পুনর্বাসন ব্যাবস্থা ছাড়াও দণ্ডকারণ্য প্রকল্প অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য রাজ্যে পুনর্বাসনের ব্যাবস্থা ছিল। উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্যে যেতে না চাইলে

[23] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, pp. 6 & 24.

[24] *Estimate Committee Reports (1959-60),* pp. 30-32.

[25] Ibid, p. 64; File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, p. 24.

[26] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p.6.

বা অন্যান্য পুনর্বাসন স্কিম নিতে অস্বীকার করলে তাদের দু-মাস অন্তর নোটিশ দিয়ে সতর্ক করে মোট চার মাস ক্যাম্পে থাকতে দেওয়া হত। তারপরে ছয় মাসের নগদ ডোল অগ্রিম দিয়ে তাদের ক্যাম্প ছেড়ে দিতে বলা হত।[27]

সরকারি অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনিঃ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার, সরকার অধিগৃহীত জমির ওপর কলোনি গড়ে তুলেছিল যেগুলি সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনি নামে পরিচিত। ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে; উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকার ৮৫,০০০ একর জমির ওপর ৫২৮টি কলোনি স্থাপন করেছিলেন; যার মধ্যে ২৮৮টি ছিল শহরে এবং ২৪০টি ছিল গ্রামীণ এলাকায়। এর মধ্যে ১৪৫টি পুরোপুরি কৃষি কলোনি। এই সমস্ত কলোনিগুলিতে ৯০,০০০ পরিবারকে বাস্তু জমি ও ২৩,০০০ পরিবারকে কৃষি জমি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে অবশ্য গ্রামীন এলাকায় থাকা কিছু কিছু কলোনি অ-কৃষি হওয়ায় পৌর কলোনি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।[28] ১৯৫৬ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বাস্তহারা মানুষদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্য থেকে প্রাপ্ত, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকার অনুমোদিত কলোনিগুলির জন্য বরাদ্দ জমি, প্লট এবং তাতে আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সংখ্যা নিচের সারণিতে প্রকাশ করা হল-

সারণিঃ-২ সরকার অনুমোদিত কলোনি

জেলার নাম	মোট স্কিম	স্কিমের অন্তর্গত মোট এলাকা	মোট প্লট	মোট পরিবার
মালদা	১০	১১০১.২০	৮২১	৫০৭
মুর্শিদাবাদ	২৪	৩৩১৭.৩৫	৩১৯২	২৩৩৫

(File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p.20)

২০০১ সালের রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত ম্যানুয়ালে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, মালদা জেলায় ১৫টি সরকারি পুনর্বাসন কলোনি ছিল, যার মধ্যে ৯টি গ্রামীণ এলাকায় ও ৬টি শহরাঞ্চলে। মুর্শিদাবাদের ২৫টি সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনির মধ্যে গ্রাম ও শহরে এলাকায় যাদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮টি ও ৭টি (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-৩, সারণি-৭,৮)। এই কলোনিগুলির মধ্যে শহরাঞ্চলের কলোনিগুলিতে শুধুমাত্র হোমস্টেড প্লট বিলি করা হত এবং গ্রামাঞ্চলের কলোনিগুলিতে পরিবার পিছু দশ কাঠা পর্যন্ত হোমস্টেড প্লট এবং ৩ একর বা ৯ বিঘা পর্যন্ত কৃষিযোগ্য জমির প্লট বিলি করা হত।[29]

[27] *Estimate Committee Reports (1959-60),* p.16.

[28] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, pp.10.

[29] Ibid, p. 17.

১৯৫৮ সালের ৩০ শে মার্চ পর্যন্ত সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে আগত ৩১.৩২ লক্ষ পুরনো অভিবাসনকারী বা ওল্ড মাইগ্রেন্ট উদ্বাস্তুর মধ্যে ৭.৯২ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[30] অর্থাৎ মোট উদ্বাস্তু সংখ্যার ২৫ শতাংশ সরকারি ক্যাম্প বা কলোনিগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাকি ৭৫ শতাংশ সরকারি ক্যাম্প বা কলোনিগুলিতে আশ্রয়গ্রহণ করেননি এবং এদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারকে ভাবতে হয়নি। এই ৭৫ শতাংশ উদ্বাস্তু তাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আগে ভারতে চলে আসা কোনো পারিবারিক সদস্যের সাহায্যে নিজেদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান খুঁজে নিয়েছিলেন।[31] আবার অনেকে ত্রাণ শিবিরগুলির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পর্যাপ্ত স্থান, শৌচালয়, জল নিকাশি ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ইত্যাদির অভাবে মনুষ্যেতর জীবন যাপনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শিবির ত্যাগ করেছিলেন। প্রফুল্ল চক্রবর্তী তার 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে এই ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুদের জীবন যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করেছেন। শিবিরের এক একটি ঘরে কুড়িটি উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তারা ইঁট, পাথরের টুকরো বা ছেঁড়া বস্ত্রখন্ড প্রভৃতি দিয়ে নিজেদের পরিবারের জন্য বরাদ্দ স্থানটুকু অন্য পরিবার থেকে পৃথক করে রাখত।[32] এস্টিমেট কমিটি রিপোর্টেও ক্যাম্পগুলির অবস্থা অসন্তোষজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। দাসপাড়া, রিলায়েন্স ক্যাম্পে কমিটির পরিদর্শক দল পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন একটি সংকীর্ণ গুদাম ঘরে কোনো পর্দা বা দেওয়াল ছাড়াই গাদাগাদি করে অনেকগুলি পরিবার একসঙ্গে বসবাস করছে। ক্যাম্পবাসীদের মধ্যে ১৫ জন যক্ষা আক্রান্ত। নটি নলকূপের মধ্যে পাঁচটিই অকেজো।[33] তবে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতোই মালদা ও মুর্শিদাবাদেও বেশিরভাগ মানুষই ক্যাম্প ও কলোনিতে ছিলেন না। সরকারি তথ্য অনুসারে ১৯৫৮ সালে মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারি ক্যাম্প, হোম ও কলোনিতে বসবাসকারী ও এগুলির বাইরে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল।

সারণিঃ-৩ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সরকারি ক্যাম্প, হোম ও কলোনিগুলিতে অবস্থানকারী ও এগুলির বাইরে অবস্থানকারী উদ্বাস্তু সংখ্যা।

জেলা	ক্যাম্প ও হোমের সংখ্যা	ক্যাম্প ও হোমের জনসংখ্যা	সরকারি কলোনির সংখ্যা	সরকারি কলোনির জনসংখ্যা	ক্যাম্প ও কলোনির বাইরে উদ্বাস্তু সংখ্যা	উদ্বাস্তুদের মোট জনসংখ্যা
মালদা	-	-	১২	২৯৩৯	৬৯০০৪	৭২৯২৪
মুর্শিদাবাদ	৮	১২৭০৯	২১	৯৯৪৫	৫৩৪৪৩	৭৬০৯৭

(জয়া চ্যাটার্জী, দেশভাগের অর্জন: বাংলা ও ভারত, ১৯৪৭-৬৭, আবু জাফর অনূদিত, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০), পৃ. ১৪১)

[30] Ibid, p. 1.

[31] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, p. 6.

[32] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ.২৬।

[33] *Estimate Committee Reports (1959-60),* p.7.

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট উদ্বাস্তুরা সরকারি ক্যাম্প, হোম বা কলোনির তুলনায় এগুলির বাইরে থাকাকে বেশি পছন্দ করেছিলেন। এর কারণ হতে পারে ত্রাণ শিবির থেকে প্রাপ্ত রসদ ও আশ্রয়ের ও অপর্যাপ্ততা। বর্তমান গবেষণায় অনেক সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ক্যাম্পে দেওয়া বা ডোল থেকে পাওয়া চালের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তাদের অনেকের মতে সেই চাল দিয়ে তারা রান্না করেও ভাত খেতে পারতেন না। অনেক সময় তাদের না খেয়েই থাকতে হত।[34] অন্যান্য খাবার খাদ্য সামগ্রী নিয়েও তাদের অভিযোগ ছিল। তাদের অনেকের মতে ক্যাম্পগুলি থেকে তাদের যে চাল, ডাল, নুন, তেল ইত্যাদি দেওয়া হত তাতে হয়ত একটা মানুষ না মরে বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু একটা সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। ক্যাম্পের খাওয়া দাওয়া তাদের মোটেও পছন্দ ছিল না, কাজেই ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে আসা ছাড়া তাদের পথ ছিল না। সরকারি ক্যাম্পগুলি থেকে উদ্বাস্তুদের বেরিয়ে আসার ফলশ্রুতিতে সেই সময় জন্ম নিয়েছিল জবরদখল কলোনি ও প্রাইভেট কলোনিগুলি।

জবরদখল কলোনিঃ পশ্চিমবঙ্গে জবরদখল কলোনির গোড়াপত্তন শুরু হয় ১৯৫০ এর আগেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের হাত ধরে। সরকারি অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনির পাশাপাশি উদ্বাস্তুরা খালি জমি, রেলের জমি, সরকারি খাস জমি, জমিদারদের জমি বা স্থানীয় নাগরিকদের ব্যক্তিগত জমি জবরদখল করে নিয়ে কলোনি গড়ে তুলেছিল সেগুলি 'জবরদখল কলোনি' নামে পরিচিত ছিল। প্রথমদিকে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার সরকারি ত্রাণ শিবিরে থাকতে ও সরকার প্রদত্ত ত্রাণ নিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাদের আত্মমর্যাদা বোধ খুব সূক্ষ্ম ছিল। তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের খালি, পরিত্যক্ত জমিগুলি অনুমোদনহীন ভাবে দখল করেন ও থাকতে শুরু করেন। এইভাবে প্রথমে কলকাতা ও শহরতলীর আশেপাশে জন্ম নিয়েছিল জবর দখল কলোনিগুলি।[35] পুরনো অভিবাসীদের প্রথম পর্যায়ের পুনর্বাসনে কলকাতা, ও কলকাতা-সংলগ্ন অঞ্চলের নিচু পরিত্যক্ত জলাজমিতে, ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলিতে এই ধরনের কলোনি গড়ে ওঠার কথা জানতে পারা যায়। পরবর্তীকালে যা ছড়িয়ে পড়ে যাদবপুরের সেনা ছাউনির সরকারি পরিত্যক্ত জমি, দমদম, বরানগর, নৈহাটির পরিত্যক্ত সরকারি জমি দখলের মাধ্যমে। ১৯৫০-এর আগে গঠিত এরূপ ১৪৯টি কলোনির হদিস পাওয়া যায় যা ১৪৯ গ্রুপ জবরদখল কলোনি নামে পরিচিত। সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত জবরদখল কলোনিগুলিকে অনুমোদন দেওয়া হয় ও নিয়মিত-করনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কলোনিগুলিতে যাতে উদ্বাস্তুরা সমস্ত রকম নাগরিক পরিষেবা পান সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়।[36] পরবর্তী পর্যায়ের উদ্বাস্তু আগমনে এই জবরদখল কলোনিগুলি বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল ও সরকারি পুনর্বাসন ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ১৯৫০ সালে উদ্বাস্তু আগমন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য

[34] সাক্ষাৎকার:-রাধাশ্যাম নন্দী, বয়স-৮১, পেশা-অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বই লেখক ও যাত্রাশিল্পী, মহলন্দী কলোনী, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২১/১১/২০২২।

[35] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, pp. 10-11.

[36] Ibid, p. 11; *Estimate Committee Reports (1959-60),* p. 30; File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p. 4.

জেলাগুলিতে বিশেষ করে বহু জেলার গ্রামীণ এলাকায় কৃষি বা অকৃষি ফাঁকা জমিগুলোতে এই কলোনিগুলি দেখা গিয়েছিল। যেমন বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায়। এইসব কলোনিগুলিতে মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা শ্রমিক শ্রেণির উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছিল। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তারা সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন এই ধরনের জবরদখল কলোনিগুলি ছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের পুনর্বাসন নীতির বিরুদ্ধে। জবরদখল কলোনিগুলি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। ক) ১৪৯ গ্রুপ জবরদখল কলোনি, খ) ১৭৫ গ্রুপ জবরদখল কলোনি, গ) ৬০৭ গ্রুপ জবরদখল কলোনি, ও ঘ) সরকার অনুমোদিত জবরদখল কলোনি।

সরকারি, আধা-সরকারি ও প্রাইভেট জমিগুলিতে উদ্বাস্তুরা যে সমস্ত জবরদখল কলোনিগুলি গড়ে তুলেছিল তার মধ্যে ১৯৫২ সালে গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি ১৪৯টি এই ধরনের কলোনি খুঁজে পায়, যেগুলি দেশভাগের পর পরই গড়ে উঠেছিল, এর জন্য তখন এই কলোনিগুলির নাম দেওয়া হয় ১৪৯ গ্রুপ কলোনি। আবার ১৯৭৫-এ একই ভাবে ভারত সরকার দ্বারা নিয়োজিত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের রিসিডিউল প্রবলেম অনুসন্ধানকারী একটি কার্যকরী দল ১৭৫টি এই ধরনের কলোনী খুঁজে পান যেগুলি গড়ে উঠেছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত, এই কলোনি গুলির নাম হয় ১৭৫ গ্রুপ। একই রকম ভাবে ১৯৫১ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চ পর্যন্ত যে সমস্ত কলোনিগুলিকে পাওয়া যায় যাদেরকে ভারত সরকার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা সাপেক্ষে টপ প্রায়োরিটি দিয়েছিলেন সেগুলি ৬০৭ গ্রুপ নামে নথিভুক্ত করা হয়।[37] যার মধ্যে এদের মধ্যে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৪৯ গ্রুপ কলোনির দেখা মেলেনি। মুর্শিদাবাদে একটি ১৭৫ গ্রুপ কলোনি ছিল যেটি ৫০টি প্লট বিশিষ্ট, সেটি মহাত্মা গান্ধী কলোনি (পৌর)।[38] তবে মালদা জেলায় ৩৮টি (৩টি পৌর, ৩৫টি গ্রামীণ) ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৩টি (১টি পৌর, ১২টি গ্রামীণ) ৬০৭ গ্রুপ কলোনি ছিল (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-৩, সারণি-৯,১০)।

সরকার অনুমোদিত জবরদখল কলোনি:- মালদা জেলায় ১২৮টি সরকার অনুমোদিত জবরদখল কলোনির খোঁজ পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-৩, সারণি-১১)। তবে মুর্শিদাবাদে এরকম কোনো কলোনি ছিল না।

প্রাইভেট কলোনি: জবরদখল কলোনিগুলির পাশাপাশি সরকারি বেসরকারি বা ব্যক্তিগত বিভিন্ন ফাঁকা জমিতে, নিচু জলা জায়গায়, সরকারি সহায়তায় বা সরকারি সাহায্য ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুরা মাথা গোঁজার জন্য প্রায় ৭৫০টি প্রাইভেট কলোনি গড়ে তুলেছিলেন।[39] কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে আইনের মাধ্যমে সরকারের দ্বারা জমি গ্রহণ করে 'প্রাইভেট কলোনি' নাম দিয়ে উদ্বাস্তুদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কলকাতা মেট্রোপলিটন

---

[37] *Manual of Refugee Relief and Rehabilitation,* p .17.

[38] Ibid, p. 71.

[39] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, p. 11.

এলাকার বাইরে পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় এই প্রাইভেট কলোনিগুলির সংখ্যা সর্বাধিক ছিল মালদা জেলায়। মালদায় ছিল ৪২টি ও মুর্শিদাবাদে ১৫টি, এগুলো সবকটিই ছিল গ্রামীন এলাকায় (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-৩, সারণি-১২,১৩)।

সারণিঃ-৪ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনিসমূহ

জেলা	সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনি	জবরদখল কলোনি			প্রাইভেট কলোনি
		সরকার অনুমোদিত	১৭৫ গ্রুপ	৬০৭ গ্রুপ	
মালদা	১৫	১২৮	-	৩৮	৪২
মুর্শিদাবাদ	২৫	-	১	১৩	১৫

উদ্বাস্তু কলোনিগুলির জন্য পুনর্বাসন স্কিমঃ পূর্বে আলোচিত, সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনি, জবর দখল কলোনি ও প্রাইভেট কলোনি যেগুলি ছিল সেগুলিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার ও নিয়মিত-করন করার কথা ভাবা হয়। রাজ্য সরকার সরকার অনুমোদিত কলোনিগুলির উন্নয়নের জন্য একটি স্কিম পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনা অনুসারে সরকার অনুমোদিত অ-কৃষি গ্রামীন ও পৌর কলোনিগুলিতে রাস্তা-ঘাট, জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি খতিয়ে দেখার জন্য একটি উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে কেন্দ্র সরকার অন্যান্য কিছু সংখ্যক কলোনির ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা প্রয়োগ করে। কেন্দ্র সরকার এই কাজের জন্য একটি ফান্ড ঋণ হিসেবে দান করে। প্রথমে কিছু সরকার অনুমোদিত কলোনি ও ১৯৫০-পূর্ববর্তী জবর দখল কলোনিগুলিকে উন্নয়নের জন্য বেছে নেওয়া হয়। এই সমস্ত কলোনিতে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার চুক্তি বিভাগের সূচনা করে যার দ্বারা দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ করা হয়।[40] জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকার থেকে রাজ্য সরকারকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল। সেগুলি কোন কোন খাতে কিভাবে বরাদ্দ ছিল তা পরিশিষ্ট-৩ অংশে, সারণি-১৪-এ দেখানো হল।

১৯৭৫-এ কেন্দ্র সরকার একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে যার কাজ ছিল এসমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করা এবং তৎকালীন অবশিষ্ট সমস্যা খতিয়ে দেখা। ১৯৭৫-৭৬-এ CMDA-এর বাইরে শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত কলোনিগুলির উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ ছিল, প্লট পিছু যথাক্রমে ৪,৫৬০ টাকা ও ৩,৬০০ টাকা।[41] কলোনিগুলিকে উন্নয়নের কাজের ভিত্তিতে ১) উন্নতির কাজ শেষ হয়েছে ২) অনুন্নত এই দুটি ভাগে ভাগ

[40] *Estimate Committee Reports (1959-60),* p. 30; File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p. 5.

[41] *Manual of Refugee Relief and Rehabilitation,* pp. 27.

করা যায়। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই দুটি শ্রেণির উদ্বাস্তু কলোনিগুলি পরিশিষ্ট-৩ অংশে, সারণি-১৫-তে দেখানো হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ কলোনিরই উন্নতি হয়নি।

মধ্যবর্তীকালীন উদ্বাস্তুদের (১৯৫৮-১৯৬৩) পুনর্বাসন

এই সময় আসা উদ্বাস্তুদের জন্য সরকার কোনো রকম পুনর্বাসন ব্যবস্থা করেনি। সরকারের ধারণা ছিল পুনর্বাসন না দিয়ে তাদের পূর্ববঙ্গ থেকে এই দেশে আসতে নিরুৎসাহিত করলে হয়ত উদ্বাস্তু আগমন থেমে যাবে। ১৯৫৯ জুলাই মাস নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ত্রাণ শিবিরগুলি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। কারণ, উদ্বাস্তু আগমন থেমে থাকেনি।[42]

নিউ মাইগ্রেন্টসদের (১৯৬৪-১৯৭১) পুনর্বাসন: ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে 'হযরত মহম্মদ (সা.)-এর চুল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই বঙ্গে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরণার্থীরা ভারতে আসতে থাকে। ফলে সরকার আবারও উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দেবার ব্যাপারটি বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। নতুন অধিবাসীদের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর কিছু ইন্টার সেপশন বা রিসেপশন সেন্টার খোলা হয়েছিল। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত এলাকাতেই অভিবাসীদের নথিভুক্ত করা, সাময়িক ত্রাণ প্রদান করা, নথিপত্র যাচাই করা, টিকাকরণ প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের মুহূর্তে শরণার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে তাদের ইন্টারসেপশন স্লিপ দেওয়া হত, যার দ্বারা সে ও তার পরিবারবর্গ উদ্বাস্তু হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃতি পেত। সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেতে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল। পশ্চিমবঙ্গে এরকম রিসেপশন সেন্টারগুলি হল- বানপুর, পেট্রোপোল, হোসনাবাদ ও শিয়ালদা। ইন্টারসেপশন সেন্টারগুলি হল- বসিরহাট, বালুরঘাট, মালদা, কোচবিহার, রায়গঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, ক্যানিং, বহরমপুর। এর মধ্যে একটি মালদা জেলায় (মালদা) ও একটি মুর্শিদাবাদ জেলায় (বহরমপুর) অবস্থিত।[43] বর্তমান গবেষণার সাক্ষাৎকারে মালদা, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের বহু মানুষ এই সমস্ত ইন্টারসেপশন ও রিসেপশন সেন্টারগুলির কথা বলেছিলেন। এই সেন্টারগুলি থেকে বর্ডার স্লিপ বা ইন্টারসেপশন স্লিপ পাওয়ার কথাও তারা বলেছেন।[44] এই সমস্ত ইন্টারসেপশন বা রিসেপশন সেন্টারগুলিতেও সাময়িকভাবে অবস্থানকালে ত্রানের ব্যবস্থা ছিল। রিসেপশন সেন্টারগুলিতে যে ত্রাণ প্রদান করা হত তা পরিশিষ্ট-৩ অংশে, সারণি-১৬-এ দেখানো হল।

স্লিপ পাওয়ার পর শরণার্থীদের ট্রানজিট সেন্টারে পাঠানো হত। উদ্বাস্তু মানুষের চাপে সেইসময় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা আগে থেকেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, জায়গার অভাব ও পুনর্বাসনযোগ্য জমির

[42] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, pp.5-6.

[43] *Estimate Committee Reports (1964-65),* 3rd Lok Sabha, Ministry of Rehabilitation, Govt. of India, New Delhi, p. 12.

[44] সাক্ষাৎকারঃ- জগবন্ধু বালা, বয়স-৮৩, পেশা-কৃষক, বৈষ্ণবনগর, মালদা, তারিখঃ-১৪/১১/২০২২।

অভাব ইত্যাদির মধ্যে নতুন করে উদ্বাস্তু মানুষের ঢেউ সামাল দেওয়া রাজ্যের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। রাজ্যে এই উদ্বাস্তু মানুষের চাপ কমানোর জন্য সেই সময় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে উদ্বাস্তুদের ছড়িয়ে দেওয়ার। এই উদ্দেশ্যেই মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের কাছে মানা এলাকায় ট্রানজিট সেন্টারগুলো খোলা হয়েছিল। এছাড়াও কুরুদ, নওগাঁ, ভান পুরি, শবরী ও ডিবিকে রেলওয়ে ইত্যাদিতেও ট্রানজিট সেন্টার খোলা হয়েছিল। পাকাপাকিভাবে পুনর্বাসন পাওয়ার আগে পর্যন্ত সাময়িক থাকার ব্যবস্থা, এইসব ট্রানজিট সেন্টারগুলিতে ছিল। এখানে থাকাকালীন শরণার্থীদের ত্রাণ সরবরাহ করা হত।[45] ট্রানজিট সেন্টারগুলিতে যে ত্রাণ প্রদান করা হত তা পরিশিষ্ট-৩ অংশে, সারণি-১৭-এ দেখানো হল।

এ সমস্তই ছিল সরকারি হিসাব, কিন্তু বাস্তবে যারা এই সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করেছিলেন তাদের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর ছিল না; এর কিছুটা জানা যায় আগের অধ্যায়ে মালদা, মুর্শিদাবাদে আগত উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রাম আলোচনা প্রসঙ্গে। ট্রানজিট সেন্টারগুলিতে শরণার্থীদের থাকার জন্য যে সমস্ত কুঁড়েঘরগুলি তৈরি করা হয়েছিল সেগুলিতে ১৮/১৪ ফুটের এক একটি ঘরে একাধিক পরিবারকে রাখা হত। যার জন্য কমিটি থেকে বলা হয়েছিল ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে পরবর্তী গন্তব্যস্থলে শরণার্থীদের তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে করে এক ঘরে একাধিক পরিবারকে গাদাগাদি করে রাখার প্রয়োজন না পড়ে। হস্তচালিত এবং পাম্পচালিত যে নলকূপগুলি ছিল সেগুলি থেকে যত ঘন্টা জল সরবরাহ করা হতো তা যথেষ্ট ছিল না। যার জন্য কমিটির পরামর্শ ছিল নতুন পাইপ লাইনের ব্যবস্থা করার অথবা জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্যাম্পবাসী পরিবারের মধ্যে সময় ভাগ করে দেওয়ার। শুধু তাই নয় গরমকালে যথেষ্ট পরিমাণে জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল কমিটির পক্ষ থেকে। যদিও এস্টিমেট কমিটির রিপোর্ট অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যার ঘাটতি ছিল। এছাড়াও চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ছিল। যেমন- হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের জন্য ঠিকঠাক খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল না, যার কারণে ভর্তির পর রোগীরা বেশিরভাগ সময় অপুষ্টি জনিত রোগে ভুগতেন।[46]

ট্রানজিট সেন্টার থেকে শরণার্থীদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল বিভিন্ন রাজ্যের ত্রাণ শিবিরগুলি। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য কিছু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা উদ্বাস্তু সমস্যার মোকাবিলায় ভারতের বিহার, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাটের রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানান যেন তারা শরণার্থীদের তাদের রাজ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। যার কারণে, ঐ সমস্ত রাজ্যে রিলিফ ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। স্থায়ী পুনর্বাসন পাওয়ার আগে পর্যন্ত এই সমস্ত রিলিফ ক্যাম্পগুলিতে মানা, কুরুদ, নওগাঁ, ভান পুরি, শবরী ও ডিবিকে রেলওয়ে ইত্যাদির ট্রানজিট সেন্টারগুলি থেকে আসা শরণার্থীরা সাময়িকভাবে অবস্থান করতেন। এখানেও তারা ট্রানজিট সেন্টারের অনুরূপ ত্রাণ পরিষেবাগুলি পেতেন। এরপর শরণার্থীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত ক্যাম্পগুলি থেকে তাদের

[45] Ibid, p. 18.

[46] *Estimate Committee Reports (1964-65)*, pp. 22-23 & 26.

দণ্ডকারণ্য প্রকল্প অনুসারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে যেমন পুনর্বাসনযোগ্য জমি ছিল সেখানে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। অন্ধপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, ত্রিপুরা, বিহার এন.ই.এফ.-এ তে ৩৪টি কৃষি স্কিম এবং আসাম, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার এই চারটি রাজ্যের ১৬টি অ-কৃষি বা শিল্প স্কিম মিলিয়ে মোট ৫০টি স্কিমের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৫ পর্যন্ত অর্থাৎ নতুন অধিবাসীদের আগমনের এক বর্ষকালের মধ্যে এই সমস্ত স্কিমের আওতায় মোট ২৩,২৯৬ উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছিলেন; যার মধ্যে ২২,০৪০টি পরিবার কৃষিজীবী ও ১২৫৬টি পরিবার ও অ-কৃষিজীবী। সেখানে তাদেরকে বিভিন্ন ঋণ ও অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করা হত। উদাহরণস্বরূপ; গৃহনির্মাণ, চাষের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়, বীজ কেনা, সার কেনা, ইত্যাদির জন্য অর্থ সাহায্য, রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান ইত্যাদি দেওয়া হত। অ-কৃষিজীবীদের বিভিন্নভাবে অর্থিক সহায়তা করা হতো, যেমন; গৃহনির্মাণ ঋণ, জমি কেনার জন্য ঋণ, রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান, ব্যবসা ক্ষেত্রে ঋণ, উন্নয়নের জন্য ঋণ ইত্যাদি।[47]

পুরনো অভিবাসীদের মতো নতুন অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও ক্যাম্পে না থাকার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৬৪ সালের এস্টিমেট কমিটি রিপোর্ট অনুসারে ৩৩.০৮ শতাংশ শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন বাকি ৬৬.৯২ শতাংশ শরণার্থী ক্যাম্পের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ আসাম ও ত্রিপুরায় নিজেদের প্রচেষ্টায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। এক্ষেত্রেও যারা পশ্চিমবঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন তারা তাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় পরিজনের সাহায্যে নিজেদের পুনর্বাসিত করেছিলেন।[48]

৪.২ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তুদের আশ্রয়গ্রহণ ও বসতি স্থাপনঃ

মালদা জেলায় উদ্বাস্তুদের আশ্রয়গ্রহণ ও বসতি স্থাপন: আগেই বলা হয়েছে, দেশভাগের পর পরই মালদা জেলায় উদ্বাস্তু আগমন যেহেতু তেমন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ঘটেনি সেই জন্য এই জেলায় তখন ট্রানসিট ক্যাম্প বা উদ্বাস্তু শিবির খোলা হয়নি। ১৯৪৯-এর শেষের দিক থেকে শুরু করে ১৯৫০ সালেও এই জেলায় উদ্বাস্তু আগমন বিপুল আকার ধারণ করলে পরবর্তীকালে এই জেলাতেও ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। তবে বেশিরভাগই ক্যাম্পে আশ্রয়গ্রহণ করেননি। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুরা মালদা জেলায় এসে জেলার সীমান্ত সংলগ্ন থানা হাবিবপুর, বামনগোলা, ওল্ড মালদা, গাজোল, ইংলিশ বাজার, কালিয়াচকে থাকতে শুরু করেছিলেন। আগত উদ্বাস্তুদের সিংহভাগ মোট উদ্বাস্তু জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সীমান্তবর্তী থানা হাবিবপুর ও বামনগোলাতেই আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, ১৯৫০ সালে এই হাবিবপুর এবং বামনগোলা থানা থেকে মুসলিমদের একটা বড় অংশ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পূর্ববাংলায় চলে যান। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা তাদেরই বাড়ি-ঘর দখল করে বসবাস শুরু করেন।

[47] Ibid, pp. 33-34 & 56.

[48] Ibid, p. 5.

পরবর্তীকালে এই উদ্বাস্তুরা অনেকে মুসলিম অভিবাসীদের সঙ্গে বাড়ি-ঘর বিনিময় করেছিলেন। সরকারি তথ্য অনুসারে, প্রায় তিন হাজার পরিবার এইরকম মুসলিমদের ফেলে যাওয়ার জমি-সম্পত্তিতে বসবাস করতেন।[49] তবে মালদা জেলার হাবিবপুর, বামনগোলা ও গাজলে তিনটি থানায় পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুরা সরাসরি এসে বস্তি নির্মাণ করেছিলেন। মুসলিমদের ফেলে যাওয়া বাড়ির পাশাপাশি এখানে গঙ্গা নদীর তীরে অসংখ্য পরিমাণে খাস জমির খোঁজ পেয়েছিলেন উদ্বাস্তুরা যা ছিল ধূ-ধূ খালি মাঠ, কোথাও নদীর চর কোথাও বা ঘাসের জঙ্গল। সেইসব জায়গা তারা দখল করে জনবসতি গড়ে তুলতে থাকেন এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে খাস জমিকে চাষযোগ্য জমিতে পরিণত করেন। যদিও বসতি গড়ে তুলতে তাদেরকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ওল্ড মালদা, গাজোল, কালিয়াচক কেবলমাত্র এই তিনটি থানাতেই ছিলেন ১৪ হাজার উদ্বাস্তু। শুধুমাত্র ইংলিশ বাজার টাউনেই ছিলেন ৮ হাজার উদ্বাস্তু (দ্রষ্টব্য সারণি-৫)।

সারণিঃ-৫ ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মালদার বিভিন্ন থানায় আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তু সংখ্যা

থানা	**উদ্বাস্তু জনসংখ্যা**
মালদা	৫,০০০
গাজোল	৪,০০০
কালিয়াচক	৫,০০০
ইংলিশ বাজার টাউন	৮,০০০

(*Malda, Census-1951,* p. Ixxviii.)

এই জেলায় আসা উদ্বাস্তুদের প্রাথমিকভাবে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী এবং শহরাঞ্চলে বসবাসকারী এই দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। গ্রামাঞ্চলে আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে মালদা, হাবিবপুর, বামন গোলা, গাজোলেই ৭২ শতাংশ উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাকিরা ইংলিশবাজার, মানিকচক, কালিয়াচক, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর ও খড়বায় আশ্রয় নেন। শহরাঞ্চলে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে ইংলিশ বাজার ও ওল্ড মালদা এই দুটি শহরে ছিলেন প্রায় ১৩ শতাংশ উদ্বাস্তু।[50] সারণি-৬-এ এর পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

১৯৫৫ সালের স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট অনুসারে, ওই সময় মালদায় আগত উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগই হাবিবপুর, বামনগোলা, ইংলিশ বাজার, ইংলিশ বাজার টাউন, মালদা, কালিয়াচক, গাজলে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে হাবিবপুরেই ৩৬ শতাংশ বামনগোলায় ১৮ শতাংশ ও ইংলিশ বাজারে ১৫ শতাংশ উদ্বাস্তু

[49] *Malda Census-1951,* p. Ixviii.

[50] Ibid, p. Ixxviii.

পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলেন। সমীক্ষা অনুসারে মালদা জেলায় আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তু পরিবার ও জনসংখ্যা সারণি-৭-এ প্রকাশ করা হল-

সারণিঃ-৬ ১৯৫১ জনগণনা অনুসারে মালদায় আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা

অঞ্চল	স্থানের নাম	উদ্বাস্তু সংখ্যা (জন)		
		পুরুষ	মহিলা	মোট
গ্রাম	ইংলিশ বাজার, মানিকচক	৮৮৪	৯০৫	১,৭৮৯
	কালিয়াচক	২,৪৩১	২,৪২৩	৪,৮৫৪
	রতুয়া, খড়বা, হরিশ্চন্দ্রপুর	২,০৭৫	১,৫৬৫	৩,৬৪০
	মালদা, হাবিবপুর, বামনগোলা, গাজোল	২৩,৬৫০	২১,৮৩৪	৪৫,৪৮৪
শহর	ইংলিশ বাজার, ওল্ড মালদা	৪,৬৮০	৩,৬৮৬	৮,৩৬৬

(*Malda, Census-1951,* p.70.)

সারণিঃ-৭ ১৯৫৫ পর্যন্ত মালদা জেলার বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে আগত উদ্বাস্তু জনসংখ্যা এবং উদ্বাস্তু পরিবার সংখ্যা

নাম	**পরিবার সংখ্যা**	**সদস্য সংখ্যা**	**নাম**	**পরিবার সংখ্যা**	**সদস্য সংখ্যা**
ইংলিশ বাজার	২৪০৬	১২৯৮৬	রতুয়া	২০৬	তথ্য বিনষ্ট
ইংলিশ বাজার	১৮৫৯	১১৩২৬	মানিকচক	৪২	ঐ
কালিয়াচক	১৪৬৭	৭৮৬৮	করবা	২৫০	ঐ
মালদা	১৬৩৮	৬৯১৫	হরিশচন্দ্রপুর	২০১	ঐ
ওল্ড মালদা	১৪৪	তথ্য বিনষ্ট	গাজোল	৯৯১	ঐ
হাবিবপুর	৫৭৫০	তথ্য বিনষ্ট	বামনগোলা	২৯৩১	ঐ
মালদা জেলায় মোট				১৫৮৮২	৭২৪৬৫

(File No:- G.P. 361.5 (5415) 083 w 52, *Rehabilitation of Refugee, A Statistical Survey-1955,* (Alipore, West Bengal Govt. Press, 1955), p. 91.)

প্রথমদিকের গ্রামের উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নেন গৌড়, কেন্দুয়া, বলদিয়াঘাট, আইহো, ঋষিপুর, বুলবুলচন্ডি, রামপাড়া ও মোবারকপুরে। তাদের মধ্যে গৌড়ে জেলা প্রশাসন তরফ থেকে তিনটি কলোনি গড়ে তোলা হয়েছিল। গৌড়ে অবস্থিত উদ্বাস্তুরা মূলত রাজশাহী ও ফরিদপুর থেকে এসেছিলেন। এরমধ্যে গৌড়ের উদ্বাস্তুরা মূলত জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খোলা তিনটি ক্যাম্পে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। এক; পূর্ববঙ্গের রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ ও

কানসাট থেকে আগত উদ্বাস্তুরা উত্তর-পশ্চিম বারদুয়ারীতে, দুই; ফরিদপুর ও পাবনার নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুরা বারদুয়ারির পূর্ব দিকের ক্যাম্পে, তিন; উচ্চবর্ণের উদ্বাস্তুরা ছোট সাগরদিঘির দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ক্যাম্পে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন।[51] পূর্ববঙ্গ থেকে মালদা জেলায় আগত বিনয়কৃষ্ণ বাবুর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, মৎস্যজীবিকায় পারদর্শী মালো সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলা থেকে এসে মালদার বুলবুলচন্ডিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। মালদার বলদিয়া ঘাটে আশ্রয়গ্রহণকারী নমঃশূদ্রদের কথাও জানা যায় তাদের জীবিকা ছিল চাষবাস ও মাছ ধরা। এই জেলার হাবিবপুর থানার সীমানা নিকটবর্তী এলাকায় পূর্ণভবা নদীর পার্শ্ববর্তী জলাভূমির কিনারাগুলিকে কাজে লাগিয়েছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নবাগত উদ্বাস্তুরা। যেখানে উঁচুডাঙার শেষ ও জলাভূমির শুরু; সেখানে তারা খড় ও বাঁশ দিয়ে ছোট ছোট ঘর তৈরি করে মাথা গোজার ঠাঁই করে নিয়েছিল।[52] পূর্ববঙ্গের খাল-বিল, নদী-নালা সর্বত্র। এসমস্ত অঞ্চলে বসবাসকারী একটা বিরাট অংশের মানুষ ওই দেশে জলের কাছে বা জলাভূমিতেই বসবাস করতেন। তাদের জীবন ও জীবিকা সবকিছুই ছিল জলকে কেন্দ্র করে। জলাভূমিতে জলাজাতের ধান উৎপাদন, নৌ-বাণিজ্য, নৌ-বিনোদন, নৌকা তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে তারা রোজগার করতেন।[53] তারা এখানে সেই একই পরিবেশ পেয়ে একই জীবিকা নির্বাহ ও জীবনধারণের সুযোগ পেয়েছিলেন।

প্রথম পর্যায়ে আসা উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে সরকারের ধারণা ছিল যে; তাদের সাময়িকভাবে ত্রাণ ও পুনর্বাসন দিলে, পরে পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি ঠিক হলে হয়ত তারা আবার নিজ জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারে। যার জন্য, প্রথম পর্যায়ের সরকারের সেভাবে কোন উদ্যোগ ছিল না। কিন্তু দিন যত যেতে লাগল, উদ্বাস্তুসংখ্যা বাড়তে থাকল, যার ফলে; মালদা জেলার প্রশাসকদের সমস্যা বাড়তে থাকে এবং তারা ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে থাকে। ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, প্রায় ৮৫% উদ্বাস্তু ক্যাম্পে অবস্থান করেননি। যাদেরকে প্রশাসন "নন-ক্যাম্প ক্যাটাগরিতে" রেখেছিলেন। সেই সময় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার সিদ্ধান্ত নেন পুনর্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে কেবলমাত্র ক্যাম্পে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের। কারণ, প্রথমতঃ সমগ্র উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেবার মতো পর্যাপ্ত তহবিল তাদের কাছে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ পর্যাপ্ত চাষযোগ্য জমির অভাব। মাত্র ২০ শতাংশ উদ্বাস্তুকে দুই থেকে পাঁচ বিঘা করে চাষের জমি দেওয়া হয়েছিল; তাও আবার নিম্নমানের। তৃতীয়তঃ জমির দাম প্রচন্ড বেড়ে গিয়েছিল। এই সময় আসা সমগ্র উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রায় আট হাজার পরিবার এমন ছিল যারা পুনর্বাসনের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী ছিলেন, বাকিরা নিজেদের ব্যবস্থা করে নেবার মত আর্থিক ভাবে সক্ষম ছিলেন বলে মনে করা হয়। ৮,০০০ পরিবারের মধ্যে ৫,১১৪ পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ঋণ দেওয়া হবে বলে

---

[51] *The Gourdoot*, 15th June 1950, cited Ashim Kumar Sarkar, Changing Profile of A Bengal District Malda, 1932-1953, (Kolkata: Classic Books, 2008), pp. 76-77; বিনয়কৃষ্ণ বোস, *মালদা জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস,* (পাকুয়াহাটঃ নিউ সেন প্রিন্টার্স, ২০১৮), পৃ. ১৬।

[52] সাক্ষাৎকারঃ-বিনয়কৃষ্ণ বোস, 'মালদা জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক, পাকুয়াহাট, মালদা, তারিখঃ-০৯/০৮/২০২৩।

[53] বিনয়কৃষ্ণ বোস, *মালদা জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস,* পৃ. ১০।

নির্ধারণ করা হয়; যার মধ্যে ১,১৯৫ পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে ঋণ প্রদান করা হয়েছিল এবং বাকি পরিবারগুলিকে আংশিকভাবে।[54]

১৯৪৮ সালের পরে সরকার যে সমস্ত সাহায্যগুলি করেছিল সেগুলি কলোনিগুলির স্থান বিশেষে পৃথক ছিল। বাড়ির তৈরির ক্ষেত্রে ৩-৫ কাঠার জন্য টাকা, এবং চাষাবাদের ক্ষেত্রে কাঠাপ্রতি ২৫ টাকা হিসেবে পরিবার পিছু ১৫ কাঠার জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। বাড়ি তৈরির জন্য পরিবার পিছু ৫০০ টাকা লোন এবং চাষাবাদের বা ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য জমি কেনার ক্ষেত্রে পরিবার পিছু এককালীন ১০০০-১২০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। গ্রামীন এলাকার ক্ষেত্রে পরিবার পিছু তিন বিঘা করে চাষাবাদের জন্য জমি কেনার লোন বরাদ্দ করা হয়েছিল। এছাড়াও ছিল বাড়ি তৈরি জন্য এককালীন লোন দেওয়া হত।[55]

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইনসেপশন থেকে মোট যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে তা পরিশিষ্ট-৩ অংশে সারণি-১৮-এ দেখানো হয়েছে। এছাড়াও সরকারি অনুমোদিত যে স্কিমগুলি ছিল সেগুলি নিচে টেবিলের আকারে প্রকাশ করা হল। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে পাঁচটি কৃষিজীবী ও দুটি অ-কৃষিজীবী স্কিমে প্রায় ৬৭৫টি পরিবারের জন্য সরকার ৫ হাজার বিঘা জমি বরাদ্দ করেছিল। শহরাঞ্চলে আবাসন প্রকল্পে যে তিনটি স্কিম ছিল তার সবকটি ছিল ইংলিশ বাজার টাউনে; পিরোজপুর-১, পিরোজপুর-২ এবং পিরোজপুর-৩। ৫০৫টি উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মোট ১৮০ বিঘা জমি।[56]

সারণিঃ-৮ ১৯৫১ পর্যন্ত মালদা জেলার উদ্বাস্তুদের জন্য বিভিন্ন স্কিম

অঞ্চল	স্কিমের ধরন	স্কিমের সংখ্যা	জমি বরাদ্দ (বিঘা)	পরিবারের সংখ্যা
শহর	আবাসন প্রকল্প	৩	১৮০	৫০৫
গ্রাম	কৃষিজীবী, অকৃষিজীবী	৫,২	৫,০০০	৬৭৫

Malda, Census-1951, p. Ixxviii.

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাস্তুহারা মানুষেরা মালদা জেলায় বিভিন্ন সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনি, জবরদখল কলোনি, প্রাইভেট কলোনিগুলিতে বসতি স্থাপন করে, কেউ সরকারি সহায়তায়, কেউ বা সরকারি সহায়তা ছাড়া নিজেদের চেষ্টায়, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে নিজেদের পুনর্বাসিত করেছিলেন। পূর্বে বর্ণিত ১৫টি সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনির মধ্যে গ্রামীণ এলাকায়, ৩টি সদর থানায়, ২টি খড়বা থানায়, ও ১টি করে ইংলিশ বাজার, মালদা, কালিয়াচক ও রতুয়া থানায় অবস্থিত এবং শহুরে এলাকায়, ৩টি ইংলিশ

[54] *Malda, Census-1951,* p. Ixxviii.

[55] Monika Mandal, *Settling the Unsettled: A Study of Partition Refugees in West Bengal,* (New Delh: Manohar Publishers and Distributors, January 2011), pp. 226-229.

[56] *Malda, Census-1951,* p. Ixxviii.

বাজার থানা, ২টি সদর থানা, ১টি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত। গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত কলোনিগুলোতে মোট ৭৭২টি এবং শহরাঞ্চলের কলোনিগুলিতে মোট ৮৩৯টি বাস্তু জমির প্লট বরাদ্দ করা হয়েছিল। সরকার অনুমোদিত গ্রামীণ কলোনিগুলির মধ্যে কালিয়াচক থানার অন্তর্গত চকবাহাদুরপুর এবং সরকার অনুমোদিত পৌর কলোনিগুলির মধ্যে ইংলিশ বাজার থানার পিরোজপুর-২ কলোনি ছিল সবচেয়ে বড়, এগুলি ছিল যথাক্রমে ৩০০ ও ৩০২ প্লট বিশিষ্ট (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-৩, সারণি-৭)।

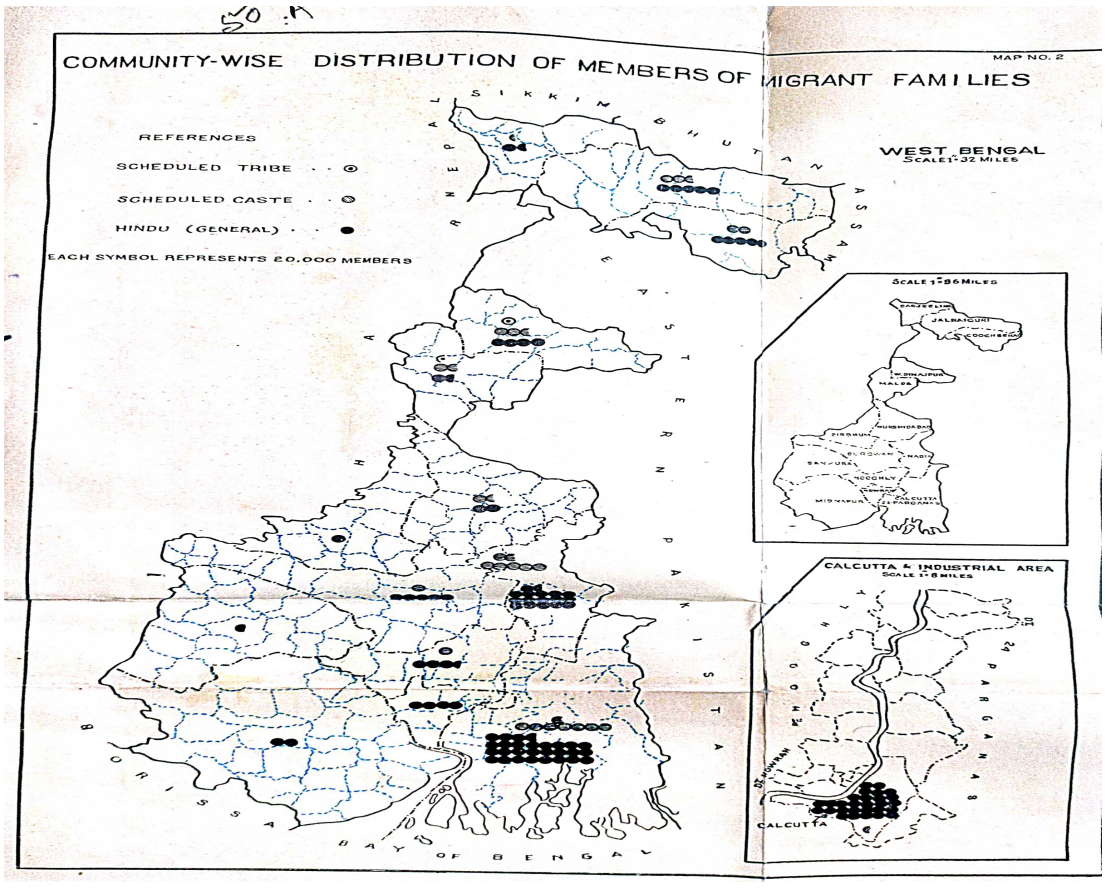
মালদা জেলায় মোট ১৬৮৯.৮৯ একর জমির ওপর ৩৮টি ৬০৭ গ্রুপ জবরদখল কলোনি গড়ে উঠেছিল। এইসব কলোনিগুলিতে মোট ৩৭৪০টি উদ্বাস্তু পরিবার বসবাস করতেন। এই কলোনিগুলি সাধারণত সরকারি খাসজমি ও রেলের জমির ওপর অবস্থিত ছিল। এর মধ্যে মালদা থানার অন্তর্গত কলোনি ৭টি, ইংলিশ বাজার থানার অন্তর্গত ৩টি, গাজলের ১১টি, হাবিবপুরে ১৪টি, বামনগোলায় ২টি ও কালিয়াচকে ১টি। উদ্বাস্তু কলোনিগুলি মালদাতে প্রধানত ইংলিশ বাজারে কালিন্দী নদীর তীরে এবং কালিয়াচকে মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। ৩৫টি কলোনি ছিল গ্রামীন এলাকায় এবং সেখানে উদ্বাস্তুরা বেশিরভাগ চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তার মধ্যে হাবিবপুর থানার ডাল্লা মৌজায় ডাল্লা কলোনিটি ছিল সবচেয়ে বড়, প্রায় ৭৬৫ একর জমির উপর অবস্থিত। এই কলোনির উদ্বাস্তু জনসংখ্যা ছিল সর্বাধিক, ৫৩৯ জনের উদ্বাস্তু পরিবার এখানে বাস করতেন। ৩টি কলোনি ছিল শহুরে এলাকায়, ২টি ইংলিশ বাজার থানার অন্তর্গত ইংলিশবাজার বড়োবুড়িতলা কৃষ্ণপল্লী কলোনি এবং পশ্চিম সর্বমঙ্গলাপল্লী কলোনি আর একটি গাজোল থানার অন্তর্গত গাজোল আদিনা কলোনি। এদের মধ্যে প্রায় ২৫ একর জমির উপর ২৭৯ উদ্বাস্তু পরিবার গঠিত নিয়ে গাজলের আদিনা কলোনি ছিল সবচেয়ে বড় (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-৩, সারণি-৯)। এগুলির পাশাপাশি ছিল ১২৮টি সরকার অনুমোদিত জবর দখল কলোনি, যেগুলি পরিশিষ্ট-৩-এর সারণি-১১-তে প্রদর্শিত হয়েছে। এছাড়াও মালদার বিভিন্ন গ্রামে মোট ৪২টি প্রাইভেট কলোনির ৬,১০৩ প্লটে উদ্বাস্তুরা বসতি স্থাপন করেছিলেন। এগুলির মধ্যে গাজিয়াপাড়া, বাবলাবন ও কালিনগরে সর্বাধিক ৩০০টি করে প্লট ছিল (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-৩, সারণি-১২)।

স্থানীয় সংবাদপত্র থেকে জানা যায় মালদা জেলা-প্রশাসনের তরফ থেকে তাদের জমি, নগদ টাকা বা কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল। তারা আইহো, রামপুর, হৃষিপুর, কেন্দুয়া, মোবারকপুরে বসতি স্থাপন করেছিল। মালদার গৌড় অঞ্চলের কথা উল্লেখ হয়েছে যে সরকারি সাহায্যে উদ্বাস্তুদের জন্য জমি, নগদ টাকা এবং তাদের বাড়ি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হয়েছিল। বলদিয়াঘাট, হৃষিপুর প্রভৃতি জায়গাতে সরকারের তরফ থেকে জমি, ক্যাশ, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং শিক্ষার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যবস্থা করে সাহায্য করেছিল।[57]

[57] *The Gourdoot*, 15th June 1950.

মালদা জেলার ওপর অপর একটি গবেষণা অনুসারে ক্যাম্পে থাকেননি এমন উদ্বাস্তুদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এক শ্রেণি যারা আর্মি, রেলওয়ে ও পুলিশে কাজ করতেন; তাদের পরিবার পূর্ববঙ্গে ছিল পরে তারা নিজেদের পরিবারকে পাকাপাকিভাবে নিজেদের কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উদ্বাস্তুদের জন্য নির্ধারিত স্কিমের সাহায্য নিয়ে এই জেলায় থেকে যান। আর এক শ্রেণির উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে তাদের আত্মীয়র কাছে বা অল্প দিনের জন্য কোনো ক্যাম্পে আশ্রয়গ্রহণ করেন ও পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদে মালদা জেলায় নিযুক্তির পর এখানে থেকে যেতে মনস্থির করেন। কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল কিছু পরিবারও এই জেলায় থেকে যান। উদ্বাস্তু পরিবারগুলি কখনো আবার একজোট হয়ে দল বেঁধে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যেখানে জমি পাওয়া যেত সেখানে ব্যক্তিগত জমির মালিকের কাছ থেকে জমি কিনত এবং কলোনি তৈরি করত। আবার দেখা যেত কিছুকাল পরে কিছু কিছু পরিবার অন্যের কাছে তাদের জমি বিক্রি করে নিজেদের পছন্দ অনুসারে পুনর্বাসনের জন্য সেখান থেকে চলে যেত।[58]

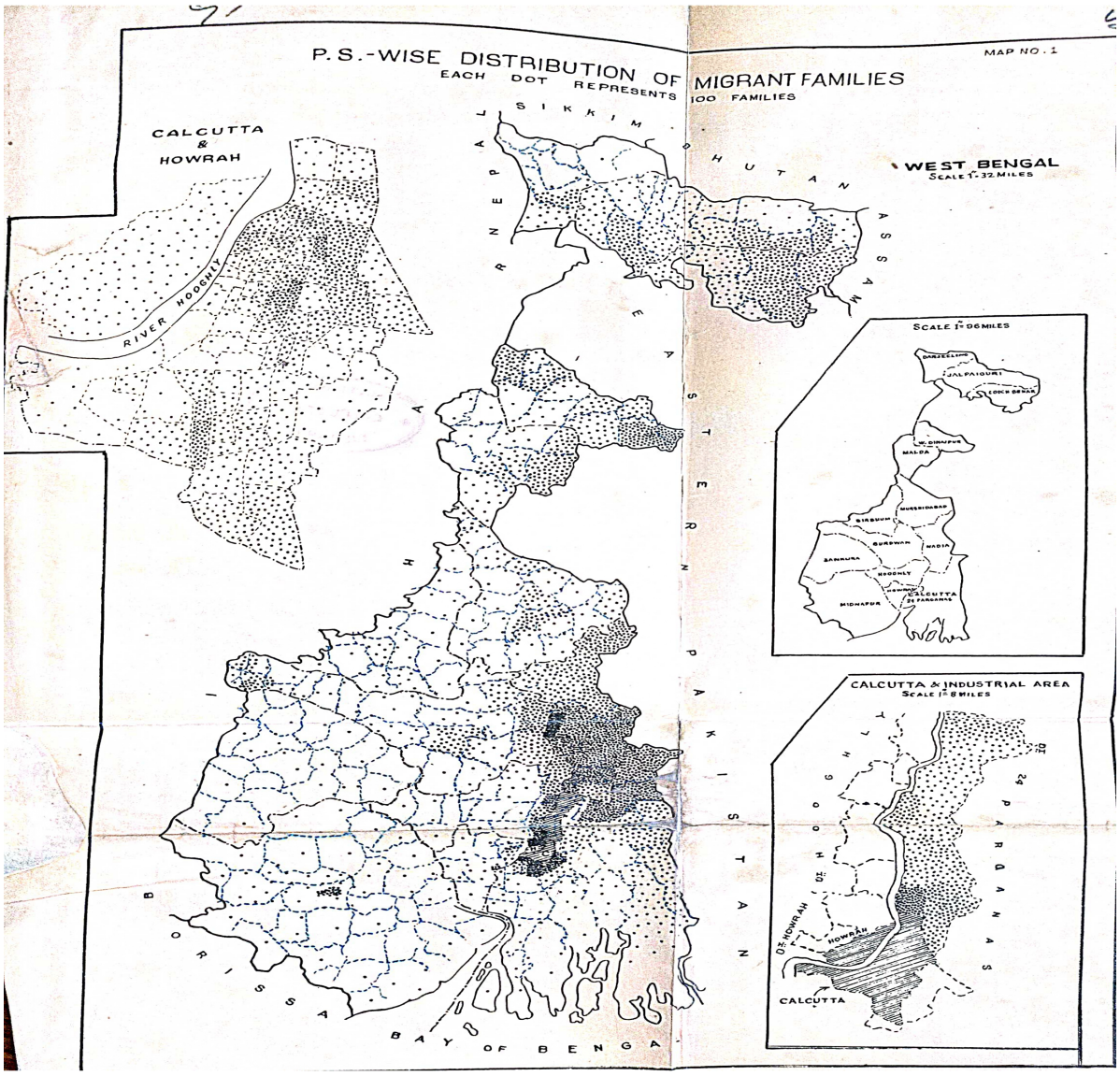
মানচিত্রঃ ১ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সম্প্রদায়ভিত্তিক বণ্টন



(Rehabilation of Refugee, A Statistical Survey-1955)

[58] Monika Mandal, *Settling the Unsettled,* p. 226.

মানচিত্রঃ ২ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির থানাভিত্তিক বণ্টন



(*Rehabilation of Refugee, A Statistical Survey-1955*)

মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তুদের আশ্রয়গ্রহণ ও বসতি স্থাপন: অন্যান্য জেলার মতই মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিতে থাকে। বিশেষত এই জেলায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন ট্রানসিট ক্যাম্প, যেমন- সারগাছি নিকটবর্তী মানকরা ক্যাম্প ও জিয়াগঞ্জের আমাইপাড়া, কাঁদির মহালন্দি, বহরমপুর-হরিহরপাড়ার সংযোগস্থল কুমড়োদহ ক্যাম্পে উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছিলেন।[59] ১৯৫৬ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের

[59] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১২-ই মে ১৯৪৮।

উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত তথ্য থেকে জানা যায়; মুর্শিদাবাদ জেলায় সে সময় ১০টি ক্যাম্প খোলা হয়েছিল এবং তাতে ১৬,২৮২ জন আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন।[60] দেশভাগের প্রথম দিকে এই জেলার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যেসব উদ্বাস্তুরা আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন তাদের পরিসংখ্যান নিচের সারণিতে দেওয়া হল-

সারণিঃ-৯ ১৯৫১ জনগণনা অনুসারে মুর্শিদাবাদে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা

অঞ্চল	স্থানের নাম	উদ্বাস্তু সংখ্যা (জন)		
		পুরুষ	মহিলা	মোট
গ্রাম	বহরমপুর, ডোমকল, জলঙ্গি	৯,৩৯০	৮,৭৭০	১৮,১৬০
	বেলডাঙা, নওদা, হরিহর পাড়া	১,৪৪৯	১,৪২০	২,৮৬৯
	মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, নবগ্রাম, লালগোলা	৪,৭৪২	৪,০৭৭	৮,৮১৯
	ভগবানগোলা, রানীনগর	১,৯০৭	১,৫৬৩	৩,৪৭০
	ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি	২,০৭০	১,৬২৮	৩,৬৯৮
	রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘী	১,৯৪৯	১,৭৬৩	৩,৭১২
	কান্দি, ভরতপুর	৮৬০	৭৩৬	১,৫৯৬
	খড়গ্রাম, বড়ঞা	১৪৩	৯৯	২৪২
শহর	বহরমপুর	৬,৭৭৫	৫,৬৮৯	১২,৩৬৪
	মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ, ধুলিয়ান, জঙ্গিপুর, কান্দি	৪,৬১০	৪,২২১	৮,৮৩১

(West Bengal District Handbook, *Murshidabad, Census-1951,* p. 108.)

উপরের সারণি অনুসারে, দেশভাগের পর পরই যারা এই জেলায় এসেছিলেন তাদের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বহরমপুর, ডোমকল ও জলঙ্গিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উদ্বাস্তু আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫১ পর্যন্ত এই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের প্রায় ৩০ শতাংশ উদ্বাস্তুই (মোট ১৮,১৬০ জন) উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন; প্রায় ১৪ শতাংশ উদ্বাস্তু (৮,৮১৯ জন) মুর্শিদাবাদ, নবগ্রাম, জিয়াগঞ্জ, লালগোলার গ্রামাঞ্চলে ও অবশিষ্ট অংশ ভগবানগোলা, রানীনগর, ফারাক্কা, সামশেরগঞ্জ ও সুতি ইত্যাদিতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। শহরাঞ্চলে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের সিংহভাগ বহরমপুরে অবস্থান করতেন। ১৯৫১ পর্যন্ত এই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের প্রায় ২০ শতাংশ উদ্বাস্তু (১২৩৬৪ জন) বহরমপুরে বসবাস করতেন। শহরে বসবাসকারী বাকি ৮,৮৩১ জন অর্থাৎ প্রায় ১৪ শতাংশ উদ্বাস্তু মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, ধুলিয়ান, জঙ্গিপুর, কান্দি ইত্যাদির শহরাঞ্চলে আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন।

[60] File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p. 18.

সারণিঃ-১০ ১৯৫৫ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে আগত উদ্বাস্তু জনসংখ্যা এবং উদ্বাস্তু পরিবার সংখ্যা

সদর সাব ডিভিশন			লালবাগ সাব ডিভিশন		
নাম	পরিবার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	নাম	পরিবার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
বহরমপুর টাউন	৫০০৪	২৪৫৫৮	মুর্শিদাবাদ	৭৩০	৩৭৩৮
বহরমপুর	১৮৭৩	১০৫২৫	মুর্শিদাবাদ	৪০৮	২২১৯
বেলডাঙ্গা	৫৪৬	১৮৬৬	জিয়াগঞ্জ	১২৭৬	৬১৬৪
নওদা	২৫৪	১১০৩	জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ	৮৬০	৪২৩৫
হরিহরপাড়া	৪১৪	১৭২৮	নবগ্রাম	২৭২	৮৬২
ডোমকল	৪৭০	২১৬১	লালগোলা	১৩৩২	৫৬০৯
জলঙ্গি	১২৭২	৬৪৮৭	ভগবান গোলা	৭১৯	৩৬৪৯
মোট	৭৯৫৯	৩৭৯০৩	রাণীনগর	৩৪০	১৫১৯
জঙ্গিপুর সাব ডিভিশন			মোট	৪৬৬৯	২১৫৪১
নাম	পরিবার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা			
ফারাক্কা	৬৬	৩১৯	কান্দি সাব ডিভিশন		
সামসেরগঞ্জ	৬৮২	৩০১৮	নাম	পরিবার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
ধুলিয়ান	১১৭	৪৯৮	কান্দি	৩৩২	১৫৩৭
সুতি	৩২৮	১৩৫৪	কান্দি	১৩৬	৬৬০
রঘুনাথগঞ্জ	১০০৬	৪৪৫৫	খড়গ্রাম	১১৩	৩৫৭
জঙ্গিপুর	৪২৯	১৮৪১	বড়এগ্রা	১০১	২১৫
সাগরদিঘী	১৫৯	৭১৭	ভারতপুর	৩৪৯	১৩২৬
মোট	২২৪১	৯৮৫৩	মোট	৮৯৫	৩৪৩৫
মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট				১৫৭৬৪	৭২৭৪২

(File No:- G.P. 361.5 (5415) 083 w 52, p.91)

১৯৫৫ সালের স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে অনুসারে; মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন সাব-ডিভিশনের আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তু পরিবার ও জনসংখ্যার পূর্ণাঙ্গ তথ্যটি সারণি-১০-এ প্রকাশ করা হল। সমীক্ষা অনুসারে, ওই সময় মুর্শিদাবাদে আগত উদ্বাস্তুদের ৮২ শতাংশ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চার ভাগই আশ্রয় নিয়েছিলেন সদর সাব-ডিভিশন ও লালবাগ সাব-ডিভিশনে। মোট উদ্বাস্তুর প্রায় অর্ধেকেরও বেশি এসেছিলেন সদর সাব-ডিভিশনে। যার মধ্যে, সিংহভাগ ছিলেন বহরমপুর টাউন ও বহরমপুরে। কেবলমাত্র বহরমপুর টাউনেই এই সাব-ডিভিশনে আসা উদ্বাস্তুদের দুই তৃতীয়াংশ বসতি স্থাপন করেছিলেন। এছাড়াও এই সাব-ডিভিশনের জলঙ্গি লালগোলা সাব-ডিভিশনের জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, লালগোলা, ভগবানগোলা; জঙ্গিপুর সাব-ডিভিশনের রঘুনাথগঞ্জ, সামসেরগঞ্জের উদ্বাস্তুরা বেশি সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের চার থেকে পাঁচ বছর পরে মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরটি গঠিত হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে নবগঠিত এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের কাজ ছিল প্রথমতঃ হাজারে হাজারে আগত উদ্বাস্তুদের বসবাসের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, দ্বিতীয়তঃ তাদের হাতে জমির দলিলপত্র তুলে দিয়ে বসবাসকে আইন সিদ্ধ করা, তৃতীয়তঃ কলোনিগুলির উন্নতি সাধন করা। শহর এলাকায় উদ্বাস্তুদের ১০ কাঠা বাস্তুজমি এবং ৯ বিঘা কৃষি জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শহর এলাকায় ৭টি এবং গ্রামাঞ্চলে ১৮টি সরকারি পুনর্বাসন কলোনি খোলা হয়েছিল। কলোনির সামগ্রিক উন্নয়ন; যেমন- রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎসংযোগ সাধন ইত্যাদি পরিকাঠামোগত বিকাশ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ, যেমন- পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও রাজ্যভিত্তিক পর্ষদ ইত্যাদির সহায়তায় করত।[61] জঙ্গিপুর সাংবাদ নামক সংবাদপত্রে তৎকালীন জঙ্গিপুর সাব-ডিভিসনের ত্রাণ সম্পর্কিত যে তথ্য পাওয়া যায় তা পরিশিষ্ট-৩ অংশে সারণি-১৯-এ দেখানো হয়েছে। এছাড়াও চাকরির পরীক্ষাতেও ছিল বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ছিল। যেমন- 'পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুর বয়স ও ফি সম্পর্কিত বিশেষ সুবিধা'। সরকারী চাকরিতে ভর্তির জন্য পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুগণ বয়সের ছাড় ও পরীক্ষার ফি সম্পর্কে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন; তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থির করেছিলেন যে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে উক্ত সুবিধা ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে। এই জন্য তাদের ভারতে আগমনের তারিখ কোনো বাধার সৃষ্টি করবে না।[62]

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীরা মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনি, জবরদখল কলোনি, প্রাইভেট কলোনিগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এদের মধ্যে অনেকে সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্প অনুসারে বিভিন্ন ঋণ, অনুদান, বাস্তু জমি, কৃষি জমি ইত্যাদি সহায়তা পেয়েছিলেন, অনেকে আবার সরকারি সহায়তা পাননি, তারা নিজেদের চেষ্টায়, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের

[61] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব,* পৃ. ৫১।

[62] *জঙ্গিপুর সংবাদ,* ২৫-ই মার্চ ১৯৫৯।

সাহায্যে নিজেদের পুনর্বাসিত করেছিলেন। পরিশিষ্ট-৩ অংশে সারণি-৮-এ প্রদর্শিত ২৫টি সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনির মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় ১২টি বহরমপুর থানা, ২টি জিয়াগঞ্জ থানা ও ১টি করে মুর্শিদাবাদ, নওদা, কাঁদি, সুতি থানার অন্তর্গত; শহুরে এলাকায় ২টি করে বহরমপুর ও বেলডাঙ্গা থানায় এবং ১টি করে লালবাগ, রঘুনাথগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ থানায় অবস্থিত। গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত কলোনিগুলোতে মোট ২০৯৪টি এবং শহরাঞ্চলের কলোনিগুলিতে মোট ৯৭৭টি বাস্তুজমির প্লট বরাদ্দ করা হয়েছিল। গ্রামীন সরকার অনুমোদিত কলোনিগুলির মধ্যে বহরমপুর থানার অন্তর্গত ৫৩২ প্লট বিশিষ্ট গোয়ালজান কলোনি ছিল সবচেয়ে বড় এবং সরকার অনুমোদিত পৌর কলোনিগুলির মধ্যে বেলডাঙা থানার বড়ুয়া-সরুলিয়া ছিল সবচেয়ে বড় ৩৩৬ প্লট বিশিষ্ট।

সরকারি অনুমোদিত কলোনির পাশাপাশি জবরদখল কলোনিগুলির মধ্যে ৫০টি প্লট বিশিষ্ট একটি গ্রামীণ ১৭৫ গ্রুপ কলোনি ছিল, মহাত্মা গান্ধী কলোনি। ৬০৭ গ্রুপ জবরদখল কলোনিগুলির মধ্যে, পরিশিষ্ট-৩-এর সারণি-১০ অনুসারে, মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ৪৪২.৯০ একর জমির ওপর ১৩টি কলোনিতে মোট ৭৫৮টি উদ্বাস্তু পরিবার বসবাস করতেন। মুর্শিদাবাদের অবস্থিত ৬০৭ গ্রুপ কলোনিগুলি ৯টি ভেস্টেড জমিতে ও ৩টি প্রাইভেট জমির উপর অবস্থিত ছিল। গ্রামাঞ্চলের ১২টি কলোনির মধ্যে জিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৩টি, মুর্শিদাবাদ থানার অন্তর্গত ৪টি, জলঙ্গি থানায় ৩টি, রানীনগরে ১টি, দৌলতাবাদে ১টি। এদের মধ্যে ২৩৩ একর জমির উপর ১৩১টি উদ্বাস্তু পরিবার নিয়ে মুর্শিদাবাদ থানার অন্তর্গত দহপাড়ার বিধান নগর কলোনিটি ছিল সবথেকে বড়। মুর্শিদাবাদের শহুরে এলাকায় একটিমাত্র ৬০৭ গ্রুপ কলোনি ছিল জিয়াগঞ্জ থানার বরানগরে, বারদুয়ারি এবং বারদুয়ারি নতুন পাড়া কলোনি যা প্রায় সাড়ে সাত একর প্রাইভেট জমির উপর ৫৫টি উদ্বাস্তু পরিবার নিয়ে গঠিত। এগুলি ছাড়াও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন গ্রামে মোট ১৫টি প্রাইভেট কলোনিতে ৩০৩০টি প্লটে উদ্বাস্তুরা বসতি স্থাপন করেছিলেন এগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র মণীন্দ্রনগরেই ছিল ১২০০ টি প্লট, যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাকিদের তুলনায় বড় (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট-৩, সারণি-১৩)।

মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত পান চাষী উদ্বাস্তুরা তৎকালীন রাজ্য সরকারের বারুজীবী পুনর্বাসন স্কিমের সুবিধা পেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মোট ২৩টি বারুজীবী কলোনির মধ্যে ২টি ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। এই স্কিমের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা ছিল কৃষি ও সেচ সংক্রান্ত। এই স্কিম অনুযায়ী প্রত্যেক বারুজীবী পরিবারকে সর্বোচ্চ ২ বিঘা অর্থাৎ ২/৩ একর করে জমি দেওয়া হয়েছিল। তবে পান পাতা চাষের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জলসেচ ব্যবস্থা, সার প্রয়োজন ও অন্যান্য চাষের তুলনায় খরচও বেশি হয়। অন্যান্য ফসল চাষের জন্য যে জল প্রয়োজন হয় পান পাতা চাষের ক্ষেত্রে একরপিছু তার থেকে অনেক বেশি জলের প্রয়োজন হয়। রিভিউ কমিটির রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় পান পাতা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা বারুজীবী কলোনিগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। বেশিরভাগ কলোনিগুলিতেই মাটি ছিল বেলে প্রকৃতির এবং খুব একটা উর্বর নয়। ফলে অনেকেই চাষ

করতে পারেনি।[63] যার কারনে রিভিউ কমিটি যে ৬টি জেলায় এই বারুজীবী কলোনিগুলি ছিল সেখানে আলাদা ভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১২৭টি বারুজীবী পরিবার ছিল এবং পান পাতা চাষের জন্য বরাদ্দ জমেছিল ১১২৩.৮৬ একর।[64]

মুর্শিদাবাদ জেলায় বারুজীবী কলোনি:

- **মহলন্দী কলোনি:** ১৯৫২ সালে ৭১টি পরিবার নিয়ে ৮০.০৬ একর জমির উপর গড়ে উঠেছিল। যার মধ্যে একটি পরিবারকে পি.এল. হোমে পাঠানো হয় এবং ১০টি পরিবার এখানে জবর দখল করে বসবাস করেন।
- **আয়েসবাগ কলোনি:** ৫৬টি পরিবার নিয়ে ৪২.৭৫ একর জমির উপরে ১৯৫১ সালে এই কলোনির প্রতিষ্ঠা। কোনো জবরদখলকারী পরিবার এখানে ছিল না। ১০ কাঠা করে বাস্তু জমি ও পান পাতা চাষের জন্য দেড় বিঘা করে কৃষি জমি দেওয়া হয়েছিল।

সারণিঃ-১১ মুর্শিদাবাদ জেলায় বারুজীবী কলোনিগুলিতে প্রয়োজনীয় সেচ পরিষেবা ব্যবস্থা

কলোনির নাম	উপলব্ধ সেচ পরিষেবা	প্রয়োজনীয় সেচ পরিষেবা	আনুমানিক খরচ (টাকা)
মহালন্দী কলোনি	শূন্য	১০ টি টিউব ওয়েল	২০,০০০
আয়েসবাগ কলোনি	শূন্য	৪ টি টিউব ওয়েল	২৬,০০০

(*Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal-1974*, p.34)

উভয় কলোনিতেই পরিবার কিছু দশ কাঠা বাস্তু জমি ও পান চাষের জন্য দেড় বিঘা করে জমি প্রদান করা হয়েছিল। এই দুই কলোনির কোনোটিতেই জলসেচ ব্যবস্থা ছিলনা। প্রথম দিকে কলোনির বাসিন্দারা পান পাতা চাষ শুরু করলেও জলসেচের অভাবের জন্য পরবর্তীকালে অন্যান্য ফসল চাষ করতে শুরু করেন।[65] কলোনি দুটির সেচ সংক্রান্ত পরিস্থিতি ও চাহিদা নিচের সারণি-১১-তে দেখানো হল। ত্রান সরবরাহ ও পুনর্বাসন মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৭৬ পর্যন্ত বারুজীবী স্কিমে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৮৮৯টি বারুজীবী পরিবার এসেছিলেন। কৃষিজীবী পরিবার এসেছিলেন ৪,৬৫৫টি। মালদা জেলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেখানে ৩,৬২৬টি কৃষিজীবী পরিবার এসেছিলেন কিন্তু কোনো বারুজীবী পরিবার আসেনি (দ্রষ্টব্য সারণি-১২)।

[63] সাক্ষাৎকারঃ- নিরঞ্জন মিত্র, বয়স-৮৬, পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, মহালন্দি কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ- ২১/১১/২০২২।

[64] *Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal,* Ministry of Supply and Rehabilitation (New Delhi: Department of Rehabilitation, 1974), pp. 3-4 & 11.

[65] Ibid, p. 22.

সারণিঃ-১২ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বারুজীবী ও কৃষিজীবী পরিবারের জনসংখ্যা

জেলা	বারুজীবী পরিবারের জনসংখ্যা	কৃষি পরিবারের জনসংখ্যা	মোট
মালদা	-	৩৬২৬	৩৬২৬
মুর্শিদাবাদ	৮৮৯	৪৬৫৫	৫৫৪৪
মোট	৮৮৯	৮২৮১	৯১৭০

(File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, Appendix-vii, p.xviii.)

বেলডাঙা ব্লকে পরিবার পিছু চার কাঠা করে বাস্তু জমি এবং গৃহ নির্মাণের জন্য গৃহঋণ সরকার থেকে দেওয়া হয়েছিল যা পরে মকুব করা হয়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের পক্ষ থেকে বহরমপুর সদর ব্লকের বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনির বাসিন্দাদের বাস্তু জমি হিসেবে দশ কাঠা করে জমির প্লট কৃষিজীবী হলে কোথাও সাড়ে নয় কোথাও দশ বিঘা চাষের জমি, চাষের লাঙ্গল বাড়ি তৈরির টিন ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল, প্রথম দিকে ৯৯ বছরের লিজ ছিল ১৯৭০-এর দিকে আলাদা দলিলে জমের স্বত্ব প্রদান করা হয়। বহরমপুরের নিকটবর্তী আয়েসবাগে প্রত্যেক পরিবার পিছু দুই বিঘা জমি এবং বাড়ি তৈরির জন্য ঋণ হিসেবে ১১০০ টাকা ও টিন দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তীকালে এই ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়। সামশেরগঞ্জের ধুসুড়ি পাড়া কলোনির প্রত্যেক পরিবারকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর ৫ কাঠা করে বাস্তু জমির বাড়ি তৈরির টিন দিয়েছিলেন। লালবাগের বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনিতে তৎকালীন রাজ্য সরকার প্রতি পরিবারকে দুই থেকে চার কাঠা জমি এবং গৃহ নির্মাণের জন্য দু হাজার টাকা ঋণ দেন যা পরে মকুব করে দেয়া হয়েছিল।[66] তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা বর্ডার স্লিপ মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি নথি না দেখাতে পারলে উদ্বাস্তু দপ্তর তাদের বাড়ি তৈরি বা জমি কেনার জন্য কোনো অর্থ সাহায্য করতে অপারগ হয়।

১৯৫৩ সালে জমিদারি উচ্ছেদ আইন প্রণীত হয়েছিল; যার ফলে বহু খাস জমি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এই জেলার বিত্তশালী ও সহৃদয় কিছু ব্যক্তি বাস্তুহারা এই সকল মানুষদের দিকে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের রাজা শ্রীশনন্দী মন্দির এবং জলঙ্গির সাদিয়ানদিয়াড়ের ডঃ এস.কে. মুখার্জি। কাশিমবাজারের রাজা তার আম বাগান স্বল্পমূল্যে, পাঁচ টাকা কাঠা দরে বিক্রি করে দেন। ১৯৫৫ সালে ডক্টর মুখার্জী জেলা শাসকের মাধ্যমে সরকারের কাছে আর্জি জানান যাতে ৫০০ উদ্বাস্তুর সাদিয়ানদিয়াড়ে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। স্থানীয় সম্পন্ন ব্যক্তি এবং প্রজাদের সহায়তায় তিনি পরিকাঠামো উন্নয়নের স্বার্থে বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।[67] দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গের বরিশালের কুমিরমারা গ্রাম থেকে আসা উদ্বাস্তুগণ প্রাথমিকভাবে কুমড়োদহ ঘাটের ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়ছিলেন পরে বহরমপুরের

[66] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব,* পৃ.৮৫-১০১।

[67] তদেব, পৃ. ৪৬।

জমিদার আলোক পোদ্দারের ২২ বিঘা আমের বাগানে তাদের 'পোদ্দার কলোনি' গড়ে তোলেন। আবার বহরমপুরের বরিশাল কলোনিতে বরিশাল থেকে আগত উদ্বাস্তুরা স্থানীয় জমিদারের কর্মচারীদের কাছ থেকে ১১-৩০ টাকা কাঠা দরে জমির ক্রয় করে তাদের মাথা গোজার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর ১৬০টি পরিবারের জন্য ১৬০টি সরকারি প্লটে, খাস জমিতে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।[68]

মালদার অনুরূপে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এক-একটি পেশার মানুষদের জন্য এক একটি কলোনি গড়ে তোলা হয়েছিল। যেমন কৃষ্ণমাটি, কালমেঘা, সিঙ্গার বিল, ধুসুড়িপাড়ায় মৎস্যজীবীদের কলোনির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আয়েসবাগ এবং আমাইপাড়া বারুজীবীদের, শ্রীকৃষ্ণপুর, হরিহর পাড়ার খিদিরপুর, সাবিত্রী নগর, নওদার মধুপুরে নমঃশূদ্র কৃষিজীবীদের জন্য কলোনি গড়ে তোলা হয়েছিল। বহরমপুরের সন্নিকটে মধুপুর, চালতিয়া, গোয়ালজান, মহেন্দ্রনগর কলোনিগুলিতে অ-কৃষিজীবী এবং অ-মৎসজীবী মূলত করণিক, শিক্ষক, আমিন, ব্যবসায়ীদের কলোনি গড়ে তোলা হয়েছিল।[69]

মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলাতে উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপন করার মধ্যে একটা প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়। দলবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একটা জায়গায় একসঙ্গে অনেকগুলো উদ্বাস্তু পরিবার বসবাস করতেন। এইভাবে গড়ে ওঠে উদ্বাস্তু কলোনি। ব্যক্তি উদ্বাস্তু পরিচয় এর বাইরে বড় হয়ে ওঠে তাদের কলোনী পরিচয়।[70] এবং এই কলোনিগুলি গড়ে তোলার পেছনে আরো একটি প্যাটার্ন ছিল তা হল একই পেশা ভুক্ত মানুষেরা একই কলোনিতে বসবাস করতেন। যা উদাহরণসহ আগেও আলোচনা করা হয়েছে। এইসব বিভিন্ন পেশাগত কলোনির মধ্যে আবার নিজ নিজ পেশার বাসিন্দাদের জাতিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ বহরমপুরের কৃষ্ণ মাটির হালদারদের সঙ্গে সামসেরগঞ্জের হালদারদের, শ্রীকৃষ্ণপুরের নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের সঙ্গে হরিহরপাড়ার খিদিরপুরের একই সম্প্রদায়ের লোকজনের আত্মীয়তা, বৈবাহিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব এরূপ সম্পর্ক দেখা যায়।[71] এছাড়াও তাদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা বেশিরভাগ হিন্দু পরিবেষ্টিত অঞ্চলকেই কলোনি গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত মনে করেছেন। ১৯৬১ সালের জনগণনায় দেখা যায় মুর্শিদাবাদের যে সমস্ত থানায় উদ্বাস্তুরা কলোনি গড়ে বসবাস করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন সেই থানাগুলি বেশিরভাগেরই হিন্দু জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক বা অর্ধেকের কাছাকাছি যেমন বেলডাঙ্গা, নোয়াদা, রঘুনাথগঞ্জ। কিছু কিছু থানায় হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যেমন- বহরমপুর, সদর মুর্শিদাবাদ, নবগ্রাম, কান্দি এবং জিয়াগঞ্জ।[72] তবে এই দুই জেলার সীমান্তবর্তী মুসলিমপ্রধান এলাকায় উদ্বাস্তু সংখ্যা নেহাত কম নয়।

---

[68] তদেব, পৃ. ৮৯ ও ৯২।

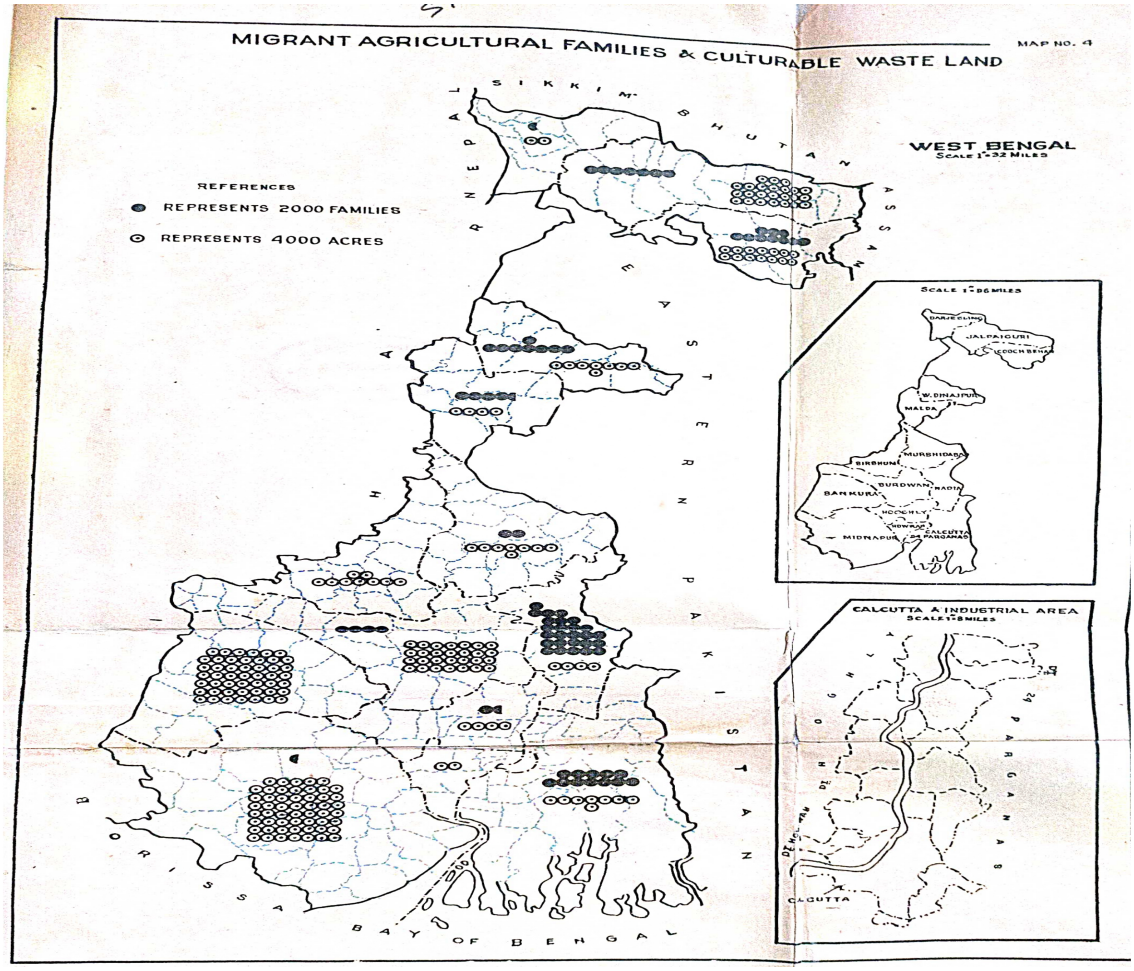
[69] তদেব, পৃ. ৬২।

[70] Monika Mandal, *Settling the Unsettled,* p. 234.

[71] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব, পৃ. ৬২।

[72] Birendra Kumar Bhattacharya, *West Bengal District Gazetteers: Murshidabad,* (Calcutta: Govt. of west Bengal, March 1979), pp. 108-109.

মানচিত্রঃ ৩ পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবী উদ্বাস্তু পরিবার ও চাষযোগ্য পতিত জমির বণ্টন।



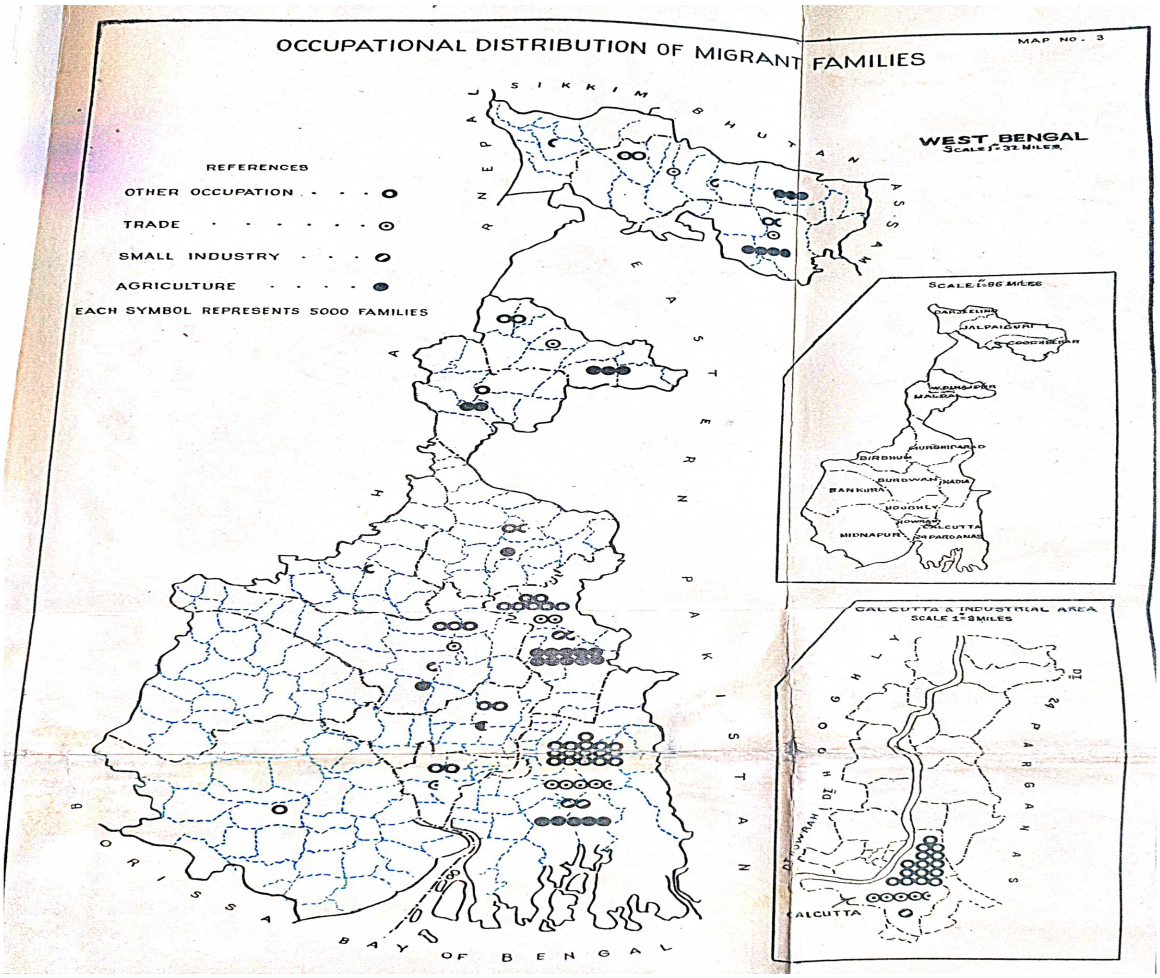
(*Rehabilation of Refugee, A Statistical Survey-1955*)

তারা নিজেদের পরিচিত পরিবেশে থাকার উদ্দেশ্যেই হয়ত এমনটা বেছে নিয়েছেন। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় অনেকের মুখে শোনা যায় ইউ.সি.আর.সি. বোর্ড থেকে তাদের কিছু প্রতিনিধি দল পাঠানো হত; তারা সে সমস্ত জায়গা ঘুরে দেখে আসতেন সেটা যদি হিন্দু পরিবেষ্টিত হত এবং সমস্ত কিছু তাদের উপযুক্ত মনে হত তবে তারা যাওয়ার জন্য বলতেন এবং সেখানে তখন বাকিরা গিয়ে বসবাস শুরু করতেন ও যার ফলে একটা কলোনি তৈরি হত।[73] তবে অবশ্য এইভাবে 'কলোনি পিপল' হয়ে থেকে যাওয়ার জন্য তাদের অনেকের মুখে আক্ষেপ ঝরে পড়ে। মুর্শিদাবাদের বিল কলোনির শংকর বিশ্বাসের কথায় "এখানকার আদিনিবাসীদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, শুধু নিজেদের লোকেদের মধ্যেই মেলামেশা। উদ্বাস্তু ছিলাম উদ্বাস্তুই থেকে গেছি। কলোনির ১৫০ ঘরের মধ্যে

[73] সাক্ষাৎকারঃ- তরুণ কুমার ভাওয়াল, বয়স-৬৩, পেশা-শিক্ষক (কাতলাপারা পূর্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়) মহলন্দী কলোনী, মুর্শিদাবাদ তারিখঃ-২১/১১/২০২২।

সীমাবদ্ধ।"[74] তবে এই ধরনের অভিজ্ঞতা খুব অল্প সংখ্যক উদ্বাস্তুর মুখেই শোনা যায়। বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারেই স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক সামাজিক মেলামেশার সম্পর্ক যেমন, একে অপরের বাড়ি যাওয়া-আসা, একে অপরকে বিভিন্ন পারিবারিক ও অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করার কথা জানা যায়; যা পরবর্তী অধ্যায়ে (পঞ্চম অধ্যায়) 'সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সম্পর্ক' বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

মানচিত্রঃ ৪ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির পেশাভিত্তিক বণ্টন



(*Rehabilation of Refugee, A Statistical Survey-1955*

৪.৩ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও জীবনধারণের ধরনঃ

মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ১৯৫৫ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকারের স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো-এর আয়োজিত স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে অনুসারে উদ্বাস্তুদের আর্থিক অবস্থা ও জীবনধারণ সম্পর্কে সমীক্ষা লব্ধ কিছু তথ্য আলোচনা করা হল। এই দুই জেলার উদ্বাস্তুদের সাধারণ আর্থিক

[74] সাক্ষাৎকারঃ- শংকর বিশ্বাস, বয়স-৬৯, পেশা-জমির মালিক, বিল কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখ:-২৯/১১/২০২২।

অবস্থার বিচারে তাদের বেশিরভাগই 'অভাবী' (in want)। মালদা জেলার ক্ষেত্রে যা ৪৯.৩২ শতাংশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে ৫০.৭০ শতাংশ অর্থাৎ ঠিক অর্ধেক। তবে মালদার ক্ষেত্রে 'দুর্দশাগ্রস্ত' (Distreesed) মানুষের সংখ্যা (২০.৯৫) তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি মুর্শিদাবাদের (১২.৬৮) তুলনায় দ্বিগুণের কিছু কম (দ্রষ্টব্য সারণি-১৩)। এর কারণ পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র মানুষদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মালদা জেলায় চলে এসেছিলেন যারা মূলত মাছ ধরে, পরের জমিতে খেটে রোজগার করতেন। এরা বেশিরভাগই মুথা ঘাস, সর্ষে ইত্যাদি বিক্রি করে জীবন শুরু করেছিলেন। ১৯৫৫ সালের প্রকাশিত স্ট্যাটিসটিকাল সার্ভের রিপোর্টে এই সকল মানুষদেরই দুর্দশাগ্রস্ত হিসেবে পাওয়া যায়। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন স্বর্ণব্যবসায়ী, তাঁতি, রেশম শিল্পী, শাখারী, কাঁসারী, দর্জি ও ব্যবসায়ীরা, যাদের আর্থিক সচ্ছলতা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। মালদা জেলাতেও উপরোক্ত পেশার উদ্বাস্তুরা এলেও কৃষক ও মৎস্যজীবীদের তুলনায় তাদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। দুই জেলাতেই কম বেশি এক তৃতীয়াংশ উদ্বাস্তু পরিবার অন্যান্য শ্রেণির অন্তর্গত, যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো অথবা জানা যায়নি এমন।

সারণিঃ-১৩ ১৯৫৫ সালে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সাধারণ আর্থিক অবস্থা। (সংখ্যাগুলি হাজারে)

জেলা	এলাকা	দুর্দশাগ্রস্ত	অভাবী	অন্যান্য	মোট
মালদা	গ্রাম	২.৯	৬.৪	৩.৭	১৩.০
	শহর	০.২	০.৯	০.৭	১.৮
	মোট	৩.১	৭.৩	৪.৪	১৪.৮
	শতাংশ	২০.৯৫	৪৯.৩২	২৯.৭৩	১০০.০০
মুর্শিদাবাদ	গ্রাম	১.৬	৫.৫	৩.৭	১০.৮
	শহর	০.২	১.৭	১.৫	৩.৪
	মোট	১.৮	৭.২	৫.২	১৪.২
	শতাংশ	১২.৬৮	৫০.৭০	৩৬.৬২	১০০.০০

(*Rehabilitation of Refugee, A Statistical Survey-1955*, p.72.)

পূর্বে উল্লিখিত সমীক্ষার অপর একটি তথ্য অনুসারে, মালদা মুর্শিদাবাদ জেলায় নিজস্ব মালিকানা আছে এমন বাড়িতে বসবাসকারী উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ৮১.৭৬ শতাংশ ও ৭২.৫৪ শতাংশ। যার মধ্যে আবার গ্রামের দিকে অধিকাংশই কাঁচা বাড়ি, পাকা বা আধ পাকা বাড়ি নেই বললেই চলে। তবে মালদা জেলার ক্ষেত্রে শহরের দিকে তুলনামূলকভাবে পাকা বাড়ির অস্তিত্ব দেখা যায়, এখানে কাঁচা ও পাকা বাড়ির অনুপাত সমান

হলেও মুর্শিদাবাদে শহরাঞ্চলে পাকা বাড়ির তুলনায় কাঁচা বাড়ির সংখ্যাই বেশি, প্রায় দ্বিগুণ। নিজস্ব মালিকানা নেই এমন বাড়িতে বসবাসকারী উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা মালদা জেলার তুলনায় মুর্শিদাবাদে বেশি এবং তা যথাক্রমে ১৮.২৪ শতাংশ ও ২৭.৪৬ শতাংশ (দ্রষ্টব্য সারণি-১৪)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলায় এক তৃতীয়াংশর কাছাকাছি উদ্বাস্তু পরিবারের নিজস্ব বাড়িই ছিল না। তবে দুই জেলার ক্ষেত্রেই একক সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা সাধারণত যেসব বাড়িতে বসবাস করতেন সেগুলিতে তাদের নিজস্ব মালিকানা ছিল না, তারা বেশিরভাগই ভাড়া বাড়িতে বা কয়েকজন মিলে অন্য বাড়ি দখল করে বসবাস করতেন।

সারণি-১৪ ১৯৫৫ সালে সরকারি ক্যাম্পের বাইরে উদ্বাস্তু পরিবারগুলির আবাস অবস্থা (সংখ্যাগুলি হাজারে)
(ক মানে ১০০-এর নীচে)

জেলা	এলাকা	কাঁচা	আধপাকা	পাকা	মালিকানাধীন বাড়িতে বসবাসকারী	মালিকানাহীন বাড়িতে বসবাসকারী
মালদা	গ্রাম	১০.৯	০.১	০.১	১১.১	১.৯
	শহর	০.৪	০.২	০.৪	১.০	০.৮
	মোট	১১.৩	০.৩	০.৫	১২.১	২.৭
	একক সদস্য পরিবার	০.৪	-	-	০.৪	০.৭
মুর্শিদাবাদ	গ্রাম	৮.৯	০.২	০.১	৯.২	১.৬
	শহর	০.৭	(ক)	০.৪	১.১	২.৩
	মোট	৯.৮	০.২	০.৫	১০.৩	৩.৯
	একক সদস্য পরিবার	০.৬	-	-	০.৬	১.০

(*Rehabilitation of Refugee, A Statistical Survey-1955,* pp.66-70.)

পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলায় পুনর্বাসনকারী উদ্বাস্তুদের প্রধানত গ্রামে বসবাসকারী ও শহরে বসবাসকারী এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মালদা ও মুর্শিদাবাদ দুটি গ্রামীণ ও কৃষি প্রধান জেলা হওয়াই এই দুই জেলার গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী উদ্বাস্তুরা বেশিরভাগ কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং শহরাঞ্চলে বসবাসকারী উদ্বাস্তুরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে এই দুই জেলায় বেশ কিছু সাদৃশ্যর পাশাপাশি কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্যও ছিল। ১৯৫১ সালের জনগণনাতে গ্রাম বা শহর সম্পর্কিত আলাদা তথ্য পাওয়া যায়নি বরং সর্বমোট পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাবাসী উদ্বাস্তুদের জীবনযাত্রার ভিত্তিতে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, কৃষিনির্ভর পরিবার ও অ-কৃষিনির্ভর পরিবারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; ১৯৫১-এর জনগণনা থেকে শুধুমাত্র কর্মী

সংখ্যা নয় বরং সেই কর্মীর উপর নির্ভরশীল অন্যান্য পারিবারিক সদস্যদেরও গণনা করা হয়েছে যার ফলে ওই সময়কালে কর্মীসংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়।

সারণিঃ-১৫ ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মালদা জেলার উদ্বাস্তু ও তাদের ওপর নির্ভরশীল সদস্যদের সংখ্যা

শ্রেণি	কার্যক্ষেত্র	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতাংশ
কৃষিজীবী শ্রেণি	১	১২৯৬	১৬২১	২৯১৭	৪.৮৫
	২	৯০৪২	৮৫৮৪	১৭৬২৬	২৯.২৮
	৩	২১৫৫	২০৮৮	৪২৪৩	৭.০৫
	৪	১৫৬১	১৫১	৩০৭	০.৫১
অ-কৃষিজীবী শ্রেণি	৫	২৭৮৩	২৭৭০	৫৫৫৩	৯.২৪
	৬	২৫০৩	২৩১২	৪৮১৫	৭.৯৯
	৭	২২২	২০১	৪২৩	০.৭০
	৮	১২৭৬১	১১৫৫৩	২৪৩১৪	৪০.৩৯
মোট		৩০৯১৮	২৯২৮০	৬০১৯৮	১০০

(*Malda, Census-1951,* p. 50.)

১. সম্পূর্ণ বা প্রধানত মালিকানাধীন জমির কৃষক

২.সম্পূর্ণ বা প্রধানত মালিকানাহীন জমির কৃষক

৩. কৃষিশ্রমিক

৪. জমির মালিক, যারা নিজেরা চাষ করেন না এবং কৃষি-খাজনা প্রাপক

৫. কৃষি ছাড়া অন্যান্য উৎপাদন। যেমন- স্টক বৃদ্ধি: গরু, মোষ অন্যান্য গবাদি পশু পালন, ছোট প্রাণী ও পতঙ্গ পালন: মৌমাছি, রেশম, পোল্ট্রি ইত্যাদি, বন পালন ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ, মাছ ধরা, খাদ্যশিল্প: ফল ও সবজি সংরক্ষণ, মৎস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি, চিনি শিল্প, বিড়ি প্রস্তুত করন, বস্ত্র শিল্প: বস্ত্রবয়ন ও বুনন, সুতো প্রস্তুত করন, পাট শিল্প, ধাতব সামগ্রী উৎপাদন: লোহা, পিতল, তামা, বেল মেটাল ইত্যাদির দ্রব্য তৈরি, পরিবহন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি: সাবান, কালি ইত্যাদি, মূল্যবান পাথর, ধাতু, অলংকার নির্মাতা ইট তৈরি কাঠের আসবাবপত্র নির্মাতা মাটির ও কাচের দ্রব্য তৈরি শ্রমিক ইত্যাদি।

৬. ব্যবসা-বাণিজ্য। খুচরো ও পাইকারি বিক্রেতা, হকার ও রাস্তায় বিক্রেতা। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের বিক্রেতা, যেমন- ফল, শাক-সবজি, শস্য, চাল, ডাল, মশলা, দুধ ইত্যাদির দোকানদার, খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের পাইকারি বাণিজ্য, যেমন- বীমা কর্মী, ব্যাংকের কর্মী ইত্যাদি।

৭. পরিবহন। জল, স্থল, বায়ু এবং রেলপথে নিযুক্ত ম্যানেজার থেকে শুরু করে সকল শ্রেণির কর্মী।

৮. অন্যান্য চাকরি ও বিভিন্ন উৎস। টেলিফোন পরিষেবা, টেলিগ্রাফ পরিষেবা, বেতার পরিষেবা, ডাক পরিষেবা, গুদামজাতকরণ, সকল প্রকার নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির কর্মী, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং জনপ্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সকল প্রকার কর্মী।

প্রথমে মালদা জেলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রায় ৪২ শতাংশ উদ্বাস্তু কৃষির উপর নির্ভরশীল, বাকি ৫৮ শতাংশ জীবনধারণের জন্য কৃষি ছাড়া অন্যান্য উপায়ের ওপর নির্ভর করে থাকেন। তার মধ্যে, মালিকানাহীন জমির কৃষকের সংখ্যাই সবথেকে বেশি ২৯ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় তিন চতুর্থাংশ। বাকিদের মধ্যে ৭ শতাংশ অর্থাৎ ছয় ভাগের একভাগ কৃষি-শ্রমিক এবং প্রায় ৫ শতাংশ অর্থাৎ তেরো ভাগের এক ভাগ মালিকানাধীন জমির কৃষক। খুব সামান্য পরিমাণ ছিলেন কৃষি জমির মালিক, যারা চাষবাস করতেন না। কৃষিকাজ বাবদ তারা জমি থেকে আয় করেন। দ্বিতীয় শ্রেণি অর্থাৎ অ-কৃষি পরিবারগুলির ৪০ শতাংশ অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি বিভিন্ন চাকরি ও অন্যান্য উৎস থেকে উপার্জন করে থাকেন। এর মধ্যে আছে সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ, ডাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার পরিষেবা, নির্মাণ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস পরিষেবা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্র, শিক্ষা ক্ষেত্র এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্র ইত্যাদি। বাকি অংশের মধ্যে ৯ শতাংশ চাষাবাদ ছাড়া অন্যান্য উৎপাদন (মৎস্য জীবিকা, রেশম চাষ ইত্যাদি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ও প্রায় ৮ শতাংশ বাণিজ্যর (হকার, সবজি বিক্রেতা, ফল বিক্রেতা, বিভিন্ন দোকানি, বস্ত্রবয়ন ও চামড়ার ব্যবসায়ী, পাইকারি ব্যবসা ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করতেন। সামান্য অংশ পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সারণিঃ-১৬ ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকারি ক্যাম্পের বাইরে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সংখ্যা। (সংখ্যাগুলি হাজারে) (ক মানে ১০০-এর নীচে)

জেলা	এলাকা	বেকার	কৃষি	ক্ষুদ্র শিল্প	বাণিজ্য	পেশা		চাকরি			শ্রমিক		অন্যান্য	মোট
						উত্তরাধিকার	অর্জিত	সরকারি	অন্যান্য	গার্হস্থ্য	দক্ষ	অদক্ষ		
মালদা	গ্রাম	০.২	৮.৬	০.৬	১.১	০.৮	০.৩	০.৩	০.২	(ক)	০.২	০.৪	০.৩	১৩.০
	শহর	০.১	০.১	০.১	০.৪	০.১	০.১	০.৫	০.২	(ক)	০.১	(ক)	০.১	১.৮
	মোট	০.৩	৮.৭	০.৭	১.৫	০.৯	০.৪	০.৮	০.৪	(ক)	০.৩	০.৪	০.৪	১৪.৮
	একক সদস্য পরিবার	০.১	০.৩	(ক)	(ক)	০.১	০.১	০.২	০.১	(ক)	(ক)	০.১	০.১	১.১
মুর্শিদাবাদ	গ্রাম	০.৩	৪.০	০.৭	১.৪	২.১	০.৩	১.০	০.৪	০.১	০.২	০.২	০.১	১০.৮
	শহর	০.২	০.২	০.৩	০.৭	০.২	০.৩	০.৯	০.৩	(ক)	০.১	০.১	০.১	৩.৪
	মোট	০.৫	৪.২	১.০	২.১	২.৩	০.৬	১.৯	০.৭	০.১	০.৩	০.৩	০.২	১৪.২
	একক সদস্য পরিবার	০.২	০.১	(ক)	০.২	০.১	(ক)	০.৬	০.২	০.২	(ক)	(ক)	(ক)	১.৬

(*Rehabilitation of Refugee, A Statistical Survey-1955, Table-3,* pp.44-45.)

১৯৫৫ সালের স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ক্যাম্প বহির্ভূত উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা গ্রামে বসবাসকারীদের তাদের ৬৬ শতাংশ অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত। বাকিদের মধ্যে ৮ শতাংশ ব্যবসা ও ৬ শতাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব প্রজন্মের পেশা অবলম্বন করেছিলেন এবং ৫ শতাংশ করে ক্ষুদ্র শিল্পে ও দক্ষ, অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের মধ্যে প্রায় ৩৯ শতাংশ বিভিন্ন চাকরিতে ছিলেন, যার মধ্যে কেবল ২৮ শতাংশই ছিলেন সরকারি চাকরিজীবী। এরা বেশিরভাগই প্রথমদিকে সরকারি চাকরিতে অপশন দিয়ে চলে আসা উদ্বাস্তু। ২২ শতাংশ ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাকিরা সারণি-১৬ অনুসারে অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৬১-এর জনগণনা অনুসারে মালদা জেলার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী উদ্বাস্তু নারী-পুরুষ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যেভাবে যুক্ত ছিলেন তা সারণি-১৭-তে তুলে ধরা হল। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী কৃষিনির্ভর উদ্বাস্তু সংখ্যা যথাক্রমে ৬৮.২২ শতাংশ ও ২.৪০ শতাংশ।

সারণিঃ-১৭ ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মালদা জেলার উদ্বাস্তুদের সংখ্যা

কার্যক্ষেত্র	গ্রামে বসবাসকারী				শহরে বসবাসকারী				সর্বমোট	শতাংশ
	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতাংশ	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতাংশ		
চাষী	১২৮১০	১৪২০	১৪২৩০	৫৫.২২	২৫	১	২৬	০.৬৫	১৪২৫৬	৪৭.৯১
কৃষিশ্রমিক	২৮২৫	৫২৭	৩৩৫২	১৩.০০	৭০	-	৭০	১.৭৫	৩৪২২	১১.৫০
মৎস্যজীবী ও অন্যান্য	১১০৮	৬১	১১৬৯	৪.৫৪	১৮	-	১৮	০.৪৫	১১৮৭	৩.৯৯
গার্হস্থ্য শিল্প	১২৫১	৮৬৭	২১১৮	৮.২২	১০১	৫০	১৫১	৩.৭৯	২২৬৯	৭.৬৩
অন্যান্য উৎপাদন শিল্প	৩৪৫	৪৮	৩৯৩	১.৫২	৪৭৬	২৮	৫০৪	১২.৬৫	৮৯৭	৩.০১
নির্মাণ	১৪৪	০	১৪৪	০.৫৬	১৭৫	১	১৭৬	৪.৪২	৩২০	১.০৮
ব্যবসা-বাণিজ্য	১০৮৮	১৬৮	১২৫৬	৪.৮৭	৮৭৫	১৮	৮৯৩	২১.০৬	২১৪৯	৭.২২
পরিবহন ও যোগাযোগ	৪০০	০	৪০০	১.৫৫	২১১	২	২১৩	৫.৩৫	৬১৩	২.০৬
অন্যান্য চাকরি	২৪৩৭	২৭২	২৭০৯	১০.৫৯	১৬৯৯	২৩৩	১৯৩২	৪৮.৫০	৪৬৪১	১৫.৬০
মোট কর্মী	২২৪০৮	৩৩৬৩	২৫৭৭১	১০০	৩৬৫০	৩৩৩	৩৯৮৩	১০০	২৯৭৫৪	১০০
শতাংশ	৭৫.৩১	১১.৩০	৮৬.৬১	-	১২.২৭	১.১২	১৩.৩৯			

(*Census of India 1961,* West Bengal & Sikkim, Part-II-C(iii), pp. 196-199 & 320-323)

১৯৭১-এর জনগণনা অনুসারে মালদা জেলার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী উদ্বাস্তু নারী-পুরুষ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যেভাবে যুক্ত ছিলেন তা সারণি-১৮-তে তুলে ধরা হল। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী কৃষিনির্ভর উদ্বাস্তু সংখ্যা যথাক্রমে ৮৯.৪৫ শতাংশ ও ৩.০২ শতাংশ।

সারণিঃ-১৮ ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মালদা জেলার উদ্বাস্তুদের সংখ্যা

কার্যক্ষেত্র	গ্রামে বসবাসকারী				শহরে বসবাসকারী				সর্বমোট	শতাংশ
	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতাংশ	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতাংশ		
চাষী	১৭১৯০	৫৭০	১৭৭৬০	৬৫.০৩	৯০	৫	৯৫	১.৭৯	১৭৮৫৫	৫৪.৭৬
কৃষিশ্রমিক	৪৫০০	২১৭০	৬৬৭০	২৪.৪২	৬০	৫	৬৫	১.২৩	৬৭৩৫	২০.৬৬
মৎস্যজীবী ও অন্যান্য	-	-	-	-	৮০	-	৮০	১.৫১	৮০	০.২৫
খনি ও খনন	-	২০	২০	০.০৭	-	-	-	-	২০	০.০৬
গার্হস্থ্য শিল্প	২০০	৪৩০	৬৩০	২.৩১	২৬৫	১৫	২৮০	৫.২৯	৯১০	২.৭৯
অন্যান্য উৎপাদন শিল্প	১০০	২৫০	৩৫০	১.২৮	৩০৫	৫	৩১০	৫.৮৫	৬৬০	২.০২
নির্মাণ	৫০	-	৫০	০.১৮	২১৫	-	২১৫	৪.০৬	২৬৫	০.৮১
ব্যবসা-বাণিজ্য	৬০০	১০০	৭০০	২.৫৬	১৬৩০	৩০	১৬৬০	৩১.৩৫	২৩৬০	৭.২৪
পরিবহন ও যোগাযোগ	১৫০	০	১৫০	০.৫৫	৪২৫	৫	৪৩০	৪.১২	৫৮০	১.৭৮
অন্যান্য চাকরি	৪০০	৫৮০	৯৮০	৩.৫৯	১৭৯০	৩৭০	২১৬০	৪০.৭৯	৩১৪০	৯.৬৩
মোট কর্মী	২৩১৯০	৪১২০	২৭৩১০	১০০	৪৮৬০	৪৩৫	৫২৯৫	১০০	৩২৬০৫	১০০
শতাংশ	৭১.১২	১২.৬৪	৮৩.৭৬	-	১৪.৯১	১.৩৩	১৬.২৪	-		

(*Census of India 1971*, Series-22, West Bengal, Part-II-D (i), pp.630-637)

মালদা জেলার মতো মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সালের জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য তথ্য অনুসারে গ্রামে বসবাসকারী ও শহরে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের জীবিকা নির্বাহ ও জীবন ধারণের ধরন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই জেলার মাত্র ২০ শতাংশ উদ্বাস্তু পরিবার কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, যা মালদা জেলার তুলনায় অর্ধেকেরও কম। ৮০ শতাংশ উদ্বাস্তু পরিবারই অ-কৃষিনির্ভর। এই অ-কৃষিনির্ভর উদ্বাস্তুদের ৩৩ শতাংশ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকরি ও অন্যান্য উৎসের ওপর নির্ভর করতেন, ২৭ শতাংশ বিভিন্ন অ-কৃষি উৎপাদন; যেমন মৎস্য জীবিকা, রেশম চাষ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ১৬

শতাংশ বাণিজ্য বা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; যেমন- হকার, সবজি বিক্রেতা, ফল বিক্রেতা, বিভিন্ন দোকানদার ইত্যাদি এছাড়া সামান্য কিছু অংশ পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সারণিঃ-১৯ ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তু ও তাদের ওপর নির্ভরশীল সদস্যদের সংখ্যা

শ্রেণি	কার্যক্ষেত্র	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতাংশ
কৃষিজীবী শ্রেণি	১	২৩৪৯	২৩৫০	৪৬৯৯	৮.০০
	২	১৬২৫	১৪১৭	৩০৬২	৫.২১
	৩	১৯৮৯	১৮৫৭	৩৮৪৬	৬.৫৫
	৪	১২২	৯১	২১৩	০.৩৬
অ-কৃষিজীবী শ্রেণি	৫	৮৫৮৫	৭৭৩০	১৬৩১৫	২৭.৮৭
	৬	৫২৮০	৪৬৩৭	৯৯১৭	১৬.৮৯
	৭	৬১৬	৫০২	১১১৮	১.৯০
	৮	১০৫৮২	৮৯৭৭	১৯৫৫৯	৩৩.৩০
মোট		৩১১৬৮	২৭৫৬১	৫৮৭২৯	১০০

(*Murshidabad, Census-1951*, pp.76)

১. সম্পূর্ণ বা প্রধানত মালিকানাধীন জমির কৃষক

২.সম্পূর্ণ বা প্রধানত মালিকানাহীন জমির কৃষক

৩. কৃষিশ্রমিক

৪. জমির মালিক, যারা নিজেরা চাষ করেন না এবং কৃষি-খাজনা প্রাপক

৫. কৃষি ছাড়া অন্যান্য উৎপাদন। যেমন- স্টক বৃদ্ধি: গরু, মোষ অন্যান্য গবাদি পশু পালন, ছোট প্রাণী ও পতঙ্গ পালন: মৌমাছি, রেশম, পোল্ট্রি ইত্যাদি, বন পালন ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ, মাছ ধরা, খাদ্যশিল্প: ফল ও সবজি সংরক্ষণ, মৎস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি, চিনি শিল্প, বিড়ি প্রস্তুত করন, বস্ত্র শিল্প: বস্ত্রবয়ন ও বুনন, সুতো প্রস্তুত করন, পাট শিল্প, ধাতব সামগ্রী উৎপাদন: লোহা, পিতল, তামা, বেল মেটাল ইত্যাদির দ্রব্য তৈরি, পরিবহন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি: সাবান, কালি ইত্যাদি, মূল্যবান পাথর, ধাতু, অলংকার নির্মাতা ইট তৈরি কাঠের আসবাবপত্র নির্মাতা মাটির ও কাচের দ্রব্য তৈরি শ্রমিক ইত্যাদি।

৬. ব্যবসা-বাণিজ্য। খুচরো ও পাইকারি বিক্রেতা, হকার ও রাস্তায় বিক্রেতা। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের বিক্রেতা, যেমন- ফল, শাক-সবজি, শস্য, ডাল, মশলা, দুধ ইত্যাদির দোকানদার, খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের পাইকারি বাণিজ্য, যেমন বীমা কর্মী, ব্যাংকের কর্মী ইত্যাদি।

৭. পরিবহন। জল, স্থল, বায়ু এবং রেলপথে নিযুক্ত ম্যানেজার থেকে শুরু করে সকল শ্রেণির কর্মী।

৮. অন্যান্য চাকরি ও বিভিন্ন উৎস। টেলিফোন পরিষেবা, টেলিগ্রাফ পরিষেবা, বেতার পরিষেবা, ডাক পরিষেবা, গুদামজাতকরণ, সকল প্রকার নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির কর্মী, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং জনপ্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সকল প্রকার কর্মী।[75]

[75] *Murshidabad, Census-1951,* pp. 27 & 68-73.

এদের মধ্যে যারা বিভিন্ন অ-কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ১৯৫৫ সালের স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়, তারা মূলত উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব প্রজন্মের পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন (দ্রষ্টব্য সারণি-১৬)। তাদের সিংহভাগ হলেন মৎস্যজীবী। পূর্ববঙ্গের মৎস্যজীবীদের একটি বড় অংশ মুর্শিদাবাদ জেলায় চলে আসেন, যা আগের অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবার রেশম চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মালিকানাধীন জমির কৃষক পরিবারের সংখ্যা সব থেকে বেশি প্রায় ৮ শতাংশ। এরপরে রয়েছে কৃষিশ্রমিক ও মালিকানাহীন কৃষক পরিবারের অবস্থান, যারা মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৭ শতাংশ ও ৫ শতাংশ। খুব সামান্য অংশ কৃষি জমির মালিক যারা নিজেরা চাষবাস করতেন না, কিন্তু কৃষি জমি থেকে আয় করতেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হল কৃষিনির্ভর উদ্বাস্তুদের মধ্যে মালদা জেলায় যেখানে নিজের জমি নেই এমন কৃষিজীবী পরিবারের সংখ্যা সিংহভাগ, সেখানে মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিজস্ব জমি আছে এমন কৃষিজীবী পরিবারের সংখ্যা সর্বাধিক। মালদা মূলত কৃষিনির্ভর জেলা হওয়ায় এখানে কৃষিনির্ভর পরিবারের সংখ্যা মুর্শিদাবাদ জেলার তুলনায় দ্বিগুনেরও বেশি; বিপরীতে মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প ও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকরির ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যা মালদা জেলার তুলনায় অনেক বেশি।

স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যাচ্ছে যে, একক সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের ক্ষেত্রে মালদা জেলায় স্বাভাবিকভাবেই কৃষির উপর নির্ভরতা বেশি যেখানে মুর্শিদাবাদ জেলায় সিংহভাগই সরকারি চাকরিজীবী। সারণি-১৬ অনুযায়ী, ১৯৫৫ সালে এই জেলার গ্রামীন এলাকার ৩৭ শতাংশ কৃষিকাজে, ২০ শতাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব প্রজন্মের পেশায়, ১৩ শতাংশ বিভিন্ন চাকরিতে ও ব্যবসাক্ষেত্রে, ৬ শতাংশ ক্ষুদ্র শিল্পে এবং ৪ শতাংশ শ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে, ৩৫ শতাংশ বিভিন্ন চাকরিতে, ২১ শতাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যে, ক্ষুদ্র শিল্প ও বিভিন্ন অর্জিত পেশার প্রতি ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ করে নিযুক্ত ছিলেন। বাকিরা সারণি-১৬ অনুসারে বিভিন্ন জীবিকা নির্বাহ করতেন।

১৯৬১-এর জনগণনা অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী উদ্বাস্তু নারী-পুরুষ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যেভাবে যুক্ত ছিলেন তা সারণি-২০-তে তুলে ধরা হল। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী কৃষিনির্ভর উদ্বাস্তু সংখ্যা যথাক্রমে ৪০.৬১ শতাংশ ও ২.১৩ শতাংশ।

সারণিঃ-২০ ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুদের সংখ্যা

কার্যক্ষেত্র	গ্রামে বসবাসকারী				শহরে বসবাসকারী				সর্বমোট	শতাংশ
	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতাংশ	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতাংশ		
চাষী	৫২২৫	২৫৩	৫৪৭৮	২৯.২৭	৮৫	-	৮৫	১.১৪	৫৫৬৩	২১.২৬
কৃষিশ্রমিক	১৭৮৮	৩৩৫	২১২৩	১১.৩৪	৬২	১২	৭৪	০.৯৯	২১৯৭	৮.৪০
মৎস্যজীবী ও অন্যান্য	২৯৮০	১৬	২৯৯৬	১৬.০১	৬৫৩	৬	৬৫৯	৮.৮৪	৩৬৫৫	১৩.৯৭
গার্হস্থ্য শিল্প	১২৪৬	৬৯০	১৯৩৬	১০.৩৪	১৩৮	৬৭	২০৫	২.৭৫	২১৪১	৮.১৮
অন্যান্য উৎপাদন শিল্প	৯৫৫	৬০	১০১৫	৫.৪২	৮৭২	২৫	৮৯৭	১২.০৪	১৯১২	৭.৩১
নির্মাণ	২৫১	-	২৫১	১.৩৪	২৩০	২	২৩২	৩.১১	৪৮৩	১.৮৫
ব্যবসা-বাণিজ্য	১৪৩৭	১০১	১৫৩৮	৮.২২	১৭৭০	২৮	১৭৯৮	২৪.১৩	৩৩৩৬	১২.৭৫
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫১৫	-	৫১৫	২.৭৫	৩৮৯	২	৩৯১	৫.২৫	৯০৬	৩.৪৬
অন্যান্য চাকরি	২৬০০	২৬৬	২৮৬৬	১৫.৩১	২৫৫৫	৫৫৫	৩১১০	৪১.৭৪	৫৯৭৬	২২.৮৪
মোট কর্মী	১৬৯৯৭	১৭২১	১৮৭১৮	১০০	৬৭৫৪	৬৯৭	৭৪৫১	১০০	২৬১৬৯	১০০

(*Census of India 1961,* West Bengal & Sikkim, Part-II-C(iii), p.200-03 & 324-327)

১৯৭১-এর জনগণনা অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী উদ্বাস্তু নারী-পুরুষ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যেভাবে যুক্ত ছিলেন তা সারণি-২১-এ তুলে ধরা হল। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী কৃষিনির্ভর উদ্বাস্তু সংখ্যা যথাক্রমে ৬০.৬৬ শতাংশ ও ১৫.৪৯ শতাংশ।

সারণিঃ-২১ ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুদের সংখ্যা

কার্যক্ষেত্র	গ্রামে বসবাসকারী				শহরে বসবাসকারী				সর্বমোট	শতাংশ
	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতাংশ	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতাংশ		
চাষী	৭৪১০	৮০০	৮২১০	৩১.৯২	৬০০	১০	৬১০	৬.৮৭	৮৮২০	২৫.৫৮
কৃষিশ্রমিক	৫০০০	২৬৫০	৭৬৫০	২৯.৭৪	৭০৫	৬০	৭৬৫	৮.৬২	৮৪১৫	২৪.৪০
মৎস্যজীবী ও অন্যান্য	২৩৬০	৮০	২৪৪০	৯.৪৯	৩২০	৫	৩২৫	৩.৬৬	২৭৬৫	৮.০২
খনি ও খনন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গার্হস্থ্য শিল্প	১১৩০	৬০০	১৭৩০	৬.৭৩	৩৫০	১২৫	৪৭৫	৫.৩৫	২২০৫	৬.৩৯
অন্যান্য উৎপাদন শিল্প	৬৯০	১০০	৭৯০	৩.০৭	৬২৫	৩০	৬৫৫	৭.৩৮	১৪৪৫	৪.১৯
নির্মাণ	১৬০	-	১৬০	০.৬২	২৬০	-	২৬০	২.৯৩	৪২০	১.২২
ব্যবসা-বাণিজ্য	১৪৭০	২০	১৪৯০	৫.৭৯	২৮৩০	৩০	২৮৬০	৩২.২৩	৪৩৫০	১২.৬১
পরিবহন ও যোগাযোগ	৮৮০	-	৮৮০	৩.৪২	৩৮৫	৫	৩৯০	৪.৩৯	১২৭০	৩.৬৮
অন্যান্য চাকরি	১৫১০	৭৫০	২২৬০	৮.৭৯	২০০০	৫৩৫	২৫৩৫	২৮.৫৬	৪৭৯৫	১৩.৯০
মোট কর্মী	২০৬১০	৫০০০	২৫৬১০	১০০	৮০৭৫	৮০০	৮৮৭৫	১০০	৩৪৪৮৫	১০০

(*Census of India 1971,* Series-22, West Bengal, Part-II-D (i), p.668-677)

সাধারণভাবে বলতে গেলে **১৯৪৭-১৭৯১** পর্যন্ত সময়কালে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তুরা গ্রামাঞ্চলে প্রধানত কৃষিকাজে এবং শহরাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, গার্হস্থ্য এবং উৎপাদন শিল্প, নির্মাণ, পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেদের পুনর্বাসিত করেছিলেন। মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তুদের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে কিছু সাদৃশ্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। মোটের উপর এই দুই জেলার গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় এবং শহরাঞ্চলে কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গার্হস্থ্য শিল্পে কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। এই দুই জেলার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

প্রথমত: গ্রাম ও শহরাঞ্চলে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা হল অন্যান্য পেশা থেকে তাদের কৃষিকাজের দিকে চলে আসা। মালদা জেলার ক্ষেত্রে **১৯৫১** সালে সমস্ত উদ্বাস্তুর ৪২ শতাংশ কৃষিনির্ভর ছিলেন (যেহেতু গ্রামভিত্তিক পরিসংখ্যান আলাদাভাবে পাওয়া যায়নি), **১৯৫৫** সালে স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভে অনুসারে; গ্রামীন উদ্বাস্তুদের ৫৬.৬০ শতাংশের জীবিকা ছিল চাষবাস, **১৯৬১** ও

১৯৭১ সালে যে সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ক্রমে ৬৮ শতাংশ ও ৯০ শতাংশে। মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রেও ১৯৫১ সালে সমস্ত উদ্বাস্তুর ২০ শতাংশ ও ১৯৫৫ সালে গ্রামীন উদ্বাস্তুদের ৩৭ শতাংশ কৃষিনির্ভর, ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালে গ্রামে বসবাসকারী কৃষিজীবীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪১ শতাংশ ও ৬১ শতাংশে। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উদ্বাস্তু আগমনের শুরু থেকে পরবর্তী দশকগুলিতে, দুই জেলাতেই বিশেষত গ্রামীণ এলাকার উদ্বাস্তুদের মধ্যে কৃষিজীবীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। যা কৃষিকাজের প্রতি গ্রামীণ উদ্বাস্তুদের আগ্রহকেই প্রমাণ করে। সারণি-২২-এ ১৯৬১ এবং ১৯৭১-এর গ্রামে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের জীবিকা তুলনা করলেই বোঝা যায় গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য জীবিকা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্বাস্তুরা কৃষিকাজের দিকে চলে আসছে এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষিই মুখ্য জীবিকা হিসেবে উপজীব্য হচ্ছে। শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রেও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে কৃষির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। মালদা জেলায় শহরাঞ্চলের কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের সংখ্যা খুব অল্প হলেও বেড়েছিল, মুর্শিদাবাদ জেলায় এই বৃদ্ধি ছিল চোখে পড়ার মত। ১৯৬১ এবং ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদের শহরাঞ্চলে মোট কৃষিজীবীর সংখ্যা যথাক্রমে ২ শতাংশ ও ১৫ শতাংশ অর্থাৎ কৃষিজীবীর সংখ্যা এক দশকে প্রায় ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ক্রমবর্ধমান জনবসতির চাপে কৃষিজমির সহজলভ্যতা কমে আসাই স্বাভাবিক; কিন্তু এক্ষেত্রে উদ্বাস্তু জনসংখ্যার মধ্যে কৃষক ও কৃষিশ্রমিকের সংখ্যাধিক্য এবং সেই সংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে অন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রথমেই যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুসারে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কৃষকদের সংখ্যা প্রায় ৭ শতাংশ কমে গিয়েছিল এবং এর বিপরীতে ওই সময় রাজ্যের কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯৬১ সালে ও ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮.৫ শতাংশ ও ৩১.৭৫ শতাংশ।[76] অর্থাৎ এই রাজ্যের কৃষকদের একটি বড় অংশ কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। এর পিছনে কারণ হিসেবে জনগণনাতে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল তা হল, বিগত কয়েক বছরের আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট অবনতির ফলে কৃষকদের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ এতটাই কমে গিয়েছিল যে, যে সমস্ত কৃষক অল্পস্বল্প বা ছোট-খাট জমির মালিক ছিলেন তারা সেই জমি চাষ করিয়ে যে উপার্জন করতেন, তার তুলনায় কৃষিশ্রমিক হিসেবে জমিতে খেটে যে পারিশ্রমিক পেতেন তাতে তাদের বেশি আয় হত।[77] এমনকি জনগণনাতে এটাও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, এই ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

---

[76] *Census of India 1971,* Series-18, West Bengal, Paper-I of, 1071, pp. 33-34.

[77] আদমশুমারিতে কৃষক এবং কৃষিশ্রমিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছিল, "For this Census, we specified that a cultivator was one who actually cultivated land held by him from the Government or from a private person, trust etc. in return for payment in cash or kind. An agricultural labourer was one who received wages for the labour he put in, without any interest of any kind in the land".

সারণিঃ-২২ ১৯৬১ এবং ১৯৭১-এর জনগণনা অনুসারে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত উদ্বাস্তুদের তুলনামূলক সারণি (সংখ্যাগুলি শতাংশে)

জেলা	মালদা				মুর্শিদাবাদ			
কার্যক্ষেত্র	গ্রামে বসবাসকারী		শহরে বসবাসকারী		গ্রামে বসবাসকারী		শহরে বসবাসকারী	
	১৯৬১	**১৯৭১**	**১৯৬১**	**১৯৭১**	**১৯৬১**	**১৯৭১**	**১৯৬১**	**১৯৭১**
চাষী	৫৫.২২	৬৫.০৩	০.৬৫	১.৭৯	২৯.২৭	৩১.৯২	১.১৪	৬.৮৭
কৃষিশ্রমিক	১৩.০০	২৪.৪২	১.৭৫	১.২৩	১১.৩৪	২৯.৭৪	০.৯৯	৮.৬২
মৎস্যজীবী ও অন্যান্য	৪.৫৪	-	০.৪৫	১.৫১	১৬.০১	৯.৪৯	৮.৮৪	৩.৬৬
গার্হস্থ্য শিল্প	৮.২২	২.৩১	৩.৭৯	৫.২৯	১০.৩৪	৬.৭৩	২.৭৫	৫.৩৫
অন্যান্য উৎপাদন শিল্প	১.৫২	১.২৮	১২.৬৫	৫.৮৫	৫.৪২	৩.০৭	১২.০৪	৭.৩৮
নির্মাণ	০.৫৬	০.১৮	৪.৪২	৪.০৬	১.৩৪	০.৬২	৩.১১	২.৯৩
ব্যবসা-বাণিজ্য	৪.৮৭	২.৫৬	২১.০৬	৩১.৩৫	৮.২২	৫.৭৯	২৪.১৩	৩২.২৩
পরিবহন ও যোগাযোগ	১.৫৫	০.৫৫	৫.৩৫	৪.১২	২.৭৫	৩.৪২	৫.২৫	৪.৩৯
অন্যান্য চাকরি	১০.৫৯	৩.৫৯	৪৮.৫০	৪০.৭৯	১৫.৩১	৮.৭৯	৪১.৭৪	২৮.৫৬
মোট কর্মী	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

এখানে একটি আকর্ষণীয় বিষয় হল জমির মালিকানা হস্তান্তরের ঘটনা। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে **১৯৬১** থেকে **১৯৭১**-এ গ্রাম ও শহরে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কৃষক ও কৃষিশ্রমিক উভয়ের সংখ্যাই ক্রমবর্ধমান, যা জমির মালিকানা হস্তান্তরের ঘটনাটিকে প্রমাণ করে। এর আগের অধ্যায়েই আলোচনা করা হয়েছিল এই দুই জেলার উদ্বাস্তু মানুষেরা কিভাবে সুচারু পরিকল্পনায় অহর্নিশ কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তিলে তিলে জমি-সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন, তাদের সেই জীবনযাত্রার কাহিনী তারা নিজের মুখে শুনিয়েছিলেন।[78] জনগণনার পরিসংখ্যানও তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। যদিও উদ্বাস্তুদের মধ্যে কৃষকের সংখ্যাবৃদ্ধি কৃষিশ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় কম। উদ্বাস্তু কৃষকদের কৃষিশ্রমিকে পরিণত হওয়াও এর একটি কারণ হতে পারে যেহেতু তারাও পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার অবনতির শিকার। উক্ত দশকে, মালদা

[78] তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৬৪।

ও মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ১৬ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল; যেখানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল ১০ শতাংশ।

উপরিউক্ত কারণটি ছাড়াও জনগণনাতে রাজ্যের কৃষিশ্রমিকের এই সংখ্যা বৃদ্ধির আরও একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছিল তা হল; আর্থিক অবস্থার অবনতির কারণে 'অন্যান্য শ্রমিক'রাও অনেকে কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালে 'অন্যান্য শ্রমিক'-এর সংখ্যা ছিল ৪৬.২ শতাংশ যা ১৯৭১-এ কমে হয়েছিল ৪২.৫ শতাংশ।[79] জনগণনাতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, "'অন্যান্য শ্রমিক'-এর শতাংশ-হ্রাস অর্থনীতির অবনতির আর একটি ইঙ্গিত"। যেটি বর্তমান এই দুই জেলার উদ্বাস্তু কর্মীদের নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও ভীষণভাবে প্রযোজ্য।

"In every sector of the economy outside agriculture activity has obviously declined fairly considerably, resulting in this lesser percentage of workers as compared to 1961. The pattern we have just indicated holds good in every district of the State; the percentage of other workers has universally declined from the 1961 percentages, while the percentage of agricultural labourers has risen everywhere". ("কৃষি ছাড়া অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকলাপ স্পষ্টতই যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে ১৯৬১ সালের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা কমেছে। আমরা যে ধরণটি উল্লেখ করেছি তা রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রযোজ্য; অন্যান্য শ্রমিকের সংখ্যা সর্বত্রই ১৯৬১ সালের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা সর্বত্রই বৃদ্ধি পেয়েছে।)

সেখানে আরো বলা হয়েছিল, "A universal trend of this type needs, necessarily, to be considered seriously. It indicates some kind of radical alteration in the pattern of activity in the State, which is not very propitious".[80] (এই ধরনের সর্বজনীন প্রবণতাকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটি রাজ্যের কার্যকলাপের ধরনে এক ধরনের আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যা খুব আশাব্যঞ্জক নয়।")

এসবের পাশাপাশি নতুন জমির সন্ধানও ছিল এই দুই জেলার উদ্বাস্তু কৃষক ও কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির আরো একটি কারণ। উদ্বাস্তু আগমনে বহু জমিদারের জমি, সরকারের, রেলের খালি জমি, খাস জমি ইত্যাদি পতিত জমিগুলি তাদের পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হয়েছিল; উদ্বাস্তু মানুষেরা নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেক অনাবাদি জমিকে আবাদি জমিতে পরিনত করেছিলেন।[81] এছাড়াও মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা দুটি গঙ্গার তীরবর্তী হওয়ায় প্রায়শ নিত্যনতুন চর জেগে উঠত, যা নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে।[82] এইসকল চরে ভালো ফসল হওয়ার সুবাদে উদ্বাস্তুরা অনেকেই এই দুই জেলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[83]

---

[79] *Census of India 1971,* p. 34.

[80] Ibid.

[81] পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২৪৫-২৫০।

[82] প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৬৭-৬৮।

[83] তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩৯-১৪০।

মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে অবশ্য আর একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রযোজ্য; তা হল, এই জেলায় রাজ্যের বারুজীবী পুনর্বাসন স্কিমে অনেক বারুজীবী পরিবার পান চাষের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু আগের আলোচনা থেকেই দেখা যায়, পান চাষের উপযুক্ত পরিবেশ এবং পরিকাঠামো এই জেলায় না থাকায় তারা দীর্ঘদিন প্রচেষ্টার পর সাধারণ চাষবাস করতে শুরু করেন। তাই প্রথম দিকের বছরগুলিতে তারা বারুজীবী হিসেবে পরিগণিত হলেও পরবর্তীকালে তাদের অনেকেই কৃষক বা কৃষিশ্রমিকে পরিণত হন।

দ্বিতীয়ত: একটি লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, মৎস্যজীবিকা বর্জন। গঙ্গার তীরে অবস্থিত, অসংখ্য নদী-নালা খাল-বিল পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এই দুটি জেলায় বিশেষত গ্রামাঞ্চলে পরবর্তী দশকগুলিতে মৎস্যজীবীদের সংখ্যার আনুপাতে হ্রাস ঘটছে। মালদা জেলায় গ্রামাঞ্চলে মৎস্যজীবীদের সংখ্যা ১৯৫১, ১৯৫৫ ও ১৯৬১-এ যথাক্রমে ৯ শতাংশ, ৬ শতাংশ ও ৪ শতাংশে পরিণত হয়। ১৯৭১-এ তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ায় দায় হয় (দ্রষ্টব্য সারণি-১৮) মুর্শিদাবাদের এই সংখ্যাটা যথাক্রমে ২৭ শতাংশ, ২০ শতাংশ, ১৬ শতাংশ, ৯ শতাংশ। নদী-নালা, জলাশয় বহুল এই দুই জেলায় পূর্ববঙ্গের জেলে সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ দেশভাগের পর চলে আসে। পূর্বপুরুষের মৎস্যজীবিকাকে অবলম্বন করে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা বাদ দিয়ে তাদের এই দুই জেলায় আসা। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী পরবর্তী প্রজন্মের উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই পেশার প্রতি ততটা আকর্ষণ দেখা যায় না।

১৯৭৯-এ প্রকাশিত মুর্শিদাবাদ জেলার গেজেটিয়ারেও এই সময় মৎস্য চাষ কমে যাওয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল; "বাগড়ি অঞ্চলে ভাগীরথী ও অন্যান্য নদীর পলি জমার ফলে বড় বড় বিলগুলি ছোট অগভীর জলাশয়ে পরিনত হয়। ফলে মৎস্য চাষ ও কৃষি এই দুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়"।[84] এই সমস্যাটি মালদা জেলার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রাসঙ্গিক। দেশভাগের পরবর্তী দশকগুলিতে এই দুই জেলায় মৎস্যজীবীদের সংখ্যা হঠাৎ করে কমে যাওয়ার পেছনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জলাশয়ের অভাবকেই প্রাথমিক কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ক্রমবর্ধমান জনবসতির চাপে এই দুই জেলায় বিভিন্ন জলাশয়, বিল, পুকুর ইত্যাদি শুকিয়ে যাওয়া, মজে যাওয়া, সংস্কারের অভাব ও ব্যক্তিগত মালিকানার জেরে মাছ ধরতে না পারা ইত্যাদি সমস্যাগুলি প্রকট হয়ে উঠেছিল। উদাহরণস্বরূপ, বহরমপুর ব্লকের ভাগীরথী তীরবর্তী কৃষ্ণমাটিতে পূর্ব পাকিস্তানের পাবনা থেকে ১৯৪৬ সালে বেশ কিছু মৎস্যজীবী পরিবার চলে এসেছিলেন। অথচ এদের জন্য বলা হচ্ছে "মূল মৎস্যজীবী পরিবারগুলি মৎস্যচাষের উপযুক্ত সুযোগ দীর্ঘদিন পূর্বেই পায়নি"।[85] চালতিয়া বিলের সঙ্গে ভাগীরথী ও ভাণ্ডারদহ বিলের সংযোগ ছিল। নগারায়নের ফলে ভাকুড়ি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সদস্যগণ ও অন্যান্য মৎস্যজীবী পরিবার বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ৩০০ বিঘার চালতিয়া বিলটি বুজিয়ে ফেলা হয়েছিল। গ্রামের

[84] *Murshidabad gazetteer 1979,* p.93.

[85] সাক্ষাৎকারঃ- বাসুদেব হালদার, মৎস্যজীবী; cited- ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব,* পৃ. ৯৮।

পুকুরগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মজে যাওয়ার কারণে মাছ চাষ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[86] জলঙ্গি ব্লকের সাদিখানদিয়াড়ে বড় বিল, খয়রামারী বিল, সাহেবনগর বিল ইত্যাদি সংস্কারের অভাবে মজে গিয়ে স্বাস্থ্যের পরে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। এমনকি বড় বিলকে সুইস গেটের সাহায্যে মৎস্য চাষের উপযোগী করার প্রয়াসও সফল হয়নি। পদ্মার নিকটবর্তী এই অঞ্চলে পূর্ব-পাকিস্তানের কুষ্ঠিয়া ও ভেড়ামারা অঞ্চল থেকে মৎস্যজীবী উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন।[87] মৎস্যজীবিকা ছেড়ে তারা বাধ্য হয়ে অন্য পেশায় যুক্ত হয়েছিলেন। সামসেরগঞ্জ ব্লকের ইন্দ্রনগর কলোনিতে পাবনা থেকে মৎস্যজীবী পরিবারগুলি এসেছিলেন। এখানকার জনৈক উদ্বাস্তুর কথায় "কিন্তু এখন মাছের সন্ধান নেই"[88] তাই পুরুষেরা কেউ দিনমজুরী করে, কেউ ফলমূল বিক্রি করে, ছোট দোকান করে ইত্যাদি নানাভাবে রোজগার করেন। মহিলারা বাজারে আনাজ বিক্রি, বিড়ি বাঁধা, অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করেন।[89]

এই সমস্ত কারণে এই দুই জেলার বহু উদ্বাস্তু মৎস্যজীবিকা ব্যতীত অন্যান্য পেশার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, বেলডাঙ্গা ব্লকের সরুলিয়া কলোনিতে পঞ্চাশের দশকে খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রাজশাহী, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া থেকে আগত মৎস্যজীবী উদ্বাস্তু পরিবারগুলি অধিকাংশই রান্নার মশলা বিক্রি, পান বিক্রি, গোপালন ইত্যাদি পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন।[90] লালগোলা ব্লকের কালমেঘা গ্রামে, ১৯৫০ এর দশকে পাবনা থেকে ৩০০ টি মৎস্যজীবী পরিবার এসেছিলেন; কিন্তু মৎস্যজীবিকার পরিবর্তে পুরুষেরা বিহার, উত্তরপ্রদেশ এমনকি নেপালে গিয়েও চা, তিলের খাজা ইত্যাদি বিক্রি করে, অনেকে আবার লালগোলা-শিয়ালদহ রুটের ট্রেনে হকার হিসেবে সারাদিন তিলের খাজা, চা এবং ঝালমুড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। মহিলারা ছাতু বিক্রি করে সংসারে আর্থিক সাহায্য করেন। একইভাবে কালমেঘা গ্রামের হালদার সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবী মানুষেরা জীবিকা পরিবর্তনে বাধ্য হন। নওদা ব্লকের মধুপুর গ্রামের মৎস্যজীবীরা দিনমজুরি ও হকারি করে উপার্জন করেন। দেবীপুরের হাটে বাজারে সমিতির সদস্যগণ মাছ বিক্রি করা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন।[91] এই পরিস্থিতির জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও সেগুলো ফলপ্রসু হয়নি যেমন,- সদর ব্লকের মণীন্দ্রনগর কলোনির কাশিমবাজার মণীন্দ্রনগর ফিশারমেনস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের মৎস্য উন্নয়ন প্রস্তাবগুলি ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন সংস্থ্যা SFDA অনুমোদন করার পর তা আর্থিক দিক থেকে রূপায়িত করার জন্য উক্ত সংস্থাটি ১৯৮১ সালে ষ্টেট ব্যাঙ্ক, জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে পাঠানোর প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। উক্ত সংস্থার (SFDA) জেলা

---

[86] সাক্ষাৎকারঃ- বাসুদেব হালদার, মুর্শিদাবাদ।

[87] সাক্ষাৎকারঃ- শচীন প্রামানিক, গণিত শিক্ষক, cited- ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব,* পৃ. ৯৮।

[88] সাক্ষাৎকারঃ-মাধব হালদার, বয়স-৬৫, পেশা-জেলে, ধুসরিপাড়া কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

[89] তদেব।

[90] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব,* পৃ. ৮৫।

[91] তদেব, পৃ. ১০৮-১০।

পরিচালন সমিতির সভায় মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের প্রস্তাব সমূহ বিবেচনার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে অনুরোধ জানানা হয়। কিন্তু সাময়িকভাবে কিছু স্বস্তি এলেও শেষ পর্যন্ত মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি।[92] তবে মালদা জেলার ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে পঞ্চাশের দশকের তুলনায় ষাটের দশকের মৎস্যজীবীদের সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তৃতীয়ত: শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় প্রবণতা হল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ। ১৯৫৫-এর স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে অনুসারে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার শহরাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত উদ্বাস্তুর সংখ্যা যথাক্রমে ৫ শতাংশ ও ২১ শতাংশ। ১৯৬১ সালে সেই সংখ্যাটি হল যথাক্রমে ২১ শতাংশ ও ২৪ শতাংশ এবং ১৯৭১ সালে যথাক্রমে ৩১ শতাংশ ও ৩২ শতাংশ। মালদা জেলাতে ১৯৬১-১৯৭১ পর্যন্ত এক দশকের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীর প্রায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি ৮ শতাংশের কিছু বেশি। খুব সহজ ভাবে বলতে গেলে, এর পেছনে মূলত দুটি বিষয় কাজ করে। এক, ব্যবসা ব্যতীত অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি থেকে বিকর্ষণ, দুই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আকর্ষণ। প্রথম অংশের ব্যাখ্যায় আসা যাক, পঞ্চাশের দশকে যেখানে উদ্বাস্তু কর্মীদের বেশিরভাগকেই বিভিন্ন চাকরি ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেখানে ষাটের দশকে চাকরির প্রতি অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এই দশকে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার শহরাঞ্চলে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে মিলিতভাবে চাকুরীজীবীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮ শতাংশ ও ১৩ শতাংশ হ্রাস পায়। যা প্রমান করে, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি ক্ষেত্রে যে পারিশ্রমিক তারা পেতেন তার তুলনায় ব্যবসাকেই তাদের বেশি লাভজনক মনে হয়েছে; এই দুই জেলার উদ্বাস্তুদের মুখে এমনটা শোনা যায়। উদাহরণস্বরূপ, তখনকার দিনে একজন শিক্ষক যা বেতন পেতেন তা দিয়ে সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণ সম্ভব ছিল না।

চাকরি ছাড়াও বিভিন্ন উৎপাদন শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং নির্মাণ এই সমস্ত পেশাগুলি থেকেও বেশ কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুর পরবর্তী দশকে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে চলে যাওয়ার একটা ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হল মূলত অবশিল্পায়ন, বিশেষত এই দুই জেলায়; যা আগের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে[93] এবং অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি; এর আগে কৃষিশ্রমিক বৃদ্ধির আলোচনায় দেখানো হয়েছে, ১৯৭১-এর জনগণনাতে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিক কমে যাওয়ার কারণ হিসাবে এ রাজ্যের আর্থিক অবস্থার অবনতির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। হান্টারের একাউন্টে মুর্শিদাবাদে যেভাবে রেশম, তুঁত, কাঁসা-পিতল, হাতির দাঁত ও অন্যান্য শিল্পের কথা বলা হয়েছিল, আস্তে আস্তে তার অবনতি ঘটতে থাকে, প্রায় একই রকম চিত্র দেখা যায় মালদাতেও।[94]

---

[92] তদেব, পৃ. ১০১।

[93] তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৪২।

[94] Birendra Kumar Bhattacharya, *West Bengal District Gazetteers: Murshidabad*, (Calcutta, March 1979), pp. 133-34; Jatindra Chandra Sengupta, *West Bengal District Gazetteers: Malda Gazetteer,*

পাশাপাশি মালদা জেলার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবনতির একটি বড় কারণ ছিল মালদা জেলার ভাগ, যা এর আগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[95] মালদা ও মুর্শিদাবাদের অর্থনৈতিক অবনতির অন্যতম কারণ হল অবশিল্পায়ন। এই দুই জেলায় দীর্ঘদিন বড়ো কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি। বড় ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভাবে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা আস্তে আস্তে ব্যবসার দিকে চলে গিয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৬১ সালে মালদা ও মুর্শিদাবাদে গার্হস্থ্য শিল্প ও অন্যান্য উৎপাদন শিল্পে জড়িত মোট কর্মী সংখ্যা যথাক্রমে ১০.৬৪ শতাংশ ও ১৫.৪৯ শতাংশ, যা ১৯৭১ সালে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৪.৮১ শতাংশ ও ১০.৫৮ শতাংশে নেমে এসেছিল। এক দশকের মধ্যে মালদা ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন উৎপাদনশিল্পে যথাক্রমে প্রায় ৬ শতাংশ ও প্রায় ৫ শতাংশ কর্মীহ্রাস শিল্পের অবনতিকেই প্রকাশ করে, যা এই দুই পিছিয়ে পড়া জেলার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শিল্পের সঙ্গে জড়িত এই কর্মীরা নিঃসন্দেহে ব্যবসায় যোগদান করেছিলেন। কারণ অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতেও সংযুক্ত কর্মীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। বাকিদের মধ্যে একটা অংশ কৃষক কৃষিশ্রমিক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক অবনতির কারণে কৃষক হিসেবে পরিচয় দেওয়ার থেকে কৃষিশ্রমিক হিসেবে পরিচয় দিতে তাদের আর্থিক সুবিধা আছে তা এর আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ উপরের আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়, ব্যবসা ব্যতীত অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি থেকে বিমুখতা উদ্বাস্তুদের ব্যবসায় আগ্রহী হয়ে ওঠার একটি কারণ।

দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উদ্বাস্তুদের আকৃষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার যোগান দিতে বাজার-হাট সম্প্রসারণে, অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির তুলনায় পরবর্তী দশকগুলিতে তাদের কাছে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ লাভজনক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় কারণটি হল, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় বিশেষত শহরাঞ্চলগুলিতে স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই অবাঙালি ব্যবসায়ীদের রমরমা জেলা দুটিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল, বিশেষত তাদের বস্ত্র-বিপণিগুলি অনুপ্রেরণার অন্যতম কারণ ছিল। শহরাঞ্চলের উদ্বাস্তুরাও সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছিল। কারণ ব্যবসায় নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা উদ্বাস্তুদের মধ্যে শহরে বেশি বেড়েছিল।[96] প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, "মালদা জেলার যে কটি 'কমার্শিয়াল মার্কেট' ও 'পৌর বাজার' গড়ে উঠেছে তার সিংহভাগের মালিক ওপার বাংলা থেকে আগত

(Calcutta, December 1969), p. 94; Ranabir Samaddar, *The Marginal Nation: Transborder Migration from Bangladesh to West Bengal,* (New Delhi: Sage Publications, 1999), p. 169.

[95] প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫৯-৬৪।

[96] মালদা ও মুর্শিদাবাদে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্মী সংখ্যা যথাক্রমে দশ শতাংশ ও আট শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল সেখানে গ্রামে তা যথাক্রমে দুই শতাংশ ও তিন শতাংশ করে হ্রাস পেয়েছিল।

বাঙালিরা"।[97] ওপার বাংলা থেকে উদ্বাস্তুদের আগমন মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় কিভাবে বাজার-হাটের সম্প্রসারণে সাহায্য করেছিল, তা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[98]

চতুর্থত: গ্রামাঞ্চলে গার্হস্থ্য শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা পূর্ববর্তী দশকে তুলনায় পরবর্তী দশকের অনেকটাই হ্রাস পেলেও শহরাঞ্চলে উভয় জেলাতেই গার্হস্থ্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জনগণনা থেকে ১৯৬১-১৯৭১ সময়ে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে এই হ্রাসের পরিমাণ যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ৪ শতাংশ। কিন্তু এর বিপরীতে দুই জেলার শহরাঞ্চলে এই বৃদ্ধি প্রায় ২ থেকে ২.৫ শতাংশ।

উপরে উল্লেখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তুদের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে কিছু স্বাতন্ত্র্যও ছিল। **প্রথমত:** বিভিন্ন দশকে মালদা জেলার গ্রামাঞ্চলের মুখ্য জীবিকা হিসেবে কৃষিকাজেরই প্রাধান্য দেখা যায়, অন্যান্য পেশায় মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু যুক্তছিলেন। কৃষিকাজের পরে বিভিন্ন চাকরি ও গার্হস্থ্য শিল্পে তাদের উপস্থিতি গন্য করার মতো। বাদবাকি কর্মক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি একেবারেই নগন্য। অন্যদিকে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে অকৃষিজীবীর সংখ্যাই সর্বাধিক ছিল (দ্রষ্টব্য সারণি-১৯)। বিভিন্ন চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে, উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব প্রজন্মের পেশাগুলিই এই জেলায় জীবিকা হিসেবে প্রাধান্য পায় (দ্রষ্টব্য সারণি-১৬)। গ্রামাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের একটি বড় অংশ প্রথম দিকে মৎস্যজীবী ছিলেন। পূর্ব-পুরুষের পেশাকে আঁকড়ে ধরে পূর্ববঙ্গের বহু উদ্বাস্তু প্রাথমিকভাবে এই জেলায় আশ্রয় নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মৎস্যজীবীদের সংখ্যা পরবর্তী দশকে কমলেও সেই সংখ্যাটি নেহাত কম নয় যেখানে মালদা জেলাতে যেখানে ১৯৭১-এ মালদার গ্রামাঞ্চলে মৎস্যজীবীদের প্রায় খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। পরের দশকগুলিতে মুর্শিদাবাদের গ্রাম অঞ্চলে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেলেও তা মালদা জেলার মতো কৃষিতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়নি বরং ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প, মৎস্যজীবিকা ও বিভিন্ন চাকরিতে কর্মী সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। এমনকি মুশিদাবাদ জেলায় যোগাযোগ ও পরিবহন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন নির্মাণ ক্ষেত্রেও উদ্বাস্তু কর্মীসংখ্যা অল্প হলেও গণ্য করার মতো ছিল; যা মালদা জেলার ক্ষেত্রে একেবারেই নগণ্য ছিল। (সারণি ১৭, ১৮ ২০, ২১) এর কারণ হল; মালদা জেলার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যাদের নিজস্ব জমি নেই তারা অন্যের জমিতে চাষ করে, দিনমজুর কিংবা কৃষিশ্রমিক হয়ে কৃষি নির্ভর জীবন যাপন বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছেন, মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ মালিকানায় নিজস্ব জমি আছে এমন কৃষকের সংখ্যায় বেশি। যাদের জমি কেনার সমর্থ্য নেই তারাই অন্যান্য জীবিকায় চলে যাচ্ছেন (দ্রষ্টব্য সারণি-১৫ ও ১৯)।

---

[97] রীতা রায়, "স্বাধীনতা ও দেশভাগঃ মালদা জেলায় তার প্রতিফলন", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহানর্ব, বিষয়ঃ দেশভাগের যন্ত্রনা,* (বহরমপুরঃ দশম বর্ষ-২০২১) পৃ. ৮৩।

[98] পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২৪৩-২৪৫।

দ্বিতীয়ত: শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে মালদা জেলায় মূলত চাকরিই প্রাধান্য পেয়েছিল। এর পাশাপাশি প্রথমদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন উৎপাদন শিল্প ও গার্হস্থ্য শিল্প, নির্মাণ পরিবহন ও যোগাযোগের সঙ্গে বেশ কিছু উদ্বাস্তু যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি চাকরিই ছিল মালদা শহর অঞ্চলের প্রধান জীবিকা। ১৯৭১ সালে দেখা যায়, মালদার শহরাঞ্চলে চাকরি ও ব্যবসা এই দুটি প্রধান হয়ে ওঠে; অবশিষ্ট অন্যান্য জীবিকাগুলিতে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যার অনুপাতিক বন্টন ভীষণই কম। মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম দিকে মুখ্য জীবিকা ছিল চাকরি; এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গেও কিছু মানুষ যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী দশকগুলিতে এই জেলার শহর অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে ব্যবসার প্রতি একটি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত বিভিন্ন চাকরি ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য হারে ব্যবসার দিকে চলে আসার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত উদ্বাস্তুর সংখ্যা, বিভিন্ন চাকরিতে নিযুক্ত উদ্বাস্তু সংখ্যাকেও ছাপিয়ে যায় যেখানে তার পূর্ববর্তী দশকেই ৪০ শতাংশ মানুষ চাকরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্পষ্টত যা লাভজনক ব্যবসার প্রতি মুর্শিদাবাদের শহরবাসী উদ্বাস্তুদের আগ্রহ এবং একই সঙ্গে চাকরির প্রতি অনীহাকে প্রকাশ করে। শুধু ব্যবসাই নয়; মালদা জেলার বিপরীতে মুর্শিদাবাদ জেলার শহর অঞ্চলের উদ্বাস্তুদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ কৃষিকাজের দিকে চলে যান। প্রথমদিকের শহরে কৃষিজীবী উদ্বাস্তু সংখ্যা কম হলেও ১৯৬১-১৯৭১-এর মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্টোদিকে শেষের দশকে মুর্শিদাবাদে শহরাঞ্চলে মৎস্যজীবীদের সংখ্যা দ্রুত হারে কমার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেখানে মালদা জেলায় শহরাঞ্চলে সেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটের উপর মুর্শিদাবাদ জেলার শহরাঞ্চলে মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন চাকরির পাশাপাশি কৃষিকাজের বিভিন্ন শিল্পেও (গার্হস্থ্য শিল্প, অন্যান্য উৎপাদন শিল্প) উদ্বাস্তুদের বন্টন লক্ষ্য করা যায়।

মোটের ওপর উপরে উল্লেখিত দুটি ক্ষেত্রে মালদা জেলায় উদ্বাস্তুরা গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজ ও শহরাঞ্চলে চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে এককভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং এই জেলার উদ্বাস্তুরা উক্ত ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিলেন। এর বিপরীতে মুর্শিদাবাদ জেলায় উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলির প্রাধান্য থাকলেও গ্রাম ও শহরাঞ্চলের উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন পেশায় বিকেন্দ্রীকরণও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে, এর একটি সাধারন ব্যাখ্যা অন্তর্নিহিত আছে। সারণি-১৬-তে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পেশায় নিযুক্ত উদ্বাস্তু জনসংখ্যার দিকে তাকালে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। যেখানে মালদা জেলায় উক্ত পেশায় ৬ শতাংশ উদ্বাস্তু কর্মী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন সেখানে মুর্শিদাবাদ জেলায় সেই সংখ্যাটি ছিল ১৬ শতাংশেরও কিছু বেশি। অর্থাৎ মালদায় যেখানে ১৭ জনের মধ্যে একজন উদ্বাস্তু বংশানুক্রমিক পেশার সঙ্গে যুক্তছিলেন, সেখানে মুর্শিদাবাদে প্রতি ৬ জন উদ্বাস্তুর মধ্যে একজন বংশানুক্রমিক পেশার সঙ্গে যুক্তছিলেন। এর অর্থ, মুর্শিদাবাদের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের একটা বড় অংশ বংশানুক্রমিক পেশায়

নিযুক্ত ছিলেন, যা মালদা জেলার ক্ষেত্রে ঘটেনি। এদের মধ্যে প্রথমে ছিলেন মৎস্যজীবীরা, এদের নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে ছিলেন কংস বনিক, পিতলের দ্রব্য নির্মাতা, স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্রব্যের কারিগর, বাঁশের কাজ, মাটির কাজ, পঙ্খের কাজ ইত্যাদি সঙ্গে জড়িত কারিগররা, শঙ্খ-খোল নির্মিত জিনিস প্রস্তুতকারী, তাঁত, রেশম বস্ত্র প্রস্তুতকারী, দর্জি ও অন্যান্যরা। কারণ রেশম বস্ত্র, কাঁসা, পিতল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বিদরির কাজ, হাতির দাঁতের কাজ, মাটি, বাঁশ প্রভৃতির কাজে মধ্যযুগ থেকেই মুর্শিদাবাদ সমৃদ্ধ।[99] এছাড়াও পরবর্তীকালে পঙ্খ, শঙ্খ-খোল নির্মিত দ্রব্যের জন্যও এই জেলা সুখ্যাতি লাভ করেছিল।[100] এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হয়ে কিভাবে সমৃদ্ধি এনেছিলেন তা পরবর্তী অধ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[101] মুর্শিদাবাদে এই সমস্ত বংশানুক্রমিক পেশার বিভিন্নতার কারণেই এই জেলায় উদ্বাস্তুদের কাছে বিকল্পগুলি ছিল, যা মালদা জেলার ক্ষেত্রে ঘটেনি। মালদা জেলার ক্ষেত্রে পিতল বা কাঁসার কাজ, তাঁতের কাজ প্রচলিত থাকলেও তার প্রসার মুর্শিদাবাদ জেলার তুলনায় কম ছিল, এবং যেসব অঞ্চলে এই সমস্ত কাজগুলি হত দেশভাগের পরে বেশিরভাগ সেইসব অঞ্চলগুলি বেশিরভাগই পূর্ববঙ্গে পড়ে যায়। মালদা জেলায় রেশম পোকা চাষ এবং রেশম তন্তু উৎপাদনই বেশি হত রেশম বস্ত্র প্রস্তুত করা সেরকম হত না। রেশম বস্ত্র প্রস্তুত করা হতো মুর্শিদাবাদে, সেক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ ও মালদা থেকে কাঁচা রেশম আমদানি করত।[102] ফলে পূর্ববঙ্গের রেশম বস্ত্র উৎপাদনকারীরা, মালদার তুলনায় মুর্শিদাবাদে আসতেই বেশি পছন্দ করেছিলেন।

কর্মক্ষেত্রে উদ্বাস্তু নারীরা: বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হল গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ। গ্রামাঞ্চলের প্রায় সমস্ত পেশাতেই মহিলাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্মাণ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যতিক্রম ছিল। পরবর্তী দশকগুলিতে এই দুই জেলার গ্রামাঞ্চলে কর্মক্ষেত্রে মহিলা কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ১৯৬১ এবং ১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী; মালদা জেলায় গ্রামাঞ্চলে প্রতি ১০০ জন পুরুষ কর্মী পিছু মহিলা কর্মীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ অর্থাৎ ৩ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই বৃদ্ধি নজর কাড়ার মতো। ১৯৬১-১৯৭১ সময়কালে মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রতি ১০০ জন পুরুষ কর্মী পিছু মহিলা কর্মীর সংখ্যা যথাক্রমে ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৪ শতাংশে উন্নীত হয়, অর্থাৎ ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি। মালদা জেলাতে গ্রামাঞ্চলে কৃষিশ্রমিক হিসেবে, ব্যবসা ক্ষেত্র ও গার্হস্থ্য শিল্পে, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি চাকরিতে মহিলা কর্মীর অভূতপূর্ব সংখ্যা বৃদ্ধি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬১-১৯৭১ এই এক দশক কালে কৃষিশ্রমিকে ১৭ শতাংশ, গার্হস্থ্য শিল্পে ২৭ শতাংশ, ব্যবসা ক্ষেত্রে ১ শতাংশ ও বিভিন্ন চাকরিতে ৪৯ শতাংশ মহিলা কর্মীর বৃদ্ধি ঘটেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মালদা জেলার গ্রামাঞ্চলে গার্হস্থ্য শিল্পে মোট কর্মীর সংখ্যা উল্লিখিত দশকে প্রায় ৬

[99] শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাঙ্গলা,* (কলকাতাঃ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, আশ্বিন ১৩৩০), পৃ. ৩০৩-৫৩।

[100] *Report of Conch-Shell Industry A Type-Study,* Govt. of West Bengal Press, Alipore, 1963, pp. 1-2.

[101] পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২৫১-২৫৬।

[102] *Murshidabad Gazetteers, 1979,* p. 109.

শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, এই হ্রাসের কারণ পুরুষদের এই কাজের প্রতি অনাগ্রহ। কারণ উল্টোদিকে মহিলাদের এই শিল্পের দিকে বেশি আকৃষ্ট হতে দেখা যাচ্ছে। পঞ্চাশের দশকে মালদা জেলায়, যেখানে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী পুরুষের তুলনায় অর্ধেকের কিছু বেশি মহিলা গার্হস্থ্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেখানে ষাটের দশকে গার্হস্থ্য শিল্পে যুক্ত মহিলা কর্মীর সংখ্যা পুরুষের প্রায় দ্বিগুনেরও বেশি।

সারণিঃ-২৩ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিভিন্ন জীবিকায় নারী-পুরুষ অনুপাত

জেলা	**মালদা**				**মুর্শিদাবাদ**			
সাল	**১৯৫১-১৯৬১**		**১৯৬১-১৯৭১**		**১৯৫১-১৯৬১**		**১৯৬১-১৯৭১**	
লিঙ্গ	**মহিলা**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**পুরুষ**
কৃষিশ্রমিক	১৬%	৮৪%	৩৩%	৬৭%	১৬%	৮৪%	৩৫%	৬৫%
গার্হস্থ্য শিল্প	৪১%	৫৯%	৬৮%	৩২%	৩৬%	৬৪%	৩৫%	৬৫%
ব্যবসা-বাণিজ্য	১৩%	৮৭%	১৪%	৮৬%	৭%	৯৩%	১%	৯৯%
অন্যান্য চাকরি	১০%	৯০%	৫৯%	৪১%	৯%	৯১%	৩৩%	৬৭%

একই চিত্র লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রেও। যেখানে মালদার গ্রামাঞ্চলে মোট চাকরিজীবীর সংখ্যা ৭ শতাংশ হ্রাস পাচ্ছে সেখানে মহিলা কর্মী অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে (৪৯%)। আগের দশকে যেখানে মহিলাদের তুলনায় প্রায় ১০গুন বেশি পুরুষ বিভিন্ন চাকরি ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল, সেখানে পরের দশকে দেখা যাচ্ছে চাকরিরতা মহিলার সংখ্যা পুরুষের প্রায় দেড়গুণ বেশি। ১৯৬১ সালের জনগণনাতে দেখা যাচ্ছে নারী কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা পুরুষ কৃষিশ্রমিকের এক পঞ্চমাংশের কিছু বেশি, ১৯৭১-এ যা বেড়ে প্রায় অর্ধাংশ হয়ে গেছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে ১৯৬১-এর জনগণনাতে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা যেখানে নারীদের ১৪গুনের বেশি, ১৯৭১-এর জনগণনাতে তা মাত্র ৬গুন বেশি (দ্রষ্টব্য সারণি-১৭ ও ১৮) মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা ক্ষেত্র ও গার্হস্থ্য শিল্পে মহিলা কর্মীর সংখ্যা না বাড়লেও কৃষিশ্রমিক হিসেবে এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে উদ্বাস্তু মহিলাদের নিযুক্তি প্রশংসার দাবি রাখে। ১৯৬১-১৯৭১ এই কালপর্বে কৃষিশ্রমিক হিসেবে এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিযুক্ত উদ্বাস্তু মহিলা কর্মী বৃদ্ধি যথাক্রমে ১৯ শতাংশ ও ২৪ শতাংশ। ১৯৬১-তে মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে যেখানে এই দুই পেশায় মহিলা কর্মীর সংখ্যা পুরুষ কর্মীর যথাক্রমে প্রায় এক পঞ্চমাংশ ও এক দশমাংশ; সেখানে ১৯৭১ সালে মহিলা কর্মীসংখ্যা পুরুষ কর্মীর অর্ধেকেরও বেশি। এই জেলাতে গ্রামাঞ্চলে যেখানে মোট চাকরিজীবীর সংখ্যা ৭ শতাংশ হ্রাস পাচ্ছে সেখানে উদ্বাস্তু মহিলাদের চাকরিতে যোগদান উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫১

ও ১৯৫৫ সালের তথ্যে মহিলাদের সম্পর্কে আলাদা করে পরিসংখ্যান না থাকায় শুধুমাত্র ১৯৬১ এবং ১৯৭১ সালের জনগণনা তুলনা করা হল।

সারণিঃ-২৪ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার শহরাঞ্চলে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিভিন্ন জীবিকায় নারী-পুরুষ অনুপাত

জেলা	**মালদা**				**মুর্শিদাবাদ**			
সাল	**১৯৫১-১৯৬১**		**১৯৬১-১৯৭১**		**১৯৫১-১৯৬১**		**১৯৬১-১৯৭১**	
লিঙ্গ	**মহিলা**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**পুরুষ**
গার্হস্থ্য শিল্প	৩৩%	৬৭%	৫%	৯৫%	৩৩%	৬৭%	২৬%	৭৪%
অন্যান্য উৎপাদন শিল্প	৬%	৯৪%	২%	৯৮%	৩%	৯৭%	৫%	৯৫%
ব্যবসা-বাণিজ্য	২%	৯৮%	২%	৯৮%	২%	৯৮%	১%	৯৯%
অন্যান্য চাকরি	১২%	৮৮%	১৭%	৮৩%	১৮%	৮২%	২১%	৭৯%

শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে, এই দুই জেলার মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে তা হল মহিলারা শহরাঞ্চলে সমস্ত পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শহরের ক্ষেত্রে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে সেটা হল মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে নিযুক্তিতে অনীহা। শহরাঞ্চলের সমস্ত মহিলা কর্মচারী কতিপয় পেশার মধ্যে নিজেদের নিবদ্ধ রেখেছিলেন। দুই জেলাতেই প্রধানত গার্হস্থ্য শিল্প, বিভিন্ন উৎপাদন শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতেই মহিলাদের দেখা যেত। শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদে কৃষিকার্যে মহিলারাও অংশগ্রহণ করতেন। প্রথম দিকে এই সমস্ত পেশায় মহিলাদের দেখা গেলেও পরবর্তীকালে কেবলমাত্র বিভিন্ন চাকরিতে ও গার্হস্থ্য শিল্পের মহিলারা কেন্দ্রীভূত হয়ে যান। কেবলমাত্র চাকরি ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ৫০-এর দশকে যেখানে পুরুষদের অর্ধেক সংখ্যক মহিলা গার্হস্থ্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ষাটের দশকের সেই সংখ্যাটা হয়ে দাঁড়ায় ১৭ ভাগের এক ভাগ। একই রকম ভাবে শহরাঞ্চলের অন্যান্য উৎপাদন শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ পরবর্তী দশকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে যায়। শুধু মাত্র পুরুষের তুলনায় চাকরিরতা মহিলার সংখ্যা পরবর্তী দশকে অল্প হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই বৃদ্ধি যথাক্রমে ৫ শতাংশ ও ৩ শতাংশ। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায়, শহরাঞ্চলে প্রতি ১০০ জন পুরুষ কর্মী পিছু যথাক্রমে ৯ জন ও ১০ জন মহিলা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্তছিলেন। কর্মে নিযুক্তির প্রতি গ্রাম ও শহরের নারীদের এই বিপরীত মনোভাব যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে গ্রামাঞ্চলে পরিবারকে পোষন করার মতো যথেষ্ট আয় না হওয়ার জন্য মহিলারা বিভিন্নভাবে নিজেদেরকে কর্মে নিয়োজিত করে উপরি-উপার্জনের মাধ্যম সংসারের হাল ধরেন। শহরাঞ্চলেও প্রথম দিকে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য

মহিলারা চার পাঁচ রকম কর্ম ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে এলে বাড়ির বাইরে সম্মানজনক চাকরি ও গৃহের মধ্যে গার্হস্থ্য শিল্প এই দুইয়ের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে নেন। শহরাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে চাকরি এবং অন্যান্য কর্মক্ষেত্র থেকে বড় একটি অংশ লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে চলে আসছে। কাজেই অপেক্ষাকৃত সচ্ছলভাবে জীবন যাপনের উপায় থাকায় মহিলারা কাজে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

উপসংহারঃ উদ্বাস্তুদের আসার সময়ের ভিত্তিতে তাদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ও বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করেছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের চলে আসাকে নিরুৎসাহিত করতে পরবর্তীকালে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। প্রাথমিক ত্রানের পর পুনর্বাসন কেবলমাত্র সেই সমস্ত উদ্বাস্তুরাই পাবেন যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আশ্রয় নিতে সম্মত হবেন,- এই শর্তই তা প্রমাণ করে। ক্যাম্প-বহির্ভূত উদ্বাস্তু সংখ্যা থেকে বোঝা যায় বেশিরভাগ উদ্বাস্তুর সরকারি ত্রাণ শিবিরগুলিতে থাকতে অস্বীকার করেছিলেন। এস্টিমেট কমিটির রিপোর্ট ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয় সরকারি ত্রাণ শিবিরগুলির দুরবস্থার কথা। এমতাবস্থায় যাদের আর কোনো উপায়ান্তর ছিল না, যারা সরকারি সাহায্য ছাড়া কোনভাবেই কোনো কিছু করে উঠতে পারছিলেন না; কেবলমাত্র তারাই বাধ্য হয়ে সরকারি ত্রাণ শিবিরগুলির আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন। যারা চাকরিতে অপশন দিয়ে চলে এসেছিলেন তাদের কথা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট বহু উদ্বাস্তু পরিবারগুলি আত্মমর্যাদাবোধ থেকে সরকারি ত্রাণ শিবিরগুলিতে থাকতে বা ডোলের জন্য লাইনে দাঁড়াতে পারেননি। অনেকে আবার সরকারি ত্রাণ শিবিরগুলিতে প্রাথমিকভাবে আশ্রয়গ্রহণ করলেও বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় ত্রাণ শিবিরগুলো ছেড়ে চলে আসেন। বিল কলোনির শংকর বিশ্বাসের কথায় যেমন "নর্থ-ফরিদপুরের লোকেরা কখনো ক্যাম্পে থাকে নি"। যেখান থেকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকেদের আত্মাভিমান স্পষ্ট ঝরে পড়ে। তবে যারা ওপার বাংলায় কৃষক বা জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন তারা প্রায় সবাই সরকারি সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

এই দুই জেলায় যেখানে যেখানে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন তাদের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তা হল শহরকেন্দ্রিক মনোভাব, যার জন্য তারা জেলার সদর শহর বা অন্যান্য শহরগুলিকে বেছে নিয়েছিলেন এবং গ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে সীমান্তের কাছাকাছি গ্রামগুলি বেছে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মালদা জেলার ক্ষেত্রে সীমান্তের নিকটবর্তী গ্রামগুলি (হাবিবপুর, বামনগোলা, মালদা, ইংলিশ বাজার, গাজোল) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থানার অন্তর্গত; এর থেকে মনে হতে পারে হিন্দু বেষ্টিত অঞ্চলে তাদের থাকার একটা প্রবণতা ছিল কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানার (রানীনগর, ডোমকল, সুতি, ভগবানগোলা, লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ) অন্তর্গত সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির একই অবস্থা। এর দুটি কারণ হতে পারে; এক, সীমানার নৈকট্য, কারণ যারা পাসপোর্ট প্রথা চালু হওয়ার আগে বা পরে,

পূর্ব বাংলায় ফিরে যাওয়ার মানসিকতা রেখেছিলেন তাদের ক্ষেত্রে এটা সুবিধাজনক হবে। সাক্ষাৎকারেও দেখা গেছে ভিটের টান থেকে তারা এক বা একাধিকবার ওই দেশে ফিরে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয়ত, জেলা দুটির পূর্বাঞ্চলীয় ভৌগোলিক পরিবেশ পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশের সাদৃশ্য বেশি ও কৃষিতে সমৃদ্ধ এবং জেলা দুটির পশ্চিমাঞ্চলীয় ভৌগোলিক পরিবেশ তা থেকে কিছুটা ভিন্ন। কৃষি প্রধান, মৎস্যজীবি উদ্বাস্তারা তাদের জীবিকা নির্বাহের সুবিধার্থে তাই পরিচিত পরিবেশকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তারা অনেকেই পূর্বপুরুষের পেশা ধরে রাখতে পেরেছিলেন। স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভের সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার লব্ধ তথ্য প্রমাণ করে তবে মৎস্যজীবিদের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখা যায়, তা হল জলাশয়ের অভাব। যার কারণে অনেক মৎস্যজীবী তাদের পূর্ব পেশা ছেড়ে অন্যান্য পেশায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। উদ্বাস্তুদের পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে দশকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা হল কৃষি কাজের প্রতি আগ্রহ। গ্রাম এবং শহর উভয় ক্ষেত্রেই। পূর্ব বাংলার যারা মূলত কৃষক ছিলেন তারা প্রথমেই এই দুই জেলায় এসে কৃষিকাজ শুরু করতে পারেননি কারণ জমির অভাব। প্রাথমিকভাবে তারা মুথা ঘাস বিক্রি করে, জীবিকা নির্বাহ করতেন পরে নিজেদের কিছুটা অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে জমি কিনে চাষাবাদ শুরু করেন, যার ফলে পরবর্তীকালে কৃষিজীবীদের সংখ্যা বাড়তে দেখা যায়। আবার এই দুই জেলায় আগে থেকেই বিদ্যমান বাঙালি ও বিশেষত অবাঙালি শিল্পপতিদের ব্যবসার পরিমন্ডল ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তী দশকগুলিতে উদ্বাস্তু মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে নিযুক্তির হার যেভাবে বেড়েছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাব।

ভূমিকাঃ

দেশভাগের পর উদ্বাস্তু আগমনের ফলে মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় উদ্বাস্তু আগমন কম হলেও, হঠাৎ করে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দুটি জেলাতেও প্রাথমিকভাবে বসবাস ও জীবিকা নির্ধারণের জন্য পর্যাপ্ত স্থানসংকুলানের অভাব দেখা গিয়েছিল। খাদ্য, পানীয় জল, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই সংকট দেখা যায়। এর সঙ্গে আবার ছিল বিভিন্ন জলবাহিত, বায়ুবাহিত, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব। রাস্তাঘাটের দুর্দশা, খাদ্যাভাব, স্থানাভাব, জমির অভাব মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার সমাজ, প্রশাসনিক কাজকর্ম ও অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছিল। মালদা জেলায় আসা হাজার হাজার শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজগুলি দীর্ঘদিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল।[1] মালদা পৌরসভার রেকর্ড থেকে পাওয়া যায় মালদার ইংলিশবাজার এবং তার আশপাশের সদরঘাট, ফুলবাড়ি, বাঁশবাড়ি, সিংহতলা, পিরোজপুর, রামকৃষ্ণপল্লী, হায়দারপুর প্রভৃতি জায়গায় উদ্বাস্তুরা বসতি স্থাপন শুরু করেছিলেন; বিশেষ করে ইংলিশ বাজার টাউনে অতিরিক্ত উদ্বাস্তুদের চাপে শহরের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুব খারাপ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।[2]

একই চিত্র মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরেও দেখা গিয়েছিল। পৌরসভার দীর্ঘদিনের কমিশনার বিজয়কুমার গুপ্ত বলেছেন, উদ্বাস্তু আগমনে বহরমপুর পৌরসভার পরিষেবা প্রদানে তাদের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। তার কথায়, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সময়কালে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের চাপ বহরমপুর শহর ও তার পৌরসভার ওপর অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই আঘাত হানে। "অসংখ্য উদ্বাস্তু এই শহরের আনাচে-কানাচে এবং এই শহরের প্রান্তদেশে এসে বসতি স্থাপন করে পৌরসভার পরিচালকদের বিশেষভাবে বিব্রত করে তোলে। কারণ বহরমপুর পৌর এলাকার রেশনের আওতার মধ্যে ছিল মানকুমারী কলোনি, গোরা বাজারের জমিদারি অঞ্চলের দক্ষিণ অংশ, চালতিয়া মৌজা, অযোধ্যানগর, হরিদাসমাটির কিছু অংশ এবং মণীন্দ্রনগর।"[3] বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রয়াত অর্পণাকিঙ্কর ভট্টাচার্য এক প্রবন্ধে দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্তু আগমনে বহরমপুর পৌর এলাকার পরিবর্তন ও বিক্ষোভের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন,

---

[1] রীতা রায়, "স্বাধীনতা ও দেশভাগঃ মালদা জেলায় তার প্রতিফলন", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহার্নব, বিষয়ঃ দেশভাগের যন্ত্রনা,* (বহরমপুরঃ দশম বর্ষ-২০২১) পৃ. ৮৩।

[2] Ashim Kumar Sarkar, *Social, Economic and Political Transition of a Bengal District: Malda 1876-1953,* Thesis Submitted on 2010 for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of History at University of North Bengal, p. 362.

[3] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব ও দেশভাগের প্রভাব,* (বহরমপুর: আকাশ, ২০১৮), পৃ. ৪১।

অপরিকল্পিতভাবে জনবসতি গড়ে ওঠার ফলে পৌরসভা যেন খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। শরণার্থীরা মাছমারা বিল, বিষ্ণুপুর বিল, চালতিয়া বিলের শুকিয়ে আসা অংশে, এমনকি অল্প জল থাকা অংশেও ঘর বাড়ি তুলে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। ফলে বেশি বৃষ্টি হলে জল নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হওয়া, বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়া, গঙ্গার জলস্ফীতি ঘটলে বন্যা-কবলিত হওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছিল।[4] উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে শহরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক চাপ বেড়ে যায়। তৈরি হয় চাকরির সংকটও।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির মতো এই দুটি জেলাতেও উদ্বাস্তু আগমনে প্রাথমিকভাবে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, পরবর্তীকালে আবার তাদের হাত ধরেই ছোট ছোট গ্রামগুলি বড় গ্রামে পরিণত হতে থাকে, কম জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলি বেশি জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হতে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে শুরু হয় গ্রামের বিকাশ, নগরায়ন। এই দুই জেলার গ্রাম ও শহরে বহুমুখী পেশার উদ্ভব শুরু হতে থাকে, কিছু ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের পূর্ব বাংলার পেশার পরিবর্তন ঘটতে থাকে, আবার কিছু ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা এই দুই জেলায় তাদের পূর্ব পেশাগুলিতে নিযুক্ত হতে থাকেন; ক্ষুদ্র, কুটির শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে। রাস্তা-ঘাট, বাজার-হাট প্রভৃতিতে পরিবর্তন আসে; কিছু নতুন করে গড়ে উঠতে থাকে, কিছু সম্প্রসারিত হতে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তন চোখে পড়তে থাকে। শরণার্থীদের হাত ধরে দুই বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্প, সাহিত্য, বিনোদন ইত্যাদির আদান-প্রদান চলতে থাকে। তবে একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষণীয় এই দুই জেলায় উদ্বাস্তু আগমন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় অনেকটাই কম ছিল। যার কারণে ২৪পরগনা, নদিয়া, কলকাতা, কোচবিহার ইত্যাদি জেলায় উদ্বাস্তুদের আনুপাতিক বন্টন জেলাগুলির ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে তা অতটা চোখে পড়ার মতো নয়। ওই সমস্ত জেলাগুলিতে পরিবর্তনগুলি যতটা প্রকট হয়ে উঠেছিল, এই দুই জেলার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মাত্রা ছিল কম। কাজেই গ্রাম-শহর, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত বিরাট পার্থক্য যা অন্যান্য উদ্বাস্তুবহুল জেলাগুলির ক্ষেত্রে সহজেই চোখে পড়ে; এই দুই জেলার ক্ষেত্রে ততটা আশা করা সমীচীন হবে না। তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলি স্বাভাবিকভাবেই নজর কাড়ে তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র উদ্বাস্তু আগমন মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উপর কি প্রভাব ফেলেছিল সেটাই আলোচনার একমাত্র বিষয়বস্তু নয়; বরং এই দুই জেলার কিছু বিশেষত্ব যা উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনেও পরিবর্তন এনেছিল বা প্রভাব ফেলেছিল সেগুলিও তুলে ধরা হয়েছে।

---

[4] অপর্ণাকিঙ্কর ভট্টাচার্য, "শহর বহরমপুরের ক্রমবিকাশ-একটি স্মৃতিচারণ", বিষানকুমার গুপ্তা (সম্পা), *ইতিহাসের আলোকে বহরমপুর পৌরসভা,* (বহরমপুরঃ বহরমপুর পৌরসভা), ২০০৭, পৃ-৪২।

৫.১ মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের আর্থ-সামাজিক প্রভাবঃ

গ্রামের প্রসারঃ ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত মালদা জেলার সীমান্তবর্তী কিছু থানার (যেখানে উদ্বাস্তুরা বেশিরভাগ আশ্রয় নেয়) অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামের জনসংখ্যার পরিবর্তনের দিকে নজর দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়-

সারণি-১ মালদা জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির জনসংখ্যার দশকীয় পরিবর্তন

থানা	**অঞ্চল**	**১৯৫১**	**১৯৬১**	**১৯৭১**
হাবিবপুর	বুলবুলচন্ডি	৭৫৩	১০৬৫	১৪৯৩
	আইহো	২৩৪২	২৭৭৬	৩০০৪
মালদা	সাহাপুর	১০৬৬	১৮৫২	৩১২৫
	মঙ্গলবাড়ি	৭৭৭	১৪৬৫	২৮০৬
ইংলিশ বাজার	ইংলিশ বাজার টাউন	৩০৬৬৩	৪৫৯০০	৬১৩৩৫
	মাহাদিপুর	২৬৮৪	৩০৪৯	৪০৪৬
	যদুপুর (উঃ ও দঃ)	১১১৩	১৮৭৯	২৭৩৩
	গোপালগঞ্জ	৪০৭০	৪৮২১	৬০৩১

(West Bengal District Handbook, *Malda, Census-1951,* pp. 83-118; West Bengal District Handbook, *Malda, Census-1971,* pp. 1-23.)

এখানে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলবাড়িতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় চার গুণ। সাহাপুরে তিনগুণ, বুলবুলচন্ডি, ইংলিশ বাজার, মহাদিপুরে দ্বিগুণ করে জনসংখ্যা বেড়েছিল। বাকি সব গ্রামগুলিতেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। রণবীর সমাদ্দার তাঁর *মার্জিনাল নেশান* গ্রন্থে দেখিয়েছেন স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমনে মালদার বিভিন্ন গ্রামগুলি কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[5] একইভাবে মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন থানার অন্তর্গত নির্বাচিত কিছু গ্রাম, যেখানে উদ্বাস্তুরা বেশি সংখ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন ও বসতি স্থাপন করেছিলেন; বিভিন্ন দশকে সেখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য করলেও একই চিত্র ধরা পড়ে।

[5] Ranabir Samaddar, *The Marginal Nation: Transborder Migration from Bangladesh to West Bengal* (New Delhi: Sage Publications, 1999), pp. 172-179.

সারণি-২ মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির জনসংখ্যার দশকীয় পরিবর্তন

থানা	গ্রাম	সাল		
		১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
জলঙ্গি	বারোমাসিয়া	৮২৪	১৯০১	২৪৬৫
	পরাশপুর	৯১	৩১২	৩৬৭
	সাদিখানদিয়ার	১২২১	১৯২৬	২৩৮৩
	উদয় নগর	৪১৬	৮৫৪	৯৪৭
	নরসিংহপুর	৯৭৭	১৬১৬	১৯০৮
	দেবীপুর	৩৮১৬	৬৪৬১	৬৫০৩
বহরমপুর সদর	বাঞ্জেটিয়া	৯৪৯	১৮৩০	২৫৫০
	চালতিয়া	২৪৭৫	৪১৬৯	৫১৯৬
	হরিদাসমাটি	১৫০৬	২২০৮	৩১৭৬
	অযোধ্যা নগর	৮৭২	২১৭৩	২৫১১
	নিয়াল্লিশ পাড়া	৩৮২	৬৩৬	৭৫৯
বেলডাঙা	সরুলিয়া	১৬১০	২৬৭৭	৩৫২৩
	বড়ুয়া	১৭১৯	২৬৩৯	৩৫৫১
ডোমকল	ভাতশালা	৯১৭	১৫১০	২০৩৮
	হরিশংকরপুর	৫৫০	৮৬৯	১৩৫৭
লালগোলা	কালমেঘা	১৮৯৩	২৫৬১	৩৪২৮
নওদা	মধুপুর	৪০৮১	৬২৩২	৮২৭৩

জিয়াগঞ্জ	কুসুমখোলা	১০০	৪৬৫	৫৭১
কান্দি	মহলন্দী	৪৫৭৪	৫৩০১	৬৭৯৪
হরিহরপাড়া	খিদিরপুর	১৯৯৪	২৯৩৩	৩৭৬১
সামসেরগঞ্জ	ধুসুরি পাড়া	৩১২১	৪৪১৯	৭০৫৯
রঘুনাথগঞ্জ	জোতকমল	১৭০৮	২৩৬৬	২৮২৭
রানীনগর	নবীপুর	২৫২৭	৩৭৪৯	৪১১০

(West Bengal District Handbook, *Murshidabad, Census-1951,* pp. 198-238; West Bengal District Handbook, *Murshidabad, Census-1971,* pp. 3-31.)

১৯৫১ থেকে **১৯৭১** পর্যন্ত সময়কালে বেশিরভাগ গ্রামের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা দ্বিগুণ বা আড়াই গুণ হয়ে গিয়েছিল। এরমধ্যে জলঙ্গি থানার বারোমাসিয়া, বহরমপুর সদর থানার নিয়াল্লিশ পাড়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আগের তিনগুণ হয়েছিল, জলঙ্গি থানার পরাশপুরে এবং জিয়াগঞ্জ থানার কুসুমখোলা গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আগের তুলনায় যথাক্রমে চার গুণ ও পাঁচ গুণ হয়েছিল। এই সমস্ত গ্রামগুলিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হলেও একসঙ্গে এত জন উদ্বাস্তু এসে আশ্রয় নেওয়ায় এই বৃদ্ধি অবশ্যই ত্বরান্বিত হয়। এইভাবেই মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ছোট ছোট গ্রামগুলি উদ্বাস্তুদের হাত ধরে বড় বড় গ্রামে পরিণত হতে শুরু করে। শুধু তাই নয়, বিজন প্রান্তর, ফাঁকা মাঠ, ঝোপ-জঙ্গল, নদীর চরগুলিতেও মানুষের আবাস, নতুন নতুন জনপদ গড়ে উঠতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মালদা জেলায় পারদেওনাপুর চরে বর্তমানে যে উদ্বাস্তু জনবসতি গড়ে উঠেছে তার সূচনা করেছিলেন চরের বাসিন্দা উদ্বাস্তু শান্তিরঞ্জন সরকারের জ্যাঠামশাই। শ্রীযুক্ত সরকারের মতে "এই চরটি আমার জ্যাঠামশাইয়ের আবিষ্কার। জ্যাঠামশাই ঘুরতে ঘুরতে এই জায়গায় এসেছিলেন, প্রথমে দু-চারজনকে নিয়ে থাকতে শুরু করেন। পরে আরো কয়েকজনকে নিয়ে আসেন, এইভাবে এই চরে জনবসতি গড়ে ওঠে"।[6]

নগরায়নঃ উদ্বাস্তু আগমন এই দুই জেলার নগরায়নে সাহায্য করেছিল। এই দুই জেলার শহরগুলির জনসংখ্যার পরিবর্তনের দিকে নজর দিলে বিষয়টি বোধগম্য হয় (দ্রষ্টব্য সারণি-৩)। উনিশ শতকের বিভিন্ন দশকের মধ্যে **১৯৪৭**-পরবর্তী দশকগুলিতে এই দুই জেলার বিভিন্ন শহরের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষত মালদার ইংরেজ বাজার পৌরসভা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর পৌরসভার ওপর এই বিপুল জনসংখ্যার চাপ ছিল সর্বাধিক। কারণ, এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুরা, জেলা সদর হিসেবে এই দুটি শহরের

[6] সাক্ষাৎকারঃ- শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, বয়স-৭০, পেশা- কৃষক ও সক্রিয় বামকর্মী, মালদা, তারিখঃ- ২৯/১০/২০২২।

প্রতি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৪১-১৯৭১-এর মধ্যে ইংলিশ বাজার পৌরসভার জনসংখ্যা প্রায় তিনগুন হয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র ১৯৫১-১৯৭১ এই দুই দশকের মধ্যে এই শহরের জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল।

সারণি-৩ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার শহরগুলির জনসংখ্যার দশকীয় পরিবর্তন

জেলা	শহর/সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
মালদা	ইংলিশ বাজার	১৩৬৬৭	১৪৩২২	১৪০৫৭	১৬৯০৭	২৩৩৩৩	৩০৬৬৩	৪৫৯০০	৬১৩৩৫
	পুরাতন মালদা	৩৭৩৪	৩৭৫০	৩১৪৫	২৭৭৯	৩৮৪৫	৪৪৯৮	৪৮৮৫	৬৬৯১
মুর্শিদাবাদ	ঔরঙ্গাবাদ	-	-	-	-	-	-	১২৭৮৩	১৬৩৯২
	বহরমপুর	২৪৩৯৭	২৬১৪৩	২৬৬৭০	২৭৪০৩	৪১৫৫৮	৫৫৬১৩	৬২৩১৭	৭২৬০৫
	কাশিমবাজার	-	-	-	-	-	-	-	৬৩০৪
	বেলডাঙ্গা	-	-	৮৩৫৪	৯৭৪৫	৬০০২	-	৭৮৪১	৯৭৯৯
	ধুলিয়ান	-	৮২৯৮	৮৪৩৫	৯৭৬৭	১২৬১৩	১৫৯৩৫	১৭২২০	২২০৬৮
	ফারাক্কা টাউনশিপ	-	-	-	-	-	-	-	৮০৯৬
	জঙ্গিপুর	১০৯২১	১১৪০৮	১০৭৩৯	১২৭৯৬	১৬৯০৩	১৮২৫৫	২৪২০১	২৯৮৭২
	জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	১৩৩৮৫	১২৩২৭	১১২৩১	১০৯৯৮	১৫২২৩	১৯১৪৮	২৩৬৭৫	২৬৫৩৫
	কান্দি	১২০৩৭	১২৬৩৮	১১৭৮৭	১২৬১৬	১৬৬৫২	১৫২২০	১৯৭৮০	২৬২২৫
	লালগোলা	-	-	-	-	-	-	১০৬৫৭	১৩৪১৯
	মুর্শিদাবাদ	১৫১৬৮	১২৬৬৯	১০৬৬৯	৯৪৮৩	১১৪৯৮	১০৭৫৬	১৬৯৯০	১৭১১০

(*Malda, Census-1951,* pp. 26-27; *Murshidabad, Census-1971*, pp. 34-35.)

সারণি-৩ অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর পৌরসভায় এই সময় জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ছিল ৩০ হাজার। বহরমপুর শহরের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে উদ্বাস্তুরা বসতি স্থাপন শুরু করেছিলেন। পূর্ব দিকে ঝোপ-জঙ্গল, বাগান ও ফাঁকা মাঠ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বসতিতে ভরে উঠেছিল। 'শহর বহরমপুরের ক্রমবিকাশ' প্রসঙ্গে জানা যায়; "প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্বাস্তু কলোনির তাঁবু, ঘরের চালায় ভরে গিয়েছিল শহরের চারপাশ। বরিশাল কলোনি,

রাজশাহী কলোনি, নবনগর কলোনি ইত্যাদি বস্তিতে শহরের পূর্বদিককে প্রশস্ত করে তুলেছিল। দক্ষিণ দিকে রেল স্টেশন ছাড়িয়ে, বন সাফ করে মানকুমারী কলোনি, স্বর্ণময়ী কলোনী, সুতির মাঠ প্রভৃতি বসতি গড়ে উঠেছিল। গঙ্গার ধারে গড়ে উঠেছিল গান্ধী কলোনী, নেতাজি কলোনি, হঠাৎ কলোনি ইত্যাদি। ১৯৫৩ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন পাস হলে জমিদারের বাসভূমির অনেকটাই সরকার তথা পৌরসভার দখলে চলে যায়; তাতে আরো বেশ কিছু লোকের সুবিধা হয়। মাছমারা বিল, চালতিয়া বিল, বিষ্ণুপুর বিলের শুকিয়ে আসা অংশে বা অল্প জল থাকা অংশেও ঘর-বাড়ি গড়ে তুলে থাকা শুরু করেছিলেন উদ্বাস্তুরা"।[7] এছাড়াও কাশিমবাজার মনীন্দ্রনগর অঞ্চল, পঞ্চাননতলা, চুঁয়াপুর, স্বর্ণময়ী, বাবুলবোনা, মধুপুর, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি অঞ্চলেও উদ্বাস্তু বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়।[8] এগুলির পাশাপাশি প্রতি দশকে শহরের সংখ্যা একটা করে হলেও বেড়েছিল। ১৯৪১ সালে মুর্শিদাবাদে মোট শহরের সংখ্যা ছিল ৭টি, ১৯৫১-তে ৮টি, ১৯৬১-তে ৯টি ও ১৯৭১ সালে ১১টি।

সারণি-৪ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম ও শহরে বিভিন্ন দশকে উদ্বাস্তু জনসংখ্যা। (সংখ্যাগুলি শতাংশ)

উদ্বাস্তু/সাল	মালদা জেলা			মুর্শিদাবাদ জেলা		
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
গ্রামে বসবাসকারী	৮৬.৯৬	৮৪.৬৮	৮০.২৮	৬৬.৭৬	৭২.৯১	৬৫.৫৮
শহরে বসবাসকারী	১৩.০৪	১৫.৩২	১৯.৭২	৩৩.২৪	২৭.০৯	৩৪.৪২

(Malda, Census-1951, p. 79; *Murshidabad, Census-1951,* p. 108; *Malda Census-1961,* p. lxviii; *Murshidabad, Census-1961,* p. 93; *Census of India 1971,* Series-22, West Bengal, part-II-D(i), pp. 39 & 49)

১৯৫১, ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে উদ্বাস্তুদের বন্টনের দিকে নজর দিলে দেখা যায় উদ্বাস্তুরা শহরে থাকাটাই পছন্দ করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৫০-এর দশকের কিছু শহরে বসবাসকারী উদ্বাস্তু গ্রামীন এলাকায় চলে গেলেও পরবর্তী দশকে তারা আবার শহরে ফিরে আসেন। সম্ভবত, শহরে জমির অভাব এবং জমির উচ্চদরের কারণে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু উপার্জনের আশায় গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। গ্রামগুলি আগে থেকেই ঘনজনবসতিপূর্ণ হওয়ায় এবং পরবর্তী দশকে শহরের সংখ্যা (২টি) বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা আবার শহরে বসবাস করতে শুরু করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, জেলার আদি-নিবাসীদের তুলনায় এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে শহরে বাস করার প্রবণতা ছিল অনেক

[7] অপর্ণাকিঙ্কর ভট্টাচার্য, "শহর বহরমপুরের ক্রমবিকাশ, পৃ-৪২।

[8] সৌম্যেন্দকুমার গুপ্ত, "শহর বহরমপুর কালগত বিবর্তনের পথে একটি সামাজিক রূপরেখা", ড: বিষাণ কুমার গুপ্ত (সম্পাঃ), *ইতিহাসের আলোকে বহরমপুর পৌরসভা: ১৮৭৬-২০০৭,* (বহরমপুরঃ বহরমপুর পৌরসভা, ২০০৭), পৃ. ৪৮।

বেশি। ১৯৫১-১৯৭১ এই কালপর্বে জেলা দুটির মোট জনসংখ্যা এবং উদ্বাস্তু জনসংখ্যার যত শতাংশ শহর এলাকায় বসবাস করতেন তার চিত্রটি নিম্নরূপ।

সারণি-৫ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তু জনগণ ও স্থানীয়দের মধ্যে শহরে বাস করার প্রবণতা। (সংখ্যাগুলি শতাংশ)

শহরে বসবাসকারী (শতাংশে)	মালদা জেলা			মুর্শিদাবাদ জেলা		
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
উদ্বাস্তু জনসংখ্যা	১৩.০৪	১৫.৩২	১৯.৭২	৩৩.২৪	২৭.০৯	৩৪.৪২
সর্বমোট জনসংখ্যা	৩.৭৫	৪.১৬	৪.২২	৭.৮৬	৮.৫৪	৮.৪৫

(*Malda, Census-1951,* p. 2&79; *Murshidabad, Census-1951,* p. 1&108; *Malda Census-1961*, p.lxviii, 28; *Murshidabad, Census-1961*, pp.22 & 93; *Census of India 1951* series 22 west bengal Part II-D(i) p. 39 & 49)

মালদা জেলার ক্ষেত্রে মোট জনসংখ্যার একশো জনের মধ্যে গড়ে চারজন যেখানে শহরে বসবাস করতেন, সেখানে উদ্বাস্তুরা ১০০ জনের মধ্যে গড়ে প্রায় ১৫ জন শহরে বসবাস করতেন। মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাগুলো যথাক্রমে ৮ জন ও ৩২ জন। উদ্বাস্তুদের এই শহরকেন্দ্রিক মনোভাবই পূর্বে প্রদর্শিত সারণি-৩-এর ১৯৪৭-পরবর্তী দশকগুলিতে বিপুল জনাগমকে নির্দেশ করে। এর সম্ভাব্য কারণ,

প্রথমতঃ শহরাঞ্চলে অর্থ উপার্জন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বেশি। সরকারি চাকরিতে অপশন দিয়ে চলে আসা বা এদেশে এসে সরকারি বা বেসরকারি চাকরিতে যারা যোগ দিয়েছিলেন, তারা শহরে থাকতে পছন্দ করবেন এটাই স্বাভাবিক। আবার অনেকে যারা জমি-জমা বিক্রি বা বিনিময় করে আসতে পেরেছিলেন, অথবা নিজেদের সঙ্গে কিছু সম্পদ নিয়ে আসতে পেরেছিলেন তারাও বসবাসের জন্য গ্রাম অপেক্ষা শহরকেই বেছে নিয়েছিলেন। নদীয়া জেলার ওপর গবেষণায় পাওয়া যায় কৃষকরা প্রাথমিকভাবে যে জমি পেয়েছিলেন তা অনূর্বর হাওয়ায় এবং কৃষিকাজের পক্ষে অনুপযুক্ত হওয়ায় তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থানান্তর গমন ও নতুন বসতি স্থাপন শুরু করেছিলেন।[9] ভালো জমির সন্ধানে এদের অনেকে, গ্রামীন এলাকায় জমি পাওয়ার চেষ্টায় সেই সময় মালদা, মুর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাদের অনেকেই আবার জমি পাওয়ার আশা ছেড়ে, গ্রামীণ অঞ্চল বাদ দিয়ে আধা-শহর ও শহরতলিতে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[10] গ্রামীণ-উদ্বাস্তুদের সংখ্যা শতকরা ৬০ থেকে কমে ৫০ হয়ে দাঁড়ায় এবং

[9] Tetsuya Nakatani, 'Away from Home: The Movement and Settlement of Refugees from East Pakistan in West Bengal, India', *Journal of the Japanese Association for South Asian Studies-12*, 2000, p. 89.

[10] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন: বাংলা ও ভারত, ১৯৪৭-৬৭, আবু জাফর অনূদিত,* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০), পৃ. ১৩৫-১৩৬।

১৯৫০ সাল থেকে "গ্রামীণ এলাকা থেকে শহর এলাকায় উদ্বাস্তুরা উল্লেখযোগ্য হারে চলে যায়"।[11] ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে উল্লেখ পাওয়া যায়, কৃষি-নির্ভর উদ্বাস্তুদের একটা 'উল্লেখযোগ্য অংশ' যথেষ্ট 'বিস্ময়করভাবে বিভিন্ন শহরে বসবাস করছে'। এর ব্যাখ্যা হিসেবে সেখানে বলা হয়; কৃষকরা কেবলমাত্র কৃষি কাজের উপরে আর ভরসা করতে পারছে না, তারা দ্বিতীয় একটি অপশন অবলম্বন হিসেবে তাদের জন্য রেখে দিতে চাইছে।[12] ১৯৪৭-এর দেশভাগে, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসা মালদার হারাধন মন্ডলের নিজস্ব অভিজ্ঞতা "শহর চায় সবাই, ওপার থেকে হিন্দুরা জমি বিনিময় করে বা জমি বিক্রি করে এই দেশে এসে শহুরে এলাকায় জমি কিনছে; যাদের উপায় নেই, তারা যা জমি পাচ্ছে তাই কিনছে। যাদের পয়সা নেই, গাছ কেটে জমি বানাচ্ছে, জবরদখল করছে। কিন্তু তবু শহুরে এলাকায় থাকতেই পছন্দ করেছে। জমির দাম হু হু করে বাড়ছে"। এগুলো সব তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও, ওল্ড মালদার কোর্ট-স্টেশনের মতো এলাকায় জমি পেয়েও তারা অনেকেই কেনেননি। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, "মঙ্গলবাড়ি, সাহাপুর, ওল্ড মালদার হাল যে এমন হবে কে জানতো! ভেবেছিলাম জমি বিক্রি-বাটা করে টাউনে কিনব। এখানকার পাঁচ বিঘা বিক্রি করে টাউনে এক বিঘাও যদি কিনি সেটাই করব"[13] হারাধন বাবুর কথাতেই ধরা পড়ে উদ্বাস্তুদের মধ্যে শহরে বসবাস করার প্রবণতা কতটা বেশি ছিল।

দ্বিতীয়তঃ নিরাপত্তার প্রশ্নে শহরাঞ্চলে থাকা বেশি সুবিধাজনক ছিল। তৃতীয়ত: মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে যে সমস্ত মুসলিমরা দেশত্যাগ করে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যান তারা বেশিরভাগই সম্পদশালী, শিক্ষিত, উচ্চশ্রেণির শহুরে মুসলিম। কাজেই জমি, বাড়ি বিনিময়ের সুবিধা ও ফাঁকা বাড়িঘর পাওয়ার সুযোগ শহরাঞ্চলেই বেশি ছিল। এই সমস্ত কারণে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির মতো এই দুই জেলাতেও শহরাঞ্চলে বসতি স্থাপনে স্বচেষ্ট হয়েছিলেন।

রাস্তা-ঘাট সম্প্রসারণঃ নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট সম্প্রসারণের কাজও শুরু হতে থাকে। উদ্বাস্তুদের বসতি বা কলোনিগুলি গড়ে ওঠার আগে যে সমস্ত জায়গাগুলি ফাঁকা ছিল, সেই সমস্ত এলাকাগুলিতে উদ্বাস্তুদের হাত ধরে গড়ে ওঠা জনপদে প্রয়োজনের তাগিদেই চলাচলের রাস্তা তৈরি হতে থাকে, পরবর্তীকালে সেই পায়ে-চলা পথ ক্রমে কংক্রিটের রাস্তায় পরিণত হয়। এই দুই জেলার অসংখ্য উদ্বাস্তু কলোনি ও জনপদগুলিতে তাদের বসবাসকে কেন্দ্র করে এই ভাবেই বহু রাস্তা গড়ে উঠেছিল। মালদার হারাধন মন্ডল অভিজ্ঞতায় মালদা কোর্ট-স্টেশনের রাস্তাটি

---

[11] File No:- G.P. 361.5 (5415) 083 w 52, *Rehabilitation of Refugee, A Statistical Survey-1955,* (Alipore, West Bengal Govt. Press, 1955), p. 2.

[12] *West Bengal, Census-1951*, p. 326.

[13] সাক্ষাৎকারঃ- হারাধন মণ্ডল, ওল্ড মালদা, উদ্ধৃত, সুব্রতকুমার ব্রহ্ম, "মালদা কোর্ট স্টেশন থেকে সদরঘাট-শিকড়ের সন্ধানে", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২৩, ইতিহাস না ইতিহাসঃ মালদা এবং বিষয়ান্তর,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২৩), পৃ. ৯৪।

তারা তৈরি হতে দেখেছিলেন। আগে সেখানে বনজঙ্গল ছিল; সেখানে বাঘের বাস ছিল, ১৯৫০ সালেও সেখানে তারা বাঘের অস্তিত্ব টের পান। শহরে থাকাকে প্রাধান্য দিয়ে বহু মানুষ জমি কিনতে এলেও বাঘের ঘোরাফেরা দেখে এই অঞ্চলে জমি কেনেননি। তবে সেখানে এই হারাধন মন্ডলের মতোই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অনেক উদ্বাস্তুরা ছিলেন। কোর্ট-স্টেশনের রাস্তা ছিল ইঁট বিছানো। বর্ষাকালে খানা-খন্দে ভরে যেত। কিন্তু স্থানীয় জমিদার ব্রজসিংহের কাছে জমি অধিগ্রহণ করে সরকার সেখানে পাকা সড়ক তৈরি করে।[14]

মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে নতুন রাস্তা, সড়ক নির্মাণ হয়; কিছু ক্ষেত্রে আগে থেকেই থাকা রাস্তার সম্প্রসারণের কাজ হতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বহরমপুর সদর ব্লকের চালতিয়া গভর্মেন্ট কলোনির (চুঁয়াপুর) মধ্যে পায়ে-চলার পথ হিসেবে দুই থেকে আড়াই ফুট চওড়া ইটের রাস্তা ছিল, পরবর্তীকালে রাজ্য সরকার Infrastructure Development of Government Sponsored Colonies প্রকল্প অনুযায়ী পিডব্লিউডি ৮০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায় ৮৩৭ মিটার দীর্ঘ কংক্রিটের রাস্তা ও ড্রেন তৈরি করে। কলোনির এক বাসিন্দার কথায়, "বহরমপুর থেকে রেলের লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে রাত্রিবেলায় আসতে গা ছমছম করতো, কারণ রাস্তায় আলো ছিল না, রাস্তাঘাট ভালো ছিল না, লোকালয় গড়ে ওঠেনি। ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিকরণ, জাতীয় ও রাজ্য সড়ক নির্মাণের ফলে চুয়াপুর জমজমাট হয়ে উঠেছে।"[15] উদ্বাস্তু জনগণের বসবাসের ভিত্তিতে এভাবেই পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছিল বহরমপুরের হাতিনগর পঞ্চায়েত সমিতির মাদাপুর কলোনিতে, গান্ধী কলোনিতে, হরিহরপাড়া ব্লকের খিদিরপুর উদ্বাস্তু কলোনিতে, আয়েশবাগ কলোনিতে, রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের বড়োজুমলার উদ্বাস্তু কলোনিতে। বহরমপুর ব্লকের বলরামপুর কলোনিতেও পাকা রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছিল, উদ্বাস্তুরা বসবাসের আগে যা ছিল স্থানীয় জমিদারের পড়ে থাকা জমি। এই জেলায় আগত উদ্বাস্তু মানুষের বসবাসের কারণে জেলার আর এক প্রাপ্তি পদ্মজা নাইডু রোড। মুর্শিদাবাদের সদর ব্লকের নিয়াল্লিশপাড়া-গোয়ালজান কলোনিতে ভাগীরথীর তীর থেকে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত সুন্দর পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছিল, রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু এই রাস্তায় পরিদর্শনে এলে রাস্তাটির এরূপ নামকরণ হয়।[16] রানীনগর ব্লকের প্রান্তিক গ্রাম চর-দুর্গাপুরের বাসিন্দা প্রবীণ নারায়ণ মন্ডল জানান "বাবা, কাকার হাত ধরে এক রাতের বেলায় উঠেছিলাম এই চরে; তখন রাস্তা, আলো, বিদ্যালয় কিছুই ছিল না এখানে"। ধীরে ধীরে সেখানে পাকা রাস্তা, আলো, প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি সবকিছুই হয়েছে।[17] লালগোলা ব্লকের কালমেঘা গ্রামে প্রচুর উদ্বাস্তু পরিবারের বসবাসের ফলে লালগোলা স্টেশনের এক

---

[14] তদেব,পৃ. ৯৪-৯৫।

[15] সাক্ষাৎকারঃ- কল্যাণ ভট্টাচার্য, ফারাক্কা ব্যারেজের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, চালতিয়া গভর্নমেন্ট কলোনি, উদ্ধৃত, ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি, পৃ.৮৮-৮৯।

[16] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৮৯-১০৪।

[17] সাক্ষাৎকারঃ-নারায়ন মন্ডল, চর দুর্গাপুর, উদ্ধৃত, ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি, পৃ. ৮৯-১০৪।

নম্বর রেলগেট থেকে ওই গ্রাম পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছিল।[18] ডোমকল ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরে উদ্বাস্তু কলোনির উন্নয়নে চৌরিগাছা থেকে দ্বারকা নদীর বামতীর পর্যন্ত তিন কিলোমিটার পাকা রাস্তা করা হয়েছে, যা আগে ছিল না।[19]

হাট-বাজার সম্প্রসারণঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামগুলিতে হাট-বাজার ইত্যাদির পসার বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেগুলিকে ঘিরে মানুষের জীবন ও জীবিকা পরিবর্তিত হতে থাকে। শরণার্থীদের অবস্থানের কারণে মালদা জেলার হাবিবপুর থানার অন্তর্গত কালিপুকুর হাটের জন্ম, বামনগোলা থানার কলোনি হাট বা চড়কডাঙ্গা হাট ('কলোনি হাট' নামে খ্যাত) এইভাবেই সৃষ্টি। জেলার উদ্বাস্তু বিনয়কৃষ্ণের মতে "এ সমস্ত হাট ১৯৭১ এর শরণার্থী মানুষের অবস্থান হেতু; তারাই জীবন, জীবিকার প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিল হাট। ওই সমস্ত হাটগুলিকে বলা হত 'জয় বাংলার হাট' কেননা সেই সমস্ত হাটগুলি তৈরির পেছনে ছিলেন পূর্ব-বাংলার শরনার্থীরা। তার আক্ষেপ "এখনকার প্রজন্ম সেই ইতিহাস জানতে চায় না, এখন আর কেউ জয় বাংলার হাট বলে না"। একইভাবে পাকুয়াহাট থেকে পাকুয়াবাজার রূপান্তরের পেছনে অবদান এই শরণার্থী মানুষদের। উদ্বাস্তুরা পাকুয়াহাটে ধান থেকে চাল তৈরি করা শুরু করেছিলেন। পূর্বে ওই স্থানে একটি মাত্র পানের গুমটি ও কয়েকটি মুদিখানা দোকান ছিল। পরবর্তীকালে উদ্বাস্তুদের হাত ধরে সেখানে ধান ও চাল রপ্তানির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ধান, চালের পাশাপাশি উদ্বাস্তুরা অন্যান্য ব্যবসা শুরু করলে পাকুয়াহাট, বাজারে রূপান্তরিত হয়েছিল। পাশাপাশি উদ্বাস্তুদের আর্থিক সচ্ছলতা এসেছিল।[20] জানা যায়, মালদা জেলার যে কটি 'কমার্শিয়াল মার্কেট' ও 'পৌর বাজার' গড়ে উঠেছে তার সিংহভাগের মালিক ওপার বাংলা থেকে আগত বাঙালিরা।[21] মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রেও দেশভাগের পর উদ্বাস্তু জনবসতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন হাট, বাজার গড়ে উঠতে দেখা যায়। ১৯৫২ সালে কান্দি ব্লকে জীবন্তীতে মহালন্দী উদ্বাস্তু কলোনির নিকটে গড়ে ওঠে জীবন্তী বাজার যেখানে শস্য, সবজি, মাছ, কাপড়, চা, পাঠ ইত্যাদি কেনাবেচা হতো। ১৯৫৪ সালে বহরমপুর ব্লকের মণীন্দ্রনগর উদ্বাস্তু কলোনি সংলগ্ন এলাকায় গড়ে ওঠে মণীন্দ্রনগর হাট; এখানেও সবজি, শস্য, মাছ, মাংস ইত্যাদি কেনাবেচা হতো। এই ব্লকের গোয়ালজান-নিয়াল্লিশপাড়ায় অবস্থিত উদ্বাস্তু কলোনির নিকটবর্তী অঞ্চলে ১৯৫৭ সালে সবজি, মাছ ইত্যাদি কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে খাগড়াঘাট বাজার। ১৯৫২ সালে

---

[18] সাক্ষাৎকারঃ-গৌতম রায়, রাজনৈতিক কর্মী, লালগোলা ব্লক, উদ্ধৃত, ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ১০৮।

[19] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ১১৪।

[20] বিনয়কৃষ্ণ *বোস, মালদা জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস,* (পাকুয়াহাটঃ নিউ সেন প্রিন্টার্স, ২০১৮), পৃ. ২১-২২।

[21] রীতা রায়, স্বাধীনতা ও দেশভাগ, পৃ-৮২।

হরিহরপাড়া ব্লকে অবস্থিত উদ্বাস্তু কলোনির কাছে মঙ্গল ও রবিবার সবজি, মাছ ও হোসিয়ারি দ্রব্য নিয়ে বসতে শুরু করে চোয়াহাট।[22]

পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের হাত ধরে রাস্তা-ঘাট, বাজার-হাট কিভাবে প্রসার লাভ করেছিল তার একটি নজিরবিহীন ঘটনা পাওয়া যায় মালদা জেলার ইতিহাসে। মালদার কোর্ট-স্টেশন থেকে সাগরদিঘী যাওয়ার খেয়া ঘাটের প্রবেশপথে, একটি মাত্র চায়ের দোকান থেকে ক্রমে কিভাবে মুদিখানা, বাজার, বাজার কমিটি গড়ে ওঠে তা বর্ণনা করেছেন জেলার এক উদ্বাস্তু, অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীপতি মন্ডল। চায়ের দোকানটির মালিক ছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত পশুপতি শীল। এই পশুপতি শীলের চায়ের দোকান থেকে 'পশুপতি বাজার' ও 'সদরঘাট মোড়' থেকে 'পশুপতি মোড়' হয়ে ওঠা ইত্যাদি নিজের চোখে দেখা এই সকল পরিবর্তনের সাক্ষী শ্রীপতি মন্ডল। মালদা থেকে মহানন্দা নদী পার হয়ে স্থানীয় কৃষিজীবী মানুষজন শাক-সবজি সদরঘাটে বিক্রির জন্য নিয়ে যেতেন। জেলে, তাঁতি, গোয়ালা সবার গন্তব্য ছিল পুরাটুলি, সদরঘাট, নয়তো মালদার কোনো হাট-বাজার। মালদার আদি-নিবাসীদের সঙ্গে থাকতেন শ্রীপতি মন্ডল, মহাদেব মন্ডলের মতো আরো অনেক পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা। আসা-যাওয়ার পথে পশুপতি শীলের চায়ের দোকানে বসত তাদের আসর 'পশুপতির সঙ্গে পরামর্শে তাদের ক্লান্তি জুড়াত'। কোনো এক বর্ষাকালে, প্রচণ্ড বৃষ্টি দিনে সবাই খেয়াপারে অপেক্ষারত, নৌকা আসা যাওয়া করছে না, কারবারীরা সবাই পশুপতির চায়ের দোকানে চা, বিড়িতে সময় কাটাচ্ছে। মনে মনে সবাই জানে সেদিন আর বিক্রি-বাটা হবে না। সেদিন হঠাৎই পশুপতি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন "তুরা যে সবজি, মাছ বেচার লগে ঘুম থাইকা উইঠ্যা এত্ত মেহনত করশিস, পুশায়? তবুও তুফানে নায়ের লগে অপেক্ষা, কাদা জল মাইখ্যা, তোরা বুরবাক সব" পশুপতির এই কথায় সবার মনে দাগ কাটে; তবুও এই পারে বিক্রি হওয়া নিয়ে প্রশ্ন জাগে। পশুপতির তৎক্ষণাৎ উত্তর "বিকোবে না ক্যানে? আলবাৎ বিকোবে। এক ঘন্টার মধ্যে তামাম ডালি বিকোবে। না বিকোলে আমি নিব"। তার এই এক কথায় পরের দিন থেকে পশুপতির চায়ের দোকানের সম্মুখে বাজার বসবে বলে ঠিক হয়। তবুও পরদিন শ্রীপতি মন্ডল, মহাদেব মন্ডল ছাড়া বাকিরা ছুটেছিল পুরাটুলি সদরঘাট বাজারে। শ্রীপতি মন্ডলের কথায় "সেদিন সব মালই বিক্রি হল। এক ঘন্টায় না হলেও এক বেলার মধ্যে হল। থাকল না পারাপারে জলকাদা ভাঙ্গা, লাগল না পারাণির পয়সা, রইল না মাল বিক্রির চিন্তা। ধীরে ধীরে বাকি সবাই পশুপতির চায়ের দোকানের পাশে নিজের নিজের পসরা নিয়ে বসল। পশুপতি শীল, চায়ের দোকানের পরে মুদির দোকান তৈরি করল। পরে কালী সাহা, মাখন সাহা, পরমেশ্বর চৌধুরী এবং আরও অনেকে দোকান দিল।" ১৯৬২ সালে মালদা-বুলবুলচন্ডী রোড তৈরির কাজ চলার সময় সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক, কারিগর, গাড়িওয়ালাদের খাবারের জন্য ভাতের হোটেল, মদের দোকান খুলতে শুরু করে। শ্রী মণ্ডল বলেচলেন, "১৯৬৫-৬৬ তে পশুপতি শীল, কার্তিক মণ্ডল, ছেদু মন্ডল, গুণমণি শীল,

[22] *মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার-২০০৩,* উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জেলাশাসক ও সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ, ২০০৩, পৃ. ৩৬৩-৩৭৮।

কালী সাহা, পরমেশ্বর চৌধুরী সবাই মিলে একটা বাজার কমিটি গড়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয় যার সেক্রেটারি ছিলাম আমি। গড়ে উঠল পশুপতি বাজার। এই পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছিল দুর্গা মন্ডপ, রাধাগোবিন্দ মন্দির"। 'কখনো পরামর্শ দিয়ে, কখনো আর্থিক সাহায্য করে' এলাকার মানুষের কাছে ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন পশুপতি শীল। সর্বোপরি এই বাজার তৈরি তৎকালীন সদরঘাটের মানুষজনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আর্থিক ভাবে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল এবং এর পেছনে যার সবচেয়ে বড় অবদান ছিল সেই 'উন্নয়নের হোতা' পশুপতি শীলকে সম্মান জানানোর জন্য 'সদরঘাট মোড়'এর নাম পরিবর্তন করে 'পশুপতি মোড়' রাখা হবে ঠিক হয়েছিল। "জনতা-জনার্দনের উপর আস্থা রেখে ফলক লাগানো হল 'পশুপতি মোড়'। ক্রেতা, বিক্রেতা, জমির দালাল, পাইকারি খুচরা বাজার সমস্ত কিছু মিলে একটা মিলনক্ষেত্রে পরিণত হল 'পশুপতি মোড়'। তৈরি হল ঘোড়াগাড়ি স্ট্যান্ড, গরু, মোষের গাড়ি রাখার জায়গা, রিক্সা স্ট্যান্ড। বাস চালু হল মানা-বুলবুলচন্ডি রূটে"।[23] এ ছিল কেবলমাত্র একটি চায়ের দোকানের বাজারে রূপান্তরের কাহিনী; এমনই কতশত দোকান, গুমটি থেকে বাজার, অলিগলি থেকে পাকারাস্তা, সড়কের নিঃশব্দ রূপান্তর ঘটেছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের হাত ধরে। এইভাবে উদ্বাস্তু মানুষের সমাগমে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির মতো এই জেলা দুটির রাস্তা-ঘাট, বাজার-হাটে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল।

রাস্তা-ঘাট, বাজার-হাট সম্প্রসারণের পাশাপাশি উদ্বাস্তু আগমন এই দুই জেলার অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলেছিল। উদ্বাস্তুদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন পূর্ববঙ্গের পেশা পরিবর্তন করে নতুন জীবিকা অর্জন করেছিলেন তেমনি আবার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের হাত ধরে তাদের পেশাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন এই দুই জেলার বহু মানুষ। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের হাত ধরে বিভিন্ন চাষবাস ও বিভিন্ন ধরনের ছোট, বড় শিল্পের বিকাশ জেলা দুটির অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনে। আবার এই দুই জেলায় প্রচলিত কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের হাত ধরে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা তাদের পরিবারে অন্নসংস্থানের উপায় খুঁজে পান।

কৃষিঃ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান অর্থকরী ফসল হচ্ছে পাট। এটি মুর্শিদাবাদের জেলারও প্রধান অর্থকরী ফসল।[24] মুর্শিদাবাদ হল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলির একটি। মালদা জেলাও পাট চাষে অগ্রগণ্য। তবে এই পাট চাষের ইতিহাস অনুসরণ করলে জানা যায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু কৃষক পরিবারগুলিই এপার বাংলায় পাট চাষ প্রসারের অন্যতম প্রধান কান্ডারী। পশ্চিমবাংলায় পাট চাষের প্রচলন তেমন ছিল না। কিন্তু পূর্ববাংলার চাষীরা পাট চাষে বেশ দক্ষ ছিলেন। দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পাট উৎপন্ন হত এবং এই কাঁচামাল ব্যবহার করা হত বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর দুই তীরে অবস্থিত

[23] সুব্রত কুমার ব্রহ্ম, *মালদা কোর্ট স্টেশন থেকে সদরঘাট,* পৃ. ৯০-৯২।

[24] *মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার-২০০৩,* পৃ. ৩১৯।

পাটকলগুলিতে। একটি গবেষণা অনুসারে দেশভাগের ফলে বাংলার ৭৫ শতাংশ পাট-উৎপাদনকারী অঞ্চল পূর্ববঙ্গে চলে যায়, অথচ ১০৬টি মিল পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়ে।[25] স্বাভাবিকভাবেই বাংলা বিভাজন এই পাটকলগুলিতে কাঁচামালের সরবরাহে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। পরিণতিস্বরূপ, দেশভাগের আগে পাট থেকে যে আয় হত তা বন্ধ হয়ে যায়। আয়কর থেকে প্রাপ্ত অর্থের সংকোচন ঘটে। সর্বোপরি অর্থনীতির ওপর এই বিষয়টি গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই পরিস্থিতিতে এপার বাংলায় চলে আসা পুনর্বাসনপ্রাপ্ত উদ্বাস্তু কৃষি পরিবারগুলির পাট চাষই কাঁচামালের যোগান অক্ষুন্ন রেখে পশ্চিমবঙ্গের পাটকলগুলিকে জীবিত রেখেছিল।[26] ১৯৬৯ এ প্রকাশিত মালদা গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছিল, জেলার "প্রধান পাট উৎপাদনকারী এলাকাগুলি এখন পূর্ব-পাকিস্তানে; কিন্তু তারপরও, নতুন এলাকাগুলিকে পাট চাষের আওতায় আনার ফলে, এখন এই জেলা থেকে সড়ক ও রেলপথে কলকাতায় গড়ে ৪৫০০০০ মণ (১৬৭৯৪.০কুইন্টাল) পাট রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছে।" গেজেটিয়ারে উল্লিখিত এই নতুন এলাকাগুলিতে, পূর্ববঙ্গে পড়ে যাওয়া পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলি থেকে আগত বহু উদ্বাস্তু পাট-চাষী সোনালী ফসল ফলানোর কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। সেই সময় মালদা জেলাতে ধানের পর সর্বাধিক উৎপাদিত ফসল ছিল পাট। ১৯৫৮-১৯৫৯ এই এক বছরে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ছিল ৯০.৩ হাজার মেট্রিক টন; জেলার প্রায় ২১.৭ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হত।[27] পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুরা আসায় এই জেলা পাট চাষে উন্নতি করেছিল। তাদের হাত ধরেই মুর্শিদাবাদে ব্যাপকভাবে পাট চাষের প্রবর্তন দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এইভাবে তারা জাতীয় কৃষি ও শিল্পকে বাংলা ভাগের পর নতুন করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।[28] ১৯৭৯-তে প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুসারে, মুর্শিদাবাদ জেলায় ধান ছাড়া অন্যান্য প্রধান কৃষিজাত ফসলের তালিকায় প্রথমে ছিল পাটের নাম, প্রতিবছর যার গড় উৎপাদন ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ টনেরও বেশি। তার মধ্যে লালগোলা ব্লকে সর্বাধিক পাট উৎপাদন হতো, প্রায় ৩৮.০৭ শতাংশ। রানীনগর-২ (৩৩.৪১ শতাংশ), জলঙ্গি (২৭.৩৬ শতাংশ) এছাড়াও রঘুনাথগঞ্জ-২, ভগবানগোলা-১ ও ২ এবং জিয়াগঞ্জ ছিল এই জেলার উল্লেখযোগ্য পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল।[29] এই সমস্ত ব্লকেই উদ্বাস্তুদের কলোনি দেখা যায়। ছিন্নমূল মানুষের হাত ধরে এই দুই জেলায় পাট চাষ ও পাট শিল্পে গতি আসে।

---

[25] Anwesha Sengupta, 'Unthreading Partition: The Politics of Jute Sharing between Two Bengals', *Economic and Political Weekly*, Vol. 53, Issue No. 4, 2018, pp. 43-49.

[26] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৭১।

[27] Jatindra Chandra Sengupta, West Bengal District Gazetteers: *Malda Gazetteer*, (Calcutta, December 1969), pp. 132 & 99-100.

[28] হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উদ্বাস্তু,* পৃ. ৭১।

[29] Birendra Kumar Bhattacharya, *West Bengal District Gazetteers: Murshidabad*, (Calcutta: Govt. of west Bengal, March 1979), pp. 125-130.

উদ্বাস্তুরা তাদের অবস্থানের দরুন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলোকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল বোরো ধানের চাষ। বোরো ধান সাধারণত নিচু জলাজমি, ঝিলের ধারে জলাভূমিতে ও নদীবিধৌত পলি মাটিতে হয়ে থাকে। পূর্ববঙ্গে এই ধান চাষের জন্য উপযুক্ত মাটি ও জল দুটোই ছিল। ওপার বাংলার জেলাগুলির মধ্যে একটা বৃহত্তর এলাকা জলাভূমির অন্তর্গত ছিল; যেমন,- যশোর, বগুড়া, পাবনা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি। মালদা জেলার উদ্বাস্তু বিনয়কৃষ্ণের মতে "জলাভূমি-প্রধান জেলার মানুষদের জীবনধারা ডাঙ্গাভূমির জীবনধারার থেকে সবদিক দিয়েই আলাদা ছিল। কারণ, জলপ্রধান জেলাগুলিতে ১০ ফুট জলের মধ্যে জলাজাতের ধান উৎপন্ন হতো। এই ধান আবাদের পদ্ধতি, পরিচর্যা ডাঙ্গাভূমির ধান অপেক্ষা পৃথক ধরনের"। পূর্ববঙ্গের মানুষ বোরো ধান চাষে বেশ দক্ষ ছিল। মালদা জেলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, পূর্বে এই জেলায় আউশ ও আমন ধান উৎপাদন হতো কিন্তু বোরো ধান তেমন ভাবে চাষ করা হতো না। কিন্তু উদ্বাস্তু আগমনের পর হাবিবপুর, বামনগোলা, ওল্ড মালদা ও গাজোল এই চারটি থানায় অর্থাৎ যেখানে যেখানে উদ্বাস্তুরা বেশিরভাগ বসবাস করত, সেইসব অঞ্চলে বোরো ধান সর্বাধিক উৎপাদন হত। সমগ্র মালদা জেলার ৮১ শতাংশ বোরো ধান, ৬৫ শতাংশ সরিষা এবং অল্প হলেও গম, জব, ভুট্টা ইত্যাদি এই চারটি থানাতেই উৎপন্ন হত।[30] অথচ উদ্বাস্তু আগমনের পূর্বে, এই চারটি থানার মূলত জলা বা নিচু পতিত জমিগুলিকে উৎপাদনযোগ্য মনে করা হত না। উদ্বাস্তুদের হাত ধরে এই জমিগুলোতেই সোনার ফসল ফলতে শুরু করছিল যা এই জেলার অর্থনীতিতে অনেকটাই সাহায্য করে। হাবিবপুর থানার অন্তর্গত পার্বতীডাঙ্গা, দাল্লা, আড়াগাছি, তেলনাই, মাইভিটা, নন্দগড়, কোটালপুর, হৃষিপুর, বাহারগোলা, কালাইবাড়ি, ভূঁয়োডাঙ্গা, রাধাকান্তপুর, রামকৃষ্ণপুর, ঠাকুরনগর, সোনাবাঁধ, জগজীবনপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর, আগ্রা গ্রামগুলি নিচু এলাকায় অবস্থিত ও জলাভূমিতে পূর্ণ ছিল। এখানে যে সমস্ত উদ্বাস্তুরা এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা ছিলেন পূর্ববঙ্গের জলাভূমির মানুষ, পরিশ্রমী ও কৃষিকাজে পটু। এরা এইসব নিচু এলাকার পড়ে থাকা অনাবাদি জমিগুলিকে আবাদি জমিতে পরিণত করেন। তারা এই জমিগুলোতে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান, সরিষা, কলাই, গম ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদন করতেন। গাজোল থানার নিচু ও জলাজমিতে আশ্রিত উদ্বাস্তুরা একই ধরনের ফসল উৎপাদন করতেন।[31]

মালদা জেলার মতো মুর্শিদাবাদ জেলাতেও শরণার্থীদের হাত ধরে জেলার জলাভূমিগুলোতে এবং নিচু এলাকার জমিগুলোতে উল্লেখযোগ্য ভাবে বোরো ধান চাষ করা শুরু হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে ১৯৬৪ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত সময়কালে দেখা যায়, আউশ বা আমন ধানের তুলনায় বোরো ধানের জন্য বরাদ্দ জমির পরিমাণ কমেছিল। অথচ যেখানে আউশ ধানের উৎপাদন ৯.৪০ mds/acre থেকে কমে ৭.৯৬ mds/acre বা

[30] সাক্ষাৎকারঃ-বিনয়কৃষ্ণ বোস, 'মালদা জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক, পাকুয়াহাট, মালদা, তারিখঃ-০৯/০৮/২০২৩।

[31] বিনয়কৃষ্ণ বোস, *মালদা জেলার উদ্বাস্তু,* পৃ. ৬-১৭।

আমন ধানের উৎপাদন ১৪.৩১ mds/acre থেকে কমে ১৩.৯৬ mds/acre হয়েছিল। সেখানে বোরো ধানের চাষ উল্লেখযোগ্য ভাবে এই বছরগুলোতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়ে বোরো ধানের চাষ ১০ mds/acre থেকে ২৫.৭৩ mds/acre এ পৌঁছে গিয়েছিল।[32] সারনি-৬-এ সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হল।

সারণি-৬ ১৯৬৪-৭০ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন ধরণের চালের ফলন। (সংখ্যাগুলি ১০০ টনে)

চালের ধরন	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৭০
আমন	২৬০.৭	২৪১.৫	২৬০.৩	২৫৬.২	২৫৯.৫	অজ্ঞাত
আউস	৬৯.৮	৪৫.৯	৬৯.৮	৫৪.০	৭৪.০	৫৪.৫
বোরো	৩.০	৩.০	৪.৫	৩.৬	৩.৮	৮.১

(*Murshidabad Gazetteers-1979*, p. 128)

সারণি-৬ অনুসারে, আমন ধানের উৎপাদন এই বছরগুলিতে কমেছে, আউস ধানের উৎপাদনেও হ্রাস-বৃদ্ধির ক্রম লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু বিপরীতে বোরো ধানের উৎপাদন এই কালপর্বে ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে এবং ১৯৬৯-১৯৭০-এ তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সরকারি তথ্য অনুসারে, সেই সময় মুর্শিদাবাদের ধান উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির মধ্যে খরগ্রাম, রঘুনাথগঞ্জ-১ ও ২, নবগ্রাম, কাঁদি, ভগবানগোলা-২, সুতি এবং ডোমকল ছিল উল্লেখযোগ্য। এইসব ব্লকগুলিতে ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৮০ শতাংশেরও বেশি।[33] এর মধ্যে শুধু খড়গ্রাম ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে প্রচুর উদ্বাস্তু কলোনি ছিল। তাই ধান উৎপাদনে তাদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। ডোমকল ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরের উদ্বাস্তুরাও বিরাট মাঠ জুড়ে প্রচুর পরিমাণে বোরো ধান চাষ করতেন এবং এখনও করেন বলে জানা যায়।[34]

শুধু বোরো ধানের চাষই নয় জেলা দুটির পতিত, অনাবাদি জমিগুলি আবাদি জমিতে পরিণত করতেও বাস্তুহারা ওই সকল মানুষদের ভূমিকা অনস্বীকার্য্য। জঙ্গলাকীর্ণ ঝোঁপঝাড়, বনবাদাড়, গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে উদ্বাস্তু মানুষেরা কোথাও থাকার জন্য বসতি স্থাপন করেছিলেন; কোথাও বা চাষযোগ্য মনে হলে সেই জায়গা চাষের জমিতে পরিণত করে জীবিকা নির্ধারণ করতেন। জমির উর্বরতা শক্তি কিভাবে বৃদ্ধি করতে হয় তাও তারা দেখিয়েছিলেন। মালদার পূর্বদিকে বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া পুনর্ভবা, টাঙ্গন, মহানন্দা নদীর তীরবর্তী গাজোল

[32] *Murshidabad, Gazetteers-1979*, pp. 124-129.

[33] Ibid, pp. 128-129.

[34] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি*, পৃ. ১১৪।

ও বামনগোলা থানার অন্তর্গত নিচু অঞ্চলে এক অন্যোন্য উপায়ে চাষাবাদ হত, যা ছিল জমির উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধির সহায়ক। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বিনয়কৃষ্ণ বাবু খুব সুন্দরভাবে পদ্ধতিটি বর্ণনা করেছেন;- "এই সকল অঞ্চলগুলিতে প্রাথমিকভাবে যে ধান চাষ শুরু হয়েছিল সেই ধানগুলি ছিল নিতান্তই মোটা জাতের; যেমন উজল, বাজাল, কালিরায়, জগসলাই, দীঘা, লক্ষ্মীদিঘা, সরাসরিদীঘা, বোরো ধান প্রভৃতি। আশ্বিনের শেষে, কার্তিকের প্রথমে ধান কাটার সময় এলে ধানগুলিকে এমন ভাবে কাটা হতো যাতে ধানের দীর্ঘ গাছগুলো লতিয়ে চাদরের মত মাটিকে ঢেকে রাখত। ফলে জমিতে রসের যোগান বজায় থাকত। সেই জমিতে বিনা চাষে ছিটিয়ে বোনা হতো সরষে, তিসি প্রভৃতি তৈলবীজ ও খেসারি, কলাই, মটর প্রভৃতি ডাল জাতীয় শস্য। পরে পেঁয়াজ, রসুন, কুমড়ো, লাউ, করলা, তরমুজ চাষ শুরু হয়েছিল। বিনা সেচে, বিনা সারে, বিনা কীটনাশকে উদ্বাস্তু মানুষগুলোর পরিশ্রমে খুব সুন্দর ফসল ফলত। জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পেত।"[35] এর পাশাপাশি কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকসংখ্যার দিকে নজর দিলে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১, ৫৮,৪২৭; যেটা ১৯৬১তে ২,৫৭,৩৮২ তে পৌঁছয়। ১৯৫১-১৯৬১ এই সময়কালের মধ্যে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৬২.৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪৯-'৫০-এ কর্ষিত (চাষ করা হয়েছে এমন) জমির পরিমাণ ছিল ৭,৯৭,৫০০ একর, যেটি ১৯৬০-'৬১-এর মধ্যে ৯,০৩,৭১৫ একরে পৌছায়। অর্থাৎ ১৯৪৯-'৫০-এর তুলনায় ১৯৬০-'৬১তে চাষ করা জমির পরিমাণ ১৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[36] আবাদি জমির ১৩.৩ শতাংশ বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের সংখ্যা ৬২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি কৃষিকার্যের দিকে মানুষের আগ্রহকেই প্রকাশ করছে। এতে যেমন উদ্বাস্তু পরিবারগুলির অন্নসংস্থান হয়েছিল তেমনি জেলার অর্থনীতিকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল। পড়ে থাকা নদীর চরগুলিতেও তারা ফসল ফলিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে নদীর চরে কৃষিকাজে পারদর্শী নমঃশূদ্র কৃষকেরা চরগুলিকে আবাদি জমিতে পরিণত করেছিলেন। এর কারণ হিসেবে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা চিত্তরঞ্জন বাবু বলেছেন;- "নদীর চরে ভালো ফসল হয় তাই নমঃশূদ্ররা পছন্দ করে।"[37]

মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুরা খাল-বিল, বাদা-বন, ঝোঁপ-ঝাড়, বন-জঙ্গল সাফ করে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অনুর্বর জমিকে উর্বর জমিতে পরিণত করেন। এ সমস্ত অঞ্চলে চাষাবাদের কথা কেউ ভাবতেও পারত না, সেখানে তারা জমিগুলিকে চাষযোগ্য করে তোলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুর্শিদাবাদের জেলা সদর বহরমপুরের হাতিনগর অঞ্চলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাতিশালা ছিল। সেখানে প্রচুর বনজঙ্গল ছিল। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার ফেনী থানার কালিদহ গ্রাম থেকে আসা উদ্বাস্তুগণ

[35] সাক্ষাৎকারঃ- বিনয়কৃষ্ণ বোস, মালদা।

[36] Malda Gazetteer-1969, p. 152.

[37]সাক্ষাৎকারঃ- চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, বয়স-৭৩, পেশা- উদ্বাস্তু ক্যাম্পে একজন সক্রিয়কর্মী ছিলেন (বর্তমানে মাস্টার নামে পরিচিত), মালদা, তারিখঃ- ১৫/১০/২০২২।

তাদের নেতা কালীমোহন সরকারের নেতৃত্বে সেই বনজঙ্গল সাফ করে বসবাসযোগ্য ও আবাদযোগ্য করে তোলেন।[38] জমি বন্ধক দিয়ে, জমি ক্রয় করে, বিভিন্ন জিনিস চাষ করার মাধ্যমে (যেমন সরষে ইত্যাদি) জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে, বছরে একাধিকবার ফসল ফলিয়ে, জমিকে কিভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তিতে পরিণত করতে হয় তা দেখান উদ্বাস্তুরা। এভাবে তারা অনাবাদি জমিকে আবাদি জমিতে, কম উর্বর জমিকে বেশি উর্বর জমিতে, এক-ফসলা জমিকে দোফসলা জমিতে পরিণত করেছিলেন। প্রকৃত অর্থে তারা জমিকে ব্যবহার করতে জানতেন। উদাহরণস্বরূপ, মুর্শিদাবাদ জেলায় বছরে একাধিকবার চাষ হওয়া জমির পরিমাণের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। ১৯৪৭-৪৮-এ মাত্র ২৮ শতাংশ জমিতে বছরে একাধিকবার চাষ হত, সেখানে ১৯৫৮-৫৯-এ সেই জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৪১ শতাংশে। এই সমস্ত জমিগুলি বাগরি অঞ্চল (ভাগীরথী নদীর পূর্ব অংশ, যা বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা লাগোয়া) এবং কাঁদি সাব ডিভিশনের অন্তর্গত। উপলব্ধ চাষযোগ্য জমির যত শতাংশ চাষ করা হয়েছে এমন জমির পরিমাণ, সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যান্য চাষযোগ্য জমির তুলনায় এই সমস্ত অঞ্চলেই প্রশংসনীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।[39] উল্লেখযোগ্য বিষয় হল; এইসব অঞ্চলে, বিশেষত বাগড়ি অঞ্চলেই উদ্বাস্তুদের বসবাস বেশি ছিল।

পূর্ববঙ্গ থেকে মালদায় আসা উদ্বাস্তুদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিলেন কৃষিজীবীরা আর দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন মৎস্যজীবীরা। নদীমাতৃক এই জেলায় বিভিন্ন রকমের মাছ, কচ্ছপ, বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি ধরে বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।[40] পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যদপ্তর থেকে এই জেলায় রুই, কাতলা, মৃগেল, চিতল, ইংলিশ, পুঁটি, শোল, বোয়াল, ভেটকি ইত্যাদি ৬২ রকমের মাছের বিপুল সম্ভারের উল্লেখ পাওয়া যায়। মালদার মাছ বাইরেও রপ্তানি করা হত।[41] মালদার মতোই মুর্শিদাবাদ জেলায় আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলেন মৎস্যজীবী যারা মাছ ধরে ও মাছ বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে করতেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় মূলত ভাগীরথী নদীর উপস্থিতি এবং এর পাশাপাশি অসংখ্য নদীনালা, খালবিল থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়; যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, কালবোস, রায়খয়রা, চাতলা, পালুই, কই, মাগুর, সিঙ্গি, খসা, পাবদা, ভোলা, চিংড়ি ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকারের এবং এত বিপুল পরিমাণ মাছের সম্ভার, তার সঙ্গে সুলভ বাজার পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুদের কাছে ছিল হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো। এই জেলায় বিভিন্ন পৌরসভা ও পৌরসভার বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলে মাছের বাজার বসত। এখানকার মাছের

---

[38] সাক্ষাৎকারঃ- রমেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী, শিক্ষানুরাগী, গোয়ালজান কলোনি, উদ্ধৃত, ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৯০।

[39] *Murshidabad, Gazetteers-1979,* p. 119.

[40] *Malda Gazetteer-1969,* p. 98.

[41] *Malda, Census,* pp. xii-Ixii.

বাজারগুলি ছিল বহরমপুর সদর শহর, গোরাবাজার, নতুনবাজার, খাগড়াবাজার এছাড়াও বেলডাঙা, শক্তিপুর, জলঙ্গি, সাগরপাড়া, কাজীপাড়া, ডোমকল, লালগোলা আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, ওরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ান, এবং ফারাক্কার বিভিন্ন অঞ্চলে।[42] মুর্শিদাবাদ জেলায় মৎসজীবী উদ্বাস্তুরা বেলডাঙা ব্লকের সুরুলিয়া কলোনি, বহরমপুর ব্লকের হরিদাসমাটি গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত কৃষ্ণমাটি, আয়েশবাগ, সদর ব্লকের কাশিমবাজারের অন্তর্গত মণীন্দ্রনগর কলোনি, লালবাগের সবজিকাটরা, লালগোলা ব্লকের কালমেঘা, কান্দি ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরে, নওদা ব্লকের মধুপুর, ডোমকল ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরে বসবাস করতেন। জিয়াগঞ্জ ব্লকের দেবীপুরে মৎস্যজীবীদের জন্য 'কালিগঞ্জ বাস্তুহারা ধীবর সমবায় সমিতি'ও ছিল। জলঙ্গি ব্লকের সাদিখানদিয়াড়ের স্থানীয় জমিদার ডঃ শিশির কুমার মুখার্জি উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে মৎস্য উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। সামশেরগঞ্জ ব্লকের ধুসুড়িপাড়া কলোনি মৎস্যজীবীদের জন্য মডেল ভিলেজের স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই ব্লকের ইন্দ্রনগরেও মৎস্যজীবীরা বসতি গড়ে তুলেছিলেন।[43]

মালদা জেলার উপর সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট অপারেশনের এম.ও. কার্টারের রিপোর্ট অনুসারে "the mango is another product for which Malda is famous" বিশেষত ফজলি আমের জন্য মালদা সারাদেশে বিখ্যাত ছিল। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে এই জেলায় 'আম রপ্তানি কমিটি', 'মালদা আম উন্নয়ন কমিটি' গঠিত হয়েছিল। এমনকি Jadavpur College of engineering and technology-কেও মালদার আমের ওপর গবেষণার জন্য ৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায় আম উৎপাদন এই জেলার এক অর্থকরী উপার্জনের মাধ্যম ছিল। এই জেলায় আমকে কেন্দ্র করে বহুমুখী পেশার সুযোগ ছিল; আমচাষ ছাড়াও আম সংরক্ষণ ও রপ্তানি করার জন্য 'ফল সংরক্ষণ প্রকল্প'এ এবং আমের তৈরি আমচুর ও আমসত্ত্ব বিক্রি করেও এই জেলার প্রচুর আয় হতো। মালদা জেলার ইংলিশ বাজার ছিল সর্বাধিক আম উৎপাদনকারী থানা। এই থানার এক ষষ্ঠমাংশ, প্রায় ১৫ বর্গ মাইল আমবাগান দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল; এছাড়াও রতুয়া, কালিয়াচক, খড়বা, মালদা, হরিশ্চন্দ্রপুর, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর এবং ভোলাহাটেও প্রচুর পরিমাণে আম উৎপাদন হতো। এর মধ্যে শেষের তিনটি থানা দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে পড়ে যায়।[44] ফলে ওই সকল অঞ্চলের আমকেন্দ্রিক বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত কারবারিরা মালদায় এসে নিজেদের পুরনো পেশায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পান।

শিল্পঃ অবিভক্ত বাংলার হস্তশিল্প, সংস্কৃতি এবং কারু শিল্পের উপর দেশভাগের প্রভাব পড়েছিল। বিভিন্ন হস্তশিল্পী সম্প্রদায় তাদের পেশাকে সম্বল করে এপার বাংলায় গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর আগের

[42] Murshidabad, Gazetteers-1979, pp. 133-134.

[43] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৮২-১১৪।

[44] *Malda Gazetteer-1969,* p. 87-88; *Malda Census-1951,* p. xIvi.

অধ্যায়েও আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পর্কিত পণ্য প্রস্তুতকারি কারিগররা তাদের উচ্চবর্ণের হিন্দু পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। দেশভাগের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছিল ছয়টি কারিগর সম্প্রদায়ের উপর;- কুমোর, শাঁখারি, তাঁতশিল্পী, কংসবনিক, পাটি, মাদুর প্রস্তুতকারক এবং শোলার কারিগর।[45] এই কারিগররা তাদের নৈপুণ্য এবং দক্ষতাকে সঙ্গে নিয়ে এপারে এসেছিলেন, যার অনুশীলনে তারা যেমন জীবিকা নির্বাহ করতে পেরেছিলেন তেমনি এই জেলা দুটির হস্তশিল্পও প্রসার লাভ করেছিল।

কাঁসা-পিতল শিল্পে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ যে কতটা সুখ্যাতি অর্জন করেছিল তা ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'মধ্যযুগে বাংলা' নামক গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছিলেন; 'মুসলমান অধিকারে মালদহে ও ঢাকায়; পরে মুর্শিদাবাদে ও বর্ধমানের দাঁইহাটে কাঁসা পিত্তলের বাসন নির্মাণের উন্নতি হইয়াছিল"। সেখানে তিনি মুর্শিদাবাদের খাগড়ার কাঁসাশিল্পের উৎকৃষ্টতাও বর্ণনা করেছেন; " খাগড়াই বা অন্যস্থানের কাঁসার বর্তমান সুন্দর গঠন, একালের বিদেশী দ্রব্যের অনুকরণে জন্মিয়াছে।...মোগল অধিকারে উৎসাহপ্রাপ্ত দিল্লী ও মুরাদাবাদ অঞ্চলের বিদরীর কার্য্য মুর্শিদাবাদে নকল হইয়া এককালে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল"[46] ১৯২৯ সালে বাংলার কুটির শিল্পের উপর করা একটি সার্ভের রিপোর্ট অনুসারে অবিভক্ত মালদা জেলার বিভিন্ন জায়গায় ৬৫০ জন পিতল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন নবাবগঞ্জ থানার অধিবাসী, যেটি বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত।[47] অবিভক্ত মালদায় কাঁসা-পিতল শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ইংলিশ বাজার, কালিয়াগ্রাম, মাজপাড়া ও আড়াইপুর। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর এই শিল্পে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক পরিবার নবাবগঞ্জ, কানসাট এবং সাকেরবাটি (পূর্ব-পাকিস্তান) থেকে ইংরেজ বাজার, আরাইপুর এবং মাজপাড়ায় চলে এসেছিল। অবিভক্ত মালদার কংসবণিকরা চামচ, হাতা, পান রাখার জন্য ডাবর তৈরিতে সারা বাংলায় সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এমনকি সেই সময় সারা দেশে কাঁসা ও পিতলের তৈরি চামচ এবং পান রাখার ডাবরের সিংহভাগই এই মালদা জেলা থেকে সরবরাহ করা হত। এই কাঁসা-পিতল শিল্পের প্রধান কেন্দ্রটি ছিল নবাবগঞ্জে, যেখানকার বেশিরভাগ শিল্পী ছিলেন মুসলিম। ওখানকার হিন্দু কারিগররা চলে আসেন ইংলিশ বাজার ও আড়াইপুরে। স্থানীয় অঞ্চলে তাদের তৈরি ঘড়া ও জামবাটির বিশেষ চাহিদা ছিল।[48] ১৯৬০ সালে সমগ্র মালদা জেলায় পিতল এবং কাঁসার শিল্পের জন্য ৪৪টি শিল্প

---

[45] অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত, "মালদার হস্তশিল্প-দুই চারটি কথা", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২৩, ইতিহাস না ইতিহাসঃ মালদা এবং বিষয়ান্তর,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২৩), পৃ. ১৩৬-১৩৭।

[46] শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাঙ্গলা,* (কলকাতাঃ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, আশ্বিন ১৩৩০), পৃ. ৩১১।

[47] *Malda Gazetteer- 1969,* p. 110.

[48] Ibid, p. I x.

প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল, যেগুলিতে ২১৬ জন কর্মী ছিলেন।[49] এদের মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরাও ছিলেন। ১৯৫৭-এর দেশভাগের পরও বহু কংসবনিক পরিবার ওপার থেকে এপারে মালদায় চলে এসেছিল; তারা পুরাতন মালদা, ইংরেজবাজারের বাবুপাড়া, মিস্ত্রিপাড়া, ফুলবাড়ি, গোলাপট্টি প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাদের হাত ধরেই মালদায় কাঁসা-পিতল শিল্পে নতুন জোয়ার আসে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কংসবণিকদের দ্বারা তৈরি হত বিবিধ রকমের থালা, রেকাবি, পুষ্পপাত্র ইত্যাদি বহুবিধ বাসনপত্র। কাঁসার বাসনপত্র তৈরি করতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। গড়নদার (যে কাঁসা গলায় ও ছাঁচে ঢালে) একজন, পিটনদার (যে হাতুড়ি দিয়ে পেটায়) ছয় জন, চাঁছনদার (যে থালা চেঁছে সোনালি রং বার করে) একজন, কুদনদার (যে পালিশ করে) দুইজন এবং মাঠনদার (যে পুরোপুরি আকৃতি দেয়) লাগে একজন।[50] মুর্শিদাবাদ জেলায় কাঁসা শিল্প-কেন্দ্রগুলি মূলত খাগড়া, কান্দি ও বহরমপুরে ছিল, বহরমপুরের কাঁসারিবাজার মৌজা, খাগড়ার কাঁসারিপট্টি নামগুলি তা প্রমাণ করে।[51] মালদার মতো মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন জায়গাতেও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কাঁসা-পিতল শিল্পীরা বসবাস করেন। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা ব্লকের অন্তর্গত বড়ুয়া-সরুলিয়া কলোনিতে বহু উদ্বাস্তু কংসবণিক পরিবার বসবাস করেন।[52]

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাংলা' থেকে জানা যায়, ঢাকা শাঁখা শিল্পে প্রসিদ্ধ ছিল।[53] দেশভাগের সময় সেখান থেকে অনেক শাঁখারীরাও চলে আসেন। কারণ তাদের পেশা মূলত হিন্দুধর্মের মানুষের প্রয়োজন মেটাত, ফলে পূর্ববঙ্গে তাদের বাজার কমতে লাগল। মালদার গল্পকার প্রয়াত অমিত গুপ্ত তার 'মূর্তি চোর অথবা গল্পকার' শীর্ষক গল্পে এই এলাকার শঙ্খখোলের ঐতিহ্যবাহী শিল্প সম্পর্কে লিখেছেন। শঙ্খখোলের পাশাপাশি পঙ্খের কাজ নিয়েও তার গল্পে উল্লেখ পাওয়া যায় "সারা পৃথিবীতে পঙ্খের কাজ কেবল মালদা-মুর্শিদাবাদেই হত"। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য; শাখের গুড়োকে বিশেষ পদ্ধতিতে জমিয়ে পঙ্খের কাজ হয়।[54] মুর্শিদাবাদে শঙ্খখোল নির্মিত জিনিসপত্রের শিল্প ডোমকল, জঙ্গিপুর, লক্ষীকান্তপুর ইত্যাদিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানকার প্রায় ৩০ হাজার মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, শাঁখের তৈরি চুড়ি, বালা, আংটি ইত্যাদি তৈরি করা ছিল যাদের মূল কাজ।[55] দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের শাঁখাশিল্পীদের যে কি আতান্তরে পড়তে হয়েছিল নিচের ঘটনাটি তা প্রমাণ করে। রাজশাহী জেলার জামনগর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত সঞ্জয়চরণ ধর পারিবারিক সূত্রে শাঁখার বনিক

---

[49] *Malda Gazetteer- 1969,* pp. 110-117.

[50] অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত, *মালদার হস্তশিল্প,* পৃ. ১৩৮।

[51] *Murshidabad, Gazetteers, 1979,* p. 319.

[52] সাক্ষাৎকারঃ- পূরবী মন্ডল, গোয়ালজান কলোনি, উদ্ধৃত, ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৮৫-৮৬।

[53] শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাঙ্গলা,* পৃ. ৩২০।

[54] অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত, *মালদার হস্তশিল্প,* পৃ. ১৪০।

[55] *Murshidabad, Gazetteers, 1979,* p. 161.

ছিলেন। দেশভাগের সময় মামার সঙ্গে বর্ধমানে এসে কয়েক মাস অবস্থান করে আবার পূর্ববঙ্গে ফিরে গিয়ে পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের অশান্ত পরিবেশে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষে চলে আসেন ও বাংলাদেশ স্বাধীন হলে দ্বিতীয়বার সেখানে ফিরে যান। কিন্তু সেইবার শাঁখার তেমন খদ্দের আর পেলেন না; ফলে পাকাপাকিভাবে বাংলাদেশ ছেড়ে মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় পৈতৃক ব্যবসা পুনর্স্থাপন করেন।[56]

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মণ্ডপসজ্জা, হিন্দুদের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, পূজায় দেবদেবীর অঙ্গের আবরণ ও অলংকার সজ্জা (ডাকের সাজ), শোলার ক্যানভাসে দেবদেবীর চিত্র, ঘটচিত্র, করন্ডিচিত্র, মুখচিত্র, বিয়েতে কুচিমালা বরের টোপর, কনের মুকুট, ইত্যাদিতে শোলার তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী ব্যবহারের প্রচলন আছে। বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ (ঢাকা), মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, যশোর, রংপুর, দিনাজপুর ও বরিশাল অঞ্চল শোলাশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এক সময় পুরনো ঢাকার মালিটোলা এলাকায় এ শিল্পের কারিগর, মালাকারদের বসবাস ছিল বলে ওই এলাকার নাম হয়েছে মালিটোলা। জানা যায়, বর্তমানে সেখানে শোলার কাজ তেমন হয় না।[57] ধর্ম পালনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত এই শোলার সামগ্রী প্রস্তুতকারি 'মালাকার' সম্প্রদায় দেশভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে নিজেদের পেশাকে আর ধরে রাখতে পারছিলেন না। ইতিপূর্বে তাদের পৃষ্ঠপোষকরা দেশত্যাগ করায় তারা খদ্দের পাচ্ছিলেননা; ফলে এপার বাংলায় এসে তারা বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েন। অন্যান্য কারুশিল্পের মতোই শোলাশিল্প মূলত বংশানুক্রমিক; এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পরিবারের মধ্যেই এই শিল্পের শিক্ষা বাহিত হয়। মালদা জেলার ইংরেজবাজার শহরে মকদমপুর, কালিতলা, ফুলবাড়ি ও বাবুপাড়ায় শোলা শিল্পের কারখানা গড়ে উঠেছিল।[58] অধ্যায়ের শুরুতেই দেখা গেছে ওই সকল এলাকায় উদ্বাস্তুদের ভিড় জমে উঠেছিল।

মালদা জেলা প্রাচীনকাল থেকেই সুতি এবং রেশম বস্ত্রবয়ন শিল্পে প্রসিদ্ধ জেলা। জামদানি এবং মসলিনের বস্ত্র প্রস্তুতেও মালদার সুখ্যাতি ছিল। এখানে কাঁচা রেশম এবং রেশমের সুতো উৎপাদন করা হত। অবিভক্ত মালদার উত্তরে রতুয়া থানা থেকে শুরু হয়ে মানিকচক, কালিয়াচক, শিবগঞ্জ এবং নবাবগঞ্জ থানা হয়ে দক্ষিণে গঙ্গার সাথে মহানন্দার সংযোগস্থল পর্যন্ত অঞ্চলে খুব ভালো লাক্ষা চাষ হত। দেশভাগের ফলে শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ থানা পূর্ববঙ্গে চলে যায়।[59] এই দুই থানার রেশম চাষীরা দেশভাগের পর মালদার ওই সমস্ত অঞ্চলে এসে রেশম চাষ শুরু করেছিলেন। শুধু রেশম চাষীরাই নয় রেশম শিল্পের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যরা, যেমন কাঁচা

---

[56] সাক্ষাৎকারঃ- সঞ্জয়চরণ ধর, বয়স-৯৫, পেশা-বংশগত শাঁখা শিল্পী, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২৪/১১/২০২২।

[57] http://bn.banglapedia.org/index.php/, Last Accessed on 06/08/2025.

[58] অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত, *মালদার হস্তশিল্প,* পৃ. ১৪০-১৪১।

[59] *Malda Gazetteer- 1969,* pp. 101-110.

রেশম প্রস্তুতকারক, রেশম সুতো প্রস্তুতকারক, রেশম বস্ত্রবয়নকারী, একই রকম ভাবে তাঁত শিল্পের সঙ্গে জড়িত সূত্রকার ও বয়নশিল্পীরা যারা দেশভাগের পর এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন। তারা এখানকার বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেরা যেমন উপার্জনের উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন, তেমনি এখানকার বস্ত্র শিল্পকেও সমৃদ্ধ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, রাজশাহী, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা অঞ্চলের মানুষেরা তাঁত ও রেশমের সুতো তৈরি, বস্ত্র তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[60] দেশভাগের সময় তাদের অনেকেই মালদা জেলার ইংলিশ বাজার ও তার কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে বসতি স্থাপন করেন ও নিজেদের পেশায় যুক্ত হন। তাদের দক্ষতার কারণে কাঁচা রেশম উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পূর্ববঙ্গের বস্ত্রশিল্পীরা তাদের সাথে ঐতিহ্যবাহী নকশা ও বয়ন-কৌশল নিয়ে এসেছিল, যেমন জামদানি ও মসলিনের মতো সূক্ষ্ম কাজ। এই নকশাগুলি মালদার রেশম শিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করে এবং স্থানীয় বাজারে বৈচিত্র্য বাড়ায়। উদ্বাস্তুদের এই প্রতিভা স্থানীয় কারিগরদের সাথে জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে শিল্পের মান উন্নত করতে সাহায্য করেছিল। ১৯৬৯-এ প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুসারে; ১৯৬২-৬৩ এর দিকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ৮০ শতাংশ রেশম সুতো মালদা জেলা থেকেই উৎপন্ন হত। সেই সময় এই জেলায় প্রায় ৩ লাখ মানুষ রেশম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইংলিশ বাজার, জালালপুরে রেশম পালনকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল।

শুধু তাই নয় রেশমকীট পালক, রেশম সুতো প্রস্তুতকারক ও রেশম বস্ত্রবয়নশিল্পীদের হাত ধরে বহু সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। এই জেলার এরকম ১২টি সমবায় সমিতির মধ্যে রামকৃষ্ণ কলোনি এবং আইহোতে দুইটি রেশম-বর্জ্যজাত সুতো প্রস্তুতকারকদের সমবায় সমিতি খোলা হয়েছিল, যে দুটি পুরোপুরি উদ্বাস্তু মহিলাদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। শিল্প অধিদপ্তর থেকে এই সব মহিলাদের রেশম-বর্জ্য থেকে সুতো কাটতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ২৪০ জন সদস্যের এই সমিতি থেকে সেই সময় পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল হল ১২০০ টাকা। শিবগঞ্জ এলাকার উদ্বাস্তু বয়নশিল্পীদের নিয়ে রামকৃষ্ণ কলোনিতে যে সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল সেখানে ৩০ জন সদস্যর পরিশোধিত মূলধন ছিল ১৫০০ টাকা। রেশম শিল্প ছাড়াও এই জেলার হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্রবয়নশিল্প ছিল অন্যতম প্রধান শিল্প। সরকারি তথ্য অনুসারে; ১৯৬০ সালে মালদা জেলায় স্থাপিত ৫৩৫৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ছিল হস্তচালিত তাঁতে বুননকে কেন্দ্র করেই। ২৪৮২টি তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কর্মীর সংখ্যা ছিল ৫৭৪৩ জন। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বেশিরভাগই ছিল মূলত কালিয়াচক, ইংলিশ বাজার এবং মানিকচকে। এছাড়াও মালদা, খড়বা, বামনগোলা, গাজোল, রতুয়াতেও ছিল অল্প সংখ্যক। এ সকল কর্মীদের নিয়ে মালদা জেলার বিভিন্ন থানায় ৩৪টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছিল। হস্তচালিত যন্ত্রে রেশম সুতো

[60] মোঃ সোহেল আনোয়ার অপু, বাংলাদেশের তাঁত শিল্পঃ অতীত ও বর্তমান, ৬-ই অক্টোবর, ২০২০, তাহিতী, https://www.tahitybangali.com/, Last Accessed on 02/02/2024।

কাটার কাজকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল ১০৩টি প্রতিষ্ঠান, যেখানে নিযুক্ত কর্মী সংখ্যা ছিল ৪৪৮২ জন।[61] পূর্ববঙ্গ থেকে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু এসে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মালদায় বিভিন্ন শহরে যেমন তাঁতবস্ত্র ও রেশম বস্ত্রের বাজার তৈরি হয়েছিল তেমনি গ্রামের হাটগুলি তাঁতিদের তাঁতের শাড়ি, গামছা ও রেশমের বসন বিক্রি করার অন্যতম ক্ষেত্র ছিল। দেশভাগের পূর্বে কালিয়াচকের হাট, নবাবগঞ্জের হাট, পাকুয়াহাট, বুলবুলচন্ডির হাট, আমামিগঞ্জ, নুরপুর, মথুরাপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর সর্বত্রই তাঁতের শাড়ির চাহিদা ছিল। দেশভাগের ফলে নবাবগঞ্জের সঙ্গে আমামিগঞ্জও পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়ে। পুজোর সময় তাঁতিরা শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাড়ি ফেরি করতেন। সুজাপুর, জালালপুর, গয়েশপুর, আরাপুর, রামচন্দ্রপুর, কালিয়াচকে ঠকঠকি তাঁতের কাজ হতো। মঙ্গলবাড়ি, লক্ষ্মীপুর, হাবিবপুর, সাহাপুর, সিকমাতেও তাঁতিরা ছিলেন। পরবর্তীকালে সুজাপুর, জালালপুরে তাঁত কারখানা চালু হলে সেই কারখানায় তারা শ্রমিক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন।[62]

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তু পরিবারগুলি পদ্মা নদীর তীরে ফাঁকা জায়গায় বসতি গড়ে তোলেন। সেখানে তারা তাদের পূর্বের জীবিকা, তাঁতশিল্পকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত প্রায় ২০০-২৫০ এই সকল উদ্বাস্তু পরিবারগুলির বসতিকে কেন্দ্র করে লালগোলায় গড়ে ওঠা পাড়াটি 'তাঁতিপাড়া' নামে পরিচিতি লাভ করে।[63] বহমপুরের হাতিনগর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কালিতলাদিয়ার গ্রামে ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহ থেকে মুক্তগাছার জমিদার জগৎকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র জীবেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এসেছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য ৫০-৬০টি তাঁত বসিয়েছিলেন; যাতে তারা গামছা, লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি তৈরি করতে পারে। এছাড়াও জিয়াগঞ্জ ব্লকের দেবীপুরে অনেক উদ্বাস্তু, রেশম শিল্প ও খাদি শিল্পের সঙ্গে যুক্তছিলেন বলে জানা যায়।[64] এই জেলার সদর ব্লকের কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীশনন্দী স্বাধীনতার পরে ৮০-তাঁতের 'মণীন্দ্র উইভিং মিল' তৈরি করেছিলেন। কাশিমবাজার স্টেশন সংলগ্ন মণীন্দ্রনগরে এই জমিদারি এস্টেটের আমবাগানে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনির বাসিন্দারা, এই মিলে কাজ করতেন। ১৯৫২ সালের বঙ্গলক্ষী কটন মিলের মালিক এসপি চৌধুরী কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রকের আর্থিক সাহায্যে গড়ে তোলেন 'বেঙ্গল টেক্সটাইল স্পিনিং মিল' (B.T. Mill), এখানে কয়েকশো উদ্বাস্তু কাজ করতেন; বর্তমান গবেষণায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এর আগের অধ্যায়ে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে এসপি চৌধুরী কাশিমবাজার রাজপরিবার থেকে মণীন্দ্র মিল কিনে নেন। মনিন্দ্রনগর ও হাতিনগর কলোনির বহু মানুষ এখানে কাজ করে

---

[61] *Malda Gazetteer- 1969,* pp. 113-118.

[62] জগদীশ মন্ডল, "মালদহের বস্ত্র শিল্পের গৌরব, চরম সংকট এবং বাঁচার উপায়", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহার্নব, বিষয়ঃ মালদা জেলা - সেকাল ও একাল,* (বহরমপুরঃ অষ্টম বর্ষ-২০১৯) পৃ. ১৫৮-১৫৯।

[63] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৭-ই মে ১৯৪৮।

[64] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৯০ ও ১১০।

উপার্জন করতেন।[65] মণীন্দ্র মিল, বেঙ্গল টেক্সটাইল, বঙ্গলক্ষী মিল বহু উদ্বাস্তু পরিবারকে বাঁচিয়েছিল। সেই সময় এই মিলগুলিকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তুদের বসতি ঘন হতে দেখা যায়, সেখানে তাদের অনেকেরই কর্মসংস্থান হয়। আগের অধ্যায়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশভাগের পর উদ্বাস্তু স্বর্ণশিল্পীদের অস্থায়ী ঠিকানা হয়েছিল বহরমপুরের খাগড়া। স্বর্ণশিল্পী আন্দোলনের অন্যতম নেতা নন্দদুলাল বসাকের পুত্র গোপাল বসাক এক সাক্ষাৎকারে জানান, পূর্ববঙ্গ থেকে সীমান্ত পার হয়ে বহু স্বর্ণশিল্পী পরিবার খাগড়ার এই সোনাপট্টিতে এসেছিলেন, অনেকে আবার প্রথমে কলকাতায় ও পরে খাগড়ায় এসেছিলেন।[66]

১৯৫৮ সালে পশিমবঙ্গ সকারের রাজ্য স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় জানা যায়, সমগ্র রাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ঝিনুকের বোতাম তৈরি হয় এবং এর জন্য জেলা দুটি বাংলা ও বাংলার বাইরে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়,- ''১৯৪৭ সালের পরে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারাই এই শিল্প প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল এবং এটিকে হস্তশিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য পেশা হিসেবেও অনুসরণ করা হয়''। দেশীয় ঝিনুক ও প্রাথমিক সরঞ্জাম দিয়ে এই বোতামগুলি তৈরি করা হত; কলকাতা তো বটেই এমনকি উন্নত কারিগরিতার কারণে সুদূর দিল্লি, মুম্বাই এবং উত্তর-প্রদেশেও এর চাহিদা ছিল। মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ কতে হয়। সমীক্ষায় এই জেলায় গ্রামে ৫৩টি ইউনিট ও মোট ৩৪টি প্রতিষ্ঠান এবং কাশিমবাজারের মণীন্দ্রনগর কলোনিতে ৪০টি ইউনিটের বোতাম তৈরির যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। মধ্যস্থতাকারী বা দালালের হাত ধরে এই সকল উৎপাদকরা কলকাতার বাজারে পাইকারি বিক্রেতার সঙ্গে কারবার করতেন বলে জানা যায়। এই সকল বোতাম-শিল্পীদের হাত ধরে যে সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছিল তা থেকে তারা ঋণ পেতেন, ঘোড়ামারা বিল এমনই একটি সমিতি সমীক্ষায় যার উল্লেখ পাওয়া যায়।[67]

মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় আগত বহু উদ্বাস্তু পরিবারের অবলম্বন ছিল এখানকার বিড়ি শিল্প, যা তাদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী করেছিল। সহায়-সম্বলহীন শরণার্থী পরিবারগুলোর মাথায় যখন আশ্রয়ের ছাদটুকুও ছিল না, তখন বহু সংখ্যক সেই সকল পরিবারের অন্নসংস্থানের উপায় ছিল এই বিড়ি শিল্প। বিড়ি শিল্প মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বিশেষত্ব। ভারত সরকার বিড়ি শিল্পের জন্য প্রতিবছর জঙ্গিপুর মহকুমা থেকে মোটা টাকা কর

---

[65] সাক্ষাৎকারঃ- চিত্তরঞ্জন চন্দ, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, মনিন্দ্র নগর, উদ্ধৃত, ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ১০০-১০১।

[66] সাক্ষাৎকারঃ- গোপাল বসাক, স্বর্ণ শিল্পী, খাগড়া, উদ্ধৃত, *ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৯২।

[67] *Button Industry in Nadia and Murshidabad-A Type-study*, West Bengal Govt Press, Alipore, 1959 pp.1-3.

আদায় করে থাকে। এর থেকেই বোঝা সম্ভব এই দুই জেলার অর্থনীতিতে বিড়ি শিল্পের অবদান কতখানি। সমগ্র ভারতবর্ষে বিড়ি শিল্পে এই দুই জেলা অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করে নিয়েছে। যদিও বিড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের কোনটাই এই দুই জেলায় উৎপাদিত হয় না। বিড়ির পাতা আসে সুদূর মহারাষ্ট্র, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি থেকে, তামাক আসে অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক থেকে ও সুতো আসে আমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, কর্ণাটকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। তবুও এই দুই অঞ্চল ভারতবর্ষে বিড়ি তৈরিতে অগ্রগণ্য। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য।[68] জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রতিদিন প্রায় ৩০-৪০ কোটি বিড়ি উৎপাদিত হয়। মুর্শিদাবাদের ঔরঙ্গাবাদে প্রায় ৪০-৫০টি বড় মাপের বিড়ি ফ্যাক্টরি আছে, এছাড়াও আছে ধুলিয়ান ও বাসুদেবপুরে। এখানকার বিভিন্ন বিড়ি কোম্পানির মধ্যে 'পতাকা বিড়ি' প্রত্যেকদিন ১৪ কোটি বিড়ি উৎপন্ন করে থাকে। ঔরঙ্গাবাদে অবাঙালি উদ্যোগে প্রথম বিড়ি কারবার শুরু হয়। ১৯২০ সাল থেকেই এই শিল্প রমরমিয়ে চলতে থাকে। মালদা-মুর্শিদাবাদের অর্থনীতি বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ধ্বংসের দিকে চলে যাওয়ার পর ১৯৪৭ সালের দেশভাগ বহু কৃষি-নির্ভর পরিবারগুলিকে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দেয়। তার কারণ সীমানার ওই পারে থেকে যায় তাদের চাষযোগ্য জমি-জমা ও এই পারে বসতবাড়ি। পিতৃপুরুষের বসতবাড়ির টানে এই দুই জেলার অধিকাংশ মানুষ সীমানা পার করে ওই দেশে যেতে পারেননি। তারা সর্বহারা হয়ে এপারেই থেকে যান। এরপর নদীভাঙ্গনে তলিয়ে যায় বিঘার পর বিঘা ফলনশীল জমি; তার সাথে তলিয়ে যায় হাজার হাজার মানুষের মুখের গ্রাসও। কোথাও বা জমির উপর চর পড়ে সৃষ্টি হয় বালিয়াড়ি। কর্মহারাদের সংখ্যা আরো বাড়তে থাকে। এই সমস্ত মানুষের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে নামমাত্র মজুরি দিয়ে শুরু হয় বিড়ি বাঁধানোর কাজ। পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশের বিপুল চাহিদার যোগান দিত ঔরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ানের এই বিড়ি শিল্প।[69] দেশভাগের পরে হতদরিদ্র উদ্বাস্তুরা মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলায় এসে দারিদ্রমোচন ও জীবনধারণের জন্য অনেকেই এই বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। তারা বিড়ি-শ্রমিকের খাতায় নিজেদের নাম লেখান। এতে বিড়ি শিল্পেও সুলভ শ্রমিকের যোগান বজায় থাকে। কারণ, বিড়ি শিল্পে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়; যাদের বলা হয় বিড়ি-কারিগর; যেমন,- যারা বিড়ি যাচাই করে গুনতি করে তাদের চেকার বলা হয়, যারা কোম্পানির ঢাকি ছাড়েন তাদের ঢাকিমাস্টার, যারা জালের বিড়ি যাচাই করেন তাদের জালমাস্টার, যারা বিড়ির সেঁকেন তাদের ভাটিম্যান, যারা ভাঁটির দায়িত্বে থাকেন তাদের ভাঁটিমাস্টার, যারা বিড়ির লেভেলিং করেন তাদের প্যাকার্স, প্যাকার্সদের যোগাযোগ রাখতে হয় সেন্টারের সঙ্গে।[70]

---

[68] *মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার- ২০০৩,* পৃ. ৩৩৩।

[69] *Murshidabad, Gazetteers, 1979,* p. 161.

[70] মোঃ শামসুদ্দীন, *ইতিহাসের আলোকে জঙ্গিপুর,* (বহরমপুরঃ শিল্পনগরী প্রকাশনী, ২০১৩) পৃ. ৮০-৮২।

এইভাবে এই দুই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন যাদের মধ্যে রয়েছেন উদ্বাস্তুদের এক বিশাল অংশ। এই শিল্পের একটা সুবিধা হল বিড়ি বাঁধার কাজটি করেন মূলত মহিলারা। সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এই দুই জেলার মহিলাদের বিড়ি বেঁধে উপার্জন করতে দেখে উদ্বুদ্ধ হন উদ্বাস্তু মহিলারা। তাই পরিবারের পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি কিছু বাড়তি উপার্জনের আশায় ঘরের মেয়ে-বউরা, এমনকি বাড়ির ছোটরাও বিড়ি বেঁধে পরিবারের হাল ফিরিয়েছিলেন। উদ্বাস্তু মহিলাদের একটা বিরাট অংশ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। জলঙ্গি ব্লকের বারোমাসিয়া কলোনি, সূতি-১ ব্লকের রমাকান্তপুর উদ্বাস্তু কলোনির মহিলারা বিড়ি বাঁধার সঙ্গে যুক্ত।[71] মুর্শিদাবাদের ধুসুড়ীপাড়া ও ইন্দ্রনগর কলোনির প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ বিড়ি শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত। ইন্দ্রনগর কলোনির মন্টু কুন্ডুর কথায়, "আমরা মুর্শিদাবাদের নিমতিতা স্টেশনে এসে উপস্থিত হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী আম বাগানে অস্থায়ী বসতি নির্মাণ করে থাকতে শুরু করি। এখানে আমাদের কোন অসুবিধাই হয়নি। কারণ, এই এলাকায় বিড়ি শিল্প থাকায় সকল উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেরা বিড়ি শিল্পে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হয় ও মহিলারা ঘরে বসে বিড়ি বেঁধে রোজগার করে"। এর জন্য তারা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেও দাবি করেছেন তিনি।[72] মালদা জেলাতেও বিপুল সংখ্যক বিড়ি-শ্রমিকের দেখা মেলে। ১৯৬০ সালে এই জেলায় ৫৩৫৪টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল; যার সিংহভাগ ছিল তাঁতশিল্পের জন্য ২৪৮২টি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য ১০১৭টি। বিড়ি শিল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৫৩টি। অথচ এসব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল অবাক করার মতো। যেখানে তাঁত এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য বরাদ্দ প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যথাক্রমে ৫৭৪৩ ও ৬৯৯৯ জন শ্রমিক যুক্ত ছিলেন; সেখানে বিড়ি শিল্পের জন্য মাত্র ১৫৩টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৪৪৯৪ জন শ্রমিক যুক্ত ছিলেন।[73] বরাদ্দের বিচারে এই শিল্পটি ষষ্ঠ স্থানে থাকলেও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যার বিচারে এটি তৃতীয় স্থানে। এর দ্বারাই বোঝা যায়, মালদাতেও বিপুল সংখ্যক মানুষ বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত যাদের মধ্যে উদ্বাস্তুদের একটি বড় অংশ ঢুকে আছে।

৫.২ মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের সাংস্কৃতিক প্রভাবঃ

উদ্বাস্তু আগমনের ফলে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটতে থাকে এবং এই দুই জেলায় এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হয়। মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-রেওয়াজের পাশাপাশি ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের হাত ধরে এই দুই জেলার স্থানীয় অনুষ্ঠানাদি ও পূজা-পার্বণের সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় পূজা-পার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন শুরু হয়। এমনকি লোকসংস্কৃতিতেও এই

---

[71] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৮৩ ও ১০৮।

[72] সাক্ষাৎকারঃ- নারায়ণ হালদার, বয়স-৭৪, পেশা-দর্জি, ধুসুড়িপাড়া কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখ-২১/১১/২০২২।

[73] *Malda Gazetteer-1969,* p. 116.

সংমিশন হতে থাকে।[74] পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে প্রতিপালিত মানুষজন পূর্ববঙ্গের এবং পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতিতে প্রতিপালিত মানুষজন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে থাকেন। পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে হিন্দুরা যে পিঠে-পুলি-পুরী-পায়েস ইত্যাদি করে থাকে তার প্রচলন এই দুই জেলায় মুসলিম পরিবারের মধ্যেও দেখা যায়। পূর্ববঙ্গের জলাভূমি নির্ভর জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষ নৌকা বাঁইচ বা বাছারি বাঁইচ এর প্রচলন করে এপার বাংলা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন।[75] ওপার বাংলার জলাভূমিতে বসবাসকারী শরণার্থীদের আগমনে নদীবহুল মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায়, ওপার বাংলার প্রচলিত এই ধারা খুব সহজেই জায়গা করে নিয়েছে। রানীনগর ব্লকের চর-দুর্গাপুরে ওপার বাংলার মানুষের সাথে সাথে এসেছিল তাদের সংস্কৃতির একটি অংশ; শালকাঠের থান। সাত দশক ধরে শাল কাঠের কাঠামোতেই পুজো হয়, নিয়ম মেনে হয় বলিদান আর বাতাসার ভোগ। বর্তমানে সেই পুজো ঘিরে হাজার হাজার মানুষের সমাগম দেখা যায়। এমনকি ওপার বাংলায় রাজশাহী জেলার সাত পুরুষের ভিটে 'দুর্গাপুর' গ্রামের নামের ছোঁয়াটুকু তারা পরম যত্নে জুড়ে দিয়েছেন এই চরের সঙ্গে। এমনকি পদ্মানদীর প্লাবনে চর ডুবে গেলেও মেলা আর পুজো বন্ধ থাকেনি কখনো। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি মেলা বসে। যার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে বহু লোক সমাগম হয়। মেলা কমিটির সম্পাদক দ্বিজেন মন্ডলের কথায় "অনেক কিছুই নেই, কিন্তু আমাদের এই মেলা এখনও আছে। চার দিনের এই মেলার জন্য সারা বছর মানুষ অপেক্ষা করে"।[76]

এগুলি ছাড়াও একটি বিশেষ সংস্কৃতির কথা জানতে পারা যায়, যা তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার বারিন্দ অঞ্চল, মালদা, দিনাজপুর, রাজশাহী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মাসের পয়লা থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত সমগ্র ভাদ্রমাস জুড়ে এই সমস্ত এলাকার কারো না কারো বাড়ির উঠোনে বসত গল্পের আসর। সাধারণত রাতের খাওয়া দাওয়ার পর শুরু হত এবং চলত গভীর রাত পর্যন্ত। কৃষিনির্ভর এই সব মানুষেরা সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই ভাদ্র মাসেই একটু অবসর পেতেন। কারণ এই সময় ভাদই বা ভাদেই অর্থাৎ আউশ ধান ঘরে উঠে যেত এবং হেঁউত বা হেমুই অর্থাৎ আমন ধানের রোপনও প্রায় শেষের মুখে থাকত। এই অবকাশ যাপনে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে তারা হালকা মেজাজে গল্পের আসরে মেতে উঠতেন। কথকের ডাক পড়ত। বসত গল্পের আসর। এক এক বাড়িতে তিনদিন, পাঁচদিন, সাতদিন কখনও আবার এক মাস ধরেও আসর বসত। গল্প কথককে পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থাও চালু ছিল সঙ্গে হত ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়া। গৃহস্থও বেশ আনন্দের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করতেন সঙ্গে আবার সাধ্যমতো উপহারও দিতেন। এই প্রথার প্রচলনের পেছনে ছিল এক বিশ্বাস বা সংস্কার। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, গল্প শোনালে গল্পকারের যেমন মঙ্গল, তেমন শ্রোতারও মঙ্গল হয়; সঙ্গে গৃহস্থের মঙ্গল তো আছেই। গ্রামের মানুষের আরও বিশ্বাস, গল্প শোনাতে হবে বা শুনতে হবে ভাদ্র মাসে। অন্য সময়

---

[74] রমাপ্রসাদ ভাস্কর, "বিপর্যস্ত উদ্বাস্তু বৃত্তান্ত ও মুর্শিদাবাদ" মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহানর্ব, বিষয়ঃ দেশভাগের যন্ত্রনা,* (বহরমপুরঃ দশম বর্ষ-২০২১) পৃ. ২৬।

[75] সাক্ষাৎকারঃ- বিনয়কৃষ্ণ বোস, মালদা।

[76] সাক্ষাৎকারঃ- দ্বিজেন মন্ডল, চর দুর্গাপুর, রানীনগর ব্লক, উদ্ধৃত, ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ১০৪।

শোনালে দুপক্ষেরই অমঙ্গল; কারণ ভাদ্র মাসেই কাজ কম। অন্য মাসে গল্পের আসরে মজে গেলে কাজের ক্ষতি। এই মঙ্গল-অমঙ্গল, বিশ্বাস-সংস্কার থেকেই একটি রীতি আনুষ্ঠানিক প্রথায় পরিণত হয়েছিল; যা ছিল শুধুই অবকাশ যাপন বা বিনোদনের মাধ্যম তাই একদিন হয়ে উঠেছিল অবশ্যপালনীয় রীতি। ১৯৬০ পর্যন্ত এই সংস্কৃতির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তবে বর্তমানে এই প্রথা আর নেই বললেই চলে। তবুও বিচ্ছিন্নভাবে কারো কারো বাড়িতে কখনো-সখনো মানুষের আগ্রহে এই গল্পের আসর বসত। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, বামনগোলা থানার পাকুয়াহাটের কাছে গৌরনন্দন বাটি গ্রামের বাসিন্দা তপন কুমার বর্মনের বাড়িতে এমনই এক গল্পের আসর বসেছিল বলে জানা যায়।[77]

মালদা জেলার ওল্ড মালদার মহাদেবপুরের বিখ্যাত রথের মেলা যে রথটিকে কেন্দ্র করে বসে তার পেছনে আছে এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস। মহানন্দা নদী লাগোয়া এই রথটিও মালদা জেলায় আগত হাজার হাজার উদ্বাস্তুর মতো কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে এপার বাংলায় এসেছিল। ১৯৭১ সালে দুদেশের প্রশাসনের সহায়তায় রথটিকে এপারে আনা সম্ভব হয়েছিল। এলাকার হিন্দু-মুসলমান সবার মিলিত ব্যবস্থাপনায় রথটি ওপারের রাজশাহী জেলার গোপীনাথপুর থেকে বিশালাকায় নৌকায় মহানন্দা নদী পার হয়ে এপারের মহাদেবপুরে এসেছিল। এই রথটি প্রায় দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো। অবিভক্ত মালদায় ভোলাহাট থানার কাশিমপুর গ্রামের এক ধনাঢ্য ব্যাক্তি মালদা জেলার গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষে এই পুষ্প রথের প্রচলন করেন। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার অনুষ্ঠান হলেও, মহাদেবপুরে এই রথের আলাদা অনুষ্ঠান হয় বৈশাখ সংক্রান্তিতে। অজস্র ফুলে ফুলে সজ্জিত এই রথকে তখন ‘পুষ্পরথ’ নামে ডাকা হয়। এখানকার রথটিকে কেন্দ্র করে মালদার নালাগোলা সড়কের দুধারে অসংখ্য দোকানপাট বসে।[78]

বাংলায় লোকসংগীতের একটি বিশেষ ধারা হল কবিগান। এখানে গায়ক অর্থাৎ কবিরা প্রতিযোগিতামূলক আসরে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় এই কবিগানের আসর বসত; সেখানে বহু কবিয়ালরা অংশগ্রহণ করতেন। পূর্ব-পশ্চিম উভয় বাংলাই বহু প্রথিতযশা কবিয়াল দ্বারা সমৃদ্ধ ছিলেন। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে পূর্ববঙ্গের বহু কবিয়াল পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। পশ্চিমবঙ্গের কবিগানের উপযুক্ত পরিবেশে তারা তাদের পূর্ব পেশায় নিযুক্ত থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। এদিক দিয়ে তারা নিজেরা যেমন উপকৃত হয়েছিলেন, তেমনি তাদের প্রতিভার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিকেও সমৃদ্ধ করেছিলেন। এমনই কয়েকজন কবিয়াল হলেন;- মালদার সাহাপুর গ্রামের তাঁতিপাড়ার বাসিন্দা হরেন্দ্রনাথ সরকার, ইনি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার বালিয়াঘাটা গ্রামের মানুষ ছিলেন।

---

[77] পুষ্পজিৎ রায়, “গল্পের কথা অল্প”, মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহার্নব, বিষয়ঃ মালদা জেলা- সেকাল ও একাল,* (বহরমপুরঃ অষ্টম বর্ষ-২০১৯) পৃ. ৩৭-৩৮।

[78] পুষ্পজিৎ রায়, “মালদহ জেলার রথ উৎসব”, *মহার্নব, বিষয়ঃ মালদা জেলা - সেকাল ও একাল,* পৃ. ৫৫-৫৬।

মালদা জেলার সাতমারি বাঁকাদহ গ্রামের প্রবীণ কবিয়াল রমেশচন্দ্র সরকার, পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গা হাইস্কুলে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। কবিয়াল রাজেন সরকার, বিজয় সরকার, নিশি সরকার, নকুল দত্তের গানে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে অনেকদিন উদ্বাস্তু শিবিরে থাকা এই কবিয়ালের গান শুনে সন্তুষ্ট হয়ে সেই সময় এসডিও সাহেব তাকে হারমোনিয়াম উপহার দিয়েছিলেন। মালদা জেলার গাজোল থানার শঙ্করপুরের কবিয়াল অনন্ত মালাকার জেলার এক নামকরা কবিয়াল। পূর্ববঙ্গের মাঝিরগতির প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কোলাপাটগতি হাইস্কুলে তিনি নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলা তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও মধ্যপ্রদেশ, আসাম, বিহার ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় তিনি গান করেছেন। তার শিক্ষা গুরু ছিলেন পূর্ববঙ্গের নড়াইল জেলার দরিয়াপুরের অন্তর্গত ডুমদি গ্রামের বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী (সরকার)। যে ধর্মের নামে বাংলা ভেঙে দুই ভাগ হয়ে যায়; দেশভাগের বলি হয়ে আসা এই মানুষটির গানে সেই ধর্মের নামে ভেদাভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

এ প্রসঙ্গে তার একটি গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য;-

ধর্মের নামে চলছে ভবে প্রায় দেখি সব দালালি
বুঝে পাই না জীব জগতে কোন মতে পথে চলি
...
আমরা যারা সংসারবাসী গ্রাম-গঞ্জে সব পাশাপাশি
শিখলাম কেবল রেষারেষি সেজে ধর্মের বুলবুলি।।
....
অনন্ত কয় বেদ বা গীতা তাতে পাইনা হিংসার বার্তা
এরা এসব পায় বা কোথা, ধর্মে অধর্মের বুলি।

এছাড়াও আছেন আর এক নামকরা কবিয়াল মালদা জেলার গাজোল থানার হাটনগর এলাকার অমূল্য সরকার। তার পূর্ব নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলা। তার কবি গানের গুরু ছিলেন খুলনার শরৎচন্দ্র সরকার। পূর্বে উল্লেখিত অনন্ত মালাকার পাল্লাদার হিসেবে দীর্ঘদিন তার সঙ্গে গান গেয়েছেন। দেশভাগের ফলে দেশান্তরী এই মানুষটির গানেও উঠে আসে ধর্মের নামে হানাহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও দেশভাগ। এসবের ঊর্ধ্বে সম্প্রীতির আহ্বানে তার গানের কয়েকটি চরণ-

বাবরি মসজিদ শ্রীরাম মন্দির ঘটনা
সারা বিশ্বে শুরু হল সাম্প্রদায়িক এক হাঙ্গামা
বাবরি মসজিদ শ্রীরাম মন্দির দেশের হল অকল্যাণ
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাতে কত লোকের গেল প্রাণ
....
জাতি হিংসা করে যারা রাজনীতি করিতে চায়
এরাই হল দেশের শত্রু এদের আগে কর ক্ষয়
....
মন্দির-মসজিদ একই কথা দেখতে গেলে আসল খাতা

অমূল্য কয় মনের ব্যথা, এ তত্ত্ব কেউ বোঝে না।

এছাড়াও পূর্ববঙ্গ থেকে এই জেলায় আগত কবিয়াল জ্ঞানেন্দ্র সরকারের নামও শোনা যায়।[79]

'সীমান্ত শুধু মানচিত্রে একটি রেখা নয়-এটি সাংস্কৃতিক বস্ত্রের একটি ক্ষত। গম্ভীরা তা হাসির মাধ্যমে সেলাই করে'।[80] মালদা জেলার অন্যতম প্রধান উৎসব হল গম্ভীরা, ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য ও গানের শিল্প। বাংলা বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে সমগ্র বাংলার গ্রামে-গঞ্জে যেসব আচার-অনুষ্ঠান হয়, তারই একটি প্রকার মালদার 'গম্ভীরা'; যেমন রাঢ়-বাংলার 'গাজন' ও পূর্ব-বাংলার 'চরক'। মালদা জেলার সর্বত্র এর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করার মতো। অবিভক্ত মালদার ভোলাহাট ও নবাবগঞ্জে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল।[81] ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হরিদাস পালিতের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ 'আদ্যের গম্ভীরা' অনুসারে এই উৎসব ছিল মূলত আদ্য অর্থাৎ শিবের সঙ্গে যুক্ত; শিবোৎসবের অতি প্রাচীন রূপ।[82] এর বিশেষত্ব হল মুখোশ ব্যবহার। গম্ভীরা গান ও নাচের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দিক এবং স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যকলাপ তার সমালোচনা মূলক কথোপকথন ও মানুষের জীবনযাত্রা তুলে ধরা হয়।[83] খরা, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা; রায়ত, ব্যক্তিগত ঘটনা, দলগত ও সামাজিক ঘটনা প্রভৃতি এর বিষয়বস্তু।[84] এই গম্ভীরা গানের এক অত্যাবশ্যক চরিত্র শিব, এই শিব অবশ্য লৌকিক শিব। অবিভক্ত বাংলায় প্রচলিত এই গম্ভীরা উৎসবের বিভিন্ন দেবদেবীর চরিত্র, মুখোশ, মন্ডপসজ্জা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষ গম্ভীরায় পরিত্যাগ করা হয়েছিল। ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, নাচোল, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জে কৃষকবেশী 'শিব', 'স্বামী-স্ত্রী' ইত্যাদি চরিত্রগুলি 'নানা' ও 'নাতি' চরিত্রে পরিণত হয়েছিল।[85] ফলে গম্ভীরা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নৃত্য-গীত পরিবেশনকারী, গান বাঁধার লোক, মুখোশ প্রস্তুতকারক, মন্ডপসজ্জাকারী, বাদ্যকার প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত বিরাট সংখ্যক মানুষ তাদের কাজ হারাবার ভয়ে মালদা জেলায় চলে আসেন।

ভাষাঃ ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে সুদীর্ঘ সময় পূর্ব-পশ্চিম উভয় বাংলাই ছিল অখন্ড বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত। দুই বঙ্গের প্রধান ভাষা বাংলা। দুই বাংলাতেই পূর্বে সাধু ভাষা ও বর্তমানে চলিত ভাষা প্রচলিত। তবে

---

[79] পুষ্পজিৎ রায়, "মালদা জেলার কবিয়াল" মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহার্নব, বিষয়ঃ মালদা জেলা - সেকাল ও একাল,* (বহরমপুরঃ অষ্টম বর্ষ-২০১৯) পৃ. ৫৮-৬৫।

[80] Aniket De, *The Boundary of Laughter: Popular Performances across Borders in South Asia,* (New Delhi: OUP, 2023), p. 93.

[81] সুস্মিতা সোম, *মালদা জেলার ইতিহাস,* (মালদাঃ দিপালী পাবলিশার্স, ২০০২) পৃ. ১৬৫।

[82] হরিদাস পালিত, *আদ্যের গম্ভীরাঃ বাঙ্গালার ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়,* (মালদহঃ শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার, মাঘ ১৩২০), পৃ. ৮-৯, ১৬৪-১২১।

[83] *Malda Gazetteer-1969,* p. 209.

[84] রবি বসু, *মালদহের গম্ভীরাঃ উত্তরাধিকার ও বিবর্তন,* (মালদাঃ উত্তাল কলরোল, নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা, ২০০৯),পৃঃ ৫৪।

[85] ঋষি ঘোষ, "এপার-ওপারের গম্ভীরাঃ বিস্মৃতির অতলে কিংবদন্তি গম্ভীরা শিল্পী সুফি মাস্টার", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২), পৃ. ১২৫।

অঞ্চলভেদে মান্য চলিত ভাষায় কিছু রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা উপভাষা নামে পরিচিত। অঞ্চলভেদে একই ভাষার এই তারতম্যের জন্য বলা হয়, "ক্রোশ ক্রোশ মে পানি, চার ক্রোশ মে বাণী"। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন বাংলা উপভাষাগুলিকে যে প্রধান পাঁচটি শ্রেণিতে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন তার মধ্যে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা দুটি মূলত বরেন্দ্রী এবং রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্গত। এই বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্গত জেলাগুলি হল দিনাজপুর, মালদা, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া। এই অঞ্চলগুলি ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশের প্রধান উপভাষা হল বঙ্গালী।[86]

মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলা সংলগ্ন পূর্ববঙ্গের রাজশাহী জেলার মানুষের ভাষার সঙ্গে এই দুই জেলার ভাষার অনেকটা মিল পাওয়া যায়; তবে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলো থেকে আগত মানুষের মুখের ভাষা স্থানীয় ভাষার তুলনায় অনেকটাই আলাদা। রণবীর সমাদ্দারের গবেষণা থেকেও একই তথ্য উঠে আসে। হাবিবপুর ও বুলবুলচন্ডি এলাকায় বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের জন্য বলা হয়, পাবনা জেলা থেকে আগত মানুষদের কথা শুনলে খুব সহজেই ধরে ফেলতে পারা যায় তারা পাবনা থেকে এসেছেন, কারণ রাজশাহী থেকে আগত মানুষেরা এই জেলার আঞ্চলিক ভাষাতেই কথা বলেন।[87] পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে উদ্বাস্তুরা মালদায় এসে মূলত হাবিবপুর, বামোনগোলা, ইংরেজবাজার, ওল্ড মালদা, গাজোল, কালিয়াচকের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। কাজেই সীমান্তবর্তী জেলা হওয়াই মালদায় বরেন্দ্রী উপভাষার পাশাপাশি বাঙ্গালী উপভাষার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। অবস্থানগত দিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা আবার রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বাঙ্গালী এই ত্রিভাষা বৃত্তের প্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ চাকলার অন্তর্গত ছিল মালদহ, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়ার অংশবিশেষ, বগুড়া বীরভূমের একাংশ এবং ভাগলপুর। দেশভাগের আগে ও পরে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত উদ্বাস্তু জনগণ বিচ্ছিন্নভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এই জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসবাস শুরু করেন। বহরমপুরের উপকণ্ঠে বরিশাল কলোনি, বলরামপুর, মণীন্দ্রনগর ইত্যাদি এলাকায় উদ্বাস্তু জনগণের কথ্যশব্দ, ভাষারীতি অনিবার্যভাবে স্থানীয় কথ্যভাষায় প্রভাব ফেলেছিল। এর পাশাপাশি উদ্বাস্তু জনগণের ভাষাতেও এসেছিল পরিবর্তন।[88] ভাগীরথীর পূর্ব-প্রান্ত, জিয়াগঞ্জ, লালবাগ, বহরমপুর শহরে তারা ছড়িয়ে পড়েন।

বাগরি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা বেশিরভাগ বরেন্দ্রী এবং বঙ্গালী উপভাষায় কথা বলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভাষায় বঙ্গালী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গুলি বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ

- পদের আদি অ বা ও > উ রূপে উচ্চারিত হয়-

---

[86] Suniti Kumar Chatterjee, *The Origin and Development of the Bengali Language, Vol-1,* (London: George Allen and Unwin, 1923), pp. 139-146; শ্রীসুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* (বর্ধমানঃ সাহিত্যসভা, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৫৭), পৃ. ১৩৬-১৩৮।

[87] Ranabir Samaddar, *The Marginal Nation,* p. 164.

[88] *মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার- ২০০৩,* পৃ. ১৯২-১৯৭।

বোন>বুন, বনে>বুনে, খোকা> খুকা, দোকান> দুকান, রোগা> রুগা ইত্যাদি।

- এ>অ্যা - তেল>ত্যাল, দেশ>দ্যাশ, পেট>প্যাট
- অ এর স্থানে র এর ব্যবহার, যেমন- আমের রস> রামের অস ইত্যাদি।

প্রমাণ স্বরূপ, মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ারে 'রায়খয়রা' নামক এক মাছের উল্লেখ আছে।[89] যা এই অঞ্চলে পাওয়া যায়, মাছের নামটি পূর্বোক্ত ভাষা বৈশিষ্ট্যের কারণে স্থানীয়দের মুখে 'আয়খোরা' হয়ে গেছে (রায়খয়রা>আয়খোরা)। আবার চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি গম্ভীরা গানে ' হাঁরঘে (আমাদের) কুনঠে (কোথায়), কৈহ্যা (বলে), 'ডাক্যা' (ডেকে) 'শনিব্যার', 'ছ্যালাপিল্যা', ' 'ল্যাখাপড়া' ইত্যাদি মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত শব্দগুলি ও বাচনভঙ্গির সাদৃশ্য প্রমাণ করে কাঁটাতারের বেড়া সবকিছুকে আলাদা করতে পারে না।[90] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ একসময় অবিভক্ত মালদার অংশ ছিল। এই সাদৃশ্যের জন্য মালদা, মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন পূর্ববঙ্গের অঞ্চলগুলি থেকে আগত উদ্বাস্তুদের একাংশের ভাষার দিক দিয়ে খুব একটা সমস্যায় পড়তে হয়নি। তবে পূর্ববঙ্গের যে অঞ্চলগুলি এই দুই জেলা থেকে দূরে অবস্থিত সেসমস্ত অঞ্চলগুলির উদ্বাস্তুদের কথ্য ভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্যই ছিল যেমন, বর্তমান গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় জানা যায়, পূর্ববঙ্গে তারা "নু যাই", 'উড়ুম' বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। বর্তমানে নিজেদের মধ্যে এগুলি বললেও অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের বলতে হয় "চলো যাই", 'মুড়ি'।[91] এখানে 'কোমনে' এর পরিবর্তে বলতে হয় 'কোথায়'।[92] তবে এখনো তারা "নিজেদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাদেশের ভাষাটা বজায় রেখেছেন"।[93] আবার 'সকলে' কে 'হক্কলে', 'একলা' বোঝাতে 'এল্লা', ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয় এলাকার লোকজনও।[94] এইভাবে ছোটখাটো ভাষাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে চলতে থাকে পারস্পরিক আদান-প্রদান। দুই জেলায় বসবাস করতে গিয়ে তাদের ভাষাগত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, "ভাষাগত সমস্যা অনেকটাই রেকটিফাই হয়ে গেছে। কোনো এফেক্ট করেনি। কারণ সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" অনেকের কথায় "শিক্ষিত হওয়ায় প্রবলেম নেই; যারা অশিক্ষিত তারা পরিস্থিতির ভিত্তিতে নিজেদের কথা মডিফাই করতে পারে না। যার জন্য তাদের রিফিউজি, রিফু ইত্যাদি শুনতে হয়।"[95]

---

[89] *Murshidabad, Gazetteers, 1979,* p. 133.

[90] শামসুজ্জমান খান (সম্পাঃ), *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি গ্রন্থমেলা-চাঁপাই নবাবগঞ্জ,* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৪), পৃ. ১৮৮-১৮৯।

[91] সাক্ষাৎকারঃ- শান্তিরঞ্জন সরকার, মালদা।

[92] সাক্ষাৎকারঃ- চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, মালদা।

[93] সাক্ষাৎকারঃ- তরুণকুমার ভাওয়াল, বয়স-৬৩, পেশা-শিক্ষক, মহলন্দীকলোনী, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২১/১১/২০২২।

[94] সাক্ষাৎকারঃ- মাধব হালদার, ব্যস-৬৫, পেশা-জেলে, ধুসুরিপারা কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২১/১১/২০২২।

[95] সাক্ষাৎকারঃ- নিরঞ্জন মিত্র, মুর্শিদাবাদ।

খাদ্যাভ্যাসঃ দুই বাংলার খাদ্যাভ্যাসে অনেক মিল থাকলেও বেশ কিছু পার্থক্যও ছিল, যা এখনও আছে। রান্নার পদ, রন্ধন প্রক্রিয়া ও মশলার ব্যবহারের পার্থক্যে দুই বাংলার খাদ্যে স্বাতন্ত্র এনে দেয়। পূর্ববঙ্গের মানুষের খাওয়ার ধরন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের থেকে আলাদা ছিল। পূর্ববঙ্গের লোকেরা মূলত ভাত খেতেন, দিনে তিনবার ভাত খাওয়া ছিল তাঁদের দৈনন্দিন অভ্যাস। এজন্য তাঁদের প্রায়ই 'ভেতো বাঙাল' বলে ঠাট্টা করা হত।[96] সাধারণত এপার বাংলার রান্নাতে মিষ্টি দেওয়ার প্রচলন আছে, আবার ওপার বাংলায় রান্নায় সরষে ও ঝালের ব্যবহার বেশি। পূর্ববঙ্গে মিষ্টদ্রব্য ছাড়া কোনো রান্নাতে মিষ্টি দেওয়ার প্রচলন নেই। পূর্ব-পশ্চিম বাংলার রান্নার পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর সরস উপস্থাপনা, "এক ব্যক্তি বলেন-"My motor car is sound in every parts except the Horn". ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গের রান্নার ক্ষেত্রে বলা যায়, Sugar is in everything eccept Rosogolla".[97] পশ্চিমবঙ্গের মিষ্টি দেওয়া রান্নার বিপরীতে পূর্ববঙ্গের খর প্রকৃতির, মিষ্টি ছাড়া, ঝাল-ঝাল রান্নার উপস্থিতি পুরোপুরি টের পাওয়া যায় মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায়। এই দুই জেলার স্থানীয় বাসিন্দারাও একইভাবে রান্না করেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিভিন্ন প্রকার ছাতু খাওয়ার চল। উদ্বাস্তুদের হাত ধরে ছাতু খাওয়ার প্রচলন বিপুল পরিমাণে এই দুই জেলায় ছড়িয়ে পড়ে; কারণ বিহারে উৎপন্ন খাবারটির জনপ্রিয়তা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গেই বেশি ছিল। ওপার বাংলায় সকাল বিকেলের জলখাবারে, অতিথি আপ্যায়নে, ছাতুর প্রচলন ছিল। ভাত রুটির পরে ছাতু ছিল ওই দেশের অন্যতম প্রধান আহার। এপার বাংলায় সাধারণত ছোলার ছাতু, যবের ছাতু খাওয়ার চল থাকলেও ওপার বাংলায় ছাতুর বিভিন্ন প্রকারভেদ ছিল। বিভিন্ন ধরনের ছাতু তৈরি করত তারা। 'যবের ছাতু', চাল ভাজা থেকে তৈরি 'চালের ছাতু', মাষকলাই, চিনাবাদাম, যব, ভুট্টা, চাল ভাজা ইত্যাদি মিশিয়ে 'বাদাম-কলাই ছাতু'। গাজীপুর অঞ্চলে খুব কাঁঠাল হয়। তাই সে এলাকায় কাঁঠালের বীজ ভেজে তা গুঁড়ো করে বা ঢেঁকিতে কুটে তৈরি করা হয় 'কাঁঠাল ছাতু'। ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জের বিল অঞ্চলে শাপলার মতো ঢ্যাপ হত। তার বীচি ভেজে খই করে তার যে ছাতু তৈরি করা হয় তাকে বলে 'ঢ্যাপের ছাতু'। সেখানে 'খইয়ের ছাতু'ও আছে। এখনো চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে পল্লীবধূরা চৈত্র মাসে বাদাম-কলাইয়ের ছাতু তৈরি করে রাখে, জ্যৈষ্ঠের পাকা আমের রসে খাবে বলে। জানা গেছে, আম-ছাতুর মতো জনপ্রিয় খাবার চাঁপাইনবাবগঞ্জের গ্রামে আর দ্বিতীয়টি নেই। এমনকি ছাতুকে ঘিরে ওপার বাংলায় উৎসবও প্রচলিত ছিল। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে বোন ছাতু মেখে একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাইকে খাওয়াত। এ অনুষ্ঠানকে বলা হত 'ভাই ছাতু'। এখন এটি বিলুপ্তপ্রায়।[98] ওপার বাংলায় বিশ্বকর্মা পুজোতেও ছাতু খাওয়ার প্রচলন ছিল।[99] ছাতু সহজলভ্য, তৈরিতে বিশেষ

---

[96] Gargi Chakravartty, *Coming out of Partition,* p. 84.

[97] https://irabotee.com/banglarkhawa/, Last Accessed on 10/05/2024.

[98] https://www.dailynayadiganta.com/daily/507681/, Last Accessed on 10/05/2024.

সময় বা ঝামেলা হয় না এবং অনেকটা খেলে পেটও বেশিক্ষণ ভরে থাকে; শরণার্থীদের হাত ধরে যেটা এই দুই জেলার নিতান্ত সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের খাবার খোরাক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লালগোলা ব্লকের কালমেঘা গ্রামের উদ্বাস্তু পরিবারের মহিলারা লালগোলা বাজার থেকে যব, ছোলা কিনে তার ছাতু তৈরি করে বহরমপুর, কাশিম বাজার, লালবাগ, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করে রোজগার করেন।[100] মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় কিছু কিছু জায়গায় সেই চল এখনো আছে।

পূর্ববঙ্গে খাদ্য সংকট ও অর্থ সংকট দেখা দিলে সেখানকার মানুষেরা কচু, ঘেঁচু, ফেনটু, শালুক সিদ্ধ, ঢ্যাপের খই, চিনে কাউনের ভাত খেয়ে দিন যাপন করতেন; যা উদ্বাস্তুদের হাত ধরে পরবর্তীকালে এপার বাংলার নিম্নবিত্ত, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের খাদ্যাভ্যাসে ঢুকে পড়ে। পিঠে-পুলি, ছ্যাঁচড়া, শুক্তো, মাছের টক ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের পদগুলি এপার বাংলাতেও জনপ্রিয় হতে থাকে। পূর্ববঙ্গের গৃহিণীরা পিঠে তৈরিতে সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন রকম পিঠেপুলি তারা বানাতে জানতেন। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ববঙ্গে এই পিঠের ব্যবহার বেশি। ঢাকার পিঠেওলিরা পিঠে তৈরি করে সেই পিঠে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করতেন। দেবী ঘোষ তার বইতে লিখেছেন "পূর্ববাংলার পিঠে তৈরীর বৈচিত্র পশ্চিমবাংলার তুলনায় বেশি। পূর্ববাংলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আসকে পিঠে (চিতই পিঠে)।"[101] যা পরবর্তীকালে উদ্বাস্তুদের হাত ধরে এপার বাংলাতে চলে আসে। মালদা মুর্শিদাবাদে এই পিঠে খাওয়ার বিশেষ চল আছে। মাছের বিভিন্ন পদের প্রচলন দুই বাংলাতেই আছে কিন্তু মাছে টকের ব্যবহার নতুন করে সংযোজিত হয়। রান্নায় হলুদের ব্যবহারে দুই বাংলায় পার্থক্য ছিল। পার্থক্য ছিল ভাতের চাল এবং চাল সেদ্ধর পদ্ধতিতেও। মুর্শিদাবাদ জেলার তারাপুর কলোনির জনৈক উদ্বাস্তুর কথায়,- "উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ডোল হিসেবে যে ধরনের চাল দেওয়া হত, সেই চাল রান্নার পদ্ধতি আমরা সঠিকভাবে জানতাম না। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত পদ্ধতি মেনে চাল রান্না করার পর সেই ভাত আর খেতে পারতাম না। দিনের পর দিন এইভাবে রান্না করা ভাত তাদের ফেলে দিতে হয়েছে। অনেক সময় খাওয়া-দাওয়ার এই অসুবিধের জন্য ক্যাম্প ছেড়ে অন্যত্র চলেও গিয়েছিলাম। আত্মীয়র বাড়িতে কাটিয়েছিলাম দিনের পর দিন। পরে আবার আগের জায়গায় ফিরে এসে যখন এই চাল সেদ্ধ করার সঠিক পদ্ধতি জানতে পারলাম তখন সেই ভাতই আমাদের কাছে সুস্বাদু লাগলো। তখন সেই চালই অন্নপ্রাশন বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে কিনে এনে রান্না করা হত।[102] পূর্ববঙ্গের মানুষজন তুলনামূলকভাবে বেশি ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তারাপুর কলোনির সুষমা জর্দারের ভাষায় "পূর্ববঙ্গের ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা মাছ খেত, কিন্তু মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, ডিম খেত না। মাংস খেলে সবাই নিন্দা করতো, এখানে এসে শিখেছি মাংস খেতে। মেথির শাক, ছোলার শাক খাওয়া জানতাম না, এখানে এসে সব খাই"।[103] শুধু

---

[99] বিনয়কৃষ্ণ বোস, *মালদা জেলার উদ্বাস্তু,* পৃ. ৩০।

[100] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ১০৮।

[101] https://irabotee.com/banglarkhawa/, Last Accessed on 10/05/2024.

[102] সাক্ষাৎকার:-নির্মল সরকার, বয়স-৭৪, পেশা-কর্মহীন, তারাপুর কলোনী, মুর্শিদাবাদ তারিখ:- ২৭/১১/২০২২।

[103] সাক্ষাৎকারঃ- সুষমা জর্দার, বয়স-৬৩, পেশা-গৃহিনী, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ- ২৭/১১/২০২২।

খাদ্যাভ্যাসই না খাবার বাসনপত্রেও আসে পরিবর্তন। ওপার বাংলা থেকে মালদা, মুর্শিদাবাদে আসা উদ্বাস্তুদের কথায় ওখানে সব কাঁসার বাসন-থালা, বদনা, গ্লাস, বাটি ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো, কিন্তু এখানে সব স্টিলের।

৫.৩ উদ্বাস্তু আগমনের ফলে মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষা ও সাহিত্য জগতের ওপর প্রভাবঃ

শিক্ষা: অবিভক্ত বাংলায়, মধ্যবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাচর্চার দিক দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় পূর্বাঞ্চলই বেশি এগিয়েছিল। বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, সমাজবিদ, সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ, দার্শনিকের জন্মস্থান অনুসন্ধান করলে তাদের অনেকেরই শেকড় মেলে পূর্ববঙ্গে। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা-সংক্রান্ত আলোচনায় এক গবেষক বলেছেন, "উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে লক্ষ্য করার মতো একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তা ছিল শিক্ষার প্রতি অনুরাগ; যা তাদের সামাজিক স্থিতাবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখত। উচ্চবিত্ত সম্পদশালী হিন্দুরা, বড় বড় জমিদাররা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শিক্ষার প্রসারের জন্য পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতেন।"।[104] বর্তমান গবেষণার সমীক্ষায় দেখা গেছে অভাব-অনটন বা কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়েও এই দুই জেলার উদ্বাস্তুরা পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনো আপোস করেনি। এমনকি তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রবীণ ব্যক্তিদেরও ভাবধারা ছিল,- যে কোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। মালদা জেলার ক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতার কথা পাওয়া যায় পূর্বোক্ত গবেষণায়। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, মালদা জেলার কলোনিগুলিতে বসবাসকারী উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় স্নাতকোত্তর সদস্যদের অস্তিত্ব। উচ্চশিক্ষার প্রতি অনুরাগ তাদের মধ্যে এতটাই যে, সেইসব স্নাতকোত্তরদের উচ্চমর্যাদার চোখে দেখা হয় এবং উচ্চ মেধার স্বীকৃতি দেওয়া হয়; এমনকি তারা কর্মহীন হলেও। উক্ত গবেষণায় আরো বলা হয় শিশুদের পড়াশোনা, চাকরিতে নিযুক্তি, বিয়ে বা পারিবারিক কোনো বিবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষের বা মাস্টারমশাইদের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব ছিল।[105] বর্তমান গবেষণার সমীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় সাক্ষাৎকারদাতা সত্তরোর্ধ্ব বা অশীতিপর বৃদ্ধ, পরিবারের বয়স্কা মহিলা বা সাধারণ পরিবারের গৃহিণীদের মুখে স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজি শব্দের ব্যবহার চমকে দেবার মতো; যা সচরাচর এই জেলাগুলির সমমানের পরিবারে ওই বয়সী মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। গ্রামে বসবাসকারী অতি সাধারণ পরিবারের বৃদ্ধ উদ্বাস্তু সদস্যদের মুখে 'রেকটিফাই', 'মডিফাই', 'সিলেকশন', 'ফ্যামিলি'.... ইত্যাদি শব্দবন্ধ ও তাদের সঠিক ব্যবহার শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহকেই প্রকাশ করে।

জয়া চ্যাটার্জি তার গবেষণায় দেখিয়েছেন স্থানীয় লোকেদের চেয়ে অনেক দ্রুত হারে উদ্বাস্তুরা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতেই দেখা যায়; উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোক লিখতে

---

[104] Monika Mandal, *Settling the Unsettled: A Study of Partition Refugees in West Bengal,* (New Delh: Manohar Publishers and Distributors, January 2011), p. 236.

[105] Ibid, p. 236.

ও পড়তে জানত। যেখানে স্থানীয়দের চেয়ে এই হার ছিল দ্বিগুণ। কারণ সেই সময় স্থানীয়দের ক্ষেত্রে চারজনের মধ্যে একজন লেখাপড়া জানত।[106] এই প্রসঙ্গে নিচের টেবিলে ১৯৫১ সালে মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু বনাম স্থানীয় জনগণের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার তুলনা করে দেখানো হল।[107]

সারণি-৭-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী; মালদা জেলায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষার হার জেলার স্থানীয় বাসিন্দাদের দেড়গুনেরও বেশি, এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় তা প্রায় তিন গুণ। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী গ্রাম ও শহরে আলাদা আলাদা করে এবং বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ সদস্যদের মধ্যে সবক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সাক্ষরতার হার স্থানীয় জনগণের তুলনায় বেশি ছিল।[108] সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সত্তরোর্ধ্ব, অশীতিপর উদ্বাস্তু বৃদ্ধ এমনকি বৃদ্ধাদের মধ্যেও এই সাক্ষরতার হার স্থানীয় জনগণদের পিছনে ফেলে দেয়। ১৯৫১ সালে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে সাক্ষরতার এই পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে ঊনবিংশ শতকের শেষদিক এবং বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকে পূর্ববঙ্গে শিক্ষার অগ্রগামিতাকেই প্রতিষ্ঠা করে।

সারণি-৭ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানীয় ও উদ্বাস্তু জনগণের মধ্যে শিক্ষার হারের তুলনা।

জেলা	স্থানীয় নমুনা জনগণ			উদ্বাস্তু		
	নমুনা জনসংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা	শিক্ষিত শতাংশে	মোট জনসংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা	শিক্ষিত শতাংশে
মালদা	৮৭,৮৩৪	৮,৭৮৫	১০%	৬০,১৯৮	৯,৮৭৭	১৬.৪০%
মুর্শিদাবাদ	১,৬৫,১৫৯	২০,৯৪২	১২.৬৭%	৫৮,৭২৯	২১,২৮৩	৩৬.২৪%

(*Malda, Census-1951,* p. 57; *Murshidabad, Census-1951,* p.87)

বিংশ শতকের গোঁড়ার দিকের অর্থনৈতিক অবনতির কারণে, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষার বিষয়টি বহুকাল অবহেলিত থেকে যায়। পূর্বে গ্রামপ্রধান এই দুই জেলায় দিন-আনা, দিন-খাওয়া হতদরিদ্র মানুষের কাছে বিদ্যাচর্চার ব্যাপারটি ছিল বিলাসিতার নামান্তর। সচ্ছল, শিক্ষানুরাগী পরিবারের সন্তানরা বেশিরভাগই উচ্চশিক্ষার জন্য অন্য জেলায় চলে যেতেন বিশেষত কলকাতা, ঢাকা, রাজশাহী ইত্যাদি জেলাগুলিতে।[109] সামগ্রিকভাবে বলতে

[106] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ১৪৯-১৫০।

[107] ১৯৬১ এবং ১৯৭১ সালের আদমশুমারিতে উদ্বাস্তু জনগনের শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো তথ্য না থাকায়, ১৯৫১ সালের আদমশুমারি-লব্ধ এই পরিসংখ্যানই একমাত্র বিচার্য্য।

[108] *Malda, Census-1951,* pp. 57-61; *Murshidabad, Census-1951,* pp. 87-97.

[109] উদাহরণস্বরূপ, মালদা জেলার স্বনামধন্য অক্রুরমণি করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক রাইপদ দাসের পরিবার। ইংলিশবাজার শহরে কালিতলায় বসবাসকারী রাইপদ দাসের বড়ো ছেলে মিহিররঞ্জন দাস রাজশাহী মহাবিদ্যালয় থেকে বিশেষ কৃতিত্বসহ

গেলে, এই দুই জেলায় শিক্ষার প্রতি অনুরাগ চোখে পড়ার মতো ছিল না। পূর্ববঙ্গ থেকে অবস্থাপন্ন শিক্ষিত কিছু উদ্বাস্তুরা এসে এই দুই জেলায় যখন সরকারি বড় বড় পদে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন, বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত হলেন, তখন এই দুই জেলার মানুষ শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করতে পারলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিসম্পত্তি, চাষাবাদ ইত্যাদি আয়ের উৎসগুলির পাশাপাশি শিক্ষিত হয়ে বড় বড় সরকারি পদ, বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ওকালতি, শিক্ষকতা, ডাকব্যবস্থা, রেল এই সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ জন্মাল। প্রতিষ্ঠিত হবার লক্ষ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের প্রচেষ্টা দেখা গেল। শিক্ষার্জনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং জীবনধারার বিকাশ হতে পারে এরূপ ধারণা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছিন্নমূল ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল। শিখন ও শিক্ষার প্রসারের প্রতি উদ্বাস্তুদের আপোসহীন, অদম্য আগ্রহ ছিল একটি চোখে পড়ার মতো বিষয়। সর্বহারা এই উদ্বাস্তু মানুষেরা নিজেদের খাওয়া-পরার পাশাপাশি শিক্ষাগ্রহণকেও অপরিহার্য মনে করেছিলেন। তাদের মানসিকতাটাই অন্যরকম ছিল। "শিক্ষা, উপার্জনের জন্য; তা নাহলে শিক্ষার প্রয়োজন নেই" বা "পড়াশোনা করে কী হবে" এমনটা তারা ভাবতেই পারতেন না। ভালো ভাবে অন্নসংস্থান না হলেও পরিবারের সদস্যদের শিক্ষিত করার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে ছিল। বাঙালি জাতি 'বেওসা' বা 'বেসাতি' করতে চিরকালই অনীহা পোষণ করেছেন যার ফলে 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' এই ভাবধারার সঙ্গে তারা কখনো একাত্ব হতে পারেননি। সেই সম্বলও তাদের ছিল না। আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে তারা পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তারা খুব সঞ্চয়ী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং সেই সঞ্চয়ের একটি অংশ অবশ্যই পরিবারের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ রাখতেন। কারণ শিক্ষাটাকে তারা ঐচ্ছিক নয় বরং আবশ্যিক বলে মনে করতেন। শিক্ষার প্রতি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এই উদ্বাস্তুদের যে অদম্য অনুরাগ তা নিম্নোক্ত দুটি উদাহরণেই পরিষ্কার হয়। এক; জনৈক অশোক সেন, সপরিবার তার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে আসার সময় তিনটি বাক্স ভর্তি বই নিয়েছিলেন।[110] দুই; বর্তমান বাংলাদেশের লাকসাম থানার এক গ্রামে ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণকারী, ডঃ কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামীর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। 'কাব্যতীর্থ' ও 'সরস্বতী' উপাধিধর সংস্কৃত পণ্ডিত ডঃ গোস্বামী, দেশভাগের পর মালদায় চলে আসেন ও মালদা জেলা স্কুলে শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে অর্থাৎ তার ৪৭ বছর বয়সে তিনি আই.এ. পাশ করেন এরপর ১৯৬০ সালে স্পেশাল অনার্সসহ বি.এ., ১৯৫৬ ও ১৯৬৮-তে যথাক্রমে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় এম.এ.পাস

বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন, দ্বিতীয় পুত্র দিলীপরঞ্জন দাস কলকাতার নামী ইংরেজি মাধ্যম কলেজে পড়াশোনা করতেন, তৃতীয় পুত্র অশোকরঞ্জন দাস কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র অসিতরঞ্জন দাসও কলকাতায় ডাক্তারি পড়তেন। শুধু তাই নয়, রাইপদ বাবুর বড় বোন ঊষা দাস সেই সময় কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে মালদা জেলার প্রথম লেডি ডাক্তারের তকমা পেয়েছিলেন। রাহুলরঞ্জন দাস, "আমার জেঠু মিহির দাস", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২), পৃ. ৫০।

[110] Gargi Chakravartty, *Coming out of Partition: Refugee Women of Bengal,* (New Delhi: Bluejay Books, 2005). p. 92.

করেন এবং ১৯৮৪-তে অর্থাৎ তার ৭৩ বছর বয়সে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।[111] জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে শেখা যায় তার জাজ্বল্যমান প্রমান এই ডঃ গোস্বামী।

শুধু নিজের বিদ্যার্জনই যথেষ্ট নয়; তারা তাদের সমাজ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের কথাও ভাবতেন। অপর এক গবেষণাতেও উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায়;- "উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে তোলার সাথে সাথে স্কুল গড়ে তোলাও তাদের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ পূর্ব-বাংলার মানুষরা শিক্ষাকে খুব শক্তিশালী ঐতিহ্য হিসাবে বহন করত"।[112] শিক্ষার প্রসারে কিছু কিছু অর্থবান উদ্বাস্তুদের বিদ্যালয়ের জন্য জমি দান বা নিজ অর্থে বিদ্যালয় স্থাপন, বিনা পারিশ্রমিকে পাঠদান ইত্যাদি নজির সৃষ্টি করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা জিয়াগঞ্জ ব্লকের সম্পদশালী ব্যক্তি আশুতোষ বিশ্বাস এলাকার উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি জি.এস.এফ.পি (Government Sponsored Free Primary) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ কাঠা জমি দান করেন। আশুতোষ বিশ্বাস বলতেন;- "এদিন চলে যাবে ক্ষনকাল পরে/রবে মাত্র কর্মফল চিরদিন তরে"। ডোমকল ব্লকে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ঘোষ সম্প্রদায়ের শিক্ষানুরাগী লোকেরা শ্রীকৃষ্ণপুরের সুভাষনগরে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৮ সালে শ্রীকৃষ্ণপুর হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত হয়েছে।[113] মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের অন্তর্গত পোদ্দার কলোনির উদ্বাস্তু-আন্দোলনের বড় নেতা পূর্ববঙ্গীয় কালীমোহন সরকার এলাকার উদ্বাস্তু পরিবারের শিশুদের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্যে প্রাইমারি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও ছিলেন। পূর্বে উল্লেখিত বহমপুরের হাতিনগর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কালিতলাদিয়ার গ্রামে আশ্রয়গ্রহণকারী ময়মনসিংহের জমিদার-পুত্র জীবেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অন্যান্য কীর্তির মধ্যে ছিল উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।[114] মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তুদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা এই ধরনের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল;- 'গোয়ালজান উদ্বাস্তু উচ্চ বিদ্যালয়', যেটি ১৯৫৩ সালে বহরমপুরের নিকটবর্তী গোয়ালজান কলোনিতে গড়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদ জেলা সদরের গোয়ালজান কলোনিবাসীরা শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন; যার কারণে ১৯৪৮ সালে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সূচনা করা হয়, যা ১৯৫৩ সালে সরকারের অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীকালে তাদেরই উদ্যোগে সরকারি সহায়তায় এখানে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩-এর মধ্যেই রিফিউজি হাই স্কুল, জুনিয়র হাই স্কুল, সহ শিক্ষামূলক উচ্চ বিদ্যালয়, ছাত্রীদের জন্য প্রথমে আপার প্রাইমারি বিদ্যালয় ও পরে গোয়ালজান উচ্চ

---

[111] রত্না মজুমদার "আদর্শ শিক্ষক কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২), পৃ. ৯৩-৯৪।

[112] Gargi Chakravartty, *Coming out of Partition,* p. 92.

[113] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ১০৯-১১৪।

[114] তদেব,পৃ. ৯০।

বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এই কলোনির বিদ্যোৎসাহী রমেন্দ্র নারায়ন চৌধুরী স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড ও বিদ্যালয়ের পরিচালনায় ও কলোনির উন্নয়নে বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন।[115] উদ্বাস্তুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহেই ১৯৫৩ ও ১৯৬২ সালের পথ চলা শুরু করে মনীন্দ্রনগর উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়; ১৯৬২ সালের ৪-ই জানুয়ারি বলরামপুর কলোনিতে গড়ে ওঠে 'বলরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়', জিয়াগঞ্জ ব্লকের দেবীপুরে দেবীপুর মহান্ত গণপতি দাস হাই স্কুল (১৯৬৫), জিয়াগঞ্জ ব্লকের আমাইপাড়ায় স্থাপিত হয় 'আমাইপাড়া উদ্বাস্তু বিদ্যাপীঠ (১৯৭০)'।[116]

এই সমস্ত বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ সব সময় যে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল তা নয়, উদ্বাস্তুদের কারো কারো মুখে শোনা যায় এর পেছনের ব্যথাতুর ইতিহাস, অনেক সমস্যা, সংগ্রামের কাহিনী। অর্থানুকূল্যের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু পরিবারের শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজস্ব উদ্যোগে কোনো গাছতলায় বা কোনো বাক্তির বাড়িতে, বিনা পারিশ্রমিকে অবসর সময়ে শিক্ষাদানের চর্চা শুরু করেন। উদ্বাস্তুরা গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন। যে গ্রামগুলি অপেক্ষাকৃত বড়, সেখানে দুটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল। যেমন মালদা জেলার হাবিবপুর থানার দাল্লা ও পার্বতীডাঙ্গা গ্রামে দুটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল।[117] অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সেরকম অর্থবান না হলেও উদ্বাস্তুরা কয়েকজন মিলে নিজেদের উদ্যোগে, মিলিত প্রচেষ্টায় অল্প কিছু সামর্থ্যের উপর ভর করে, প্রাথমিকভাবে ছোটখাটো বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন; যা পরে আরো বড় হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মালদা জেলার খুটাদহ, কুপাদহে বিভিন্ন প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়, দাল্লার 'সোনাঘাট উচ্চ বিদ্যালয়', জগৎজীবনপুর উচ্চ বিদ্যালয়', বিধানগড়, সেন্দিয়া, মুচিয়া, হশিপুর প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, গাজোল থানার অন্তর্গত বারডাঙ্গা, বইর‍্যাডাঙ্গী, গ্যারাধূল, মশালদিঘী উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি উচ্চ বিদ্যালয়গুলি উদ্বাস্তুদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল।[118]

আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষানুরাগী মানুষেরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদের বসবাসের জায়গাগুলিতেও তারা বিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসেন। লালগোলার কংগ্রেসকর্মীরা সেখানকার উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য গড়ে তোলেন নৈশ বিদ্যালয়।[119] জলঙ্গি ব্লকের সাদিখানদিয়াড় উদ্বাস্তু কলোনির ছেলেমেয়েরা স্থানীয় জমিদার ডঃ শিশির কুমার মুখার্জি স্থাপিত নৈশ বিদ্যালয়,

---

[115] Ibid, p. 96; https://school.banglarshiksha.gov.in/ws/website/history/19071118003, Last accessed on 10/04/2024.

[116] Ibid, p. 94-111.

[117] সাক্ষাৎকারঃ-বিনয়কৃষ্ণ বোস, মালদা।

[118] বিনয়কৃষ্ণ বোস, *মালদা জেলার উদ্বাস্তু,* পৃ. ২২-৩।

[119] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৮-ই জুলাই ১৯৪৯।

জুনিয়র বেসিক স্কুলে পড়াশোনা করত।[120] পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের শিক্ষার প্রতি এই আগ্রহে সাড়া দিয়ে তৎকালীন সামশেরগঞ্জ থানার জমিদার নিমতিতা জিডি বিদ্যালয় উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সব রকম ব্যবস্থা করে দেন। বহরমপুরের জমিদার অলোক পোদ্দার, স্থানীয় উদ্বাস্তু কলোনির জন্য ও বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি প্রদান করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে তৎকালীন বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তী তার এলাকার উন্নয়ন তহবিল থেকে চুয়াপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের চারদিকে প্রাচীন নির্মাণের জন্য চার লক্ষ টাকা প্রদান করে বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছিলেন। ডোমকল ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি সহদেব সরকার স্থানীয় উদ্বাস্তুদের বিদ্যার্জনের তাগিদ দেখে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক একর জমি দান করেছিলেন; যেখানে ১৯৬৮ সালে স্থাপিত হয় শ্রীকৃষ্ণপুর হাই স্কুল।[121] এরকম ভাবেই জেলার বিত্তশালী ও সচেতন লোকেরা উদ্বাস্তুদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন ও এর উপকারিতা অনুভব করেন। তারা এই দুই জেলায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন।

উদ্বাস্তুদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে বিদ্যালয়ের স্থাপন বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এই দুই জেলার মানুষ বুঝতে পারেন যে, সমাজের সার্বিক উন্নয়ন লুকিয়ে আছে প্রতিটি মানুষের শিক্ষিত হওয়ার পেছনে। তাই শুধুমাত্র চাকরি করার জন্য নয় শিক্ষিত সমাজ গঠনের জন্য পড়াশোনার প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি এই আকর্ষণ এই দুই জেলার শিক্ষার প্রসারে সাহায্য করে। মালদা জেলায় আশ্রিত বাস্তুহারা পরিবারগুলির শিশুদের বিনামূল্যে পঠনপাঠনের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ এলাকায় ৩৪টি এবং শহুরে এলাকায় ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল, যেগুলি সম্পূর্ণভাবে সরকার-পরিচালিত ছিল।[122] এই জেলার ক্ষেত্রে দেখা গেছে ১৯০০-১৯৪৬ পর্যন্ত ৪৬ বছরে অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার দশক ধরে যেখানে প্রায় ১৯টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মাত্র ৬ বছরেই অর্থাৎ এক দশকেরও কম সময়ে ১০টি উচ্চ বিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল।[123] মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রাক্তনী পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ডঃ শৈলেন্দ্রনাথ কুন্ডু বলেছেন, ১৯৪৭ সালে উদ্বাস্তু ছাত্রদের ভর্তির ফলে কলেজে ছাত্রসংখ্যা ৩০০ থেকে ৭০০ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[124] ১৯০১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত শিক্ষিতের হারের দিকে নজর দিলে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯০১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত শিক্ষার হার ৫-৭ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করত, ১৯৫১-তে যার আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫১-

---

[120] সাক্ষাৎকারঃ-শ্রীশচীন প্রামানিক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, জলঙ্গি, উদ্ধৃত, ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৯৭।

[121] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৮৮, ৮৯ ও ১১৪।

[122] Malda Census-1951, p. Ixxvi.

[123] Malda Gazetteers, 1969, p. 211.

[124] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৮৮, ৮৯ ও ১১৪; ডঃ শৈলেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, *আমার কৃষ্ণনাথ কলেজ,* (বহরমপুর: কৃষ্ণনাথ কলেজ, ২০০৩)।

তে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৬৮ শতাংশ ও ১৯৬১-তে ১৬.০৩ শতাংশে পৌঁছায়।[125] স্বাধীনতার পরে শিক্ষার হারের এই আকস্মিক বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ইঙ্গিতবহ। অথচ আগেই দেখা গেছে, ১৯৫১ সালে মুর্শিদাবাদে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল ৩৬.২৪ শতাংশ; যা ১৯৫১, ১৯৬১ সালের মুর্শিদাবাদের বাসিন্দাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির পেছনে কিছুটা হলেও অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে উদ্বাস্তু আগমনে এই দুই জেলায় 'শিক্ষামনস্কতা'র আবহ রচিত হয়েছিল। সমাজের প্রকৃত বিকাশে ও দারিদ্র দূরীকরণের শিক্ষা যে কত বড় হাতিয়ার সেই চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল।

নারীশিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়ন: মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলা দুটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা জেলা। দেশভাগের সময় এই দুই জেলাই ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও আর্থিক সংকটের কারণে পরিবারের মহিলা সদস্যদের বিদ্যাচর্চার বিষয়টি দীর্ঘদিন অবহেলিতই থেকে যায়। কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক রূপে এবং কিছু কুটির শিল্প ছাড়া কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের বিশেষ দেখা যেত না। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমনে সমাজের চিত্রটি পাল্টে যায়। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তনের পেছনে উদ্বাস্তু মহিলাদের দুটি শ্রেণি দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম শ্রেণির উদ্বাস্তু মহিলারা সাধারণত মধ্যবিত্ত পরিবারের, যারা শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ান। আগের অধ্যায়ের আলোচনাতেই দেখা গেছে, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রাম ও শহরাঞ্চলের উদ্বাস্তু মহিলারা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[126]

সারণি-৮ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানীয় ও উদ্বাস্তু মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার। (শতাংশে)

জেলা	স্থানীয়	উদ্বাস্তু
মালদা	৪.৩০	১১.৪১
মুর্শিদাবাদ	৬.০৮	২৬.৩৩

(*Malda, Census-1951,* p. 57; *Murshidabad, Census-1951,* p. 87)

১৯৫১ সালের আদমশুমারি থেকে এই দুই জেলার স্থানীয় নারী এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার তুলনা করলে দেখতে পাওয়া যায় স্থানীয় নারীদের তুলনায় উদ্বাস্তু নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার অনেক বেশি। স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলনায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষার হার যে অনেক বেশি ছিল তা আগেই দেখানো হয়েছে; কিন্তু স্থানীয় মহিলাদের তুলনায় উদ্বাস্তু নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার সেই আগের পার্থক্যকেও ছাড়িয়ে যায়। মালদা জেলার স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলনায় উদ্বাস্তু জনগণ যেখানে দেড় গুণ বেশি শিক্ষিত

[125] *Murshidabad, Gazetteers, 1979,* p. 325.

[126] চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ২২৮-২৩১।

ছিল, সেখানে ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই জেলার উদ্বাস্তু নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার স্থানীয় মহিলাদের তুলনায় প্রায় তিন গুনের কাছাকাছি ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তু মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার স্থানীয় মহিলাদের তুলনায় প্রায় সাড়ে চার গুণ। বিভিন্ন বয়সের স্থানীয় নারী এবং উদ্বাস্তু নারীদের তুলনা করলে দেখা যায় প্রায় সমস্ত বয়সেই উদ্বাস্তু নারীরা স্থানীয় নারীদের তুলনায় শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে।[127] পূর্ববঙ্গে কয়েক দশক আগে জন্মানো নারীরা যারা ১৯৫১ এর আদমশুমারিতে অশীতিপর বৃদ্ধা তাদের মধ্যেও সাক্ষরতা এক চমকপ্রদক ঘটনা। যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে নারী শিক্ষায় পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু নারীদের মধ্যে বিদ্যার্জনের প্রতি আকুতি প্রকাশ পায় নিম্নোক্ত উদাহরণে। মুর্শিদাবাদ জেলার সদর ব্লকের মহেন্দ্রনগর কলোনির বাসিন্দা, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত চিত্তরঞ্জন চন্দ বাবুর ছোট বোন বহরমপুর কাশীশ্বরী বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৫০ এর দশকের গোড়ার দিকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এক বালিকা বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের তিন মাইল পথ প্রতিদিন সাইকেলে অতিক্রম করতেন, এটি নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত।[128]

সেই সময় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মহিলাদের বাড়ির অন্তর্জাল থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল। যা পরবর্তীকালে এই জেলা দুটির মহিলাদের বিদ্যার্জনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। পূর্বে নারীশিক্ষা বা নারীর উচ্চশিক্ষার বিষয়টি এই দুই জেলায় অবহেলার বিষয় ছিল; যা এই সমস্ত উদ্বাস্তু মহিলাদের সাফল্যে বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পরিবারের ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও স্কুলে পাঠানোর মানসিকতা তৈরি হয়। এই সমস্ত মেয়েরা পরবর্তীকালে বেশিরভাগই সংসারের বন্ধনে গৃহপ্রাচীরে গন্ডীবদ্ধ হলেও অল্প সংখ্যক মহিলা বাড়ির বাইরে পা রেখে বিভিন্ন চাকরিতে নিযুক্ত হতে পেরেছিলেন। তারা ছিলেন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নতুন পথের দিশারী। এবং বেশিরভাগ যে অংশ পড়াশোনার পর কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি, সংসারে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন; তারাও পরিবার পরিচালনায় ও সংসার যাপনে তাদের শিক্ষার ছাপ ফেলে অন্যদের থেকে নিজেদের আলাদা করে পরিচিতি গড়ে তুলতে সমর্থ্য হয়েছিলেন। শিক্ষিত মা সমাজকে উপহার দেন শিক্ষিত সন্তানদের। নারীশিক্ষার উপকারিতা অনুভব করায় নারীশিক্ষা আর অবহেলার বিষয় হয়ে থাকেনি। তাই পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে উত্তরোত্তর এই দুই জেলায় নারী ক্ষমতায়ন চোখে পড়ে। একই উদাহরণ চোখে পড়ে সুদূর দক্ষিণে। দমদমের সরোজিনী নাইডু কলেজে প্রচুর উদ্বাস্তু মহিলারা ভর্তি হন, যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অনেক মহিলাদের কলেজে ভর্তি হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। চাকরি পাবার জন্য মহিলারা ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হতে শুরু করেছিলেন।[129] ঋত্বিক ঘটক 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রে দেখিয়েছেন হাজার হাজার মহিলা উদ্বাস্তুরা কলোনির গলিতে নিজেদের জীবন গড়তে

---

[127] *Malda, Census-1951,* pp. 57-61; *Murshidabad, Census-1951,* pp. 87-91.

[128] সাক্ষাৎকারঃ- চিত্তরঞ্জন চন্দ, অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক, মণীন্দ্রনগর কলোনি, উদ্ধৃত, ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব,* পৃ. ১০০।

[129] Gargi Chakravartty, *Coming out of Partition,* p. 88.

শুরু করেছিলেন। তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সংগ্রাম করে পরিবারের হাল ধরেছিলেন।[130]

নারীদের মধ্যে শিক্ষার এই উন্মেষ যে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে মজবুত করেছিল তাই নয়, নারীশিক্ষা যেমন নারীদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছিল তেমনি তাদের হাত ধরে জেলা দুটির সামাজ ও রাজনীতি প্রভাবিত হয়েছিল। রেচেল ওয়েবার যেমন বলেছেন নারীর স্বভাবসিদ্ধ গার্হস্থতা এখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত হয়েছিল। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পথকে প্রশস্ত করেছিল।[131] এই অধ্যায়ের রাজনীতি অংশে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। বর্তমান গবেষণায় নেওয়া সাক্ষাৎকারে উদ্বাস্তু নারীদের কণ্ঠে সেই রাজনৈতিক সচেতনতার ছাপ স্পষ্ট।

দ্বিতীয় শ্রেণির উদ্বাস্তু মহিলারা ছিলেন যারা একেবারেই নিম্নবিত্ত পরিবারের, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এদের স্বামীরা কেউ রিকশা চালক, কেউ ভ্যান চালক কেউ ফেরিওয়ালা। এরা অর্থ উপার্জনের জন্য উচ্চবিত্ত পরিবারের গৃহ সহায়িকার, গৃহ পরিচারিকার কাজ, রান্নার কাজ, সবজি বিক্রির কাজ ইত্যাদি কাজে যুক্ত হয়ে সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলিকে বাঁচার খোরাক জুগিয়েছিলেন। এর একটি অসাধারণ উদাহরণ হল মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরে উদ্বাস্তু কলোনির মহিলারা নৌকা চালাতে জানতেন।[132] এছাড়া লালগোলার কালমেঘা গ্রামের উদ্বাস্তু মহিলাদের ছাতু বিক্রির কথা আগেই বলা হয়েছে। বেঁচে থাকার তাগিদে এইভাবে পুরুষদের সহযোগিতা করতে উদ্বাস্তু নারীরা প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই হাত বাড়াতো। উদ্বাস্তু পরিবারের মহিলাদের থেকে যে এই জেলার মহিলারাই শুধু উপকৃত হয়েছেন তাই নয়; ঘটেছে এর উল্টোটাও। মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত বিড়ি বাঁধার কাজে মহিলা উদ্বাস্তুদের একটা বিরাট অংশ যুক্ত ছিলেন, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সংসারের পাঁচটা কাজের মধ্যে থেকেও, ফাঁকে ফাঁকে বিড়ি বেঁধে তারা মাস গেলে কিছু টাকা উপার্জন করতেন। এছাড়াও আচার, পাপড়, বড়ি, কাগজের ঠোঙ্গা তৈরির কাজেও এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তু মহিলারা উদ্বুদ্ধ হন। এগুলিকে তারা উপার্জনের মাধ্যম করে নেন ও পরিবারকে আর্থিক সংকটের হাত থেকে বাঁচান। উদ্বাস্তু মহিলাদের জীবন সংগ্রাম এই দুই জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। অন্য এক গবেষণা থেকে জানা যায় অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল মহিলাদেরকে। এর জন্য অনেক পরিবারের মেয়েরা

---

[130] Ibid, pp. 86-91.

[131] Rachel Weber, "Re-(Creating) the Home: Women's Role in the Development of Refugee Colonies in South Calcutta", Jasodhara Bagchi, Subhoranjan Dasgupta and Subashri Ghosh (eds), *The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India,* (Kolkata: Stree, 2009), pp. 59-79.

[132] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব,* পৃ. ১১৪।

উপার্জনকারী হয়ে উঠেছিলেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক পরিবারে বাবারা তার মেয়েদেরকে বলতেন 'তুমি এখন আমার বড় ছেলে'। এমনকি অনেকে বিয়েও পর্যন্ত করতেন না নিজের পরিবার চালানোর জন্য। জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা সন্তানদের জন্য অর্থ পাঠানোর জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পূর্ববঙ্গে থেকে গেছিলেন হেনা চৌধুরী নামে এক মহিলা।[133] এক কথায় এটি ছিল মহিলাদের জীবনের নিঃশব্দ রূপান্তর। নারীদের সমাজ এবং পরিবারের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল। দেশভাগের ফলে অনেক মেয়েদের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছিল। তারা আর কখনোই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেনি। পরিবারের দায়িত্বভার নেওয়ার জন্য তাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হয়েছিল।[134] 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতার মতোই তাদের অনেকেই হয়ত বলেছিল "আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, আমি বাঁচতে বড় ভালোবাসি"।

সাহিত্য: পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা এই দুই জেলার শিক্ষার প্রসারে যেমন অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিলেন; তেমনি তাদের সাহিত্য-প্রতিভাও এই দুই জেলাকে সমৃদ্ধ করেছিল। মালদা থেকে প্রকাশিত গৌড়বার্তা, গৌড়ভূমি, গৌড়বাণী, গৌড়কণ্ঠ ইত্যাদি পত্রিকাগুলি এই সকল প্রতিভাধর উদ্বাস্তু জনগণের লেখায় পল্লবিত হয়েছিল। এই সমস্ত পত্রিকাগুলির পেছনে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অবদান এতটাই ছিল যে একবিংশ শতকেও এই সকল পত্রিকাগুলির প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়, হয় উদ্বাস্তুদের উত্তর প্রজন্মের কারো কলম থেকে কোনো লেখা প্রকাশিত হয়; নয়তো শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কীর্তিমান কোনো উদ্বাস্তুর কীর্তি সম্পর্কে লেখা প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয় বর্তমানে যারা এই সকল পত্রিকাগুলির সম্পাদক তাদের প্রত্যেকেরই পূর্বপুরুষ ১৯৪৭-এর দেশভাগে পূর্ববঙ্গ থেকে শেকড় উপড়ে আসা পরিবারগুলির অংশবিশেষ। তাই এই পত্রিকাগুলির প্রতিটি সংখ্যার 'সম্পাদকীয়' বিভাগ দেশভাগের ক্ষত বা উদ্বাস্তু ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় বহন করে আসছে। উদ্বাস্তুদের শিক্ষানুরাগ ও সাহিত্যচর্চার ফসল হিসেবে 'বর্তিকা', 'জোয়ার' ইত্যাদি বহু লিটল-ম্যাগাজিনগুলি জেলার সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। উপরের আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কয়েকজন সাহিত্যিকের পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

পূর্ববঙ্গের নাটোরে জন্মগ্রহণকারী মিনতি দত্তমিশ্র বৈবাহিক ও কর্মসূত্রে বর্তমানে মালদার এক নম্বর কলোনির বাসিন্দা ছিলেন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত, হাইস্কুলের এই প্রধান শিক্ষিকা শিক্ষকতা বৃত্তির বাইরে জেলার

---

[133] Jasodhara Bagchi, Subhoranjan Dasgupta and Subashri Ghosh (eds), *The Trauma and the Triumph,* Kolkata: Stree (2009), pp. 81-87.

[134] Pallavi Chakravarty, *Post partition refugee rehabilitation in India with special reference to Bengal 1947 to 71,* Thesis Submitted for the Degree of Doctor Philosophy in the Department of History at University of Delhi in 2011. pp. 285-286.

অন্যতম সাহিত্য-সংগঠক, সাহিত্যসেবক।[135] ওপার বাংলার দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থেকে আগত পুষ্পজিৎ রায় মালদা জেলার শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতির অঙ্গনে অবিস্মরণীয় একটি নাম। দেশভাগের সময় তার পরিবার মালদা জেলার রায়গঞ্জে চলে আসে। স্নাতক হবার পর প্রথমে তরিয়াল হাইস্কুলে, পরে রায়গঞ্জের দুর্গাপুর-ভূপালপুর স্কুলে এবং স্নাতকোত্তর অর্জন করার পর জলপাইগুড়ির বীরপাড়া হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৬৯-এ মালদা কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত হন। মালদা জেলার সাহিত্যাঙ্গনে তার অন্যতম অবদান, 'জোয়ার' সাহিত্য পত্রিকা তথা সাহিত্য-সংস্থা, তিনি জোয়ার পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত এই মানুষটি তার আধুনিক স্বতন্ত্র ভাবনায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিদ্যালয়ের ধারণাকে একেবারে পাল্টে দিয়ে ১৯৭৫-এ শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সবুজ অবুঝ শিশু অঙ্গন' গড়ে তোলেন। মালদার নিজস্ব লোকসংস্কৃতি, প্রান্তিক মানুষের কথা, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিভিন্ন শিল্পীদের সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস নিজের লেখনীর মারফতে আপামর জনতার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আজীবন বামপন্থী এই মানুষটি গণতান্ত্রিক লেখক, শিল্প-সংঘ, গণনাট্য-সংঘ ও আদিবাসী, লোকশিল্প-সংঘের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন।[136] পূর্ববঙ্গ থেকে দেশভাগের সময় চলে আসা পূর্বোক্ত সংস্কৃত পন্ডিত ডঃ কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী মালদা জেলা স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি, মালদা জেলার সাহিত্যেও নিজের অবদান রেখে গেছেন। "লাইফ, রিলিজিয়ান এন্ড ফিলোসফি অফ স্বামী স্বরূপানন্দ", 'ভারতীয় আর্য', 'ভারতবর্ষ ও তার ভবিষ্যৎ', 'যৌবন সংগ্রাম ও সাধনা', 'মালদাহের ইতিবৃত্ত' প্রভৃতি তার অন্যান্য সৃষ্টি।[137]

মালদার মতো মুর্শিদাবাদ জেলার সাহিত্যাকাশও উদ্বাস্তু সাহিত্যিকদের প্রতিভার বিচ্ছুরণে আলোকিত হয়েছে। 'মহার্ণব' (কানাইলাল বিশ্বাস, কুষ্টিয়া), 'নাগরিক কণ্ঠ' (চিত্তরঞ্জন চন্দ, পাবনা), 'গণকণ্ঠ' (প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, নোয়াখালী) প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনগুলি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সাহিত্যপ্রেমী মানুষের হাত ধরেই পথচলা শুরু করেছিল।[138] কবি কানাইলাল বিশ্বাসের জন্ম ১৯৪৬ সালে, বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার চকদিয়ার গ্রামে। দেশভাগের দুঃখজনক ফলশ্রুতিতে ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে তিনি তার চার বছর বয়সে বাবা-মার হাত ধরে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার গড়াইমারী গ্রামে আশ্রয় নেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে, গড়াইমারী যাদবকৃষ্ণ বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করেছিলেন। সাহিত্য-সংগঠক ও সাহিত্যসেবক

---

[135] বিকাশ রায়, "মালদাহের মহিলা কবিদের কবিতায় নারীবীক্ষণ", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহার্নব, বিষয়ঃ মালদা জেলা - সেকাল ও একাল,* (বহরমপুরঃ অষ্টম বর্ষ-২০১৯) পৃ. ১৩১।

[136] স্বপ্না রায়, "সৃষ্টির অন্তরালে", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২), পৃ. ৭৩-৭৭; https://www.boulbitan.live/aglimpse, Last Accessed on 01/01/2024.

[137] রত্না মজুমদার "আদর্শ শিক্ষক কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২), পৃ. ৯৩-৯৪।

[138] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৮৬।

শ্রীবিশ্বাস, কলকাতা ও জেলার বাইরে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে লেখালেখি করতেন। কলকাতার বিভিন্ন বাণিজ্যিক সাহিত্যপত্র পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হত। বহরমপুর 'ঝড়' সাহিত্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি যুক্তছিলেন। তার নিজের পত্রিকা ছিল 'মহার্ণব'; যা এই জেলার সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দর্শনীয় স্থান, বিশিষ্ট ব্যক্তি, দেশভাগের প্রভাব, ও অন্যান্য বিষয়ের আকর গ্রন্থ, তিনি ছিলেন তার কার্যনির্বাহী সম্পাদক।[139]

'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামের আড়ালে রবীন্দ্রোত্তর কল্লোল যুগের অন্যতম পথিকৃৎ মণীশ ঘটক এই জেলার গর্ব। মণীশ ঘটকের জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা, পৈতৃক নিবাস ছিল পাবনা জেলার ভারেঙ্গা গ্রামে। ১৯২৭ সালে কেন্দ্র সরকারের আয়কর বিভাগের অ্যাসেসর হিসেবে যোগদান করার পর কর্মসূত্রে বদলি হয়ে ১৯৪৫ সালে তিনি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে আসেন। বাংলার প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের বড় দাদা এই মণীশ ঘটক ১৯৫২ সালে চাকরিতে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করে জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছিলেন। তার লেখা কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ;- 'শিলালিপি', 'যদিও সন্ধ্যা', 'একচক্রা', 'যুবনাশ্বের নেরুদা', 'পটলডাঙার পাঁচালী'; তার লেখা উপন্যাস 'কনখল''; তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মান্ধাতার বাবার আমল'। 'পাবলো নেরুদা'র অনেক কবিতা তিনি অনুবাদও করেছেন। 'বসুমতি', 'দেশ', 'প্রবাসী', 'পরিচয়', 'অমৃত' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় নিয়মিত তার লেখা প্রকাশিত হত। বহরমপুর থেকে 'বর্তিকা' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন তিনি সম্পাদনা করতেন।[140]

ওপার বাংলা থেকে দেশভাগের আবহে এপার বাংলায় এসে যে সকল মানুষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ ভারতের দরবারে উজ্জ্বল করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ঋত্বিক ঘটক, মুর্শিদাবাদ জেলাবাসীর কাছে গর্ব করার মতো নাম; যে নাম সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহর সঙ্গে সমস্বরে উচ্চারিত হয়। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় জন্মগ্রহণকারী এই মণীশ অনুজ, জেলাশাসক বাবার হাত ধরেই এদেশে এসেছিলেন। পূর্ববঙ্গে কিছুকাল পড়াশোনার পরে তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন। পদ্মশ্রী (১৯৭০), বাচসাস (১৯৭৪) পুরস্কারপ্রাপ্ত ও সেরা কাহিনীকার, সেরা চিত্র-পরিচালক বিভাগে একাধিকবার জাতীয় পুরস্কারে (১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৭০, ১৯৭৪) ভূষিত এই প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব একাধারে ছিলেন অভিনেতা, চিত্র-পরিচালক, কাহিনীকার, নাট্যকার, লেখক। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ঋত্বিক ঘটক ভারতীয় গণনাট্য-সংঘে যোগ দেন (১৯৫১)। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন। মুম্বাইয়ের প্রদর্শনীতে তার মঞ্চস্থ করা 'দলিল' নাটক সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম পুরস্কার লাভ

---

[139] অরূপ চন্দ্র, মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহার্নব, বিষয়ঃ মালদা জেলা - সেকাল ও একাল,* (বহরমপুরঃ অষ্টম বর্ষ-২০১৯) পৃ. সম্পাদকীয়।

[140] রবীন্দ্রনাথ দাস, "মনীষ ঘটকঃ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মুর্শিদাবাদের অন্যান ব্যক্তিত্ব- দ্বিতীয় খন্ড,* সপ্তম বর্ষ, (বহরমপুরঃ মহার্নব প্রকাশনী, ২০১৮), পৃষ্ঠা- ৬৯-৭০।

করে। তার পরিচালিত কিছু কালজয়ী ছায়াছবি হল;- ‘নাগরিক’, ‘অযান্ত্রিক’, ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’, ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘কোমলগান্ধার’, ‘সুবর্ণরেখা’, ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। শুধু চলচ্চিত্রকার হিসাবে নয় তিনি কথাসাহিত্যেও ব্যতিক্রমী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'দেশ', ‘শনিবারের চিঠি’, 'অগ্রণী' প্রভৃতি একাধিক পত্র-পত্রিকায় তিনি কলম ধরেছেন। এছাড়াও ‘গন্ধর্ব’, ‘অভিনয়’, ‘দর্পণ’, ‘চিত্র’, ‘বিজ্ঞান’ ইত্যাদি পত্র-পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত লিখতেন। তার প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ;- ‘চলচ্চিত্র’, ‘মানুষ’, ‘আগেপিছু’। প্রথম নাটক ‘কালো সায়র’ এর পাশাপাশি ক্ষুধা-দারিদ্র্য সংকট নিয়ে তিনি লেখেন 'জ্বালা' নাটক। 'দ্য লাইফ অফ দ্য আদিবাসিজ ', 'রঁদেভু', 'ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান', 'আমার লেনিন', প্রভৃতি শর্টফিল্ম ও তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তার তৈরি ডকুমেন্টারি;- ‘পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য’, ‘ইয়ে কিছু’, ‘ইন্দিরা গান্ধী’, ‘চিত্রশিল্পী রামকিঙ্কর’ প্রভৃতি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এই অনন্য সাধারণ মানুষকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে। তার মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ‘ঋত্বিক ট্রাস্ট’ গঠন করা হয়; এছাড়াও বহরমপুরের স্কোয়ার ফিল্ডের কাছে ‘ঋত্বিক সদন’ তৈরি করা হয় যেখানে এখনো বহু দেশি-বিদেশি ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়।[141]

মণীশ ঘটকের পাশাপাশি অনিবার্যভাবে এই আলোচনায় যার নাম চলে আসে তিনি হলেন মণীশ ঘটকের সুযোগ্যা কন্যা মহাশ্বেতা দেবী। পদ্মশ্রী (১৯৮৬), পদ্মবিভূষণ (২০০৬), ম্যাগসাসাই (১৯৯৭) ইত্যাদি বহুবিধ সম্মানে ভূষিতা এই বিদুষী নারী তার সাহিত্য ও সমাজসেবায় জেলা তথা বাংলা তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় তার জন্ম হলেও কর্মসূত্রে তার পিতার বদলির দরুন মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে তার আগমন ও লালদীঘিতে তাদের স্থায়ী বসবাস শুরু হয়। তার প্রাথমিক পড়াশোনা ঢাকায় শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় তা সমাপ্ত হয়। তার ঘটনাবহুল জীবনে, কলকাতার পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতার কাজে, ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কেরানির পদে, বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপিকা হিসেবে তাকে দেখা যায়। ১০০টিরও বেশি উপন্যাস এবং ছোটগল্প, কিশোর-সাহিত্য, প্রবন্ধ সংকলন মিলে ৫০টিরও বেশি গ্রন্থ তিনি উপহার দিয়েছেন। ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘হাজার চুরাশির মা’ তার অনন্য সৃষ্টি। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ১৯৮০-১৯৮৪ সময়কালে তিনি ‘যুগান্তর’ পত্রিকা ও বাবার মৃত্যুর পর মণীশ ঘটক সম্পাদিত ‘বর্তিকা’ পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। বসুমতি', 'আজকাল', 'বর্তমান' প্রভৃতি পত্রিকা ও 'ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি' (মুম্বাই), 'বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড', 'সানডে', 'ফ্রন্টিয়ার', 'নিউ পাবলিক' (রাঁচি) প্রভৃতি ইংরেজি পত্রিকায় তার লেখা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হতো। ছাত্র জীবনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী যেমন আদিবাসী ও সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের জন্য কলম ধরেছিলেন; তেমনি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ২৪ পরগনা, শিবপুর-হাওড়া, সিংভূম, উড়িষ্যা প্রভৃতি জায়গার বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সংগঠনের পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ

[141] ঋত্বিক ঘটক, উইকিপিডিয়া; সৌরভ দত্ত, সিনেমাওয়ালা ঋত্বিক ঘটক, মুক্তধারা, গণশক্তি, ৮-ঈ নভেম্বর ২০২৩।

করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন।[142]

ওপার বাংলা থেকে এই জেলায় আসা আর এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব মণীশ ঘটকের স্নেহধন্য বিমল চক্রবর্তী। বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলায় ১৯৩৪ সালে জন্মগ্রহণ করে দেশভাগের সময় পরিবারের সঙ্গে চলে আসা এই মানুষটি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, কবি, সম্পাদক। এই জেলার মণীন্দ্রনগরে তারা বসবাস শুরু করেন, সেখানে তৎকালীন রাজা শ্রীশচন্দ্র উদ্বাস্তুদের পাট্টা দিতেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি প্রথমে টিকটিকিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও পরে মণীন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাপীঠে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হতো। তার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ 'সংক্রান্তির মাদল', 'চতুর্দিকে স্মৃতিরেখা', 'আলোকে গোলোকে শোলকে', 'বাগেশ্রী বাগেশ্রী কোথায় যাও', 'সঙ্গে আছি সঙ্ঘে আছি', তার কয়েকটি অনুবাদ কাব্য 'লংমার্চ ও অন্যান্য কবিতা', খর কৃপাণ সময় গুনছে কোষে কোষে' তার সম্পাদিত পত্রিকা 'একলব্য', 'উত্তরকাল' 'মুর্শিদাবাদের খবর'। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দেশ', 'কবিকণ্ঠ পত্রিকা' ও 'আকাশবাণী' তার কবিকর্মকে যথাযথ স্বীকৃতি দেয়।[143]

পূর্ববঙ্গের ঢাকায় জন্মগ্রহণকারী সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার (২০০১) প্রাপ্ত মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্মেষ জেলার অন্যান্য মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। দেশভাগের পর ছিন্নমূল হয়ে এসে মুর্শিদাবাদ জেলার বাঞ্জেটিয়া গ্রামের মণীন্দ্রনগর কলোনিতে পরিবারের সঙ্গে তিনি বসবাস করেছিলেন। কলকাতার 'যুগান্তর' পত্রিকায় সাংবাদিকতার পেশা ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ জেলার সাটুই সিনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি যোগদান করেছিলেন। তার বিখ্যাত সৃষ্টি "নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে" ছিন্নমূল মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও সংগ্রামের এক হৃদয়স্পর্শী আখ্যান, যা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় ভারতীয় সাহিত্যেও তাকে স্মরণীয় করে রেখেছে। ভারতের ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে বারোটি মূল ভারতীয় ভাষায় তার এই উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গল্প, উপন্যাস মিলিয়ে তার গ্রন্থের সারণি প্রায় ৮৪টি, ১০টি কিশোর উপন্যাস ও ছোট-বড় মিলিয়ে তার প্রাপ্ত পুরস্কারের সংখ্যা ১০। তার কিছু বিখ্যাত রচনা 'মহিনের ঘোড়াগুলি', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান', 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'আজ আমার সংবর্ধনা', 'দেবী মহিমা' ইত্যাদি।[144]

---

[142] দীননাথ মন্ডল, "মহাশ্বেতা দেবী", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মুর্শিদাবাদের অনন্য ব্যক্তিত্ব- দ্বিতীয় খন্ড,* সপ্তম বর্ষ, (বহরমপুরঃ মহার্নব প্রকাশনী, ২০১৮), পৃষ্ঠা- ৮৯-৯৩।

[143] নীলিমা সাহা, "গাছের বৃক্ষ হওয়া (বিক্রম চক্রবর্তী)", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মুর্শিদাবাদের অনন্য ব্যক্তিত্ব- দ্বিতীয় খন্ড,* সপ্তম বর্ষ, (বহরমপুরঃ মহার্নব প্রকাশনী, ২০১৮), পৃষ্ঠা- ১১২-১১৯।

[144] সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, উইকিপিডিয়া, Last Accessed on 10/05/2024.

৫.৪ মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের ফলে ইতিহাস চর্চায় নতুন পরিভাষার জন্মঃ সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সম্পর্কের সমীকরণ

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের ফলে সেই সমস্ত জেলার রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়তে দেখা যায় বিভিন্ন গবেষণাধর্মী রচনায়। একইভাবে মালদা ও মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলায় এই সমস্ত ক্ষেত্রে কম-বেশি প্রভাব পড়তে দেখা গেলেও সব থেকে স্বতন্ত্র যে প্রভাবটি পড়েছে তা হল উদ্বাস্তু ইতিহাস চর্চায়। "সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সম্পর্কের সমীকরণ" তৈরি হওয়ার একটি প্রেক্ষাপটের আবির্ভাব এবং এই পরিভাষার জন্ম। "সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সম্পর্কের সমীকরণ" নিয়ে পূর্বের সবিস্তার আলোচনার সাপেক্ষে মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় এই "সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সম্পর্ক" কেমন ছিল তা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়; অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের যেমন সাদরে গ্রহণ করা হয়নি তেমনটা ঘটেছিল এই দুই জেলাতেও। চাকরিতে অপশন দিয়ে চলে আসা বা জমি বিক্রি, হস্তান্তর বা বিনিময় করে চলে আসা উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে তেমন সমস্যা না হলেও; সহায়-সম্বলহীন একেবারে নিম্নবিত্ত উদ্বাস্তু, যারা বিভিন্ন ক্যাম্প, দণ্ডকারণ্য বা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা ঘুরে খালি জমি বা খাস জমির সন্ধান পেয়ে এই দুই জেলায় এসেছেন তাদের সঙ্গে স্থানীয় ঘোষ এবং মুসলিমদের একটি বিরোধ বাঁধে। বহুক্ষেত্রে তা হাতাহাতিতেও পৌঁছায়। কারণ পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা গেছে ওই সমস্ত জমি ভোগ করতেন স্থানীয় ঘোষ, চাঁই, মন্ডল এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা, যারা ছিলেন নিম্নবিত্ত। জমির দখল ছাড়াকে কেন্দ্র করে এই বিপত্তি। এখানে ধর্মকেন্দ্রিক বা সাম্প্রদায়িক বিবাদের কথা কোথাও পাওয়া যায়নি। এই সমস্ত বাগবিতন্ডা কোথাও প্রশাসনের তৎপরতায় কোথাও তারা দুই পক্ষ নিজেরাই মিটিয়ে নিয়েছিলেন। তবে উদ্বাস্তুদের জন্য বলা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তাদের আত্তীকরণ হতে কিছুটা সময় লাগে।

সমীক্ষায় জানা যায় স্থানীয় মুসলিমদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের মধ্যে মেলামেশা শুরু হয় পরিবারের বাচ্চাদের হাত ধরে। সন্তানদের বিদ্যালয়ে যাওয়া, শ্রেণীকক্ষে একসঙ্গে পড়া থেকে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া, বাড়ি ফেরা, মাঠে একসঙ্গে খেলাধূলা করা ইত্যাদির মাধ্যমে ছোটদের মধ্যে মেলামেশা শুরু হলে ক্রমে তা অভিভাবকদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। একে অপরের বাড়ি আসা যাওয়া ইত্যাদি চলতে থাকে যা পরবর্তীকালে জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পূজা, ঈদ ইত্যাদিতে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।[145] আবার একইভাবে পরিবারের কর্মরত সদস্যদের কর্মক্ষেত্রে তাদের পেশার তাগিদে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে প্রয়োজনের তাগিদে একে অপরের সঙ্গে কথা বলা, মেলামেশা ইত্যাদির মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

[145] সাক্ষাৎকারঃ-শান্তিররঞ্জন সরকার, মালদা।

তবে বাড়ির বাইরে পা রাখার দরুন স্বভাবতই শিশু বা পুরুষদের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি মেলামেশা সম্ভব হয়েছিল; তুলনায় বিংশ শতকের পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের গৃহবধূদের ক্ষেত্রে সংকোচ ছিল কিছু বেশি। মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তু নির্মল সরকারের কথায়, "মেলামেশার ক্ষেত্রে মা, জেঠিমা, কাকিমাদের মধ্যে দ্বিধা ছিল বেশি। তারা সহজে কাওকে বিশ্বাস করতে চাইত না"। মালদার ফ্যালানি বিশ্বাস যেমন বলেন "ভালো মুসলিমরা আশ্রয় দেয়, সাহায্য করে। কিন্তু আমাদের মনে ভয় ছিল, মেলামেশা হতে অসুবিধা কেটে যায়"। এই ভাবে এই জেলা দুটিতে আশ্রয়গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক উদ্বাস্তু স্থানীয় মুসলিমদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মালদার অপর এক উদ্বাস্তু রবীন্দ্রনাথ সরকারের কথা অনুসারে, "এখানকার গফুর মিয়ার কাছ থেকে আমি জমি কিনে চাষবাস শুরু করেছিলাম, তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন"। এই জেলার সুবলচন্দ্র সরকার বলেন "মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমানদের কথার দাম অনেক বেশি। এক টাকায় একটা জমির বায়না হলে তারা এক কোটিতেও বিক্রি করতো না"। আবার এমনও দেখা গেছে উদ্বাস্তুরা কয়েকশো ঘর মিলে একসঙ্গে জোটবদ্ধভাবে কলোনি গঠন করে বসবাস করার ফলে তাদের 'কলোনি' পরিচয়ই বড় হয়ে থেকে গেছে। বাইরের মানুষজন, স্থানীয় হিন্দু বা মুসলিম কারো সঙ্গে তেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। মুর্শিদাবাদ জেলার বিল কলোনির শংকর বিশ্বাসের কথায় এই আক্ষেপ ঝরে পড়ে। অপর এক গবেষণাতেও উদ্বাস্তুদের এই 'কলোনি পিপল' হিসেবে পরিচিতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[146]

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়; উদ্বাস্তুদের অভিজ্ঞতা সব জায়গায় এক ছিল না কোথাও তাদের 'রিফু' মতান্তরে 'রিপু' নামে ডাকা, কোথাও আবার জমি দিয়ে সাহায্য করা এইরকম মিঠে-কড়া অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়। এগুলি আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক রকমই থাকে না পরিবর্তন আসে তাদের পারস্পারিক সম্পর্কে। কর্ম জগৎ,বাচ্চাদের শিক্ষা জগৎ, সামাজিক সাংস্কৃতিক ধার্মিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, উৎসব তাদের মধ্যেকার ব্যবধান ঘোঁচানোর কাজ করে। ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশে নতুন সমাজে তাদের আত্তীকরণ ঘটতে থাকে, কোথাও এক দশক কোথাও দু দশক বা তারও বেশি সময় লেগে যায়।

৫.৫ মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের রাজনৈতিক প্রভাবঃ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অবদান ছিল মূলত শাসক দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাম দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি ও রাজ্যে বামপন্থী রাজনৈতির উত্থানের পথ প্রশস্ত করায়। পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত জেলা গুলিতে খুব বেশি সংখ্যক উদ্বাস্তুরা এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই সমস্ত জেলাগুলি থেকে বাম দলগুলি উদ্বাস্তুদের সমর্থন পেয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন গুলিতে দেখা যায় সে সমস্ত এলাকায়

[146] Monika Mandal, *Settling the Unsettled,* p. 234.

বামেরই বেশি জয়যুক্ত হয়েছে।[147] কারণ ত্রাণ ও পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে উদ্বাস্তুদের পাশে থেকে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনকে জোরালো করতে সাহায্য করেছিল বিভিন্ন বাম দলগুলি। পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায় মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা এই জেলার মোট জনগণের মাত্র ৫ শতাংশের কিছু বেশি।[148] তবে জেলার রাজনীতিতে উদ্বাস্তু জনগনের একেবারেই কোনো অবদান নেই তা কখনোই বলা যায় না। কারণ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের উপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় মালদা জেলার সেই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে সিপিএম বরাবর ভালো ফল করেছে যেখানে উদ্বাস্তুরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এটা নিহাতই কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়। দেশ স্বাধীন হবার পর মালদা জেলায় লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেসেরই একাধিপত্য ছিল। মালদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রথম চারটি নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে। প্রতিটি নির্বাচনেই বিরোধী দলগুলিকে প্রায় ৪০ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে ছিল কংগ্রেস। এর মধ্যে দুবারের লোকসভা ভোটে মালদা কেন্দ্র থেকে বিজয়ী কংগ্রেসের রেনুকা রায় ছিলেন তৎকালীন উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পূনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী। ১৯৭১ সালের পঞ্চম লোকসভা নির্বাচনে প্রথম বার সিপিএমের দীনেশচন্দ্র জোয়ারদার গতবারের (১৯৬৭) বিজয়ী উমা রায় কে পরাজিত করে জয়লাভ করেন। পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনেও (১৯৭৭) তিনি জয়ী হয়েছিলেন। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা প্রণব মুখার্জি তার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এরপর সপ্তম লোকসভা নির্বাচন (১৯৮০), থেকে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন (২০০৪) পর্যন্ত মালদা লোকসভা কেন্দ্র থেকে একনাগাড়ে পর পর আট বার জয়লাভ করে নজির সৃষ্টি করেন এবিএগণি খান চৌধুরী। এরমধ্যে মালদা জেলার সিপিএমের দুই প্রভাবশালী নেতা দুইবারের সাংসদ দীনেশচন্দ্র জোয়ারদারকে দুইবার ও তিনবারের বিধায়ক শৈলেন সরকারকে তিনবার পরাজিত করেন।[149] এই 'গণি মিথ'-এর জন্য জেলার সাধারণ মানুষের মনে তিনি অপরাজেয় এই প্রত্যয় জন্মায়। এমনকি তার মৃত্যুর পরও ওই লোকসভা এলাকায় উপনির্বাচন হলে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবু হাসেম খান চৌধুরী জয়লাভ করেছিলেন।

মালদার কিছু কিছু অঞ্চল মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছিল না। ১৯৬২-তে তৃতীয় লোকসভা নির্বাচনে হাবিবপুর, মালদা, খড়বা ও হরিশ্চন্দ্রপুর এই ৪টি কেন্দ্র বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের (তপশিলি উপজাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসন) সঙ্গে যুক্ত ছিল, যেখান থেকে জয়লাভ করেছিলেন মালদা জেলার কমিউনিস্ট প্রার্থী সরকার মুর্মু।[150] লক্ষণীয় বিষয় হল ১৯৫৫ সালের প্রকাশিত স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট

---

[147] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ৩২৭-৩৩৩।

[148] তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৪৩-১৫৩।

[149] Dilip Banerjee, *Election Recorders: An Analytical Reference,* (Kolkata: Star Publishing House, 2009, pp. 116-220.

[150] Ibid, pp. 125-127.

অনুসারে এই হাবিবপুরেই বেশিরভাগ উদ্বাস্তুরা এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এর পাশাপাশি মালদাতেও বসবাস করতেন একটা বিরাট অংশ। এই চারটি কেন্দ্রে মোট ৭৮৩৯টি উদ্বাস্তু পরিবার বসবাস করতেন।[151] সংখ্যাটি নিহাতই কম নয়। এছাড়াও আগেই বলা হয়েছে মালদা আগত উদ্বাস্তুদের ৮০ শতাংশই ছিল তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত। এরকম একটি কেন্দ্রে কমিউনিস্ট প্রার্থী সরকার মুর্মুর জয় কোন দিকে ইঙ্গিত করে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মালদা জেলার রাজনীতিতে উদ্বাস্তুদের অবদান অনুসন্ধানে হাবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শুধু হাবিবপুর নয়, এই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছিল বামনগোলাও। বামনগোলা হল মালদার সর্বাধিক উদ্বাস্তুদের আশ্রয়গ্রহণকারী অঞ্চলগুলির মধ্যে দ্বিতীয়। শুধু হাবিবপুর ও বামনগোলাতেই ৮৬৮১ টি পরিবার বসবাস করতেন।[152] ১৯৬২-এর বিধানসভা নির্বাচনে হাবিবপুর আলাদাভাবে মালদা জেলার বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে প্রথমবার আত্মপ্রকাশ করলে ১৯৬২-সহ পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন গুলিতে এই কেন্দ্র থেকে সিপিএমই বরাবর জয় লাভ করতে থাকে; শুধুমাত্র ১৯৬৭ ও ১৯৭১ এই দুটি নির্বাচন ব্যাতিক্রম। ১৯৬৭ সালে হাবিবপুর, মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হলে প্রথমবার ওই কেন্দ্রে কমিউনিস্ট দল হিসেবে সিপিআই প্রার্থী দেয় এবং ১৬.৩৪ শতাংশ ভোট পায় এবং পরের দুটি লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমই জয় লাভ করে।[153]

কিন্তু তার পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে কোনো দলই গণি খানের জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। জেলার উদ্বাস্তু রাজনীতি বোঝার জন্য হাবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মতো আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিধানসভা কেন্দ্র হল ইংলিশবাজার। কারণ হাবিবপুর, বামনগোলার পর ইংলিশ বাজার ও ইংলিশ বাজার টাউনেই উদ্বাস্তুরা বেশিরভাগ আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবং সেই কেন্দ্রেও বিধানসভা নির্বাচন গুলিতে সিপিএম তার জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছিল। ১৯৭১-এ লোকসভা নির্বাচনে প্রথম বার মালদা কেন্দ্র সিপিএমের দখলে এলেও বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৯৭৭ এর আগে পর্যন্ত সবকটি নির্বাচনেই কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে এসেছে। ১৯৭৭-এ সমগ্র রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলে মালদাতেও বিধানসভা ভোটে তারা সর্বাধিক আসনে জয়লাভ করে। রাজ্যে ৩৪ বছরের সিপিএমের শাসনকালে সব নির্বাচনেই যে মালদায় সিপিএম জয় পেয়েছিল তাই নয়; ওই সময়কালে দুটি নির্বাচনে কংগ্রেসের দখলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন থেকে যায়। এই সময়কালে (১৯৭৭-২০১১) সিপিএম ৪৪টি আসনে জয় লাভ করলেও ওই সময় এই জেলায় কংগ্রেস ৩৬টি আসন পেয়েছিল। ১৯৫২-২০১১ পর্যন্ত প্রাপ্ত ভোট শতাংশের বিচারেও এই জেলায় বরাবরই এগিয়ে ছিল কংগ্রেস। দশম, একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ কেবলমাত্র এই চারটি বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম এর প্রাপ্ত ভোট শতাংশের বিচারে কংগ্রেসের থেকে এগিয়ে থাকলেও কেবলমাত্র ত্রয়োদশ নির্বাচন ছাড়া বাকি তিনটি ক্ষেত্রে এই ব্যবধান ছিল মাত্র এক শতাংশ বা তারও

[151] File No:- G.P. 361.5 (5415) 083 w 52, p.91.

[152] Ibid.

[153] Dilip Banerjee, *Election Recorders,* pp. 116-220; Ibid, pp. 291-550.

কম। ত্রয়োদশ নির্বাচনে এই ব্যবধান ছিল মাত্র ৬ শতাংশ।[154] এই সমস্ত পরিসংখ্যানগুলি এটাই প্রমাণ করে, মালদা জেলা ছিল কংগ্রেসের দুর্জয় ঘাঁটি। বিরোধী দল হিসেবে সিপিএম মাঝে মাঝে হানা দিলেও কংগ্রেস এই জেলায় তার দুর্গকে মোটামুটি ভাবে অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়েছিল এবং এর পিছনে জেলার ভূমিপুত্র এবিএ গণি খান চৌধুরীর অবদান অনস্বীকার্য্য।

সারণি-৯ মালদা জেলায় লোকসভা নির্বাচন সমূহের ফলাফল।

কেন্দ্র	৫২	৫৭	৬২	৬৭	৭১	৭৭	৮০	৮৪	৮৯	৯১	৯৬	৯৯
মালদা	INC	INC,INC	INC	INC	CPIM	CPIM	INC	INC	INC	INC	INC	INC
অন্যান্য	INC,INC	INC	-	INC	INC	-	-	-	-	-	-	-
বালুরঘাট	-	-	CPI	-	-	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP
রায়গঞ্জ	-	-	-	-	-	JD	Ind	Ind	Ind	CPIM	CPIM	INC
মোট আসন	৩	৩	২	২	২	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
INC	৩	৩	১	২	১	-	১	১	১	১	১	২
Ind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPIM	-	-	-	-	১	১	১	১	১	১	১	-
RSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	১
Others	-	-	CPI-১	-	-	JD-১	-	-	-	-	-	-

অন্যান্য কেন্দ্রঃ ১৯৫২ সালে একটি কেন্দ্র পশ্চিম দিনাজপুর ও একটি কেন্দ্র বীরভূম, ১৯৫৭ সালে একটি কেন্দ্র পশ্চিম দিনাজপুর; ১৯৬৭, ১৯৭১ সালে একটি করে কেন্দ্র জঙ্গিপুর।

লোকসভা নির্বাচনে তার জনপ্রিয়তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনে ১৯৫২-তে মাত্র ২৬ বছর বয়সে তার প্রথম প্রকাশেই নির্দল প্রার্থী হিসেবে কালিয়াচক উত্তর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে তিনি জয় লাভ করেছিলেন। এরপর ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ৫টি বিধানসভা নির্বাচনে একাদিক্রমে পাঁচবার তিনি সুজাপুর কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে তিনি ৭০% শতাংশ, কখনো কখনো তারও বেশি ভোট অর্জন করেছিলেন। তিনি তার কেন্দ্রে যেভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতেন তার একটি উদাহরণ হল; ১৯৬৭ চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচনে তার প্রাপ্ত ভোট ছিল ৭৫.৪৯ শতাংশ এবং

[154] Ibid, pp. 431-7oo.

দ্বিতীয় স্থান অধিকারীর প্রাপ্ত ভোট ছিল ৮.৪১ শতাংশ।[155] ভোটে জয়ের এত বড় ব্যবধান নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন ঘটনা এবং এই ব্যবধান প্রমাণ করে মালদার রাজনীতিতে ব্যক্তির জনপ্রিয়তা দলকে ছাপিয়ে উঠেছিল। তার এই জনপ্রিয়তার কারণ হল তার কাজ ও জনসংযোগ।

সারণি-১০ মালদা জেলায় বিধানসভা নির্বাচন সমূহের ফলাফল।

কেন্দ্র	৫২	৫৭	৬২	৬৭	৬৯	৭১	৭২	৭৭	৮২	৮৭	৯১	৯৬	০১
গাজোল	CPI	-	-	INC	INC	CPM	INC	CPM	CPM	CPM	CPM	CPM	CPM
খড়বা	INC	Ind	Ind	Ind	IndUF	CPM	INC	Ind	INC	CPM	CPM	INC	INC
হরিশ্চন্দ্রপুর	INC	Ind	INC	Ind	WP	WP	INC	JP	INC	FB	FB	FB	INC
রতুয়া	INC	INC1,2	INC	INC	IndUF	INCR	INC	CPM	INC	CPM	CPM	INC	CPM
মানিকচক	INC	-	INC	SWA	INC	INCR	INC	CPM	INC	CPM	CPM	INC	CPM
মালদহ	IND,INC	INC1,2	CPI	INC	INC	INCR	INC	CPM	INC	CPM	CPM	INC	CPM
কালিয়াচক	Ind,INC	INC	Ind	CPM	INC	INCR	INC	INC	CPM	CPM	INC	INC	INC
ইংলিশবাজার	-	INC	INC	INC	CPI	CPI	CPI	CPM	CPM	CPM	INC	INC	CPM
সুজাপুর	-	Ind	INC	INC	INC	INCR	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC
হাবিবপুর	-	-	CPI	INC	CPI	Ind	CPI	CPM	CPM	CPM	CPM	CPM	CPM
আড়াইডাঙ্গা	-	-	-	-	-	-	-	CPM	CPM	CPM	INC	INC	INC
মোটআসন	৯	৯	৯	১০	১০	১০	১০	১১	১১	১১	১১	১১	১১
INC	৬	৬	৫	৬	৫	৫	৮	২	৬	১	৪	৮	৫
Ind	২	৩	২	২	২	১	-	১	-	-	-	-	-
CPI	১	-	২	-	২	১	২	-	-	-	-	-	-
CPM	-	-	-	১	-	২	-	৬	৫	৯	৬	২	৬
Others	-	-	-	SWA-১	WP-১	WP-১	-	JP-১	-	FB-১	FB-১	FB-১	-

[155] Ibid, pp. 291-492.

গনি খানের এই সাফল্যের পেছনে তার দু একটি কীর্তির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মন্ত্রিসভায় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী থাকাকালীন জেলার গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ, ভূতনি নামে প্রত্যন্ত এলাকায় ফুলাহার নদীর তলদেশ দিয়ে কেবিলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-সংযোগের প্রচেষ্টা, ভুতনিতে বন্যা প্রতিরোধের জন্য রিং বাঁধ নির্মাণ; এছাড়াও জেলা সদর মালদার সৌন্দর্যায়নের জন্য চিত্তরঞ্জন পৌরবাজারের নবরূপদান, অতুল চন্দ্রকুমার বাস টার্মিনাস, শুভঙ্কর শিশু উদ্যান ও প্রধান ডাকঘরের সামনে ফোয়ারা বসানো ইত্যাদি ছিল তার অবদান। মালদা কলেজের প্রাক্তন রিডার ও হরিশচন্দ্রপুর কলেজের প্রাক্তন প্রথম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তথা গবেষক ডঃ সমর কুমার মিশ্র এই গণি খান সম্পর্কে বলেছেন;- "এই সময় তিনি রাজ্য বিদ্যুৎপর্ষদে ১০০০০-এর বেশি যুবকদের চাকরি দেন ও প্রত্যেক বিধায়কের জন্য নির্দিষ্ট কোটা স্থির করে দেন। মালদা জেলার কোটা থেকে তিনি যাদেরকে চাকরি দিয়েছিলেন তার ৯০ শতাংশ যুবক-যুবতীই ছিলেন হিন্দু পরিবারের। তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল; জনপ্রতিনিধি হল সব দল ও সব মানুষেরই ভরসা। কাজেই দল জাতি-ধর্ম-বর্ণ মত নির্বিশেষে সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হয়"। ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় সেচ, বিদ্যুৎ ও কয়লা মন্ত্রকের মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ফারাক্কায় গঙ্গার উত্তর তীরে মালদা জেলার সীমানায় বিখ্যাত এনটিপিসি টাউনশিপ ও গঙ্গার বন্যা প্রতিরোধে রিং বাঁধ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন কলকাতায় নির্মীয়মান মেট্রোরেল ও চক্ররেলের কাজ সম্পন্ন করেন। সেইসঙ্গে বালুরঘাটবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি একলাখি-বালুরঘাট রেলপথ, মালদায় ইস্টার্ন রেলের নতুন ডিভিশন, ডিজেল লোকোশেডসহ কর্মী আবাস কলোনি, বিভাগীয় রেলওয়ে হাসপাতাল, রেল পার্ক রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অফিস (RRB), লক্ষ্মণ সেন স্টেডিয়াম, মালদা-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস, নিউ-জলপাইগুড়ি-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস নামক নতুন দুটি ট্রেন চালুসহ রাজ্য ও সারা দেশের জন্য রেলের অসংখ্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পন্ন করেন। তাছাড়া মালদার জন্য লক্ষ্মীপুরে একটি বিশাল বিদ্যুৎ পরিবাহী স্টেশন ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন, মঙ্গলবাড়ীতে 'গৌড় ভবন' নির্মাণ তাঁর উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়। যে কারণে জেলার জনসাধারণ তাকে "মালদার উন্নয়নের কান্ডারী" বা "মালদার উন্নয়নের রূপকার" নামে আখ্যায়িত করেছিল।[156]

শুধু জেলা বাসীদের জন্যই নয় মালদা জেলার উদ্বাস্তুদের জন্যও তার যথেষ্ট অবদান ছিল। মালদা জেলায় আগত উদ্বাস্তু তথা কমিউনিস্ট দলের জেলা কমিটির সদস্য শান্তিরঞ্জন সরকার বলেছেন কিভাবে সিপিএমের সমর্থকরাও লোকসভায় গণি খানকে ভোট দিতেন। ওপার বাংলা থেকে হাজার হাজার শরণার্থীরা এসে পূর্ববঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া গণি খানের সম্পত্তির অন্তর্গত জমি-জায়গাগুলি দখল করে বসবাস শুরু করেছিলেন; "উনি তাদের কোনদিন কিছু বলেননি, পূর্ববঙ্গের সীমান্তের উদ্বাস্তুরা এক বাক্যে বরকত সাহেবের কথা শুনত। ব্যক্তিগত কারণে প্রত্যেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বরকত সাহেবকেই ভোট দিত। বিধানসভায় তারাই আবার সিপিএমকে ভোট দিত।" এর

[156] ডঃ সমর কুমার মিশ্র, *স্বাধীনোত্তরকালে মালদহ জেলার রাজনীতি ও নির্বাচন,* (কলকাতাঃ অক্ষর প্রকাশনী, ২০২১), পৃ. ২৫৬-২৬০।

কারণ জানতে চাইলে তার সপাট উত্তর "আপনি যদি আমারে খাবার-দাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে আমি দেখব না আপনি কি পার্টি করেন, আমি আপনারেই ভোট দিব"।[157] উদ্বাস্তুদের কথায় তার প্রতি অভিভাবকসুলভ সম্মান ঝরে পড়ে। জেলার অপর উদ্বাস্তুদের কথাতেও ধরা পড়ে এই জেলায় গণি খান চৌধুরীকে পরাজিত করা মোটেও সহজ ছিল না। তাদের মধ্যে সুবল চন্দ্র সরকার সাক্ষাৎকারে বলেছেন "গনি খান চৌধুরী নিঃসন্দেহে ভালো ও উদার লোক ছিলেন। উনার প্রভাব এত বেশি ছিল যে মালদা ও মুর্শিদাবাদের লোক সিপিএমের কথা ভাবতেই পারেনি"।[158] জেলায় "গণি খান চৌধুরীর প্রভাব ছিল" এ কথা বলেছেন আরও এক উদ্বাস্তু, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস।[159] এই সমস্ত আলোচনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট, রাজ্যে বাম আমলে বিধানসভা নির্বাচনে জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও লোকসভা নির্বাচনে তাদের লড়াইটা কংগ্রেস বনাম সিপিএম নয় বরং গণি খান বনাম সিপিএম হয়ে গিয়েছিল। আর এই একটা মানুষের ব্যক্তিত্বের কাছে তাদের আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় ছিল না। এই মহীরূহের ছায়ায় ঢেকে না পড়লে সমগ্র জেলার রাজনৈতিক চিত্রটাই হয়তো অন্যরকম হতো। তবে বিধানসভা নির্বাচন গুলিতে হাবিবপুর ও ইংলিশবাজার কেন্দ্র দুটিতে ধারাবাহিকভাবে সিপিএমের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার পেছনে জেলার উদ্বাস্তু জনগণের অবশ্যই একটা বিরাট অবদান ছিল এবং এই ধারাবাহিকতাই পরবর্তীকালে বাম আমলে জেলায় অন্যান্য কেন্দ্রগুলিকে সিপিএমের দখলে রাখতে সাহায্য করেছে। কংগ্রেসের গড় এই মালদা জেলাতে বিরোধী শক্তি যেটুকু মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল তাতে উদ্বাস্তু জনগণের ভূমিকা অপরিসীম। জেলার উদ্বাস্তুদের কথা থেকে জানা যায় তারা গোপনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, বুথে গিয়ে প্রচার চালাতেন, বলতেন "সিপিএমরে ভোটটা দিবি"।[160]

বিপুল জনজোয়ারে সংখ্যার যে পার্থক্য আনা যায়, রাজনৈতিক সমীকরণগুলি পরিবর্তন করা যায়; যেমনটা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র পরিলক্ষিত হয়েছে সেই সুযোগ এই জেলার উদ্বাস্তুদের কাছে ছিল না। তবুও জেলার একটি ক্ষুদ্র অংশ হয়েই দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ এইসব উদ্বাস্তু জনগণ তাদের ধারাবাহিকতা ও ঐক্যবদ্ধতার দ্বারা জেলার রাজনীতিতে 'লাইট হাউস'এর কাজটি করে গেছেন। তাদের কাছ থেকে এই জেলা রাজনৈতিক পরিসরে পেয়েছে শৈলেন সরকারের মত প্রবাদপ্রতিম বামপন্থী নেতাকে। পূর্ববঙ্গের বরিশালে জন্মগ্রহণকারী শৈলেন সরকার ছাত্রাবস্থাতেই বাংলা-বিহার একত্রীকরনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি ভারতের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও ১৯৬৪ সালের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সদস্য হন। ১৯৬৮-তে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর মালদা জেলার সম্পাদক হন। এছাড়াও পার্টির শিক্ষক সংগঠন

[157] সাক্ষাৎকারঃ- শান্তিরঞ্জন সরকার, মালদা।

[158] সাক্ষাৎকারঃ- সুবলচন্দ্র সরকার, মালদা।

[159] সাক্ষাৎকারঃ- চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস মালদা

[160] সাক্ষাৎকারঃ- শান্তিরঞ্জন সরকার, মালদা।

এবিটিএ-র রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে শিক্ষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পাঁচবারের বিধায়ক ও রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রকে মন্ত্রিত্ব পেয়েছিলেন তিনবার। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ইংলিশ বাজার কেন্দ্র থেকে সিপিএম প্রার্থী রূপে জনতা পার্টির নেতা তথা জেলায় হিন্দু মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হরিপ্রসন্ন মিশ্রকে পরাজিত করে প্রথমবার জয়ী হন। এর পরবর্তী দুটি বিধানসভা নির্বাচন ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সালেও তিনি ওই কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি মালদা শহরের রথবাড়ী মোড়ে ফ্লাইওভার, সত্য চৌধুরী ইনডোর স্টেডিয়াম, মালদহ কলেজের অডিটোরিয়াম, বৃন্দাবনী মাঠে মুক্ত মঞ্চ, পবিত্র সেন আর্ট গ্যালারি, নতুন কালেকটরেট ভবনসহ জেলার বহু স্থানে নদীর উপর সেতু ও অন্যান্য নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন। এরপর ২০০১ ও ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী (MIC) এবং ২০০৬-এ রাজ্য মন্ত্রীসভায় পরিবেশ ও পরিষদীয় দপ্তরের মন্ত্রী (MIC) হন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মন্ত্রীসভায় থাকাকালীন তিনি জেলার জন্য আরও যে সকল উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন করেন সেগুলি হল: রতুয়া স্টেডিয়াম, ও জেলা কৃষি খামারে ফুড পার্ক নির্মাণ। এছাড়া তিনি মালদা মেডিক্যাল কলেজ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কালিয়াচক কলেজ, পাকুয়াহাট কলেজ, গাজোল কলেজ ও হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।[161] এই শৈলেন সরকারের সম্পর্কে জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক পূর্বোক্ত ডঃ মিশ্র বলেছেন, "স্বাধীনোত্তর কালে মালদহ জেলায় বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলনের প্রকৃত নায়ক অভিধায় যদি কাউকে আখ্যায়িত করতে হয়, তিনি হলেন শৈলেন সরকার। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদিত নেতা কমরেড মানিক ঝাঁ ছয়ের দশকে মালদহ জেলায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির যে চারাটি রোপণ করে দেন সেটিকে পুষ্প-পল্লবে পূর্ণরূপে বিকশিত করার কাজটি সম্পন্ন করেন শৈলেন সরকার।" কারণ রাজ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন হবার পর বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছর সময়কাল পর্যন্ত তার সুদক্ষ পরিচালনায় জেলায় দলের অগ্রগতি হয়। তিনি শুধু সিপিএমের সুদক্ষ সংগঠকই নন, তিনি ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ ও পার্টির নির্বাচনের কৌশলী। তার নির্বাচনী কৌশল ও পরিচালনাতেই মালদা জেলায় ১৯৬৭ থেকে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত সময়কালে মোট ৪৯ জন বিধায়ক নির্বাচিত হন।

মালদা জেলার রাজনীতিতে উদ্বাস্তু মানুষের অবদান প্রসঙ্গে 'নাচোলের রাণীমা' ইলা মিত্রের নাম উল্লেখ না করলে এই আলোচনা সম্পূর্ণ হয়না। জন্ম কলকাতায় হলেও বৈবাহিক সূত্রে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জের প্রভাবশালী ভূস্বামী পরিবারের পুত্রবধূ হয়ে অন্দরমহলেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এই অবরোধ এতটাই ছিল যে কোনো পুরুষ আত্মীয়-স্বজন বা চাকর-বাকরদের সঙ্গে তাদের কথা বলাও বারণ ছিল। অথচ বেথুন কলেজের স্নাতক এই ছাত্রী

[161] ডঃ সমর কুমার মিশ্র, *স্বাধীনোত্তরকালে মালদহ,* পৃ. ২৫০-২৫৩।

ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির প্রতি আগ্রহী ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির 'গার্লস স্টোরস কমিটি'র কাজে তিনি আগেই যুক্ত হয়েছিলেন। মুক্তমনা, রাজনীতি-সচেতন এই নারী অন্দরমহলের গন্ডী টপকে ছিলেন রাজনৈতিক তাগিদ থেকে। তার মত আরও শত শত গ্রাম-বাংলার মহিলাদের অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে বের করে এনে নারী শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতার আলোয় উদ্ভাসিত করেছিলেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জে তিনি ওখানকার মহিলাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। মালদায় বিয়ে হওয়ার সুবাদে তিনি মালদার বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে নোয়াখালীর হাসনাবাদে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে ফসলের দুই তৃতীয়াংশের ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে, তেভাগা আন্দলনে রাজশাহী জেলার বিশেষত নাচোলের কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। অবিভক্ত মালদার কৃষক আন্দোলনে এ ছিল এক সোনালী অধ্যায়। প্রান্তিক আদিবাসী মানুষ ও কৃষকদের মধ্যে ইলা মিত্রের গ্রহণযোগ্যতা এতটাই ছিল যে তাদের কাছে তিনি ইলা মিত্র থেকে 'রাণীমা' হয়ে ওঠেন। স্বাধীনতার পরেও মালদার সঙ্গে ইলা মিত্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল; যদিও তিনি থাকতেন কলকাতায়। ১৯৬২-৭৮ সময়ের মধ্যে মানিকতলা নির্বাচনী এলাকা থেকে তিনি পরপর চারবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হন। এর মধ্যে দুবার তিনি ছিলেন বিধানসভার কমিউনিস্ট পার্টি ডেপুটি লিডার। জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[162] কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে যাওয়ার পর সিপিআই এর তরফ থেকে মালদা জেলার সংগঠনের দেখভালের দায়িত্ব ছিল ইলা মিত্রের উপর। 'জেলা কমিটির বৈঠক, কিংবা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকলে তিনি আসতেন, পার্টিকে নেতৃত্ব দিতেন'।[163]

সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলাতে উদ্বাস্তু জনসংখ্যা প্রতি ৩৫ জনে, একজন।[164] এত লঘু জনঘনত্ববিশিষ্ট এক শ্রেণির মানুষ যে তাদের উপস্থিতির দ্বারা জেলার রাজনীতিতে বিরাট কিছু পরিবর্তন আনতে পারবেন তার প্রত্যাশা সমীচীন নয়। তবুও তাদের উপস্থিতি, অভিন্ন চিন্তাধারা, ঐক্যবদ্ধতা সময়ের সাথে অনুকূল পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে জেলার রাজনৈতিক বাতাবরণে কিছুটা প্রভাব ফেলে যা একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। এই পরিবর্তন বা প্রভাব ঘটেছিল মন্থর গতিতে ও সুনির্দিষ্ট পথ ধরে। সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্তর পর্যবেক্ষণ অনুসারে "মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ সালের আগে এই জেলায় মুসলিম লীগ দল প্রধান দল হিসেবে কাজ করতো। আবার ১৯৪৭ থেকে ৬৭ পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রভাব ছিল। ১৯৬৭ পরবর্তী বিশেষ করে

---

[162] কল্লোল মজুমদার, "ইলা মিত্রঃ মালদা থেকে বৃহত্তর সংগ্রামে", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২), পৃ. ৫-৫৬।

[163] সাক্ষাৎকারঃ- তরুণ দাস, সিপিআই-এর নেতা, মালদা।

[164] তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৪৩-১৫৩।

১৯৭৭ সাল থেকে এই জেলের মানুষজন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে বামের দিকে কিছুটা হলেও যাওয়ার মনোভাব তৈরি হয়েছিল"।[165] কিন্তু এই প্যাটার্নের কারণ কী ছিল এবং এর নির্ধারক বা প্রভাবক উপাদানগুলি কী ছিল সে নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। বর্তমান গবেষণাও এই একই উপনীত হয়েছে। এবার দেখে নেওয়া যাক কোন পথ ধরে এই সিদ্ধান্ত তার রূপ পেয়েছে। জেলার লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন ফলাফলগুলোর দিকে নজর দিলে দেখা যায় প্রথম দিকে ১৯৫১ ও ১৯৫৭ এর সব নির্বাচনেই কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৭১ এর পর থেকে জেলায় লোকসভা, বিধানসভা উভয় নির্বাচনেই যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে থাকে।[166] জেলায় কংগ্রেস তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল ও কয়েক দশক ধরে তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল স্বতন্ত্র দল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে এই জেলার রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হত এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভোটে। এবং তার অধিকাংশই ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক। কিন্তু এই কংগ্রেসের গড়েই যুক্তফন্টের গোড়াপত্তন হয়েছিল এবং প্রায় তিন দশক পর্যন্ত তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রেখেছিল।[167] 'মুসলিমদের কংগ্রেসপ্রীতি' ছাপিয়ে উঠে এই জেলায় বাম দলগুলির এই সাফল্যের পেছনে জেলার উদ্বাস্তু জনগণের নিঃশব্দ কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সহযোগ অতিরিক্ত প্রাণবায়ু সরবরাহ করে। তারা তাদের স্বল্প সংখ্যক ভোটে জেলায় রাজনৈতিক পালাবদল করার ক্ষমতা না রাখলেও জেলাবাসীর রাজনৈতিক মনোভাবের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রচ্ছন্নভাবে হলেও জেলার মানুষদের বিশেষত গ্রামীণ অসচ্ছল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আরও বেশি রাজনীতি মনস্ক করে তোলার কাজটিও তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল অতি সন্তর্পণে। এই পরিবর্তন অনুধাবন করার আগে এই জেলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

দেশভাগ পূর্বে মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে মূলত কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ এই তিনটি দলের প্রাধান্য ছিল। বামপন্থী কোনো দলের অস্তিত্ব তখনও পর্যন্ত চোখে পড়ার মতো কিছু ছিল না। দেশভাগ হলে হিন্দু মহাসভা বিভিন্ন কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই জেলার রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা হারায়।[168] স্বাধীনতা পরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়কে যদি ভাগ করা যায় তাহলে দুটি শ্রেণি পাওয়া যাবে; এক, উচ্চবিত্ত সম্পদশালী শিক্ষিত এলিট ক্লাসের মুসলিম; দুই, একেবারে দিন-আনা, দিন-খাওয়া কৃষক শ্রেণির নিম্নবিত্ত মুসলিম যাদের মধ্যে শিক্ষার হার নিতান্তই কম ছিল বা একেবারেই ছিল না। প্রথম শ্রেণির মুসলিমরা দেশভাগের আগে দেশের প্রথম সারির রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষত মুসলিম লীগ ও কিছু সংখ্যক কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

---

[165] সৌম্যেন্দকুমার গুপ্ত, শহর বহরমপুর, পৃ. ৮১-৮২।

[166] মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার- ২০০৩, পৃ. ৬১৫-৬২৪।

[167] তদেব, পৃ. ৬২০-৬২৪।

[168] প্রদীপ মজুমদার, *১২৫ বছরের আলোকে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস,* (বহরমপুরঃ মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটি, ২০১০), পৃ. ৫৪; জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ২৪৫, ৩০২ ও ৩১৩ ।

এর মধ্যে মুসলিম লীগের প্রভাবই ছিল বেশি। আব্দুল বারি, মৌলবি আব্দুল গণি, সাখাওয়াত হোসেন আল কাদরী, মুহাম্মদ আফাজউদ্দিন, মাওলানা আবুল মোমিন ইত্যাদি মুসলিম নেতৃবর্গ মোহাম্মদ আলী জিন্নার উগ্র সমর্থক ছিলেন। এর পাশাপাশি, এই জেলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আব্দুস সামাদ, রেজাউল করিম, মাকসুদ আল হোসেন, এ এ ইউসুফ জিলানী। দেশভাগের পর বেশিরভাগ মুসলিম লীগ নেতা বা সমর্থকেরা অনেকে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনায় পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যান। আবার মান-সম্মান বাঁচাতে ও নিরাপত্তার কারণে অনেক মুসলিম লীগের উগ্র সমর্থকরা দেশভাগের অব্যবহিত পরেই পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যান। পরবর্তীকালে তাদের অনুসরণ করে তাদের অনুগামী ও সমর্থকেরাও দেশত্যাগ করেন। যারা এই দেশে থাকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা বেশির ভাগই কংগ্রেসে সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার প্রশ্নে, জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে তারা কংগ্রেসকে ভোট দেয়। কংগ্রেস তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য।[169] মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই জেলায় কংগ্রেসের ভীত শক্ত হয়।

শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা তার সমর্থকরা নন এই জেলার অনেক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, সম্পদশালী পরিবার পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন।[170] আবার বেশ কিছু পরিবার এই দেশে থেকে গেলেও সেই পরিবারের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সন্তানটিকে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ইত্যাদি জেলাগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[171] এই ধরনের পরিবারগুলি থেকে অনেকে আবার সপরিবারে জেলা ছেড়ে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি, বিশেষত কলকাতায় চলে আসেন ও প্রতিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ দেশভাগের ফলে রাজনীতি সচেতন উচ্চবিত্ত শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা অংশ পূর্ববঙ্গে চলে যান ও আরেকটি অংশ কংগ্রেসের সমর্থক হয়ে যান। এমতাবস্থায় এই জেলায় যারা রয়ে গেলেন তারা সিংহভাগ হলেন উপরে উল্লেখিত দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলিম। এই শ্রেণির মানুষেরা অশিক্ষা বা স্বল্পশিক্ষা বশত স্বভাবতই উচ্চপর্যায়ের বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজনীতি করতেন না বরং সমাজের

---

[169] খাজিম আহমেদ, *বাঙ্গালী মুসলমান আপন ভুবনের সন্ধানে,* (দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ উদার আকাশ, ২০২১), পৃ. ২৪১-২৪৪; প্রদীপ মজুমদার, *১২৫ বছরের আলোকে,* পৃ. ৫৪; জয় চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ২১৩।

[170] লীগ নেতা জঙ্গিপুরের ফারহা মর্তুজা রেজা চৌধুরী, জেলার আইনজ্ঞ কলকাতা হাইকোর্টের উকিল সৈয়দ মেহবুব মোর্শেদ পূর্ববঙ্গে গিয়ে ১৯৫১ সালে ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবী, ৫৫-তে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ৬৪-তে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যা বিনদিনী ভরতপুর থেকে ১৯৫২ সালে ঢাকা চলে যান সেখানে তিনি শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হন। লেডি ব্রেবোন কলেজের স্নাতক বড়ঞা ব্লকের জাহানারা ইমাম স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ময়মনসিংহে স্কুল শিক্ষিকা পদে যোগ দেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বনি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর কৃষ্ণনাথ সরকারি কলেজের অধ্যাপক খড়গ্রামবাসী আব্দুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় যোগদান করেন। সালারের কণ্ঠশিল্পী আব্দুল আলিম পূর্ববঙ্গে গিয়ে ঢাকা সংগীত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। সিনেমাটোগ্রাফার আনোয়ারুল ইসলাম ১৯৭০ এর দশকে বাংলাদেশে চলে যান। সাদিখান দিয়ার এবং ভবতা মাদ্রাসার শিক্ষক আনোয়ার পাশা ওপার বাংলায় গিয়ে ঢাকায় অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হন। ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি, পৃ. ৩৬-৩৭।

[171] ভরতপুরের বাবলা গ্রামের আবুল বরকত ১৯৪৮ সালের বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করে উচ্চশিক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের চলে যান। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের শহীদ হন। ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৩৬।

প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ যেই দিকে তাদের মনোনয়ন দিতেন সেই মোতাবেক মতামত প্রদর্শন করতেন। বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া মতো বা রাজনৈতিক পথ প্রদর্শনের জন্য কেউ ছিল না।

আরও একটি বিষয় হল; কংগ্রেস সরকার ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে প্রচার চালিয়েছিল তা মুসলমানদের হয়ত কিঞ্চিত আশ্বস্ত করেছিল। "বিশেষত মুসলমানদের অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল জওহরলাল নেহেরুর সেকুলার ভাবমূর্তি"।[172] আর একটি অংশ কংগ্রেসকে ভোট দিতেন ভয়ে। শাসকগোষ্ঠীকে ভোট না দিলে এই দেশে থাকা যাবে না এই ধারনা একটা শ্রেণির মুসলিমদের মনে দৃঢ় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলিমদের চাহিদাও বিশেষ কিছু ছিল না। তাদের চাহিদার মধ্যে ছিল প্রয়োজনটুকু মেটা এবং যেভাবে তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে জীবন ধারন ও জীবিকা নির্বাহ করছেন নির্বিঘ্নে তা সম্পাদন করে যাওয়া। সহজ সরল এইসব মানুষরা চাইতেন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা বর্জন করে চলতে। কারন বিষয়, বৈভবহীন এই সব মানুষের মধ্যে দেশত্যাগের জন্য ছিল তীব্র অনীহা, যা পূর্ববঙ্গের নিম্নবিত্ত সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এর আগে দেখা গেছে পূর্ববঙ্গের সবশেষে দেশত্যাগকারী সংখ্যালঘুরা এই শ্রেণির মানুষ ছিলেন, যারা নিতান্তই অসুবিধার সম্মুখীন না হলে দেশ ছাড়ার কথা ভাবেনি। এই ধরনের মানুষেরা ছিল মুর্শিদাবাদের গ্রামের মুসলিম জনসমষ্টি, এই সমস্ত মানুষদের উপর রাজনৈতিক নেতৃবর্গের নিয়ন্ত্রণ ছিল সর্বাধিক। রাজনীতিতে এদের মানসিক নিষ্ক্রিয়তা ছিল লক্ষ্য করার মতো। এদের নিয়ন্ত্রণ করতেন গ্রামের প্রভাবশালী মুসলিমরা; যারা স্থানীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। এসবের পাশাপাশি জেলার কংগ্রেস নেতৃত্বের রণকৌশল ছিল লক্ষ্য করার মতো। বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে কংগ্রেসের উচ্চশ্রেণির মুসলিমদের যাদের সামাজিক অবস্থান (স্ট্যাটাস বা ইমেজ) বা মান-মর্যাদা অনেক বেশি তাদেরকে প্রার্থী পদে মনোনীত করত। এই নীতির প্রচলন করেন মুর্শিদাবাদ জেলার কংগ্রেস নেতা দুর্গাপদ সিংহ। তিনি প্রার্থী পদে মনোনয়ন করার মাধ্যমেই মুসলমানদের মধ্যে থেকে নেতা বানানোর কথা বলতেন। সম্ভ্রান্ত, উচ্চবিত্ত বা প্রভাবশালী, বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের মুসলিমদের কংগ্রেসে টেনে আনার মুখ্য ভূমিকাটি তিনি দক্ষতার সঙ্গে পালন করতেন। উদাহরণস্বরূপ, মুর্শিদাবাদের নবাব ওয়াসিম আলী মির্জার সঙ্গে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের বন্ধুত্বের জেরে বন্ধুপুত্র কাজেম আলী মির্জাকে কংগ্রেসে নিয়ে আসেন। আবার ডক্টর রায়ের আগ্রহেই লুৎফুল হক কংগ্রেসে যোগদান করেন। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিজেদের প্রয়োজনেই জেলার বর্ণময় ব্যক্তিত্ব খোদা বক্সকে কংগ্রেসে নিয়ে এসেছিলেন।[173] অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেই নির্বাচনী কেন্দ্রের সঙ্গে মনোনীত প্রার্থীর তেমন কোন সম্পর্ক নেই বা কোনভাবে যুক্ত নয় বা সংগঠনের সঙ্গে ও তেমনভাবে যুক্ত নন। শুধুমাত্র তার সামাজিক ইমেজকে কাজে লাগিয়ে সেই মুখটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে এলিট শ্রেণির কংগ্রেসমনা মুসলিম সমাজ জেলার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

---

[172] খাজিম আহমেদ, *বাঙ্গালী মুসলমান,* পৃ. ২৪৪।

[173] তদেব, পৃ. ২৪৫-২৪৬; প্রদীপ মজুমদার, *১২৫ বছরের আলোকে,* পৃ. ৫৪।

১৯৫২ ও ১৯৫৭-এর পর ১৯৬২ সালে কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী হলেও প্রাপ্ত আসনসংখ্যা কমে যায়। ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬৭ ও ১৯৭২-এ আসন সংখ্যা যথাক্রমে ৮৮ শতাংশ, ৯৩ শতাংশ, ৭৮ শতাংশ ও ৭২ শতাংশ আসনে জয়লাভ করে। সেখানে ১৯৬২ সালে ১৬টির মধ্যে ৮টি অর্থাৎ ৫৯ শতাংশ আসন পায় কংগ্রেস, বাকি আসনগুলির মধ্যে ৩টি নির্দল ও বাম দলগুলি (যদিও তখন যুক্ত ফ্রন্ট গঠন হয়নি) লাভ করেছিল। যেমন আরএসপি ৩টি, সিপিআই ১টি অর্থাৎ তারা যৌথভাবে ৪টি আসন পায় যা মোট আসন সংখ্যার ২৫ শতাংশ।[174] এই বিধানসভা নির্বাচনেই প্রথম নিজেদের অস্তিত্ব তুলে ধরে বাম দলগুলি। ১৯৬২-এর এই ফলাফল বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ কারণ পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের বিশেষ প্রভাব পড়েছে এই ফলাফলে, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই ফলাফলের গভীর তাৎপর্য আছে এবং এর উত্তর লুকিয়ে আছে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে। লোকসভা নির্বাচনে তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রটি শুরু থেকেই আরএসপির দখলে ছিল। পরবর্তী তিনটি নির্বাচন ১৯৬২, ১৯৬৭ এবং ১৯৭১-এ এই জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস, আরএসপি ও নির্দল তিনটি দলই একটি করে আসন পায়।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিটি লোকসভা নির্বাচনে বরাবরই আরএসপি জয়লাভ করে। এর কারণ হল ওই কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতেন আরএসপি দলের সর্বভারতীয় নেতা ত্রিদিব চৌধুরী। গোয়া মুক্তি আন্দোলনের পর ত্রিদিপ চৌধুরী রাজনীতির অঙ্গনে সর্বভারতীয় পরিচিতি ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। জনগণের মধ্যে তার খ্যাতি এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে; ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জওহরলাল নেহেরুও পর্যন্ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তার বিরূদ্ধে কোনো প্রার্থী দাঁড় না করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ওই বছর গোয়ায় বন্দী ত্রিদিব চৌধুরী জেল থেকেই মনোনয়নপত্র দিয়েছিলেন এবং তিনি জয়লাভ ও করেছিলেন।[175] এই ত্রিদিব চৌধুরী উদ্বাস্তু উচ্ছেদ-বিরোধী কমিটিতেও ছিলেন।[176] ১৯৫০ সালের ৭ই জানুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে লোকসভা ও রাজ্যসভা সদস্যদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর যে বৈঠক হয় সেখানেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পক্ষে সওয়াল করার জন্য কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে তিনি উপস্থিত ছিলেন।[177] ত্রিদিব চৌধুরীর এই অবস্থানের জন্য উদ্বাস্তু ভোট যে তার পক্ষেই যাবে সে নিয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। এমনকি এও শোনা যায়, ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে তার বিরূদ্ধে দাঁড়ানো কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক রেজাউল করিম নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বলতেন "ঢাকু (ত্রিদিব চৌধুরীর ডাকনাম) ভালো ছেলে, ভালো মানুষ, তাকে আপনারা

---

[174] *মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার- ২০০৩,* পৃ. ৬১৫-৬২০।

[175] তদেব,পৃ. ৬২৩-৬২৪।

[176] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৩-ই মার্চ ১৯৫১।

[177] *স্বাধীনতা পত্রিকা,* ৭-ই জানুয়ারি ১৯৫০।

ভোট দিন। ঢাকুকে না দিলে, তবে আমাকে দিন"।[178] এতে যেমন তার রাজনৈতিক সৌজন্যে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি, ত্রিদিব চৌধুরীর গ্রহণযোগ্যতাও ঘোষিত হয়েছে।

সারণি-১১ মুর্শিদাবাদ জেলায় লোকসভা নির্বাচন সমূহের ফলাফল।

কেন্দ্র	'৫২	'৫৭	'৬২	'৬৭	'৭১	'৭৭	'৮০	'৮৪	'৮৯	'৯১	'৯৬	'৯৮	'৯৯
বীরভূম	INC1,2	INC1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মুর্শিদাবাদ	INC	INC	Ind	Ind	Ind	BLD	CPM	CPM	CPM	CPM	CPM	CPM	CPM
বহরমপুর	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP	INC	RSP	RSP	RSP	RSP	INC
মালদা	-	-	INC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জঙ্গিপুর	-	-	-	INC	INCR	CPM	CPM	CPM	CPM	CPM	INC	CPM	CPM
মোটআসন	৪	৪	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
INC	৩	৩	১	১	১	-	-	১	-	-	১	-	১
Ind	-	-	১	১	১	১	-	-	-	-	-	-	-
RSP	১	১	১	১	১	১	১	-	১	১	১	১	-
CPM	-	-	-	-	-	১	২	২	২	২	১	২	২
BLD	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-

এছাড়া আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ১৯৫৫ সালের স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলায় বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের থানাভিত্তিক যে পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছিল সেই তালিকায় উদ্বাস্তুদের সর্বাধিক সংখ্যা ছিল বহরমপুরে। আগের অধ্যায় দেখানো হয়েছে, এই সমগ্র মুর্শিদাবাদের আগত উদ্বাস্তুর প্রায় ৫০ শতাংশই বহরমপুর ও বহরমপুর টাউনে বসবাস করতেন এবং সংখ্যাটি নেহাতই কম নয়, প্রায় ৩৫ হাজার।[179] কোন একটি বিধানসভা কেন্দ্রে এত বিপুল সংখ্যক ভোটার যে কতটা ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ

[178] খাজিম আহমেদ, *বাঙ্গালী মুসলমান,* পৃ. ২৬৪।

[179] File No:- G.P. 361.5 (5415) 083 w 52, p.91.

করতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় আগত উদ্বাস্তুরা যেভাবে একযোগে বাম দলগুলিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।[180] তাতে বলাই বাহুল্য বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে বামপন্থী আরএসপির একাধিপত্যে উদ্বাস্তুরা একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। শুধু উদ্বাস্তুরাই নয় এই কেন্দ্রে আরএসপি পাশে পেয়েছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুদের। ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলায় সবচেয়ে বেশি তপশিলি জাতি ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেখা যায় খড়গ্রাম, বড়ঞা, কান্দি, ভরতপুর, বহরমপুরে। উল্লেখিত সবকটি থানাই বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। সমগ্র জেলায় তপশিলি জাতি যেখানে ১২ শতাংশ, সেখানে খরগ্রাম, বড়ঞা, কান্দি, ভরতপুরে যথাক্রমে প্রায় ২৮ শতাংশ, ২১ শতাংশ, ১৮ শতাংশ ও ১৫ শতাংশ।[181] সমগ্র রাজ্যের চিত্রটা যেখানে পাঁচ জনের মধ্যে একজন তপশিলি জাতি, সেখানে খড়গ্রামে তিনজনের মধ্যে একজন ও বড়ঞাতে পাঁচজনের মধ্যে একজন তপশিলি জাতিভুক্ত। এরমধ্যে কান্দি ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরে জমির দখল নিয়ে স্থানীয় ঘোষদের সঙ্গে বাস্তুহারা নমঃশূদ্রদের দীর্ঘদিন বিবাদ চলেছিল এই দ্বন্দ্বের জন্য তারা অতি বাম দলগুলির ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে।[182] শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্ণের মানুষদের পাশে থাকা আরএসপি স্বাভাবিকভাবেই বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের বরাবরের জয়ী দল। এই সমস্ত কারণেই ১৯৬২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে সিপিআই এবং বেলডাঙ্গা, খরগ্রাম, ভরতপুর থেকে আরএসপি জয় লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৬২ সালে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত থানাগুলি হল কাঁদি, বহরমপুর, নওদা, বেলডাঙ্গা, হরিহরপাড়া, খড়গ্রাম ও ভরতপুর। এর মধ্যে হরিহরপাড়া ও নওদা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং খড়গ্রাম ও ভরতপুর থানা দুটি ১৯৬২ সালে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। লক্ষণীয় ১৯৬২-এর আগে এ পর্যন্ত দুটি নির্বাচনে এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল, কিন্তু ১৯৬২-তে এগুলি বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হতেই সেখানে আরএসপি জয়যুক্ত হয়।[183] আরও একটি বিষয় হল কান্দি, ভরতপুর, বড়ঞা, খড়গ্রামে উদ্বাস্তু জনসংখ্যা বেশি ছিল না, কিন্তু মুর্শিদাবাদের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই সকল অঞ্চলের মুসলমানদের রাজনীতিতে প্রকৃতিগত ফারাক ছিল। কারণ, এই অঞ্চলের মুসলমানরা 'আশরাফ' অর্থাৎ উচ্চশ্রেণি এবং 'আয়মাদার' অর্থাৎ নিম্নশ্রেণি এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উচ্চশ্রেণির মুসলমানরা জেমো এবং কাঁদি রাজবাড়ীর ভক্ত ছিলেন।[184] একই সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম সামাজিক বিভাজনে কংগ্রেসের ভোট কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে।

---

[180] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ৩২৭-৩৩৩।

[181] *Murshidabad, Census-1961,* pp. 82-83.

[182] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ১১১।

[183] *মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার- ২০০৩,* পৃ. ৬১৫-৬১৬।

[184] খাজিম আহমেদ, *বাঙ্গালী মুসলমান,* পৃ. ২৪৮।

সারণি-১২ মুর্শিদাবাদ জেলায় বিধানসভা নির্বাচন সমূহের ফলাফল

কেন্দ্র	'৫২	'৫৭	'৬২	'৬৭	'৬৯	'৭১	'৭২	'৭৭	'৮২	'৮৭	'৯১	'৯৬	'০১
ফারাক্কা	INC	INC	INC	INC	BC	CPIM	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M	INC	INC
ঔরঙ্গাবাদ	-	-	-	-	-	-	-	INC	INCI	CPI M	CPI M	INC	INC
সুতি	Ind	INC	INC	RSP	INC	INC	RSP	INC	RSP	RSP	INC	INC	RSP
জঙ্গিপুর	-	INC1, 2	INC	Ind	RSP	ML	INC	INC	INCI	INCI	INC	INC	RSP
সাগরদীঘি	INC1, 2	-	INC	INC	BC	INCR	INC	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M
লালগোলা	INC	INC	INC	INC	INC	INCR	INC	INC	INCI	INCI	INC	INC	INC
ভগবানগোলা	-	INC	PSP	INC	RSP	ML	INC	Ind	INCI	Ind	Ind	INC	INC
নবগ্রাম	-	-	-	INC	Ind,UF	Ind,UF	INC	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M	INC	CPI M
মুর্শিদাবাদ	INC	INC	Ind	INC	INC	INCR	INC	FB	FB	INCI	FB	Ind	FB
জলঙ্গি	INC	INC	Ind	INC	INC	JS	INC	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M
ডোমকল	-	-	-	CPI M	INC	CPIM	INC	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M
নওদা	Ind	INC	INC	INC	PML	ML	ML	RSP	RSP	RSP	INC	RSP	Ind
হরিহরপাড়া	INC	INC	INC	INC	PML	ML	SUC	INC	INCI	CPI M	RSP	CPI M	Ind
বহরমপুর	INC	INC	CPI	INC	CPI	INCR	INC	RSP	RSP	RSP	INC	INC	INC
বেলডাঙ্গা	INC	INC	RSP	INC	Ind	RSP	RSP	RSP	INCI	INCI	INC	RSP	INC

কান্দি	INC	INC1, 2	INC	INC	INC	INCR	INC	INC	INCI	CPI	INC	INC	INC
খড়গ্রাম	INC1, 2	-	RSP	INC	RSP	INCR	INC	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M	CPI M
বড়ঞা		-	-	RSP	RSP	INCR	INC	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP
ভরতপুর	INC	INC	RSP	INC	RSP	CPIM	INC	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP	RSP
রাণী নগর	INC	Ind	Ind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট আসন	১৬	১৬	১৬	১৮	১৮	১৮	১৮	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯	১৯
INC	১৪	১৫	৮	১৪	৬	১,INCR -৭	১৩	৬	INCI -৭	INCI -৪	৭	৯	৭
Ind	২	১	৩	১	১	-	-	১	-	১	১	১	২
CPI	-	-	১	-	১	-	-	-	-	১	-	-	-
CPIM	-	-	-	১	-	৩	১	৬	৬	৮	৮	৫	৫
RSP	-	-	৩	২	৫	১	২	৫	৫	৫	২	৪	৪
FB	-	-	-	-	-	-	-	১	১	-	১	-	১
ML/PML	-	-	-	-	PML-২	৪	১	-	-	-	-	-	-
Others	-	-	PSP -১	-	IndUF -১ BC-২	IndUF-১ JS-১	SUC-১	-	-	-	-	-	-

বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্তির ফলে বেলডাঙ্গাতেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬২-তে বেলডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আরএসপি জয়লাভ করে। যার কারণে কংগ্রেস ওই বছর হরিহরপাড়া থেকে নির্বাচিত এমএলএ আব্দুল লতিফকে পরের নির্বাচনে অর্থাৎ ১৯৬৭-তে বেলডাঙ্গায় প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করায় এবং তিনি সেখানে জয়লাভ করেন।[185] যদিও এই কৌশল কাজে লাগেনি কারণ পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন গুলিতে বেলডাঙ্গা থেকে আরএসপিই জয় লাভ করে। ১৯৫৫ সালের স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট

[185] *মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার- ২০০৩,* পৃ. ৬১৫-৬১৬; Dilip Banerjee, *Election Recorders*, pp. 349 & 376.

অনুসারে, এই বেলডাঙ্গাতে প্রায় ২০০০ উদ্বাস্তু নিয়ে ৫৫০-র কাছাকাছি উদ্বাস্তু পরিবার বসবাস করতেন।[186] ১৯৭১ পরবর্তী নির্বাচনগুলিতেও দেখা গেছে, এইসব কেন্দ্র থেকে বাম দলগুলির জয়লাভ এবং ১৯৭৭ থেকে এই জেলার বিভিন্ন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বাম দলগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পেছনে এইসব ফলাফলগুলি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অন্যদিকে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলিতে বাম দলগুলির সাফল্য না পাওয়া। এপর্যন্ত আলোচিত বিধানসভা নির্বাচন গুলির মধ্যে ১৯৫২ সালে ৮টি নির্বাচনী কেন্দ্রে বামদলগুলির বিভিন্ন শাখা মিলে ১১টি প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল আশ্চর্যের বিষয় যার মধ্যে কেবলমাত্র দুজন মুসলিম প্রার্থী ছিলেন। শুধু তাই নয়; মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি থেকেও ফরওয়ার্ড ব্লক, কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি ইত্যাদি দলগুলির পক্ষ থেকে হিন্দু প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে দেখা গিয়েছিল। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে ৮টি বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বামদলগুলি ৮ টি ও ৯টি প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল, উভয়ক্ষেত্রেই মুসলিম প্রার্থী ছিলেন মাত্র একজন। এই একটি মাত্র মুসলিম প্রার্থী শিশ মহাম্মদ সুতি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন আরএসপির পক্ষ থেকে। কংগ্রেসের লুৎফুল হকের কাছে মাত্র ৬ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। পরের বিধানসভা নির্বাচনে ওই কেন্দ্র থেকেই তিনি আবার জয়লাভ করেছিলেন।[187] অথচ এই জেলার মুসলিমরা যে সবাই এক জোটে কংগ্রেসকেই সমর্থন করেছে তা নয়। বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেসের পাশাপাশি ৪-৫টা আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে যাদের প্রার্থীরা বেশিরভাগই মুসলিম। এবং সেখানে পঞ্চমুখী, ষড়মুখী প্রতিযোগিতাও হচ্ছে। ভরতপুর ও কান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে ১৯৫২ সালে ৬ জন করে আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সপ্তমুখী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। ওই বছর দ্বিআসনবিশিষ্ট সাগরদিঘী নির্বাচনী কেন্দ্রে ১৮ জন প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন যার মধ্যে ১৪ জন ছিলেন স্বতন্ত্র দলের। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে এই একই প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৭-তে রানীনগর, ১৯৬২-তে বহরমপুর, হরিহরপাড়া, জলঙ্গি, নওদা বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে দেখা যায় কংগ্রেস ছাড়া আরও ৪-৫টি স্বতন্ত্র দলের উপস্থিতি।[188] কংগ্রেসের বিপরীতে এত সংখ্যক স্বতন্ত্র দলগুলির আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত করে, জেলার মুসলিমরা এককভাবে কংগ্রেসকেই চাননি; তারা বিকল্পও খুঁজছিলেন। জয়া চ্যাটার্জীর গবেষণাতেও একই তথ্য উঠে আসে।[189]

---

[186] File No:- G.P. 361.5 (5415) 083 w 52, p.91.

[187] Dilip Banerjee, *Election Recorders,* pp. 294-377.

[188] Ibid, pp. 294-350.

[189] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ২১৪-২১৫।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বহু-সংখ্যক স্বতন্ত্র দলগুলি বেছে নিলেও বাম দলগুলির প্রতি তাদের লক্ষ্যণীয় অনীহা। এই অনীহার মূলে ছিল পূর্বে-আলোচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলিমদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা। খুব কড়াকড়ি ভাবে বা রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে ধর্মপালন না করলেও তাদের সহজ বুদ্ধি ও স্বল্পশিক্ষার কারণে তারা বেশির ভাগই নির্ভর করতেন সমাজে স্বজাতি প্রভাবশালী, সম্পদশালী ব্যক্তিত্ব ও মসজিদের মৌলানা বা ইমামের কথার উপরে। ধর্মভীরু মুসলিমরা নাস্তিক মনোভাবাপন্ন মার্কসীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ বামদলগুলি থেকে দূরত্ব বজায় রাখাকেই শ্রেয় মনে করতেন। যার কারণে এই দুই জেলার মুসলিম ভোট ব্যাংক বামদলগুলির ভীত শক্ত করতে পারেনি। বাম আদর্শে উদ্বুদ্ধ পূর্ববঙ্গ থেকে আসা জেলার বিশিষ্ট প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জিয়াগঞ্জবাসী দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকারের লেখা 'লড়াই-সংগ্রামে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ' গ্রন্থে জেলার বাম রাজনীতির চালচিত্র কিছুটা ধরা পড়ে। উক্ত গ্রন্থে জেলায় বামদলগুলির উত্থানে দলের নেতা কর্মী, সমর্থক, সংগঠক, সংগ্রামী, আন্দোলনকারী সর্বত্রই যেভাবে হিন্দু সদস্যর নাম পাওয়া যায় তার তুলনায় এই জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নাম নিতান্তই হাতে গোনা। দেশভাগের অব্যবহিত পরে জেলার বাম রাজনীতিতে আব্দুস শহীদ মল্লিক, মামুদ খাঁ ছাড়া মুসলিম নেতা বা সদস্যের নাম তেমন পাওয়া যায় না।[190] অথচ প্রতিবেশী জেলা মালদায় মুসলিম জনসংখ্যা মুর্শিদাবাদের তুলনায় অনেক কম হলেও সেখানে স্বাধীনতার প্রাক্কাল থেকেই জেলার কমিউনিস্ট দলে সুজাত আলী মজুমদার, আব্দুস সিদ্দিকী, সেখ সিদ্দিক, আলম শাহ, নূহুল ইসলাম, আব্দুল মাজিদ, নাজমুল হক, মোজাফফর হোসেন, জামিল ফেরদৌস, শামসুল হক, মকবুল হোসেন, নজরুল ইসলাম, হাবিব মোস্তফা, সাদিকুল ইসলাম, মনসুর আলী প্রভৃতি নেতারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।[191] শ্রীযুক্ত সরকারের রচনা অনুসারে মুসলিম নেতা, কর্মী, সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য ভাবে আবির্ভাব ঘটে অনেক পরে, প্রায় সত্তরের দশকের কাছাকাছি।[192] একই কথা ধরা পড়ে জয়া চ্যাটার্জির কলমেও "কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা মোজফ্ফর আহমেদ ও আব্দুল হালিম দুজন মুসলিম হলেও শহরকেন্দ্রিক মূলত কলকাতার সংস্কৃতিসম্পন্ন মুসলিমদের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারেনি। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে মুসলিমরা ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে সিপিআইএমের মুসলিম ক্যাডার ছিল দলের একটা ক্ষুদ্র অংশ।"[193] এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে তার পর্যবেক্ষণ, বাম দলগুলি পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের সমর্থন হারাবার আশঙ্কায় মুসলিমদের কাছে বিষয়গুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। মুসলিম তোষণের দোষে দুষ্টু হওয়ার ভয়ে তাদের বিপদে নিঃস্বার্থ ও আগলহীন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি।

---

[190] দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার, *লড়াই-সংগ্রামে জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ,* (বহরমপুরঃ শিল্পনগরী, ২০২২), পৃ. ৫-৬০।

[191] ডঃ সমর কুমার মিশ্র, *স্বাধীনোত্তরকালে মালদহ,* পৃ. ২১৩-২২৫।

[192] দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার, *লড়াই-সংগ্রামে,* পৃ. ৬৭।

[193] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ৩৩৩।

মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হওয়ার জন্য আরো একটি বিষয় কাজ করে তা হল, বামপন্থীরা যেভাবে উদ্বাস্তুদের আন্দোলনে তাদের পাশে থেকে তাদের কণ্ঠকে বলিষ্ঠ করে এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য জোরালো দাবি তোলে তা কিঞ্চিত হলেও এই জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের মনে দাগ কাটে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে এই জেলাগুলি থেকে তাদেরকে ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ববঙ্গে চলে যেতে হবে এই আশঙ্কার জন্ম দেয়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা হয়তো ভাবতে পারে তারা যেহেতু দেশ ছেড়ে এই দেশে এসে মাথার উপর নিরাপদ ছাদের খোঁজ করছে তাই এদেশের মুসলিমরা 'তাদের জন্য নির্ধারিত মুসলিম রাষ্ট্রে' চলে যাক একথাও যে তাদের মনে উঁকি দেয়নি সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুরা বামপন্থীদের নিজের পাশে পেয়ে যাবে ফলে তারাও দেশত্যাগ করতে বাধ্য হবে এমন নিরাপত্তাহীনতা থেকেও জেলাবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা বামপন্থী দলগুলোকে বিধানসভায় সমর্থন করতে পারেননি। এর পাশাপাশি নবাব বাহাদুর ওয়াসিম আলী মির্জার পুত্র কাজেম আলী মির্জা ও খোদা বক্সের মতো কংগ্রেস নেতাদের তারা বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করেছিল। কারণ নবাব ওয়াসিম আলী মির্জা, খোদা বক্স ইত্যাদি মর্যাদা সম্পন্ন লোকেরা দেশভাগের সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা মুর্শিদাবাদ জেলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করেন এবং জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের দেশ ছেড়ে না যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানান।[194] এই জেলায় নবাব ওয়াসিম আলী মির্জার কথার বিশেষ গুরুত্ব ছিল, তাকে সমাজে সকলে মানত। এই সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আশ্বাসে এই দেশে থেকে যাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যখন দেখলেন তারা বা তাদের বংশধরেরা কংগ্রেসে যোগদান করছেন তখন তারাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেতে পারেননি। এই জেলার উদ্বাস্তু নিরঞ্জন মিত্রের বিশ্লেষণেও উচ্চশ্রেণির মুসলিমদের কংগ্রেস প্রীতি ধরা পড়ে "ওয়াশিম আলী মির্জা, কাজেম আলী মির্জা, তারা কংগ্রেস করতেন। তারা ছিলেন দেশের হর্তাকর্তা, তাদের লোকে মানত বেশি, তারা মানসিকতায় ছিলেন উচ্চ, দরাজ মানুষ ছিলেন, সমাজে প্রভাব ছিল বেশি। বড় বড় নেতারা, মুসলিম জমিদাররা কংগ্রেস করতেন, গ্রামে-গঞ্জে কংগ্রেসের ক্রেজটা ছিল। কংগ্রেস আদি পার্টি"।[195] এই সকল কারণের জন্য জেলার বামপন্থী দলগুলিকে ক্ষমতায় আসার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৬২ পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে বাম দলগুলি, কৌশলগত পরিবর্তনে কিছুটা সাফল্য লাভ করে। ১৯৬৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাম দলগুলি থেকে দাঁড় করানো ৮টি প্রার্থীর মধ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্রে দুজন মুসলিম প্রার্থী ছিলেন এবং দুজনেই জয়লাভ করেন। ডোমকলে 'মাস্টার' নামে স্বনামধন্য মোহাম্মদ আব্দুল বারী ৯ হাজার ভোটে ওই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়ে জয়লাভ করেন। অনুরূপে সুতিতেও শিশ

[194] প্রদীপ মজুমদার, *১২৫ বছরের আলোকে,* পৃ. ৫৫-৫৬।

[195] সাক্ষাৎকারঃ- নিরঞ্জন মিত্র, মালদা।

মহাম্মদ সাড়ে চার হাজার ভোটে কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়ে জয় লাভ করেন।[196] এই দুই কেন্দ্রে জয়লাভের ঘটনা বাম দলগুলোর চোখ খুলে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুতি ও সামসেরগঞ্জ নিয়ে গঠিত সুতি বিধানসভা কেন্দ্রে দেশভাগের পর প্রায় সাড়ে চার হাজারের বেশি উদ্বাস্তুদের নিয়ে প্রায় ১ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলেন।[197] জেলা রাজনীতিতে কংগ্রেসের দেখানো পথ ধরেই তারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলিমদের মধ্যে থেকে প্রার্থী দেওয়া শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে অবশ্য বামদলগুলি এর আগেই এই নীতি অবলম্বন করেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ১৯৫৭ সালের কলকাতার বউবাজারে সাড়ে ২৯ হাজার মুসলিম ভোটার সম্বলিত এলাকায় ডক্টর বিসি রায়ের বিপরীতে মোঃ ইসমাইল নামক এক মুসলিম প্রার্থী দাঁড় করালে অত্যন্ত অবমাননাকর মাত্র ৪৫০ ভোটের ব্যবধানে ডক্টর রায় জয়লাভ করেন। একই বছর মেদিনীপুরেও মুসলিম ভোট আকর্ষণ করার জন্য বামেরা 'স্থানীয় মুসলিম কর্মীদের নিয়োজিত করে' বলে পুলিশ রিপোর্ট পাওয়া যায়।[198]

এসবের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলায় নির্দল প্রার্থী সৈয়দ বদরুদ্দোজা যার সম্পর্কে বলা হয়, তিনি নিজেই 'প্রতিষ্ঠান স্বরূপ'; জেলার মুসলিমদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে রাণীনগর কেন্দ্র থেকে বিধানসভার সদস্য, ১৯৬২ সালে রাণীনগর বিধানসভা ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে ও ১৯৬৭ তে পুনরায় লোকসভা ভোটে নির্বাচিত হন।[199] বিভিন্ন জায়গায় তিনি কংগ্রেসের ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতি নিয়ে ভাষণে সাধারণ জনগনকে সতর্ক করতেন। বাম-নেতা শশাঙ্কশেখর সান্যাল ও ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে তার গভীর রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। বামেদের বহু নেতা তাকে সমীহ করে চলতেন। কংগ্রেসের পরিবর্তে জেলায় বামপন্থী দলগুলিকে আনার জন্য তিনি সাধারণ জনগণকে ভীষণ ভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন।[200] ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে সৈয়দ বদরুদ্দোজার যে বিশেষ অবদান ছিল অনুধাবন করা যায় যখন ব্রিগেডের বিজয় উৎসবে তাকে অন্যতম প্রধান বক্তা হিসেবে দেখা যায়। তার রাজনৈতিক প্রচারে সুতি ও জঙ্গিপুরে দুজন আরএসপি প্রার্থী যথাক্রমে শিশ মহম্মদ, আব্দুল হক উপকৃত হয়েছিলেন। জেলার মুসলিম জনগণ ধীরে ধীরে বামপন্থী দলগুলির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।[201]

১৯৬৯-এর অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বাম দলগুলির ১১ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন ছিলেন মুসলিম। এদের মধ্যে জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আরএসপি দলের প্রার্থী আব্দুল হক জয়লাভ করেন এবং বাকি ২ জন; সুতি ও

---

[196] Dilip Banerjee, *Election Recorders,* pp. 375-377.

[197] File No:- G.P. 361.5 (5415) 083 w 52, p.91.

[198] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।

[199] Dilip Banerjee, *Election Recorders,* pp. 332-377.

[200] জয়া চ্যাটার্জী, *দেশভাগের অর্জন,* পৃ. ২২১-২২২।

[201] খাজিম আহমেদ, *বাঙ্গালী মুসলমান,* পৃ. ২৪৯-২৫৩।

ডোমকল বিধানসভা কেন্দ্রে যথাক্রমে আরএসপির এবং সিপিএমের শিশ মহম্মদ ও মহম্মদ আব্দুল বারী মাত্র ২৫০-এরও কম ভোটে পরাজিত হন।[202] ১৯৮৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভগবানগোলা কেন্দ্র থেকে সোসালিষ্ট পার্টির নওয়াব জানি মির্জার 'রাজনৈতিক পিতা' হিসাবেও পরিচিত ছিলেন সৈয়দ বদরুদ্দোজা। এর পরবর্তীকালে ১৯৭১-এর অন্তর্বর্তী নির্বাচনেও বাম দলগুলি ভালো ফল করে। ১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৭৭-পরবর্তী লোকসভা ও বিধানসভা উভয় নির্বাচনগুলিতে বামজোটই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে থাকে।[203] সৈয়দ বদরুদ্দোজার নেতৃত্ব ও জেলার বাম দলগুলির কৌশলগত পরিবর্তন, জেলার বামপন্থী রাজনীতিতে একরামুল হক, এবাদুল হক, মানোয়ারা খাতুন, আমিনুল ইসলাম, রুহুল আমিন, নূরশেদ আলী, আবু সাঈদ, ইমাম আলি খাঁ প্রমুখদের টেনে আনতে সক্ষম হয়।[204] এইভাবে প্রথম কয়েকটি নির্বাচনে উদ্বাস্তু এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের হাত ধরে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র এবং তার অন্তর্গত বিধানসভা কেন্দ্রের আসন গুলিতে জেলায় বামদলগুলি নিজেদের প্রতিষ্ঠা দিয়ে শুরু করে। পরবর্তীকালে কংগ্রেস-বিরোধী কিছু মুসলিম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এগিয়ে এলে এবং ধীরে ধীরে মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে তাদের 'নিজেদের লোক' মুসলিম প্রার্থীদের দাঁড় করিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন লাভ করতে সচেষ্ট হয়।

কংগ্রেসের গড় এই মুর্শিদাবাদ জেলায় বামপন্থী রাজনীতির ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করায় জেলার উদ্বাস্তু জনগণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উদাহরণস্বরূপ, নোয়াখালী থেকে আগত প্রাণরঞ্জন চৌধুরী ১৯৪৯ সালে এপার বাংলায় এসে খাদ্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবি তোলেন। তিনি প্রথম দিকে আরএসপি এবং পরে সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫০, ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে তিনি কারাবরণও হয়েছিলেন। ঢাকা-বিক্রমপুর থেকে আগত বিজন ভট্টাচার্য ১৯৫২ সালে বহরমপুরে আরএসপি দলের সঙ্গে যুক্ত হন ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে আন্দোলন করেন। পাবনা থেকে আগত কবি বিমল চক্রবর্তীও আরএসপি দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন, যিনি উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে সংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মণীন্দ্রনগর কলোনি উন্নয়নে তার বিশেষ অবদান ছিল। তিনি পরপর চারবার মণীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে খুলনা থেকে আগত চিত্তরঞ্জন মজুমদার উদ্বাস্তু ত্রাণ বিভাগের কর্মী হওয়ার সুবাদে বহরমপুরের উপকণ্ঠে বিষ্ণুপুর, মধুপুরের ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার করে মধুপুর কলোনির সার্বিক উন্নয়নে সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[205]

---

[202] Dilip Banerjee, *Election Recorders,* pp. 403-405.

[203] *মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার- ২০০৩,* পৃ. ৬২০-৬২৪।

[204] দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার, *লড়াই-সংগ্রামে,* পৃ. ৬৪-৭৪।

[205] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৪২-৪৩।

শুধু পুরুষেরাই নয় তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উদ্বাস্তু মহিলারা যেভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা জেলার রাজনীতির ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করেছিল। আগেই দেখা গেছে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু আন্দোলনে পরিবারের পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও বামপন্থীদের হাত শক্ত করেছিলেন।[206] এই জেলাতেও তার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, খুলনা থেকে আগত জিয়াগঞ্জের আশালতা বসুর দৃষ্টান্ত-স্থাপনকারী নেতৃত্ব জেলার উদ্বাস্তু মহিলা, পুরুষ, আদিবাসীদের বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি প্রথমে সিপিআই ও পরে শৈলেন অধিকারীর সোশালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ ও লালবাগ এলাকায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আন্দোলনে শামিল হন। আজিমগঞ্জের অধিবাসী-প্রধান এলাকার সিলিং বহির্ভূত জমি চিহ্নিতকরণ ও তার উদ্ধারকার্যে সফল হন। সাঁওতাল, ওরাও ও মুন্ডা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার অন্যতম কীর্তির মধ্যে ছিল কুসুমখোলায় আদিবাসীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিধান কলোনি গঠন। তিনি শুধু মহিলা কর্মীদের দিয়েই টেস্ট রিলিফের কাজ মঞ্জুর করিয়েছিলেন। লালবাগ মুকুন্দবাগ রাস্তা মহিলা কর্মীদের দ্বারাই তৈরি, যাতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালের আজিমগঞ্জের রেল ধর্মঘটকারীদের সমর্থনেও তিনি পথে নেমেছিলেন।[207] এই জেলার আরো এক উদ্বাস্তু মহিলা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছায়া ঘোষ। ফরোয়ার্ড ব্লক নেত্রী ছায়া ঘোষ জমিদারের সঙ্গে লড়াই করে সুভাষ কলোনিতে লালবাগের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ওখান থেকে বিধানসভা নির্বাচনে চারবার জয়যুক্ত হয়ে প্রথমে বিধায়িকা ও পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন। ছায়া ঘোষের নেতৃত্ব লালবাগে ফরওয়ার্ড ব্লকের ভীত শক্ত করেছিল।

এদের পাশাপাশি ছিলেন এসইউসি কর্মী অনুরাধা বন্দোপাধ্যায়। রঘুনাথগঞ্জের বড়জুমলায় উদ্বাস্তুদের প্রশাসন উচ্ছেদ করতে গেলে অনুরাধা দেবী উদ্বাস্তু মহিলাদের নিয়ে সেই অভিযান প্রতিরোধ করেন। শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায় পরপর তিনবার রঘুনাথগঞ্জ পুরসভার কাউন্সিলার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। জেলা সদর বহরমপুরের মাদাপুর উদ্বাস্তু কলোনিতে ২০০৬ সালের এপ্রিলে বিদ্যুৎ, রাস্তা ও জলের অভাবের জন্য প্রতিবাদ হিসেবে ৯৯ নং বুথের ফুলকুমারী ওঁরাও ভোট বয়কটের ডাক দেন।[208] এরকম আরও অসংখ্য উদ্বাস্তুরা নিজেদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা সংখ্যায় অল্প হলেও প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যই ছিলেন রাজনীতি মনস্ক, এবং বামপন্থী রাজনীতির ঘোষিত বা অঘোষিত সমর্থক বা সক্রিয় কর্মী। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় তাদের কথাবার্তায় রাজনৈতিক মনস্কতা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বোঝা যায়, তারা কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা কারো কথায় কোনো দলকে ভোট দিতেন না বরং বামপন্থী রাজনীতিটা আন্তরিকভাবে করতেন; যেখানে জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অধিকাংশই

---

[206] Rachel Weber, *"Re-(Creating) the Home,* pp. 59-79

[207] দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার, লড়াই-সংগ্রামে, পৃ. ৫৫; ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি,* পৃ. ৪২-৪৩।

[208] ড. বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৮৯, ১০৫ ও ১০৭।

সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, উচ্চশ্রেণির মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভোট দিতেন; তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনার বড়ই অভাব ছিল। উপরে আলোচিত দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলিমদের রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার পরিমণ্ডলকে কুঠারাঘাত করে নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনার জগতে আনার কাজে উদ্বাস্তু জনগণের এই রাজনৈতিক মনস্কতা পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। জেলার আপামর জনগণ বুঝতে পারে তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা, নিজস্ব মতামত আছে তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এইভাবে উদ্বাস্তু জনগণের উপস্থিতি প্রচ্ছন্নভাবে হলেও জেলা রাজনৈতিক বাতাবরণে একটি পরিবর্তন নিয়ে আসে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমনের একটি বিশেষ ইতিবাচক দিক হল জেলার নারীদের মনমানসে রাজনৈতিক সচেতনতার বিকাশ। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বাস্তু নারীরা কিভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, বর্তমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় দেখা গেছে একাত্তরের পূর্বে আগত পঞ্চাশোর্দ্ধ, ষাটোর্ধ্ব মহিলারা যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাবলীল ভঙ্গিতে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, জেলার স্থানীয় পরিবারগুলোর মধ্যে ওই বয়সের কোন মহিলার কাছ থেকে এই ধরনের কথাবার্তা খুব একটা শোনা যায় না বরং তারা রাজনৈতিক আলোচনা এড়িয়ে থাকেন বা এই বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা, সীমিত জ্ঞানের দরুন তার ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন না। তাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এতটাই যে, তা উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু সমবয়স্কা উদ্বাস্তু পরিবারগুলির নারী সদস্যদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তাদের স্বকীয় রাজনৈতিক চেতনা বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক পার্থক্য অবাক করার মতো। তারা রাজনীতিতে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং সংযুক্ত। বিষয়টি এই জেলার বিখ্যাত অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞানী ডঃ বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়েরও চোখ এড়ায় নি। জেলা সদর বহরমপুরের মাদাপুর উদ্বাস্তু কলোনি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন "এলাকার আদিবাসী মহিলাগণ রাজনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট সচেতন।" উদ্বাস্তু নারীদের রাজনীতির আঙিনায় পদার্পণে অবশ্য তারা পাশে পেয়েছিল বাম মতাদর্শীয় উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মটি। কারণ মতাদর্শ অনুসারে বাম দলগুলি লিঙ্গ ভেদ করত না। তারা নারী-পুরুষ লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান জানাত। বরং কংগ্রেস আদি দল হয়েও সাধারণ পরিবারে মহিলাদের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয়নি; এই আক্ষেপ করেছেন খোদ মুর্শিদাবাদের জেলা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত প্রদীপ মজুমদার। কলেজ-জীবন থেকে পারিবারিক সূত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত এবং পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ জেলা যুব কংগ্রেস সেবাদল ও জেলা কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকারকারী বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রী মজুমদারের স্বীকারোক্তি "তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব মহিলা কংগ্রেসকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না।" এজন্য তিনি মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে কিছুটা দায়ী করলেও 'আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে', এমনকি 'স্বাধীনতা লাভের পরেও মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতিতে মহিলা কংগ্রেসের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না' বলে আক্ষেপ করেন। মহিলা কংগ্রেস কমিটি গঠন করা হয় ১৯৬৭ সালে যেখানে লেখকের মাতা শ্রীমতি শোভনা

মজুমদার মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে মনোনীত হন। অথচ তার লেখাতেই পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদ জেলার ইংরেজবিরোধী আইন-অমান্য আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অর্থাৎ যাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী দেশাত্মবোধ আছে, দেশ গঠনের পর তাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে আসতে না পারার জন্য কংগ্রেসের অবহেলা ও ঔদাসীন্যকেই তুলে ধরে। তিনি আরো বলেন, "জেলা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যেও মহিলাদের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলিম মহিলাদের রাজনীতিতে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হন।"[209] অথচ প্রতিবেশী মালদা জেলার মহিলা কংগ্রেস যথেষ্ট সক্রিয় ছিল সেই আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকেই। মালদা জেলার ইতিহাস সূত্রে জানা যায় ১৯২১-২২ সালে মহিলাদের স্বদেশী কাজকর্মে তথা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার জন্য মালদা জেলা কংগ্রেস নেতাগণ উদ্যোগী হন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন সুধারানী দেবী, সুরেন্দ্র বালা রায়। তরুবালা সেন, উমা রায়, রেনুকা রায়, গঙ্গামনি ব্যানার্জি, সুশোভা সেন, সাবিত্রী গোস্বামী, কমলা মৈত্র, হেনা চক্রবর্তী প্রভৃতি মালদার মহিলা কংগ্রেসে উল্লেখযোগ্য নাম।[210] যেখানে মালদা জেলা কংগ্রেস থেকে রাজ্য মহিলা মন্ত্রী পাচ্ছে (রেনুকা রায়, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী), সেখানে মুর্শিদাবাদের মহিলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পেতেই স্বাধীনতা পাওয়ার পর দুই দশক পেরিয়ে যাচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ব্যাপার। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বামফ্রন্টের হাত ধরে মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্বাস্তু মহিলারা অনেকাংশেই রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত হতে পেরেছিলেন। কারণ বামপন্থী দলগুলি মহিলাদেরকে সে প্লাটফর্মটি দিয়েছিল। পুরুষদের পাশাপাশি ওপার বাংলা থেকে হাজারে হাজারে উদ্বাস্তু মহিলারা এই রাজ্যে এসেছিলেন। তারা নিজেদের ন্যায্য পাওনার দাবিতে পরিবারের অবস্থার উন্নয়নের তাগিদে রাজনীতির অঙ্গনে পা রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কংগ্রেস সমর্থক উচ্চশ্রেণির পরিবারগুলির মুসলিম মহিলা, রক্ষণশীল পর্দা প্রথার অনুসারী স্থানীয় হিন্দু পরিবারের মহিলাদের বিপরীতে এই সকল রাজনীতি সচেতন উদ্বাস্তু মহিলারা সত্যিই নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

উদ্বাস্তু আগমনে মালদা ও মুর্শিদাবাদ এই দুটি জেলার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির পরিবর্তনের মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল,– **প্রথমত:** মালদা রাজনীতিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাম দলগুলির মধ্যে কেবলমাত্র অবিভক্ত সিপিএম এবং বিভাজনের পরে সিপিআইএম এর প্রাধান্যই লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্বতন্ত্রদল এবং বাম দলগুলির মধ্যে আরএসপি, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি বিভিন্ন দলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কংগ্রেস বিরোধী কোনো একটি বামদল এককভাবে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। মালদায় আরএসপি বা ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগঠন তেমন মজবুত ছিল না।

---

[209] প্রদীপ মজুমদার, *১২৫ বছরের আলোকে,* পৃ. ৯০।

[210] ডঃ সমর কুমার মিশ্র, *স্বাধীনোত্তরকালে মালদহ,* পৃ. ২০৪-২০৫।

দ্বিতীয়ত: মালদার তুলনায় মুর্শিদাবাদের জেলায় সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু অনুপাত অনেক বেশি হওয়ায় এখানে 'শ্রেণি রাজনীতির তুলনায় 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতি' বেশি চোখে পড়েছে, জেলার মুসলিম জনগণের কাছে তাদের স্বধর্মীয় প্রার্থীরা বেশি বিশ্বাসযোগ্য ছিল। যার কারণে বাম দলগুলি প্রথম দিকে মুসলিমদের কাছে ঠিক ভাবে পৌঁছাতে পারেনি। উদ্বাস্তু-প্রধান কেন্দ্রগুলি থেকে বাম দলগুলি জয়লাভ করলে, মুসলিম প্রধান এলাকায় মুসলিমদের মধ্যে থেকে প্রার্থী দাঁড় করানো হলে জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ধীরে ধীরে বামপন্থী দলগুলিকে সমর্থন করতে শুরু করেন। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, নবাব ওয়াসিফ আলী মির্জা, খোদা বক্স ইত্যাদি মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা দেশভাগের সময় মুর্শিদাবাদ জেলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করেন এবং জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের দেশ ছেড়ে না যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানান। এই সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আশ্বাসে এই দেশে থেকে যাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যখন দেখলেন তারা কংগ্রেসে যোগদান করছেন তখন তারাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেতে পারেননি। এর বিপরীতে মালদা জেলায় প্রথম থেকেই সিপিএম 'শ্রেণি-রাজনীতি'র সূচনা করে। ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন, মহিলা সংগঠন ইত্যাদি। সিপিএমের মালদা জেলার নেতৃত্বে এই আলী, আলম, সিদ্দিক, শেখ প্রভৃতি নামগুলি মুসলিম জনগণদের আকৃষ্ট করতে থাকে।

তৃতীয়তঃ মালদা জেলার রাজনীতিতে 'গনি খান ফ্যাক্টর'এ সবকিছু ঢাকা পড়ে যায়। এই জেলায় গণি খানকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার পরে দীর্ঘ কয়েক দশক দলকেন্দ্রিক রাজনীতির পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি বড় হয়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে তেমনটি হওয়ার সুযোগ ছিল না। এই জেলায় শাসক দল ও বিরোধী বিভিন্ন দলেরই একাধিক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

চতুর্থতঃ মুর্শিদাবাদ জেলার মহিলা কংগ্রেস যেভাবে বহুদিন দুর্বল হয়েছিল মালদায় তা হয়নি। মালদায় জেলা কংগ্রেসের মহিলা-শাখা যথেষ্ট জোরালো ছিল। স্বাধীনতার আগে ও পরে কংগ্রেসের বহু মহিলা নেত্রীর নাম পাওয়া যায়, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচনে মহিলারাই জয়লাভ করেন। উল্টো দিকে মুর্শিদাবাদে মহিলা কংগ্রেস তাদের অস্তিত্ব জানান দেয় স্বাধীনতার প্রায় দু দশক পরে এবং উদ্বাস্তু মহিলাদের সক্রিয় রাজনীতি ও বামদলগুলির লিঙ্গ বৈষম্যহীন দৃষ্টিভঙ্গি জেলার মহিলাদের রাজনীতির আঙিনায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

দুই জেলার ক্ষেত্রেই সাধারণ যে বিষয়টি চোখে পড়ে তা হল এই দুই জেলার উদ্বাস্তুদের বাম দলগুলির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ। বর্তমানে মালদা থেকে প্রকাশিত গৌড়বার্তা, গৌড়ভূমি, গৌড়বানী ইত্যাদি 'বাম রাজনীতির মুখপত্র' নামে পরিচিত পত্রিকাগুলির প্রতিটি সংখ্যায় যারা কলম ধরেছেন তারা বেশিরভাগ জেলার উদ্বাস্তু জনগণের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম। আবার এই সকল পত্রিকাগুলিতে মালদা জেলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, রাজনীতির পাশাপাশি জেলার কীর্তিমান পুরুষ বা মহীয়সী মহিলার জীবনী বা কার্যকলাপ তুলে ধরা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে

দেখা যায় সেই পুরুষ বা মহিলা অথবা তাদের পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন। এমনকি বর্তমানে যারা এই সকল পত্রিকার সম্পাদক তাদের 'বাপ-ঠাকুরদার দেশ' কিন্তু পূর্ববাংলা। উদাহরণস্বরূপ, গৌড়বার্তার সম্পাদক অভিজ্ঞান সেনগুপ্তর ঠাকুরদা এসেছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা থেকে, গৌরভূমি পত্রিকার সম্পাদক দীপক চৌধুরীর বাবা ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহীর মানুষ। তারই বাল্যবন্ধু গৌড়বাণী পত্রিকার সম্পাদক।[211] এসব থেকেই ওপার বাংলা থেকে আগত লোকেদের 'বাম প্রীতি' স্পষ্ট হয়। বর্তমান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকারে দেখা যায় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুরা অধিকাংশ বামফ্রন্টের নেতা, মেম্বার, বা সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আবার অনেকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও বামফ্রন্টকে সমর্থন করতেন। এর কারণ হিসেবে তারা বলেছেন " বামফ্রন্ট গরিবের দল, কংগ্রেস বড়োলোকের দল, গরিবের পাশে বামফ্রন্ট আসে (আছে)"[212] জেলার উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা উন্মাদনা কাজ করতো। তারা নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যে বলাবলি করতেন "এবার সিপিএম জিতবে, দক্ষিণবঙ্গে পার্টি খুব উঠেছে, সিপিএমকে ভোটটা দিবি"।[213] অনুরূপভাবে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও উদ্বাস্তুদের মধ্যে বহু বাম-কর্মী, সমর্থকদের পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আছেন তরুণ কুমার ভাওয়াল, বাম পরিচালিত ইউসিআরসির মেম্বার রাধাশ্যাম নন্দী, নির্মল সরকার প্রমুখ। জেলার উদ্বাস্তু নিরঞ্জন মিত্রের মতে "বাম লেবার শ্রেণি, গরিব শ্রেণির দল। Free school education, খাস জমি পাওয়া ইত্যাদি উদ্বাস্তুদের বাম-প্রীতির কারণ" তিনি আরো বলেন "Lower caste বামেদের প্রতি attracted হয়েছিল। বামেদের আমলে Lower caste ভোটে দাঁড়াতে পারত, MP, MLA হতে পারত যেমন দশরথ মিস্ত্রী"[214] এ সমস্ত কারণগুলি এই দুই জেলার উদ্বাস্তু জনগণকে বাম দলগুলোর প্রতি আকর্ষণ করেছিল। এর পাশাপাশি আরও একটি বিষয়ে এই দুই জেলার উদ্বাস্তু রাজনীতিতে সাদৃশ্য ছিল তা হল উদ্বাস্তু নারীদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় রাজনৈতিক সচেতনতা ও সক্রিয়তা যা দৃষ্টান্তসহ এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

উপসংহারঃ হঠাৎ করে উদ্বাস্তু আগমন সাময়িক কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করলেও পরবর্তীকালে সেই সকল উদ্বাস্তুদের তাদের হাত ধরেই এই দুই জেলার বিভিন্ন পরিসরে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের প্রসার, নগরায়ন, রাস্তাঘাট ও হাট বাজারের প্রসার ইত্যাদি যেমন ঘটেছিল; তেমনি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের হাত ধরে মালদা মুর্শিদাবাদ জেলায় পাট চাষ ও বোরো ধান চাষ, কৃষি ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। নিচু এলাকা, জলাভূমিগুলিতে যেখানে আগে চাষাবাদ হত না, সেই সমস্ত এলাকায় চাষের নতুন ধারা প্রবর্তন করে উদ্বাস্তুরা

---

[211] অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত, "দেশভাগ, ১৮ আগস্ট, মালদাঃ একটি মিথের উৎস সন্ধানে", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২), পৃ. ১৯৪; রেশমি মজুমদার, "গৌড় ভূমি ও সবার দিপুদা", *বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্য,* পৃ. ৪৫।

[212] সাক্ষাৎকারঃ- শান্তিরঞ্জন সরকার, মালদা।

[213] সাক্ষাৎকারঃ- রবীন্দ্রনাথ সরকার, মালদা।

[214] সাক্ষাৎকারঃ- নিরঞ্জন মিত্র, মালদা।

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। একইভাবে পতিত, অনাবাদী, জমিগুলিকে আবার যোগ্য করে, কোথাও বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে সেই সমস্ত অঞ্চলে চাষাবাদ শুরু করে এই জেলার একটা বড় অংশ চাষের আওতায় নিয়ে এসেছিলেন, যা জেলার সামগ্রিক উৎপাদনে অবদান রেখেছিল। শিল্পক্ষেত্রেও দেখা যায় ছোটখাটো কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, এই উদ্বাস্তুদের হাত ধরে প্রসার লাভ করেছিল, এদের মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত পিতল ও কাঁসার কারবারিরা, রেশম শিল্পী ও তাঁত বস্ত্রশিল্পীরা, স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবসায়ীরা শোলা শিল্পী বা মালাকারেরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত শিল্পীদের দ্বারা গড়ে ওঠা বিভিন্ন সমবায় সমিতি, জেলার অর্থনীতিকে মজবুত করেছিল। যেমন রেশম শিল্পীদের বা তাঁত বস্ত্র শিল্পীদের এরকম সমবায়-সমিতির কথা জানা যায়। পাশাপাশি শাঁখারী, মালাকার, পুরোহিত, ঢাকি প্রভৃতি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বংশানুক্রমিক পেশার মানুষেরা পূর্ববঙ্গে তাদের বাজার কমে গেলে এই দুই জেলায় এসে তাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। এই দুই জেলায় প্রচলিত বিড়িশিল্প বহু উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। উদ্বাস্তু পরিবারগুলির একটি বিরাট অংশ এই দুই জেলার বিড়িশিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

বিভিন্ন পূজা-পার্বণ আচার-আচরণ, রীতি-রেওয়াজ আদান-প্রদানে এই দুই জেলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি জেলায় প্রচলিত গম্ভীরা শিল্প, কবিগান, আলকাপের গান পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু শিল্পীদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। সাহিত্য চর্চা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের অবদান অস্বীকার্য। উদ্ভাস্ত আগমনে এই দুই জেলা এক ঝাঁক আঞ্চলিক পত্রিকার মুখ দেখেছিল। যা এখনো সগৌরবে তাদের বিভিন্ন সংখ্যা প্রকাশ করে চলেছে এবং জেলার ঐতিহ্য সংস্কৃতি ইতিহাসগুলি তুলে আনছে। পাশাপাশি, শিক্ষার প্রতি তাদের অদম্য আগ্রহ, খাওয়া-পরার পাশাপাশি শিক্ষাকে অপরিহার্য রূপে দেখার তাদের মানসিকতা, নিজেদের চেষ্টায় বহু সংগ্রাম করে বিদ্যালয় করে তোলা, বিনা পারিশ্রমিকে পড়ানো বিদ্যালয়ের জন্য জমি দান, অর্থ দান প্রভৃতি এই দুই জেলার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং এই দুই জেলার শিক্ষা হারে বিরাট বড় পার্থক্য এনেছিল। একই ভাষার অন্তর্গত দুটি ভিন্ন উপভাষা অঞ্চলের মানুষের কাছাকাছি আসার ফলে ভাষাগত আদান-প্রদান ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে কিছুটা অসুবিধা হলেও, তাদের ভাষা নিয়ে খুব বেশি অসুবিধার মুখে পড়তে হয়নি। এছাড়াও এই দুই জেলার রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিতে উদ্বাস্তু আগমনের প্রভাব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই প্রভাব ছিল ভীষণ সূক্ষ্ম। সংক্ষেপে বলা যায় কংগ্রেসের পর এই দুই জেলায় বামপন্থী মনোভাব বা বাতাবরণ যেটুকু তৈরি হয়েছিল তা উদ্বাস্তু মানুষের হাত ধরে। রাজনৈতিক সচেতনতা, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে উদ্বাস্তুদের হাত ধরেই এসেছিল। সর্বোপরি সংখ্যালঘু হয়ে ভারতবর্ষে এসে এই দুই জেলায় আশ্রয় নিয়ে পুনরায় সংখ্যালঘু হওয়া এবং সংখ্যাগুরু-অভিবাসী সহাবস্থানের ক্ষেত্রটি বিচার করে বলা যায়, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল মাথা গোঁজার ঠাঁই, জীবিকা নির্বাহ, অর্থাৎ খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান এই তিনটি প্রাথমিক চাহিদার যোগান ধর্মের থেকে বড় হয়ে উঠেছিল।

উপসংহার

বর্তমান গবেষণার মূল উপজীব্য পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ, যার বিভিন্ন দিকগুলি এই সন্দর্ভে উঠে এসেছে। সাম্প্রদায়িক হিংসা, পাকিস্তান সরকারের অসহযোগিতা ও অত্যাচার, আতঙ্ক, আক্রমণের ভয়, গুজব, আর্থিক অবস্থার অবনতি, দুর্ভিক্ষ, অন্যান্যদের দেশত্যাগের সিদ্ধান্তের প্রভাব, পদ্মা ভাঙ্গন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুরা তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। তবে তাদের সকলেই যে ভারতে থেকে গিয়েছিলেন এমন নয়, অনেকেই আবার ওই দেশে ফিরে গিয়ে পুনরায় বসবাস শুরু করেন। আবার অনেকে ওই দেশে যাওয়ার পর পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন। কারো কারো ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের একটা অংশ পূর্ববঙ্গে থেকে যায়, আবার কেউ কেউ তাদের সঙ্গে না থেকে এই দেশে চলে আসাকে ভালো মনে করেন।

অন্যদিকে, দণ্ডকারণ্য-ফেরত অনেক উদ্বাস্তু বিভিন্ন জেলা ঘুরে থাকার সুবিধা করতে না পেরে, শেষে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তারমধ্যে নদীয়া জেলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়। এই দুই জেলায় সরকারি ফাঁকা জমি, খাস জমি, রেলের জমি ইত্যাদি আছে বলে ঘোষণা করা হলে তারা এই দুই জেলায় চলে আসেন। আবার মালদা ও মুর্শিদাবাদ উভয় জেলাই নদীবহুল হওয়ায়, এই দুই জেলা মৎস্যজীবীদের এবং এখানকার নদীর নতুন পলিমাটি বহু কৃষক পরিবারকে আকর্ষণ করেছিল। নদীর বুকে যে চর গঠিত হয় সেই 'চরে ভালো ফসল হওয়ার কারণে' অনেকেই দুই জেলাকে বেছে নিয়েছিলেন।

দুই জেলার উদ্বাস্তুরা সাধারণত পূর্ববঙ্গের রাজশাহী জেলার মানুষ। কারণ রাজশাহী মালদা ও মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন পূর্ববঙ্গের জেলা, যা কেবলমাত্র গঙ্গা নদী দ্বারা এই দুই জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এছাড়াও পাবনা, দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলাও এই দুই জেলার কাছাকাছি ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষরা ভৌগলিক নৈকট্য, পূর্ব পরিচিতের সান্নিধ্য, ভৌগোলিক পরিবেশের সাদৃশ্যহেতু এই দুই জেলাকে বসবাসের জন্য বেছে নেন। বিশেষ করে সীমান্ত বরাবর পশ্চিমবঙ্গে আশার বিভিন্ন পথ ছিল, যা তাদের ভাষায় 'বর্ডার'। বিভিন্ন বর্ডারের কাছাকাছি অবস্থিত জেলাগুলো থেকে পূর্ববঙ্গের মানুষেরা সেই সেই নিকটবর্তী বর্ডারে এসে সীমানা পার করেছিলেন। যার মধ্যে এই দুই জেলার মানুষ বেশিরভাগ গেদে বর্ডার, দর্শনা বর্ডার, বয়রা বর্ডার দিয়ে এসেছিলেন।

সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা সকলের হয়ত দরকার হয়নি, অনেকে নিজেরাই নিজেদের পুনর্বাসিত করেছিলেন এদের মধ্যে ছিলেন চাকরিতে অপশন দিয়ে চলে আসা সরকারি চাকুরীজীবী, শিক্ষিত শ্রেণি যারা সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, যেমন ডাক্তার, শিক্ষক, আইনজীবী প্রভৃতি। আবার যারা কিছু অর্থ বা সম্পদ সঙ্গে করে আনতে পেরেছিলেন তারা ব্যবসা বা অন্যান্য কারবার শুরু

করতে পেরেছিলেন। তবে অনেকে আত্মমর্যাদা বশত ত্রান শিবিরে থাকতে বা ডোল নিতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন, কিন্তু এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তদের সিংহভাগই যেহেতু নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ছিলেন তাই তাদের প্রাথমিকভাবে সরকারি সাহায্য নিতে হয়েছিল। সরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনার অন্তর্গত দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে অনেককে রাজ্যের বাইরে ভিন রাজ্যে যেতে ও থাকতে হয়েছিল, যদিও তারা সেখানে থাকতে পারেননি। ভাষা, সংস্কৃতি, পরিবেশ ইত্যাদি বিভিন্নতার কারণে তারা আবার এই রাজ্যে ফিরে আসতে বাধ্য হন এবং এখানে এসে নিজেদের চেষ্টায়, আত্মীয়-পরিচিত, বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় তারা পুনর্বাসিত হন। যারা দেশভাগের প্রথম দিকে এসেছিলেন তারা সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার সঙ্গে এই দুই জেলায় পুনর্বাসিত হয়েছিলেন কিন্তু যারা পরের থেকে এসেছিলেন তারা সরকারি সাহায্য খুব একটা পাননি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন প্রকল্পের অন্তর্গত বারুজীবী স্কিমে অনেক পান চাষী পরিবার মুর্শিদাবাদ জেলায় এসেছিলেন কিন্তু পান চাষের জন্য উপযুক্ত জলসেচ ব্যবস্থা ও জমি না থাকায় এই জেলায় এই স্কিম সফল হতে পারেনি, ফলে তাদের বাধ্য হয়ে অন্যান্য চাষবাস শুরু করতে হয়েছিল।

এই দুই জেলায় বিভিন্ন সরকার অনুমোদিত কলোনি, জবরদখল কলোনি ও প্রাইভেট কলোনিতে ওপার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুরা বসবাস শুরু করেন। এক একটি কলোনি গড়ে ওঠার পেছনে আলাদা আলাদা ইতিহাস রয়েছে। কোথাও একসঙ্গে অনেকগুলি পরিবার এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন, কোথাও বা চার-পাঁচটি পরিবার থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে সেটি একটি জনপদে পরিণত হয়। বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা এই দুই জেলার প্রধানত শহরাঞ্চলগুলি ও সীমান্ত নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিকে পছন্দ করেছিলেন। এই দুই জেলার পূর্বাঞ্চল কৃষিতে বিশেষ সমৃদ্ধ হওয়ায় পূর্বের সীমান্ত-ঘেঁষা অঞ্চলে তাদের বেশি দেখা যায়। খাস জমি বা রেলের জমি যেগুলি স্থানীয় মানুষেরা, মুসলিম, ঘোষ, চাঁই, মন্ডলরা ভোগ করতেন, তারা প্রাথমিকভাবে তার দখল ছাড়তে নারাজ ছিলেন। বিশেষত সেগুলি ছিল ঘোষ সম্প্রদায়ের লোকেদের গোচারণভূমি। জমির উপর দখলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ঘোষেদের সঙ্গে, চাঁই, মন্ডলের সঙ্গে, মুসলিমদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের বিরোধ বাঁধে; কোথাও বচসা, কোথাও হাতাহাতি ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার কথা শোনা যায়। তবে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় উদ্বাস্তুরা শেষ পর্যন্ত জমির উপর তাদের দখল বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

বাসস্থানের ব্যবস্থা হলেও খাওয়া পরার জন্য অর্থ উপার্জনের তাগিদে এই দুই জেলার সহায়-সম্বলহীন উদ্বাস্তুরা প্রথমদিকে মুথা ঘাস বিক্রি, হকারি, রিকশা চালনা, সবজি বিক্রি ইত্যাদি দিয়ে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে সঞ্চিত অর্থ থেকে অনেকেই জমি কিনে চাষবাস শুরু করেছিলেন, অনেকে মুদিখানা দোকান বা ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছিলেন। মহিলারা গৃহপরিচারিকার কাজ, রান্নার কাজ, বিড়ি বাঁধা, আঁচার-পাঁপড়-বড়ি তৈরির কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও দক্ষ চাষী। এই দুই জেলার বহু পতিত, অনাবাদি জমিগুলিকে তারা চাষযোগ্য

করে গড়ে তুলেছিলেন। আবার এই দুই জেলার বহু নিচু জায়গা, জলাজমি যেগুলিতে কেউ কখনো চাষের কথা ভাবতেও পারিনি সেই সমস্ত জায়গায় পূর্ববঙ্গের জলা জায়গায় বসবাসকারী উদ্বাস্তুরা তাদের অভিনব পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করে জেলার মানুষকে অবাক করে দিয়েছিলেন। নিচু ও জলাজমিতে ভিন্ন জাতের ধান, ভিন্ন পদ্ধতিতে চাষ এর আগে জেলার মানুষ কখনো দেখেননি, যা এই দুই জেলার অর্থনীতিতে পরিবর্তন এনেছিল। আবার এক-ফসলা জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে কি করে একে দো-ফসলা জমিতে পরিণত করতে হয় তাও তারা জানতেন। এর সঙ্গে ছিল পাট চাষ, যা উদ্বাস্তুদের আরেকটি অবদান। এই দুই জেলার জনগণনায় দেখা যায় যেখানে যেখানে উদ্বাস্তুরা বেশিরভাগ আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন এই সমস্ত অঞ্চলে বোরো ধানের চাষ, পাট চাষ, বছরে একাধিকবার চাষ হওয়া জমির পরিমাণ, উপলব্ধ জমির তুলনায় আবাদ হওয়ার জমির অনুপাত ইত্যাদির বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা জেলার অর্থনীতিতে গঠনমূলক পরিবর্তন এনেছিল। তেমনি আবার পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বহু কাঁসা, পিতল দ্রব্য প্রস্তুতকারী, রেশম ও তাঁত বস্ত্রশিল্পীদের শিল্প নৈপুন্য, নতুন কৌশল, নতুন নতুন নকশা এই সমস্ত শিল্পগুলিকে সমৃদ্ধ করেছিল। এই সমস্ত শিল্পীদের দ্বারা গড়ে ওঠা বিভিন্ন সমবায় সমিতি, জেলার অর্থনীতিকে মজবুত করেছিল। যেমন, রেশম শিল্পীদের ও তাঁত বস্ত্র শিল্পীদের এরকম সমবায়-সমিতির কথা জানা যায়। পাশাপাশি শাঁখারী, মালাকার, পুরোহিত, ঢাকি প্রভৃতি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বংশানুক্রমিক পেশার মানুষেরা পূর্ববঙ্গে তাদের বাজার কমে গেলে এই দুই জেলায় এসে তাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। এই দুই জেলায় প্রচলিত বিড়িশিল্প বহু উদ্বাস্তু পরিবারগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। উদ্বাস্তু পরিবারগুলির একটি বিরাট অংশ এই দুই জেলার বিড়িশিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

একইভাবে খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, পূজা-পার্বণ রীতিনীতিতে দুই সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটেছিল উদ্বাস্তু হাত ধরে। এই দুই জেলার সাহিত্যচর্চা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু আগমনের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। উদ্বাস্তু আগমনে এই দুই জেলা এক ঝাঁক আঞ্চলিক পত্রিকার মুখ দেখেছিল যা এখনো সগৌরবে তাদের বিভিন্ন সংখ্যা প্রকাশ করে চলেছে এবং জেলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসগুলি তুলে আনছে। গবেষণার পঞ্চম অধ্যায় দেখানো হয়েছে পূর্ববঙ্গীয় মানুষদের শিক্ষার হার পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি ছিল, এই দুই জেলায় আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। স্থানীয় জনগণের তুলনায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষার হার সার্বিকভাবে দেড় থেকে দুই গুণ ও স্থানীয় মহিলাদের তুলনায় উদ্বাস্তু মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার তিন থেকে চার গুণ বেশি ছিল। শিক্ষার প্রতি তাদের প্রবল আকর্ষণ ও অদম্য আগ্রহ, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়ের জন্য জমি দান, অর্থ দান, বিনা পারিশ্রমিকে পড়ানো ইত্যাদি শিক্ষার প্রতি এই দুই জেলার মানুষের মনোভাব পাল্টে দিয়েছিল। স্বাধীনতার আগে ও পরে বিভিন্ন দশকগুলিতে এই দুই জেলার শিক্ষার হারের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যার যে হঠাৎ পরিবর্তন তা একেবারেই কার্যকারণ সম্বন্ধহীন নয়। উদ্বাস্তু আগমনে এই দুই জেলার রাজনৈতিক বাতাবরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যদিও সেই পরিবর্তন ছিল খুব সূক্ষ্ম এবং এই পরিবর্তন এসেছিল খুব ধীরগতিতে,

সুনির্দিষ্ট পথ ধরে। সমগ্র রাজ্যে উদ্বাস্তু মানুষের আন্দোলন ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বামপন্থী রাজনীতি যেভাবে তার পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে পেরেছিল এই দুই জেলার ক্ষেত্রে তার অনুসরণ অতটা সহজ ছিল না। কারণ মালদা জেলায় যে কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দলের কাছে চ্যালেঞ্জস্বরূপ গণি খান চৌধুরীর উপস্থিতি ও মুসলিম জণঘনত্ববিশিষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলায় অভিজাত ও প্রভাবশালী মুসলিম পরিবারগুলির 'কংগ্রেস প্রীতি'; এই দুই জেলায় বামেদের ভীত শক্ত হতে না পারার পেছনে ছিল প্রধান অন্তরায়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুণ জাতীয় নিরাপত্তাবোধ থেকে 'এই দুই জেলার মুসলিমদের যে কংগ্রেস প্রীতি'কে ছিল তাকে ছাপিয়ে বিধানসভা বা লোকসভা নির্বাচনে জয় লাভ করা মোটেও সহজ ছিল না। সেখানে এই দুই জেলার উদ্বাস্তু মানুষেরা তাদের ঐক্যবদ্ধতা ও স্থির সংকল্পের অটল থেকে এই দুই জেলার মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ও রাজনৈতিক মনষ্কতায় পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে ধাপে ধাপে ধারাবাহিকভাবে ও সুনির্দিষ্ট পথে এই পরিবর্তন এসেছিল। এই দুই জেলার উদ্বাস্তু মানুষের এক বিশেষ অবদান হল স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও তাদের রাজনীতিমনস্ক করে তোলা।

বর্তমান গবেষণায় এই সমস্ত বহুবিধ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হলেও তথ্যের অপর্যাপ্ততা অনেক ক্ষেত্রেই একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী অতিমারি করোনার প্রকোপে তথ্য সংগ্রহ করা ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জস্বরূপ। অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের উপলব্ধতা ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে আবার সেই উপলব্ধতা ছিল বাধাপ্রাপ্ত। ভবিষ্যৎ কাজের জন্য স্থানীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দুটি ব্যবহারের আগ্রহ থাকল। তাছাড়া এই দুই জেলার উদ্বাস্তুদের ওপর শ্রেণিভিত্তিক, সম্প্রদায়ভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক কাজের সম্ভাবনাও বিশেষ আকর্ষণীয়। গবেষণার শুরুর দিকে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা ও রাজশাহী জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে নদীর বুকে চর গঠন এবং সেই চরের দখলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আইনি জটিলতা সীমানা নির্ধারণ ও সর্বোপরি সাধারণ জনজীবন কিভাবে ব্যাহত হয়েছিল তার কিছু কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই জেলার সীমান্ত অঞ্চল নিয়েও ভবিষ্যতে আরো কাজের পরিকল্পনা করা যায়।

মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু আগমন সমগ্র থেকে বিশেষকে আলাদা করে না। এই দুই মুসলিম-প্রধান জেলাকে বেছে নেওয়া এবং কয়েক প্রজন্ম ধরে বছরের পর বছর সেখানে বসবাস করা তারই জ্বাজল্যমান প্রমাণ। যে ধর্মীয় পৃথকীকরণ, দ্বিজাতি তত্ত্ব কেড়ে নিয়েছিল তাদের জাতীয় পরিচয়, সেই ধর্মীয় মেরুকরণ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এই দুই জেলায়। কিন্তু মহাফেজখানা বা অন্যান্য ঐতিহাসিক পাঠ্যর বিপরীতে যারা এই দুই জেলায় এসেছিলেন তাদের মুখের কথা এক অন্য আখ্যানকে তুলে ধরে। রাষ্ট্রপরিচয়, সাধারণ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, যাদের সঙ্গে সেই রাষ্ট্র পরিচালনার, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করার কোনো সম্বন্ধ নেই। যেমন, খুব সহজভাবে বলতে গেলে হিন্দু-প্রধান খুলনার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের জেলায় নিশ্চিন্ততা বা নিরাপত্তা অনুভব করতে পারছেন না। কারন সেটি পাকিস্তান নামক মুসলমান রাষ্ট্রের অন্তর্গত। আবার সেই মানুষেরাই মালদা মুর্শিদাবাদের

মতো মুসলমান প্রধান জেলায় আশ্রয় নিতে দ্বিধাবোধ করছেন না কারণ সেটি ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত। স্থানীয় বা আঞ্চলিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাষ্ট্রীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছে যে নতি স্বীকার করতে বাধ্য তা প্রমাণিত হচ্ছে। তাই স্থানীয় বা আঞ্চলিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার থেকেও ছাপিয়ে উঠেছে এই রাষ্ট্রীয় পরিচয়। মালদার শান্তিরঞ্জন সরকার সেই নিশ্চিন্ততা থেকেই বলতে পারেন পশ্চিমবঙ্গে তার যাওয়ার জায়গার অভাব হবে না। সেখানে যে থাকতে তার অসুবিধা হচ্ছে এমনও তিনি বলেননি কয়েক দশক নিশ্চিন্তেই তিনি মালদা জেলার বাসিন্দা হয়ে কাটিয়ে দিতে পেরেছেন।

এতক্ষণের আলোচনা সমাজের সামগ্রিকভাবে চিত্র তুলে আনলেও যদি সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণি, নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় সেখানে খাদ্যবস্ত্র, বাসস্থানের চিন্তাটুকুই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাথার উপর ছাদ, এক টুকরো চাষের জমি; এইটুকুই ছিল তাদের প্রাথমিক চাহিদা। সর্বহারাদের আর কিছু হারাবার ভয় থাকেনা। মুর্শিদাবাদ জেলার শংকর বিশ্বাস যথার্থই বলেছেন "যতক্ষণ বিপদ আছে ততক্ষণ জাতপাত নেই"। দেশভাগের সাত দশক পরে আজ তাদের একে অপরের বাড়িতে যাওয়া আসা, পূজা-পার্বণ, ঈদ-পরবে, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ, বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে পরস্পরকে নিমন্ত্রণ তাদের কাছে কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়, বরং তাদের এই সহাবস্থান প্রতিদিনের জীবনে সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠেছে। কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ও পারিপার্শ্বিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর চেষ্টা করলেও অসৎ উদ্দেশ্য সব সময় জয়লাভ করতে পারে না এবং সময়ের সাপেক্ষে তা প্রশমিত হয়ে যায় এমন প্রমাণও সাম্প্রতিককালে পাওয়া যায়। তবে জেলার উদ্বাস্তু মানুষদের কাছে পৌঁছানো, জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের তাদের বাড়িতে অবাক যাতায়াতের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

বাস্তুচ্যুত হয়ে এই দুই জেলায় এসে তাদের অবস্থান্তর ঘটেছে ঠিকই কিন্তু তা এক বিরাট অপূরণীয় ক্ষতির বিনিময়ে। সেই ক্ষতি কারো কাছে একসঙ্গে সহপাঠীদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যাওয়া, ফুটবল মাঠে একসঙ্গে খেলা, হারানো বাড়ি, গোয়ালঘর, মন্দির তলা, কখনো আবার 'খেজুর গুড়ের সাথে উড়ুম' খাওয়া, 'নু যাই' ইত্যাদি নিজের দেশের ভাষা বলতে পারার আনন্দ, আরো কত টুকরো স্মৃতি, যা আজও তাদের নস্টালজিক করে তোলে। প্রায় সকলের একই আক্ষেপ এই দেশভাগের কি দরকার ছিল! যে সিদ্ধান্তের কোথাও কখনো কিছু মাত্র অংশ তারা ছিলেন না সেই সিদ্ধান্তের বিস্বাদের ফল (Apple of discord) তাদের জীবনভর বয়ে বেড়াতে হল। যদিও তারা সংগ্রামের দ্বারা নিজেদের পুনর্জীবিত, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন; তবু তাদের স্মৃতি এখনো তাদের ডেকে যায়। ভাঙা মনের একটা টুকরো পড়ে থাকে সীমান্তের ওপারে। একটা কাঁটাতারের বেড়া আন্তরাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণ করে ঠিকই কিন্তু এই সকল মানুষের স্মৃতিতে যেন সেই ছোট্ট মেয়ে গীতার "বাবা, বডার কই?"[1] এর অনুরণন শোনা

[1] ভুমিকা, পৃ.১।

যায়। যে কারণে, আজ মানুষ যখন উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে, মহাকাশে বিচরণ করছে, তখন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সেই একই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় নভশ্চারীকে বলতে শোনা যায়, "পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে এক দেখায়...মহাকাশ থেকে দেশবিদেশের সীমানা দেখা যায় না। দেখা যায় না কাঁটাতার (Border)... কোনও ভেদাভেদ নয়, বরং মহাকাশ জাগিয়ে তোলে ঐক্য এবং মানবতার অনুভূতি!"[2]

[2] *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ২৯-এ জুন ২০২৫।

পরিশিষ্টঃ- ১

সাক্ষাৎকারের নমুনা প্রশ্নপত্র

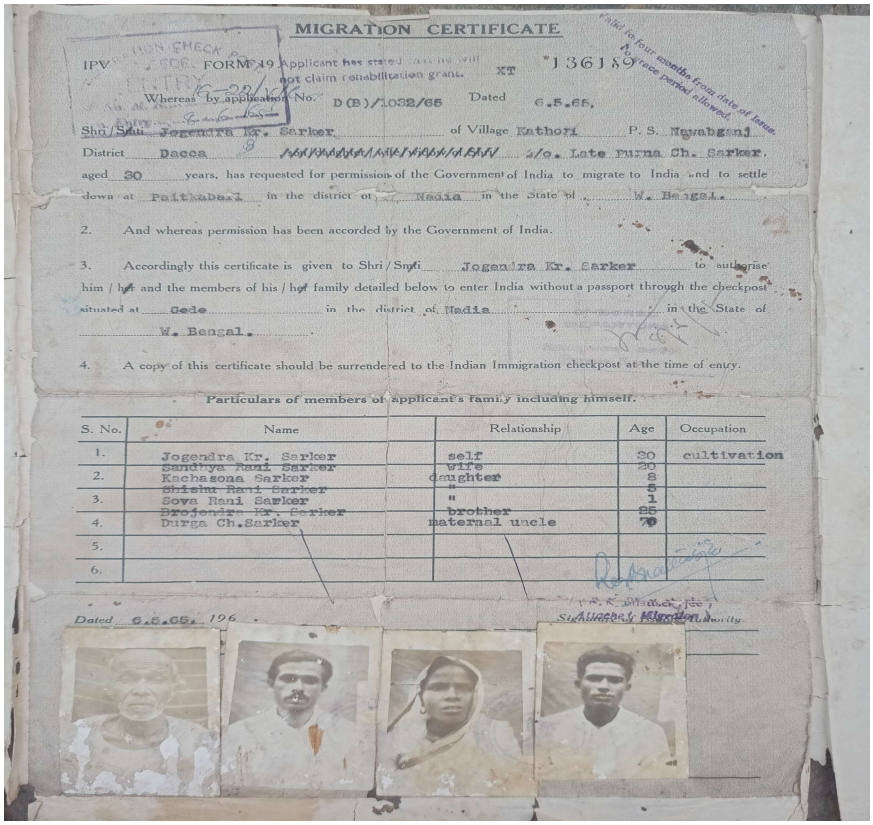
- কেন দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন?
- ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের প্রয়োজনীয়তা কি কখনো অনুভব করেছিলেন?
- দেশভাগের ঘোষণায় আপনাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া কি ছিল?
- পশ্চিম বাংলায় এসে কোথায় আশ্রয় নেবেন তা কি আগের থেকে ঠিক করে রেখে ছিলেন?
- দেশভাগের আগে আপনাদের পশ্চিম বাংলায় কোনো আত্মীয় বসবাস করত?
- আপনার চোখের সামনে কোন গণ্ডগোল হয়েছিল?
- দেশ ছাড়ার সময় স্মরণীয় কোনো ঘটনা বা স্মৃতি।
- পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হলে অনেক মুসলিমরা বাঁচিয়ে ছিল সেরকম কোন ঘটনা ঘটেছিল?
- দেশভাগের আগে এবং পরে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের কোন পরিবর্তন আপনারা লক্ষ্য করেছিলেন? কী কী পরিবর্তন আপনারা লক্ষ্য করেছিলেন? এই পরিবর্তনের কারণ কি ছিল এবং এই পরিবর্তনের পিছনে কাদের হাত ছিল বলে আপনার মনে হয়? সেই পরিবর্তন কি আপনাদের কোন ভাবে প্রভাবিত করেছিল?
- পশ্চিমবঙ্গে আসার সময় আপনাদের পরিচিত মুসলিম পরিবার বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্কের কোনো পরিবর্তন ঘটে ছিল? তাদের সঙ্গে কি কোনো মানসিক বা সামাজিক দূরত্ব তৈরি হয়েছিল?
- আপনার কি মনে হয়ছিল দেশভাগ চিরকালীন, না সাময়িক কোন ঘটনা, যা পরে হয়তো আবার পরিস্থিতি আগের মত হয়ে যাবে এবং নিজের দেশে ফিরে যাব?
- পূর্ববঙ্গে জীবিকা নির্বাহ কি ছিল? পশ্চিমবঙ্গে এসে কি পূর্বের পেশা ধরে রাখতে পেরেছিলেন?
- ঘরবাড়ি, সম্পত্তি বিক্রি বা বিনিময় কি হয়েছিল?
- পশ্চিমবঙ্গে কেউ কি সাহায্য করেছিল?
- কোনো রাজনৈতিক সংগঠন কি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল?
- সরকারি কোন সাহায্য পেয়েছিলেন?

- পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও মানুষের সাথে নিজেদের কিভাবে মানিয়ে নিলেন? কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কি বা কোন অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল?
- বাস্তহারা বা উদ্বাস্তু বলে কি এখানকার মানুষ আপনাদের খারাপ চোখে দেখতো এই রকম কোনো অভিজ্ঞতা কি হয়েছিল?
- নতুন সমাজের সাথে মানসিক মেলবন্ধন কিভাবে ঘটেছে বা কতটা সময় লেগেছে?
- দেশভাগের আগে যেখানে থাকতেন সেখানে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল? আর এখানে এসে হিন্দু-প্রধান না মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে বাস করতে শুরু করলেন?
- দেশভাগ কতটা ভালো হয়েছে না মন্দ এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?
- কখনো ইচ্ছে করেনা যে জন্মভিটে একবারের জন্য দেখে আসি?
- পূর্ব-পুরুষদের বাড়িঘর, বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে এসে ক্যাম্পের ভিতরে কেমন লাগত ?
- শোনা গেছে ক্যাম্পের ভিতরে একদিকে যেমন মৃত মানুষের লাশ পড়ে থাকত, আর অন্যদিকে মানুষ প্রতিদিনের জীবন-যাপন করত এরকম কোন অভিজ্ঞতা আপনার রয়েছে ।
- গর্ভবতী মহিলাদের জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল?
- ক্যাম্পে থাকাকালীন জীবন-যাপন কেমন লেগেছিল তার পুরো কাহানী যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলেন।
- দেশত্যাগ থেকে আশ্রয় খোঁজা পর্যন্ত আপনার কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছে?
- কেন আপনারা বসবাসের জন্য মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলাকেই বেছে নিলেন? কি কি সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই জেলার এসেছিলেন?
- আপনারা পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে অনেককেই সেখানে অত্যাচারিত হয়েছিলেন, সিদ্ধান্ত নেন দেশ ছাড়ার, তারপরও আবার কেন বসবাসের জন্য মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা বেছে নিলেন?
- এখানে এসে এই পরিবেশে এখানকার মানুষদের সাথে কিভাবে নিজেকে মানিয়ে নিলেন?
- এই জেলায় ধর্মীয় উৎসব, পূজা-পার্বণ বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে কি আপনি কখনো বাধার সম্মুখীন হয়েছেন? বা আপনার ধর্ম বিশ্বাসে কেউ কখনও আঘাত দিয়েছে?
- এই জেলাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বেশি কখনো ভয় হয়নি যে পরিস্থিতি পূর্ববঙ্গের মত হতে পারে?

- এই জেলাতে মুসলিমদের ভয় দেখিয়ে তাদের বাড়িঘর দখল করা হয়েছিল এরকম কি কোন ঘটনা ঘটেছিল?
- পূর্ববাংলা থেকে চলে এসে এই জেলার মুসলিমদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা কি ঘটেছিল?
- সীমান্তবর্তী এলাকায় থাকার অভিজ্ঞতা কেমন আপনাদের?
- স্থানীয় কোনো উদ্বাস্তু সংগঠন কি আছে? তারা কি কোনো ভাবে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ বা সাহায্য করেছে?
- ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আপনাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছিল কি ?
- পূর্ববঙ্গ থেকে বহু হিন্দুরা এলেন, তারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে বসবাস শুরু করলেন, এক এক জায়গাতে কলোনি গড়ে উঠতে থাকে, কলোনিগুলোতে কিভাবে উন্নতি করা যায় তার চেষ্টা করেছিলেন । এখানে সেরকম কোনো চেষ্টা আপনারা লক্ষ্য করেছিলেন?
- এই জেলা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র যাবার বা বসতি স্থাপন করার কোনো ইচ্ছা কি ছিল বা আছে ?

পরিশিষ্টঃ- ২ সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়কার নমুনা চিত্র।

১. যোগেন্দ্র কুমার সরকার ১৯৬৫ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় চলে আসেন।



MIGRATION CERTIFICATE

IPV FORM 19 Applicant has stated that he will not claim rehabilitation grant. XT 136189

Valid for four months from date of issue. No grace period allowed.

Whereas by application No. D(B)/1032/65 Dated 6.5.65,

Shri/Smti Jogendra Kr. Sarker of Village Kathori P. S. Nawabganj

District Dacca s/o. Late Purna Ch. Sarker,

aged 30 years, has requested for permission of the Government of India to migrate to India and to settle down at Paikabari in the district of Nadia in the State of W. Bengal.

2. And whereas permission has been accorded by the Government of India.

3. Accordingly this certificate is given to Shri/Smti Jogendra Kr. Sarker to authorise him/her and the members of his/her family detailed below to enter India without a passport through the checkpost situated at Gede in the district of Nadia in the State of W. Bengal.

4. A copy of this certificate should be surrendered to the Indian Immigration checkpost at the time of entry.

Particulars of members of applicant's family including himself.

S. No.	Name	Relationship	Age	Occupation
1.	Jogendra Kr. Sarker	self	30	cultivation
2.	Sandhya Rani Sarker	wife	20	
	Kachasona Sarker	daughter	8	
	Shishu Rani Sarker	"	5	
3.	Sova Rani Sarker	"	1	
4.	Brojendra Kr. Sarker	brother	25	
	Durga Ch.Sarker	maternal uncle	70	
5.				
6.				

Dated 6.5.65. 196

Signature of Issuing Officer



(যোগেন্দ্র কুমার সরকার, ব্যস-৭৭, মালদা, ২০২২)

২. বকুলরানী বিশ্বাস, বয়স-৬০ এবং চিত্ত বিশ্বাস, বয়স-৬৭, মালদা (সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী)।





৩. উদ্বাস্তুদের কলোনিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মালদা।



৪. উদ্বাস্তুদের কৃষি কাজের পাশাপাশি ছাগলের খামার, মালদা।



৫. পানীয় জলের ব্যবস্থা, মহালন্দী উদ্বাস্তু কলোনি, মুর্শিদাবাদ।



৬. উদ্বাস্তু মহিলার কাঁথা সেলায়ের কাজ, মুর্শিদাবাদ।



৭. ফারাক্কার গঙ্গা নদীতে উদ্বাস্তুদের পূর্ব-পেশা মৎস্য জীবিকাকে ধরে রাখার চেষ্টা।





পরিশিষ্টঃ- ৩

সারণি-১

পুরনো অভিবাসীদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা: ত্রাণ শিবিরগুলিতে নগদ ডোল ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাথমিক ত্রাণ হিসেবে দেওয়া হত। মালদা ও মুর্শিদাবাদসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ত্রাণ শিবির ও হোমগুলিতে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হত তা নিচে বিস্তারিতভাবে দেখানো হল।

রক্ষণাবেক্ষণ অনুদানঃ

ক্যাম্পে: পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ৫০-৬০ টাকা।

- প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে মাসিক ১২ টাকা করে; যেখানে শুধুমাত্র ক্যাশ ডোলের ব্যবস্থা ছিল।
- প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে মাসিক ১৮ টাকা; যেখানে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হত।
- প্রত্যেক অপ্রাপ্তবয়স্ককে মাসিক ৮ টাকা
- অসুস্থদের জন্য মাথা পিছু দৈনিক ১ টাকা।

হোমে: মাথাপিছু সর্বোচ্চ ৪০ টাকা; যার মধ্যে ছিল-

- খাদ্য বাবদ- মাথাপিছু মাসিক ১৮ টাকা
- চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য খাতে- মাথাপিছু মাসিক ২ টাকা
- আপতকালীন প্রয়োজনে- মাথাপিছু মাসিক ২ টাকা
- নগদ ভাতা- মাথাপিছু মাসিক ২ টাকা
- ঘর ভাড়ার জন্য- মাথাপিছু মাসিক ২ টাকা
- কর্মী ও প্রশিক্ষণ চার্জ- মাথাপিছু মাসিক ১৩ টাকা।

পোশাকবাবদ ভাতা

ক্যাম্পে: প্রতিবছর মাথাপিছু ১৬ টাকা।

হোমে: প্রতিবছর মাথাপিছু ২৪ টাকা।

ক্যাম্প ও হোম সবার ক্ষেত্রে,

- প্রত্যেক পুরুষের জন্য: বছরে ৩টি ধুতি, ২টো শার্ট, ২টো পাঞ্জাবি, ১টা গামছা।
- প্রত্যেক মহিলার জন্য: বছরে ৩টি শাড়ি, ২টো সায়া, ২টো ব্লাউজ/সেমিজ, ১টা গামছা।
- প্রত্যেক বাচ্চার জন্য: বছরে ১টা গামছা, ১ জোড়া সাধারণ মানের জুতো; এর সঙ্গে ছেলেদের জন্য বছরে ৪টে প্যান্ট, ৪টে শার্ট ও মেয়েদের জন্য বছরে ৪টে প্যান্ট, ৪টে ফ্রক।[1]

[1] File No:- G. P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, *Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal,* Refugee Relief and Rehabilitation Department, August 1956, Govt. of West Bengal, pp. 12-13.

শীতবস্ত্র

- পরিবার পিছু গড়ে ২টি করে কম্বল।
- গরমকালে সুতির চাদর, প্রতিবছরে ১টি।
- শীতকালে উলের কম্বল, প্রতি ৩ বছরে ১টি।

এছাড়াও প্রতিটি ক্যাম্পে বিনামূল্য জল সরবরাহ, শৌচালয় ও বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা ছিল।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা

- ডিসপেনসরি, আউটডোর বিভাগসহ ৫৯১ শয্যাবিশিষ্ট ১৬ টি হাসপাতাল।
- বড় আকারের ক্যাম্পগুলির জন্য ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র ও ভ্যান।
- প্রতি ক্যাম্পের জন্য একজন করে চিকিৎসক ও একজন দাইসহ কিছু সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা

- প্রত্যেক ক্যাম্প এবং হোমগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল।
- বড় আকারের ক্যাম্পগুলির ক্ষেত্রে যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও খোলা হয়েছিল।
- যে সমস্ত ক্যাম্পগুলিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অল্প সেখানে নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা

উপরোক্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি ছাড়াও ক্যাম্প এবং হোমে বসবাসকারীদের জন্য নিম্নলিখিত কিছু সুযোগ-সুবিধা বরাদ্দ করা হয়েছিল

- মেয়েদের বিবাহ ও বিধবাদের পুনরায় বিবাহর জন্য বিবাহ অনুদান।
- মৃতদেহ সৎকার ও শ্রাদ্ধের জন্য অনুদান
- গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদানকারী মা এবং বাচ্চাদের জন্য দুধ।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ডায়েট বাবদ খাদ্য ভাতা।
- হোমে বসবাসকারী, যারা দীর্ঘকালীন সরকারি সহায়তার উপর নির্ভরশীল তাদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, যাতে পরবর্তীকালে তাদের কর্মসংস্থানের সুবিধা হয়।[2]

পুরনো অভিবাসীদের জন্য পুনর্বাসন ব্যবস্থা:

সাধারণভাবে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্র সরকার কয়েকটি স্কিম নিয়েছিলেন সেগুলি হল-

---

[2] File No:- G. P. 361.5 (5415) In 2 r, *Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal,* Ministry of Supply and Rehabilitation, Department of Rehabilitation, Govt. of India, March 1976, Appendix-iv, pp. vi-vii.

- আবাস স্কিম
- গ্রামীণ বন্দোবস্ত প্রকল্প
- ব্যবসা-বাণিজ্য স্কিম
- শিক্ষা ক্ষেত্রে স্কিম
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্কিম
- কারিগরি প্রশিক্ষণ স্কিম
- কর্মসংস্থান স্কিম (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মাঝারি শিল্প স্কিম)[3]

সারণি-২ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী পুরনো অভিবাসীদের জন্য বরাদ্দ বিভিন্ন প্রকার ঋণ ও তার শর্ত

ঋণের ধরন	ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
বাস্তু জমি ক্রয় বাবদ ঋণ	৭৫ টাকা	অকৃষিজীবি পরিবারের জন্য
গৃহ নির্মাণ ঋণ	৫০০ টাকা	
ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ	৫০০ টাকা পর্যন্ত	রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি মাসে ৫০ টাকা করে তিন মাস পর্যন্ত
কৃষি জমি ক্রয় বাবদ ঋণ	৯০০ টাকা পর্যন্ত	৩ একর বা ৯ বিঘার জন্য
কৃষি ঋণ ১.কৃষি কাজের উপকরণ বলদ ও বীজ ক্রয় বাবদ ২. পুনরুদ্ধার বাবদ ৩. রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ	৫০০ টাকা পর্যন্ত একর প্রতি ৫০ টাকা প্রতি মাসে ৫০ টাকা, ৯ মাস পর্যন্ত	
বারুজীবি ঋণ (পান চাষের জন্য) ১. চাষাবাদ বাবদ ২. রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৩. জমি ক্রয় ঋণ	৬০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি মাসে ৫০ টাকা, ৯ মাস পর্যন্ত বিঘা প্রতি ১০০ টাকা	সর্বোচ্চ ১-১/৩ বিঘা (ভালো জমি) ২ বিঘা ১০ কাঠা (অনুর্বর জমি)

[3] *Estimate Committee Reports (1959-60),* p. 19.

উদ্যান পালন ঋণ ১. উৎপাদন বাবদ (বীজ, সার ইত্যাদি) ২.মূলধন বিনিয়োগ • সেচ (নলকূপ) • বেড়া দেওয়া • চাষের উপকরণ • পুনরুদ্ধার	 ৩০০ টাকা পর্যন্ত মোট ৬০৫ টাকা ৩৭৫ টাকা ৭৫ টাকা ৮৫ টাকা ৭০ টাকা	

(File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, Appendix-v, pp.viii-ix.)

সারণি-৩ শহরাঞ্চলে বসবাসকারী পুরনো অভিবাসীদের জন্য বরাদ্দ বিভিন্ন প্রকার ঋণ ও তার শর্ত

ঋণের ধরন	ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
বাস্তু জমি ক্রয় বাবদ ঋণ	৬০০ টাকা (সংযোগকারী রাস্তা কাঁচা) ১০০০ টাকা (সংযোগকারী রাস্তা পাকা)	ক্যাম্প/হোম ও জবরদখল কলোনিগুলির জন্য প্রযোজ্য, যারা নিজের উদ্যোগে জমি অর্জন করেছিলেন
গৃহ নির্মাণ ঋণ ১. অংশীদার না হলে ২. অংশীদার হলে	 ১২৫০ টাকা পর্যন্ত + ২০০ টাকা ৫০০০ টাকা পর্যন্ত	অতিরিক্ত ২০০ টাকা শৌচালায় তৈরির জন্য
ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ	৭৫০ টাকা পর্যন্ত	
বড়ো ব্যবসার জন্য ঋণ	৫০০০ টাকা পর্যন্ত ৫০০০ টাকার বেশি	রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত কেন্দ্র সরকার দ্বারা অনুমোদিত
কৃষি ঋণ ১.কৃষি কাজের উপকরণ বলদ ও বীজ ক্রয় বাবদ ২. পুনরুদ্ধার বাবদ ৩. রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ	 ৫০০ টাকা পর্যন্ত একর প্রতি ৫০ টাকা প্রতি মাসে ৫০ টাকা, ৯ মাস পর্যন্ত	

(File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, Appendix-v, pp.ix-x.)

সারণি-৪ গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বসবাসকারী পুরনো অভিবাসীদের জন্য বিভিন্ন পেশা ক্ষেত্রে বরাদ্দ ঋণ ও তার শর্ত

পেশা	যন্ত্রপাতি বাবদ	রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ

চিকিৎসক গ্রামে এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কবিরাজি শহরে (কলকাতা) এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কবিরাজি কলকাতার বাইরে এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কবিরাজি	 ২০০০ টাকা পর্যন্ত ৫০০ টাকা পর্যন্ত ৬০০ টাকা পর্যন্ত ১০০০ টাকা পর্যন্ত ৪০০ টাকা পর্যন্ত ৪০০ টাকা পর্যন্ত ২০০০ টাকা পর্যন্ত ৮০০ টাকা পর্যন্ত ৯০০ টাকা পর্যন্ত	 প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা (প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে ৬ মাস) ঐ ঐ
আইনজীবী	৬০০ টাকা পর্যন্ত	প্রতিবছরে ১৫০০ টাকা

(File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, Appendix-v, pp.x-xi.)

সারণি-৫

যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসায় বরাদ্দ

ক্যাম্প বহির্ভূত যক্ষা আক্রান্ত উদ্বাস্তু ও তার পরিবারের জন্য বরাদ্দ

- হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য অপেক্ষারত রোগীকে মাসিক ২০ টাকা ভাতা
- হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীকে মাসিক ৫ টাকা ভাতা
- হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ ও মাসিক ২০ টাকা করে ৩ মাস পর্যন্ত ভাতা।
- হাসপাতালে ভর্তি থাকা বা ভর্তির জন্য অপেক্ষারত রোগীর ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাথাপিছু মাসিক ১৫ টাকা করে এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাথাপিছু মাসিক ১০ টাকা করে রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা।

ক্যাম্পবাসী যক্ষারোগীর জন্য বরাদ্দ: মাসিক ডায়েট ভাতা মাসিক ৫৫ টাকা।[4]

সারণি-৬ উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি বা অনুদানের ব্যবস্থা

শিক্ষার্থী	অনুদান/বৃত্তি	মন্তব্য
প্রাথমিক বিদ্যালয়	সকল উদ্বাস্তু শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠদান ৫০% উদ্বাস্তু শিক্ষার্থীদের প্রতি বছরে ৫ টাকা	যাদের অভিভাবকের মাসিক আয় ১০০ টাকার নিচে

[4] File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, Appendix-v, pp. xiii-xiv; File No:- G.P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, p. 7.

মাধ্যমিক বিদ্যালয় শ্রেণী- পঞ্চম-ষষ্ঠ সপ্তম-অষ্টম নবম-দশম	মাসিক টিউশন ফি ও বই কেনার জন্য প্রতিবছরে মাথাপিছু ২০ টাকা করে প্রতিবছরে মাথাপিছু ৩০ টাকা করে প্রতিবছরে মাথাপিছু ৪০ টাকা করে	অভিভাবকের আয় ১০০ থেকে ১২০ টাকার মধ্যে ঐ ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে
মহাবিদ্যালয়	পাঠক্রম অনুসারে ৩০ থেকে ৫০ টাকা বৃত্তি	আগের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর > ৫০%
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পাঠক্রম	পাঠক্রম অনুসারে ৩০ থেকে ৬০ টাকা বৃত্তি	
মুক ও বধির	মাথা পিছু ৩০ টাকা প্রতি মাসে	
অন্ধ	মাথা পিছু ৪০ টাকা প্রতি মাসে	স্কুল ও ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা ফি

(File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, Appendix-v, pp. xii-xiii.)

সারণি-৭ মালদা জেলায় সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনিসমূহ

গ্রামীণ			শহুরে		
কলোনির নাম	থানা	প্লট সংখ্যা	কলোনির নাম	থানা	প্লট সংখ্যা
সাহাপুর মোবারকপুর-১ মোবারকপুর-২ অমৃতি জলকরবিথান চকবাহাদুরপুর কান্দ্রান মশালদহ বাজিতপুর	সদর ঐ ঐ ইংলিশ বাজার মালদা কালিয়াচক খড়বা ঐ রতুয়া	১২০ ১২৩ ৩৮ ৫৪ ৩০০ ৪০ ৩৯ ৫৮	পিরোজপুর G.S.-I পিরোজপুর G.S-II পিরোজপুর G.S.-III মোকাতিপুর G.S. সরবারী G.S. বাচামারী G.S.	ইংলিশ বাজার ঐ ঐ কোতোয়ালি সদর ঐ	৮২ ৩০২ ১৩৮ ১০৩ ৬৭ ১৪৭

সারণি-৮ মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকার অনুমোদিত পুনর্বাসন কলোনিসমূহ

গ্রামীণ			শহুরে		
কলোনির নাম	থানা	প্লট সংখ্যা	কলোনির নাম	থানা	প্লট সংখ্যা

আয়েসবাগ	মুর্শিদাবাদ	৫৬	বিষ্ণুপুর G.S.	বহরমপুর	১২৫
শিবপুর	বহরমপুর	১৫	মধুপুর G.S.	ঐ	১৬২
বাইরগাছি-১	ঐ	৫০	বড়ুয়া সরুলিয়া G.S.-I	বেলডাঙা	
বাইরগাছি-২	ঐ	৩৪	বড়ুয়া সরুলিয়া G.S.-II	ঐ	৩৩৬
বাইরগাছি-৩	ঐ	৩৬৩	কুর্মিতলা G.S.	লালবাগ	৩১৫
কুলবেড়িয়া	ঐ	২১৩	বাগদাহার G.S.	জিয়াগঞ্জ	
গোয়ালজান	ঐ	৫৩২	রঘুনাথগঞ্জ G.S.	রঘুনাথগঞ্জ	৩৯
চালতিয়া	ঐ	৪৯			
হাতিনগর	ঐ	১৩৩			
মুক্তিনগর	ঐ	১৮			
বানজেটিয়া-১	ঐ				
বানজেটিয়া-২	ঐ	১২৫			
মধুপুর জি.এস.	ঐ				
মধুপুর-২	নওদা	৬১			
আমাইপাড়া	জিয়াগঞ্জ	৯৪			
বাগদাহার	ঐ	২৬১			
মহালন্দী	কান্দি	৭১			
পুরোপাড়া	সুতি	১৯			

(*Manual of Refugee Relief and Rehabilitation,* p. 55 & 60.)

সারণি-৯ মালদা জেলায় ৬০৭ গ্রুপ জবরদখল কলোনিসমূহ

ক্রম	উদ্বাস্তু কলোনি	থানা	উদ্বাস্তু পরিবার সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	গ্রাম/শহর	জমির ধরন
১	মঙ্গলবাড়ি কলোনি	মালদা	৬০	৪.০০	গ্রাম	খাস জমি
২	খাইহাটা কলোনি	ঐ	৩৩	২.২০	ঐ	ঐ
৩	গান্ধী কলোনি	ঐ	৬৯	৫.০০	ঐ	ঐ
৪	খানপুর কলোনি	ঐ	৩৫	১.৩২	ঐ	ঐ
৫	বাগলবাগি কলোনি	ঐ	৮৫	৭.২০	ঐ	ঐ
৬	চরলক্ষ্মীপুর কলোনি	ঐ	১০১	২৮.০৫	ঐ	উঃপূঃ রেল জমি
৭	ফুলডাঙ্গা কলোনি	ঐ	২৫	১.২৫	ঐ	প্রাইভেট জমি
৮	ডাল্লা কলোনি	হাবিবপুর	৫৩৯	৭৬৪.৬৭	ঐ	খাস জমি

৯	পার্বতীডাঙ্গা কলোনি	ঐ	২৪৮	২৭০.২৫	ঐ	ঐ
১০	আগ্রা কলোনি	ঐ	৭৯	১৮৪.৮৮	ঐ	ঐ
১১	তেলনাই কলোনি	ঐ	৮৯	১৭৬.৪৩	ঐ	ঐ
১২	হরিশ্চন্দ্রপুর ও আরাগাছি কলোনি	ঐ	১৪৯	৩৫৫.৬৮	ঐ	ঐ
১৩	নন্দনগর ও পাওলি কলোনি	ঐ	৪৫	৭৬.২৬	ঐ	ঐ
১৪	পাথর শাসুলি কলোনি	ঐ	৬২	১০৯.৯৯	ঐ	ঐ
১৫	ধরন্দা ও যুগী-পাথর কলোনি	ঐ	২৫	১৩.০০	ঐ	ঐ
১৬	কুচিয়ামোর কলোনি	ঐ	৭৭	১২৮.০০	ঐ	ঐ
১৭	ছাইটাঙ্গাছি মধ্যম কেন্দুয়া (ডায়েরি ফার্ম) কলোনি	ঐ	১১৪	৯.৫০	ঐ	ঐ
১৮	বুলবুলচন্ডি রাইস মিল (কেন্দুয়া) কলোনি	ঐ	১১৭	১০৮.০০	ঐ	ঐ
১৯	জয়দেবপুর কলোনি	ঐ	২৫	২.০০	ঐ	ঐ
২০	কেন্দুয়া কলোনি	ঐ	১০০	১৫.২৪	ঐ	উঃপূঃ রেল জমি
২১	বক্সিনগর কলোনি	ঐ	৭৩	৩.৭০	ঐ	ঐ
২২	ভাঙ্গাটোলা কলোনি	কালিয়াচক	২৫০	৬৬	ঐ	ঐ
২৩	দিগলবাড়ি কলোনি	বামনগোলা	৫২	৫.৩৩	ঐ	খাস জমি
২৪	বারোয়াডাঙ্গা কলোনি	ঐ	৮৫	৪.৩৯	ঐ	ঐ
২৫	উত্তর মহিমনগর ও কাঞ্চন নগর কলোনি	গাজোল	৪৬	২.৩০	ঐ	ঐ
২৮	গোবিন্দপুর কলোনি	ঐ	২৮	২.০০	ঐ	ঐ
২৭	দুবা খোকসান কলোনি	ঐ	৬০	৫.০০	ঐ	ঐ
২৮	কদুবাড়ি কলোনি	ঐ	৭০	৬.০০	ঐ	ঐ
২৯	চন্দ্রাইল কলোনি	ঐ	২৫	৪.২০	ঐ	ঐ
৩০	বোলবাড়ি কলোনি	ঐ	২৫	৩.৮৮	ঐ	ঐ
৩১	কুতুবসাহার-গোলঘর কলোনি	ঐ	১৪০	২৭.০০	ঐ	ঐ

৩২	ঘাসনি বাগ কলোনি	ঐ	১১১	১০.০০	ঐ	ঐ
৩৩	কুতুবসাহার কলোনি	ঐ	৫৬	৫.০০	ঐ	ঐ
৩৪	চিনি দানা কলোনি	ঐ	৩৮	৬.০০	ঐ	প্রাইভেট জমি
৩৫	বিলবাড়ি-নাজির খানি কলোনি	ইংলিশ বাজার	৩৭	৩.০০	ঐ	ঐ
৩৬	বুড়াবুড়িতলা কৃষ্ণপল্লী কলোনি	ঐ	২৬৩	১১.৩৪	শহর	ঐ
৩৭	পশ্চিম সর্বমঙ্গলা পল্লী কলোনি	ঐ	২৫	১.৫০	ঐ	বিমান বিভাগ, ভারত সরকার
৩৮	আদিনা কলোনি	গাজোল	২৭৯	২৫.০০	ঐ	খাস জমি

(*Manual of Refugee Relief and Rehabilitation,* pp. 92-94)

সারণি-১০ মুর্শিদাবাদ জেলায় ৬০৭ গ্রুপ জবরদখল কলোনিসমূহ।

ক্রম	উদ্বাস্তু কলোনি	থানা	উদ্বাস্তু পরিবার সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	গ্রাম/শহর	জমির ধরন
১	বিবেকানন্দ কলোনি	মুর্শিদাবাদ	৩১	৪.৫২	গ্রাম	প্রাইভেট জমি
২	বিধাননগর কলোনি	ঐ	১৩১	২৩৩	ঐ	ভেস্টেড
৩	সুভাষ কলোনি	ঐ	৫৪	৮.৫৪	ঐ	ঐ
৪	ইছাগঞ্জ গঙ্গাধর জবরদখল কলোনি	ঐ	২৫	০.৬৬	ঐ	ঐ
৫	পার্শপুর লেনিন কলোনি	জলঙ্গি	৮০	২৮	ঐ	ঐ
৬	সূর্যনগর কলোনি	ঐ	৯০	৬৬.৬৬	ঐ	ঐ
৭	নয়াপল্লী	ঐ	১৫	৫০	ঐ	ঐ
৮	সিংহ পাড়া কলোনি	রানীনগর	৬৪	২.২৪	ঐ	ঐ
৯	রামেশ্বরপুর মল্লিক পাড়া কলোনি	দৌলতাবাদ	২৭	২	ঐ	ঐ
১০	সেকেন্দি পাহাড় কলোনি	জিয়াগঞ্জ	২১	৪.৫০	ঐ	ঐ
১১	বাবলাবনা কলোনি	ঐ	৬৪	১০	ঐ	ঐ
১২	কুসুমখোলা কলোনি	ঐ	১০১	২৫.৪২	ঐ	প্রাইভেট জমি

১৩	বারোদুয়ারি এবং বারোদুয়ারি-নতুনপাড়া কলোনি	ঐ	৫৫	৭.৩৬	শহর	ঐ

(*Manual of Refugee Relief and Rehabilitation,* p. 76)

সারণি-১১ মালদা জেলায় সরকার অনুমোদিত জবরদখল কলোনিসমূহ

থানা-হবিবপুর	৩৪. ইট বাঁধা	৬৯. কৃষ্ণনগর	১০২. হাঁসপুকুর (এগ্রিঃ)
১. রামকৃষ্ণপুর (এগ্রিঃ)	৩৫. চম্পা দিঘি	৭০. পিরোল তোলা	১০৩. আসাম পাড়া (এগ্রিঃ)
২. জগন্নাথপুর (এগ্রিঃ)	৩৬. রসিকপুর (এগ্রিঃ)	৭১. ইমাম নগর	১০৪. খুটা দহ (এগ্রিঃ)
৩. হরিশ্চন্দ্রপুর (এগ্রিঃ)	৩৭. দুর্গাপুর	৭২. বাদডাঙা	১০৫. তুলা ভিটা
৪. রাধাকান্তপুর (এগ্রিঃ)	৩৮. দাসনগর	৭৩. শান্তিনগর	১০৬. বড় ভিটা (এগ্রিঃ)
৫. গোপীনাথপুর	৩৯. নীলনগর	৭৪. মহিষাল	১০৭. ডোবা ডাঙা
৬. কালীতলা	৪০. কালীনগর	৭৫. হাটনগর	১০৮. সোনঘাট (এগ্রিঃ)
৮. কালীপুকুর	৪১. কাঞ্চননগর	৭৬. শ্রীরামপুর	১০৯. তালতলা (এগ্রিঃ)
৯. কালীপুকুর-২	৪২. বাঁচাহার	৭৭. নরসিংহ ডাঙা	১১০. ঢাকা পাড়া
১০. টিলাসান (এগ্রিঃ)	৪৩. লক্ষ্মীনারায়ণপুর	৭৮. গৌরাঙ্গপুর	১১১. শ্রীবিষ্ণুপুর
১১. দোলমালপুর	৪৪. ভাগন কলোনি	৭৯. সুলাই ডাঙা	১১২. ভুলকিমারী (এগ্রিঃ)
১২. চাঁদপুর	৪৫. আকুণ্ড	৮০. নয়া পাড়া	**থানা-মালদা**
১৩. দক্ষিণ চাঁদপুর	৪৬. আনন্দপল্লী	৮১. খানাকোলা	১১৩. মহানন্দা কলোনি
১৪. পাতিলগড়	৪৭. জীগিন	৮২. সূর্যনগর	১১৪. ছাতিয়ান মোর
১৫. রণজিৎপুর	৪৮. মশালদিঘি	৮৩. বয়ারডাঙি	১১৫. গান্ধী কলোনি
১৬. অনুরাধাপুর	৪৯. দেবীদহ	**থানা-বামনগোলা**	১১৬. নবাবগঞ্জ রিফিউজি পাড়া
১৭. কলাইবাড়ি	৫০. কাশিমপুর	৮৪. তালভিটা (এগ্রিঃ)	১১৭. সাহাপুর রিফিউজি পাড়া
১৮. তেঘরিয়া	৫১. মাধাগাসোল ভেস্ট পাড়া	৮৫. বাট্রোলি	১১৮. কোর্ট স্টেশন বাকচা
১৯. কোতলপুর (এগ্রিঃ)	৫২. জলসা খাসপাড়া	৮৬. রাঙামাটি	১১৯. চার লক্ষ্মীপুর সারদা পল্লী
২০. হরিপুর	৫৩. ছোট জলসা	৮৭. কুপাদহ	১২০. দেবীপুর
২১. আইহো ফিল্ড পাড়া	৫৪. আকালপুর	৮৮. ডাকাতপুকুর	১২১. মঙ্গলবাড়ি রিফিউজি পাড়া
২২. সোনাবাঁধ	৫৫. আরাজি জলসা (এগ্রিঃ)	৮৯. কাটুয়াডাঙা	**থানা-কালিয়াচক**
২৩. ঠাকুরনগর	৫৬. বাবলা বোনা	৯০. জামডাঙা	১২২. ধুলিয়ানচর ১নং (এগ্রিঃ)
২৪. ঝিনঝিনি পুকুর	৫৭. চিটু পল্লী	৯১. দামুর	১২৩. ধুলিয়ানচর ২নং (এগ্রিঃ)
২৫. বুলবুলচণ্ডী স্টেশন	৫৮. রংগ ভিটা	৯২. নিমডাঙা	১২৪. ধুলিয়ানচর ৩নং (এগ্রিঃ)
২৬. ছাতা কলোনি	৫৯. শংকরপুর	৯৩. বামনগোলা উত্তরপাড়া	১২৫. ধুলিয়ানচর ৪নং (এগ্রিঃ)
২৭. পুকুর পাড়	৬০. সরসা ডুবি	৯৪. বামনগোলা দক্ষিণপাড়া	১২৬. ভাঙ্গাতোল্লা
২৮. কুলাডাঙা	৬১. পোলাডাঙা	৯৫. নলগোলা পূর্ব পাড়া	**থানা-ইংলিশবাজার**
থানা-গাজোল	৬৩. বাণীওয়াল	৯৬. নলগোলা পশ্চিম পাড়া	১২৭. পুরাতুলি হাতলপাড়া
২৯. শ্রীকৃষ্ণপুর (এগ্রিঃ)	৬৪. সিটকা মহল	৯৭. তেলচিটকা	১২৮. বুড়াবুড়িতলা
৩০. মুরিয়া কুণ্ডু (এগ্রিঃ)	৬৫. আদিনা রিফিউজি পাড়া	৯৮. রাখালপুকুর (এগ্রিঃ)	
৩১. জোড়গাছি	৬৬. ছয় ঘাটি	৯৯. পাকুয়া খাস পড়া	
৩২. রানীপুর	৬৭. তুলসীডাঙ্গা	১০০. আধা ডাঙা (এগ্রিঃ)	

৩৩. পাবনা পাড়া	৬৮. বুড়িদহ (এগ্রিঃ)	১০১. নন্দিনী দহ (এগ্রিঃ)	

(প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, *প্রান্তিক মানব,* পৃ.২৪৪-২৪৬)

সারণি-১২ মালদা জেলার প্রাইভেট কলোনিসমূহ

১. আশরাফপুর	৮. ভুসাডাঙ্গা	১৫. কূপাদহ	২২. গাজিয়াপাড়া	২৯. কাগাসুরা	৩৬. মাহিনগর
২. পার্বতীডাঙ্গা	৯. নীল নগর	১৬. সাপমারি	২৩. গান্ধীনগর	৩০. মশালদিঘি	৩৭. চৈতনমোড়
৩. ডাল্লা	১০. বাচাহার	১৭. শোনঘাট	২৪. নতুন হুযীপুর	৩১. অহোরাবান্দ	৩৮. সুকদেবপুর
৪. মাইভিটা	১১. বুড়ি দহ	১৮. হাসপুকুর	২৫. সিরশি	৩২. কালিনগর	৩৯. সাসহিলাপুর
৫. তিলাসন	১২. কুতুব শহর	১৯. ছোটপাথারী	২৬. বাবলাবন	৩৩. নীলনগর	৪০. নন্দিনাদহ
৬. আড়াগাছি	১৩. আদিনা	২০. রাখালপুকুর	২৭. বাইরাগাছি	৩৪. উপদলবিল	৪১. আহিল
৭. তেলনাই	১৪. বুনাইডাঙ্গা	২১. পারহবিনগর	২৮. বানিয়াল	৩৫. ইট বান্ধা	৪২. ইমামনগর

(*Manual of Refugee Relief and Rehabilitation,* pp.297-298)

সারণি-১৩ মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাইভেট কলোনিসমূহ

১.হাফিনা ইন্দ্রনগর	৬.লক্ষীনারায়ণ-১	১১.হরিদাসমাটি প্রাইভেট
২.সবজি কাটরা প্রাইভেট	৭.লক্ষী নারায়ণ-২	১২.কৃষ্ণমাটি
৩.শ্রীকৃষ্ণপুর	৮.বরিশাল (নবনগর), বহরমপুর	১৩.গোয়ালজান
৪.সাবিত্রীনগর	৯.গিরিজাপাড়া	১৪.মনিন্দ্র নগর
৫.আমতলা ভরামারা	১০.কুমার দুর্গানাথ	১৫.দহপাড়

(*Manual of Refugee Relief and Rehabilitation*, p. 300)

সারণি-১৪ বিভিন্ন কলোনিগুলির জমি অধিগ্রহন ও উন্নয়ন বাবদ প্রদেয়

১. **জমি অধিগ্রহণ বাবদ**		
অ. সরকার অনুমোদিত কলোনি		
গ্রামীণ/ পৌর	পরিমাণ	সর্বোচ্চ সীমা
গ্রামীণ কৃষি জমি বাস্তু জমি (10 কাঠা পর্যন্ত) **পৌর** বাস্তু জমি	৯০০ টাকা, পরিবার পিছু ৩ একর) ৭৫ টাকা ১২০০ টাকা/ ৫কাঠা	১০০/- থেকে বেড়ে ৪০০/- (প্রতি বিঘা) ১৬/০৩/১৯৬৫ ৭৫/- থেকে বেড়ে ২০০/- ১৩/০৪/১৯৬৬ * ১৬০০/- ১৩/০৪/১৯৬৬, ১৮০০/- ৩০/০৫/১৯৬৮ *
আ. জবরদখল কলোনি: নিয়মিত করনের জন্য ১৮৭৫টাকা		
২. **উন্নয়ন বাবদ** (সরকার অনুমোদিত কলোনি ও জবরদখল কলোনি)		
গ্রামীণ/ পৌর	পরিমাণ	সর্বোচ্চ সীমা ১৩/০৪/১৯৬৬ ও ২৭/০৩/৭৩ এ

গ্রামীণ	৭০০ টাকা	৪৫০/- থেকে বেড়ে ৫০০/- ও ৭০০/-
পৌর	২২৪০ টাকা	১২৫০/- থেকে বেড়ে ১৬০০/- ও ২২৪০/-

*পি এল হোম পরিবারের জন্য (File No:- G.P. 361.5 (5415) In 2 r, Appendix-v, pp. xii-xiii.)

সারণি-১৫ উন্নতির কাজের ভিত্তিতে মালদা ও মুর্শিদাবাদের কলোনিসমূহ

জেলা	সরকার অনুমোদিত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কলোনির সংখ্যা			
	উন্নতির কাজ শেষ হয়েছে		অনুন্নত	
	গ্রামীন	পৌর	গ্রামীন	পৌর
মালদা	-	-	**৯টিঃ-** সাহাপুর, অমৃতি, মোবারকপুর-১, মোবারকপুর-২, জলকরবিথান, চকবাহাদুরপুর, কান্দ্রান, বাজিতপুর, মশালদহ।	**৬টিঃ-** পিরোজপুর-১, পিরোজপুর-২, পিরোজপুর-৩, মোকাতিপুর, সরবারী, বাচামারী।
মুর্শিদাবাদ	**২টিঃ-** বাইরাগাছি-৩, চালতিয়া	**১টিঃ-** রঘুনাথগঞ্জ	**১৮টিঃ-** মধুপুর-২, হাতিনগর, মুক্তিনগর, বানজেটিয়া-১, বানজেটিয়া-২, শিবপুর, বাইরগাছি-১, বাইরগাছি-২, কুলবেড়িয়া, গোয়ালজান, আয়েসবাগ, আমাইপাড়া, বাগদাহার, মহালন্দী, পুরোপাড়া, ধুসুড়ি পাড়া, খিদিরপুর, মাদাপুর।	**৪টিঃ-** বিষ্ণুপুর, মধুপুর, বড়ুয়া সরুলিয়া, কুর্মিতলা

(*Manual of Refugee Relief and Rehabilitation,* pp. 263-78.)

সারণি-১৬

রিসেপশন সেন্টারে যে ত্রাণ প্রদান করা হত; দৈনিক বরাদ্দ ছিল:

ভাতা: মাথাপিছু ০.৫০ টাকা করে, টাকায় অথবা জিনিসে।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস: ব্যক্তি পিছু দৈনিক ত্রাণ

ত্রাণ সামগ্রী	**প্রাপ্তবয়স্ক**	**অপ্রাপ্তবয়স্ক**
চাল বা আটা	২৮৬ গ্রাম	৮ বছরের নিচে অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বরাদ্দ সামগ্রীর অর্ধেক পরিমাণ বরাদ্দ ছিল
ডাল	৮০ গ্রাম	
চিড়ে	৬০ গ্রাম	
গুড়	২০ গ্রাম	
নুন	২০ গ্রাম	
চিনি	৬০ গ্রাম, শুধুমাত্র অসুস্থদের জন্য	

প্রত্যেক পরিবারকে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো দেওয়া হত।

পোশাক বাবদ: ৮ বছরের উর্ধ্বে প্রত্যেক সদস্যের জন্য ১৬ টাকা এবং ৮ বছরের নিচে প্রত্যেক সদস্যের জন্য মাথাপিছু ৮ টাকা।

- প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য ১ জোড়া ধুতি।
- প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের জন্য ১ জোড়া শাড়ি।
- বাচ্চা ছেলেদের জন্য ১ জোড়া শার্ট এবং প্যান্ট।
- বাচ্চা মেয়েদের জন্য ১ জোড়া প্যান্ট এবং ফ্রক।

শীতবস্ত্র: মাথা পিছু ১টি করে উলের কম্বল, পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ৩টি।

বাসনপত্র:

- মগ-১টা
- মাদুর- ২টো
- কড়াই- ১টা
- থালা- ১টা (মাথা পিছু)
- গ্লাস- ১টা (মাথা পিছু)
- ঝুড়ি- ১টা

যাত্রাকালীন ভাতা: পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ত্রাণ শিবির বা ট্রানজিট সেন্টারগুলিতে যাবার জন্য যাত্রা শুরুর কালে শরণার্থীদের ১০ দিনের অগ্রিম নগদ ডোল ও যাত্রাকালীন ভাতা দেওয়া হত। এছাড়া যাত্রাকালে খাওয়া-দাওয়ার খরচ নির্বাহের জন্য নগদ ভাতা দেওয়া হত। আট বছরের উর্ধ্বে সদস্যদের জন্য মাথাপিছু দৈনিক ২ টাকা এবং আট বছরের নিচে সদস্যদের জন্য মাথাপিছু দৈনিক ১.৩০ টাকা।

রেলওয়ে ওয়ারেন্ট: পশ্চিমবঙ্গ থেকে গন্তব্যস্থলের জন্য তৃতীয় শ্রেণির রেলওয়ে ওয়ারেন্ট দেওয়া হত।[5]

সারণি-১৭

ট্রানজিট সেন্টারগুলিতে যে ত্রাণ প্রদান করা হত:

নগদ ডোল: পরিবারের সদস্যসংখ্যা অনুসারে প্রতিমাসে তিন কিস্তিতে সর্বনিম্ন ৩০ থেকে সর্বোচ্চ ৭০ টাকা পর্যন্ত।[6]

পোশাক বাবদ: ৮ বছরের উর্ধ্বে প্রত্যেক সদস্যের জন্য ১৬ টাকা এবং ৮ বছরের নিচে প্রত্যেক সদস্যের জন্য মাথাপিছু ৮ টাকা।

শীত বস্ত্র: প্রচন্ড শীতল এলাকার ক্ষেত্রে ১২ বছরের বাচ্চাদের এক-তৃতীয়াংশ দামে, উলের জামা স্বামীহীন মহিলাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে শীত বস্ত্র দেওয়া হত।

---

[5] *Estimate Committee Reports (1964-65),* pp. 15-16.

[6] Ibid, p. 68.

কম্বল: মাথা পিছু ১টি করে উলের কম্বল পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ৩টি।

সৎকার ও শ্রাদ্ধকার্যে অনুদান: প্রতি মৃত ব্যক্তি পিছু ৩০ টাকা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: বাসনপত্র, বিছানাপত্র, লণ্ঠন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ১৫ টাকা।

দুধ: দুর্বল ও অসুস্থ মহিলা ও বাচ্চা শরণার্থীদের জন্য পাউডার দুধ।

চিকিৎসা এবং শিক্ষা পরিষেবা: ক্যাম্পবাসীদের জন্য চিকিৎসা এবং শিক্ষা পরিষেবা প্রদান করা হত।

বিবাহর জন্য অনুদান: অবিবাহিত কন্যার বিবাহ ও বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য ২০০ টাকা করে

অন্যান্য অনুদান: শারীরিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের খরচ নির্বাহের জন্য পরিবার পিছু বাৎসরিক এক টাকা। এগুলি ছাড়াও ট্রানজিট সেন্টারগুলিতে জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ-এর ব্যবস্থা ও চিকিৎসা পরিষেবা ছিল।[7]

সারনিঃ- ১৮

লোনগুলি হল-

শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ—২,৩০,৭২৫ টাকা

গ্রামাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ—১৫,৪০,২৭৭ টাকা

শহরাঞ্চলে ব্যবসার জন্য ঋণ—৪৮,৬০০ টাকা

গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ঋণ—২৩,৭৫০ টাকা

কৃষি ক্ষেত্রে ঋণ—৮,৬৪,০৩৫ টাকা

শহরাঞ্চলে কারিগরি শিল্পে ঋণ—৭০০ টাকা

গ্রামাঞ্চলে কারিগরি শিল্পে ঋণ—৮,৩০০ টাকা

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঋণ—১,৩০০ টাকা

বর্গাদার স্কিমে বরাদ্দ-

রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান—১৫,০৫,১৪৭ টাকা

গবাদি পশু ক্রয় ও পালন—৬,৮৮,৬২১ টাকা

কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি—১,০৪,৯১৯ টাকা

চাষের জন্য বীজ ও সার ক্রয়—২,৪৫,০০০ টাকা

নৌকা তৈরি—৪৯,৩৯০ টাকা কুটির তৈরি—৫৫,৩৮১ টাকা

জল সরবরাহের জন্য ব্যয়-৪২,৮৭৪ টাকা

রেশম চাষ প্রশিক্ষণ স্কিমে বরাদ্দ-

শিক্ষানবিশের ভাতা/স্টাইপেন্ড—১৮,১০৫ টাকা

যন্ত্রপাতি ক্রয়—২৮,৩৭৮ টাকা

ইউনিয়ন বোর্ড স্কিমের রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান—৪,৬৬,০২১ টাকা

ক্যাশ ডোল—৯,০২০ টাকা।[8]

---

[7] Ibid, pp. 18-19 & 24-26.

সারণিঃ- ১৯

জঙ্গিপুর সাবডিভিসনের রিলিফ কার্যের বিবরণ

টি, আর:- এই মহকুমার পাঁচটি থানার মধ্যে রাস্তা, খাল, পুকুর, জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি ১৫৭টা কার্য করা হয়েছিল। এই কার্যে ৫৬৬১০৭ জন মজুর নিয়োগ করা হয়েছিল এবং ৬৭১৮৫৮৫ নয়া পয়সা ও ৩০৪০৪ মণ গম খরচ করা হয়েছিল।

জি, আর:- এই বৎসর ২৫৯৮২ জন লোককে (১৮ জন অপ্রাপ্তবয়স্কসহ) ৪৪,৩৬৩ টাকা এবং ৪৫৭৪ মণ গম দানস্বরূপ বিতরণ করা হয়েছিল।

এম, আর:- এই মহকুমায় এ বৎসর সরকারী ধার্য্যমূল্যে খাদ্য বিতরণের জন্য মোট ১৮৫টা রেশনের দোকান খোলা হয়েছিল।

অন্যান্য রিলিফ কার্য্যের বিবরণ

১। লোন মঞ্জুর	বিতরণ
এগ্রি লোন—	৬,১৫০০০
সি, পি, লোন—	৩৮০০০
আরটিসান লোন —	১৬০০০
ফারটিলাইজার লোন —	৫০০০০
২। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য	
চাউল -	৪৭ বস্তা
গম –	৫০ বস্তা
ভূট্টা –	৫০ বস্তা
ধুতী -	১২১১ টি
শাড়ী -	১২২৫ টি
জামা -	১১৮৫ টি
কম্বল -	৫২৫ টি

রেডক্রস সাহায্য:- গুঁড়া দুধ ৮২৫.৫ পাউণ্ড, বাটার অয়েল ৮২৫ পাউণ্ড, বার্লি ৬ পাউণ্ড। তাছাড়া কাপড় ও বাসনপত্র প্রভৃতি ১৩৩ জন নাবালকসহ মোট ৫৪৩৪ জন লোকের মধ্যে ১৯৫৯ সালের ১৫-ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১৬,৭১৬, টাকা সাহয্যকল্পে দান করা হইয়াছে এবং ৬টা টি.আর. কার্য আরম্ভ করা হয়েছিল। পুন:- মহকুমা শাসক, সার্কেল অফিসার ও রেডক্রস সম্পাদকের পক্ষ থেকে সীমানা ধার্য্যের দরুণ উদ্বাস্তুদের সাহায্য মিল্ক পাউডার ১০ কেস, চাদর ১০ টি, ধুতী ১০ টি, শাড়ী ৬ টি, বিতরণ করা হয়েছিল। এছাড়াও জনসাধারণ-কর্তৃক উদ্বাস্তুদের সময়োপযোগী সাহায্য চাল, কলাই ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে।[9]

---

[8] *Malda Census-1951,* p. Ixxviii.

[9] *জঙ্গিপুর সংবাদ,* ২৫-ই মার্চ ১৯৫৯।

উপাদান

ক) প্রাথমিক সুত্র

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা প্রকাশিত রিপোর্টঃ

File No: E/0 320.954 B 436 b, *Boundary demarcation, Bengal/1947/,* National Library. Kolkata.

File No: G. P. 309/15415, *Report on Displaced Persons Migrating from East Pakistan to West Bengal.*

File No:- G. P. 336.54, *Reception, Dispersal and Rehabilitation of New Migrants Arriving in India from East Pakistan*, 1964.

File No:- G. P. 361. 5 (1) (5415) w 52 mi, *The Live Again: Millions Came from Eastern Pakistan*, Govt. of West Bengal, 1954.

File No:- G. P. 361. 5 (1) (5415), *Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal,* Govt. of West Bengal, 1957,

File No:- G. P. 361.5 (5415) 083 w 52, *Rehabilitation of Refugee, A Statistical Survey-1955,* (Alipore, West Bengal Govt. Press, 1955).

File No:- G. P. 361.5 (5415) In 2 r, *Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal,* Ministry of Supply and Rehabilitation, Department of Rehabilitation, Govt. of India, March 1976.

File No:- G. P. 361.5 (5415) In 2, *Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal,* Ministry of Supply and Rehabilitation (New Delhi: Department of Rehabilitation, 1974).

File No:- G. P. 361.5 /1/ (5415) w 52 red, *Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal,* Refugee Relief and Rehabilitation Department, August 1956, Govt. of West Bengal.

File Nos G. P. 361. 5 (1) (5415) In 2 rp. *Purba Pakistaner Bastuhara, Punorbasoner Panch Bachar,* Ministry of Information and Broadcasting, 1952-56.

Agreement Between The Govt.s of India and Pakistan Regarding Seurity and Rights of Mimorities (Nehru Liaquat Agreement), New Delhi, 8 April 1950.

Carter, M. O., *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Malda, 1928-1935,* Bengal Govt. Press, Alipore.

Estimate Committee Reports (1959-60), 2nd Lok Sabha, Ministry of Rehabilitation, New Delhi.

Estimate Committee Reports (1964-65), 3rd Lok Sabha, Ministry of Rehabilitation, Govt. of India, New Delhi.

Hunter, W. W., *A Statistical Account of Bengal*, Vol-VII & IX, 1876.

Major, Andrew J., 'The chief Sufferers': Abduction of women during the Partition of Punjab, *South Asia, Vol. XVIII*, Special Issue, (1995).

Manual of Refugee Relief and Rehabilitation, vol-1, (Kolkata: Govt. of West Bengal, 2001).

Millions on The Move, The Aftermath of the Partition, Ministry of Information and Broadcasting.

Parhamentary Debates (Lok Sabha and Rajya Sabha Debates).

Partition Horrors Remembrance Day, Government of India, 14 August 2021.

Partittion Proceedings, vol-vi.

Pran Nath Luthra, *Rehabilitation,* (Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India: New Delhi, 1972).

Rao, U Bhaskar, *The Story of Rehabilitation*, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1967.

Rehabilitation of Camp Refugees, Dr. B.C.Roy, Chief Minister, West Bengal, October, 1958.

Report of Conch-Shell Industry A Type-Study, Govt. of West Bengal Press, Alipore, 1963.

Report of State Statistical Bureau (West Bengal), 1951.

Report of the Committee of Ministers for the Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal, Govt. of India Press, Calcutta.

Reports of International Arbital Awards on Boundary disputes between India and Pakistan relating to the interpretation of the report of the Bengal Boundary Commission, Vol-XXI, United Nations, 26 January 1950.

Reports of the Bengal and Punjab Boundary Commission (Radcliffe Award), Government of India, New Delhi, 1958.

Statistical Information on the influx of Refugees into India and their Repatriation to Bangladesh till 31st December 1971, Ministry of Labour and Rehabilitation, Govt. of India.

Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, UNHCR.

The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol-88, The Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, New Delhi.

The Mountbatten Viceroyalty Announcement and Reception of the 3 June Plan 31 May-7 July 1047, in N. Mansergh and P. Moon (eds.), *Constitutional Relations between Britain and India: The Transfer of Power 1942-7,* Vol-XI, London.

The Mountbatten Viceroyalty Formulation of a Plan, 22 March-30 May 1947, in N. Mansergh and P. Moon (eds.*), Constitutional Relations between Britain and India: The Transfer of Power 1942-7,* Vol-X, London, 1983.

The Mountbatten Viceroyalty Prines, Partition and Independence 8 July-15 August 1947 in N.Mansergh and P.Moon (eds.), *Constitutional Relations between Britain and India: The Transfer of Power 1942-7,* Vol-Xii, London, 1983.

The Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land Act, 1951, West Bengal Act XVI of 1951, Govt. of West Bengal.

West Bengal Legislative Assembly Proceedings.

সরকারি মহাফেজখানাঃ

Home Political CR, 155/50 May 1950, B279-327, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, 1950, 224-225, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, 1B-105/59, B. JULY 1961 203-220, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, 1B-3/51 PTI, B. AUG 1953 57-73, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, 2B - 24/56 B. JUNE 1957 52-57, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, 2B - 31/55 B. Nov 1956 1-3, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, 2B - 4/56 B. DEC 195 92-98, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, 2B - 5/521 B. AUG 1954 666-674, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, B Dec. 1950, 602-622, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, B Jan 1952, 93 = 149 West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, B May 1950, 249-272, West Bengal Stat Archive, Kolkata.

Home Political CR, IB - 234/58 B. FEB 1960 129-145, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, IDM 1192/49 Dec. 1950, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, IDM 1192/49 Dec. 1950, West Bengal State Archive, Kolkata.

Home Political CR, March 1954, 495-506, West Bengal State Archive, Kolkata.

গেজেটিয়ারঃ

Bhattacharya, Birendra Kumar, *West Bengal District Gazetteers: Murshidabad*, (Calcutta: Govt. of west Bengal, March 1979).

Sengupta, Jatindra Chandra, *West Bengal District Gazetteers: Malda Gazetteer*, (Calcutta, December 1969).

মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার-২০০৩, উচ্চশিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জেলাশাসক ও সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ, ২০০৩।

আদমশুমারি রিপোর্টঃ

Census of India 1951, vol-vi, West Bengal, Sikkim and Chandenagore, Part-1A Report.

Census of India 1961, West Bengal & Sikkim, Part-II-C(iii).

Census of India 1971, Series-18, West Bengal, Paper-1.

Census of India 1971, Serles-22, West Bengal, Part-11-D(i).

West Bengal and Sikkim, Vol-xvi, Part-II-C(ii), *Census-1961*

West Bengal District Handbook, *Malda, Census-1951.*

West Bengal District Handbook, *Malda, Census-1961.*

West Bengal District Handbook, *Malda, Census-1971.*

West Bengal District Handbook, *Murshidabad, Census-1951.*

West Bengal District Handbook*, Murshidabad, Census-1951.*

West Bengal District Handbook, *Murshidabad, Census-1961.*

West Bengal District Handbook, *Murshidabad, Census-1971.*

West Bengal, *Census-1951.*

West Bengal, *Census-1961.*

West Bengal, *Census-1971.*

West Bengal, Part-II-D (1), Migration tables, *Census-1971.*

খ) সংবাদ পত্র

বাংলাঃ

আজাদ প্রত্রিকা।

আনন্দবাজার পত্রিকা।

ইংরেজি।

গণশক্তি।

গৌড়দূত।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

দৈনিক বসুমতি পত্রিকা।

পল্লী রান্ধব প্রত্রিকা

যুগান্তর পত্রিকা।

স্বাধীনতা পত্রিকা।

Jai Hind.

The Hindustan Times.

The Tribune.

গ) সাক্ষাৎকারের নমুনা

সাক্ষাৎকারঃ- অজিত হালদার, বয়স-৫৮ পেশা-গ্রন্থাগারিক, ধূসড়িপাড়া কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখ:- ২১/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- অভিমুন্য টিকাদার, বয়স-৮১, পেশা-কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ১৪/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- কমল হালদার, বয়স-৭১, পেশা- জেলে, ধুসরিপাড়া কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তাঃ-২১/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- কালোন সরকার, বয়স-৬৭, পেশা- গৃহিণী, মালদা, তারিখঃ-১৫/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- চিত্ত বিশ্বাস, বয়স-৬৭, পেশা- কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ১৫/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, বয়স-৭৩, পেশা- উদ্বাস্তু ক্যাম্পে একজন সক্রিয়কর্মী ছিলেন (বর্তমানে মাস্টার নামে পরিচিত), মালদা, তারিখঃ- ১৫/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- জগবন্ধু বালা, বয়স- ৮৩, কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ১৫/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ তরুণ কুমার ভাওয়াল, বয়স-৬৩, পেশা-শিক্ষক (কাতলাপারা পূর্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়) মহলন্দী কলোনী, মুর্শিদাবাদ তারিখঃ-২১/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- দয়াল বিশ্বাস, বয়স-৭৭, পেশা-কৃষক, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তাঃ-২৭/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- দয়ালচন্দ্র মজুমদার, বয়স-৬৫, পেশা-বিড়ি শ্রমিক, মালদা, তারিখঃ- ২০/০২/২০২৩।

সাক্ষাৎকারঃ- নয়ন তারা সরকার, বয়স- ৬৫, পেশা-গৃহিণী, তারাপুর কলোনী, মুর্শিদাবাদ, তারিখ:- ২৭/১১/২০২২:

সাক্ষাৎকারঃ- নারায়ণ হালদার, বয়স-৭৪, পেশা-দর্জি, ধূসুড়িপাড়া কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখ-২১/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- নিরঞ্জন মিত্র, বয়স-৮৬, পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, মহালন্দি কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২১/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- নির্মল সরকার, বয়স-৭৪, পেশা-কর্মহীন, তারাপুর কলোনী, মুর্শিদাবাদ তারিখ:- ২৭/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- নীলকান্ত বিশ্বাস, বয়স-৭৬, পেশা-কৃষক ও ঘরামি, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখ:- ২৭/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- প্রকাশ সরকার, বয়স-৭০, কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ১৪/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- ফ্যালানি বিশ্বাস, বয়স-৭১, পেশা- গৃহিনী, মালদা, তারিখঃ-১৫/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- বলরাম সরকার, বয়স-৭০, পেশা-কৃষক, মালদা, তারিখঃ-২৯/১০/২০২২

সাক্ষাৎকারঃ- বাসুদেব বিশ্বাস, বয়স-৬৮, পেশা-মুদি, মালদা, তারিখঃ- ২৭/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- বিনয়কৃষ্ণ বোস, 'মালদা জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক, পাকুয়াহাট, মালদা, তারিখঃ- ০৯/০৮/২০২৩

সাক্ষাৎকারঃ- ভবানী মণ্ডল, বয়স-৬৭, পেশা-কৃষক, মালদা, তারিখঃ- ২০/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- মন্মখা বালা, বয়স-৬৬, পেশা-গৃহিণী, মালদা, তারিখঃ-১৪/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- মাধব হালদার, বাস-৬৫, পেশা-জেলে, ধুসুরিপারা কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২১/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- রবীন্দ্রনাথ সরকার, বয়স-৮৩, পেশা-কৃষক ও বামকর্মী, মালদা, তারিখঃ-২০/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- রাধাশ্যাম নন্দী, বয়স-৮১, পেশা-অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, বই লেখক ও যাত্রাশিল্পী, মহলন্দী কলোনী, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২১/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- লক্ষণ সরকার, বয়স-৬৬, পেশা-কৃষক, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২৭/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- শংকর বিশ্বাস, বয়স-৬৯, পেশা-জমির মালিক, বিল কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখ:-২৯/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- শান্তি রঞ্জন সরকার, বয়স-৭০, পেশা-চাষী প্রাইভেট টিউটর সক্রিয় বাম কর্মী ছিলেন, মালদা।

সাক্ষাৎকারঃ- শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, বয়স-৭০, পেশা- কৃষক ও সক্রিয় বামকর্মী, মালদা, তারিখঃ- ২৯/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- শান্তিরঞ্জন রায়, বয়স-৭২, পেশা- কৃষক ও সক্রিয় বাম কর্মী, মালদা, তারিখঃ- ১৫/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- সঞ্জয়চরণ ধর, বয়স-৯৫, পেশা-বংশগত শাঁখা শিল্পী, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ-২৪/১১/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, বয়স-৮১ পেশা- কৃষক, মালদা, তারিখঃ-২৯/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- সুবল চন্দ্র সরকার, বয়স-৬৬, পেশা- কৃষক, মালদা।

সাক্ষাৎকারঃ- সুবোধ কুমার বিশ্বাস, বয়স, ৮১, পেশা-কৃষক, বৈষ্ণবনগর, মালদা, তারিখঃ-২০/১০/২০২২।

সাক্ষাৎকারঃ- সুষমা জর্দার, বয়স-৬৩, পেশা-গৃহিনী, তারাপুর কলোনি, মুর্শিদাবাদ, তারিখঃ- ২৭/১১/২০২২৪

ঘ) আত্মজীবনীমূলক রচনা

বাংলাঃ

দত্ত, দেবব্রত, *বিজয়গড়: একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ,* (কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ, ২০০১)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণময়, *উদ্বাস্তু,* (কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০১৩), পৃ. ৭০।

বসু, দক্ষিণারঞ্জন (সম্পাঃ), *ছেড়ে আসা গ্রাম,* (কলকাতাঃ জিজ্ঞাসা, ১৯৭৫)।

মিত্র, অশোক, *তিন কুরি দশঃ তৃতীয় খণ্ড,* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আষাঢ় ১৯৬০)।

রায়, অন্নদাশঙ্কর, *এই সময়,* (কলকাতাঃ আনন্দ, ১৯৮৯)।

রায়, অন্নদাশঙ্কর, *যুক্তবঙ্গের স্মৃতি ও মুক্তভঙ্গের স্মৃতি* (কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স অগ্রহায়ণ, ১৪২৭)।

ইংরেজিঃ

Chakrabarty, Saroj, With Dr. B. C. Roy and other Chief Ministers: A Record up to 1962, (Calcutta: Benson's, 1974).

Chowdhury, Hamidul Huq, Memoirs, (Dhaka: Associated Printers Ltd, 1989).

Guha, Dr. Biraja Sankar, *Memoir No. 1,* 1954, Studies In Social Teasions among the Refugees from Eastern Pakistan, (Dept. of Anthropology: Govt. of India, Calcutta, 1959).

ঙ) কথা সাহিত্য ও সিনেমা

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, *খোয়াবনামা।*

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *অর্জুন।*

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *পূর্ব পশ্চিম।*

ঘটক, ঋত্বিক, *কোমল গান্ধার।*

ঘটক, ঋত্বিক, *মেঘে ঢাকা তারা।*

ঘটক, ঋত্বিক, *সুবর্ণরেখা।*

ঘোষ, নিমাই, *ছিন্নমূল।*

বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে।*

বসু, প্রতিভা, *জীবনের জলছবি।*

মান্টো, সাদত হাসান, *টোবা টেক সিং।*

রায়, প্রফুল্ল, *কেয়া পাতার নৌকা।*

রায়, সত্যজিৎ, *মহানগর (১৯৬৩)।*

হোসেন, সেলিনা, *যাপিত জীবন।*

M S Sathyu, *Garm Hava (1973)*

Sahni, Bhisham, *Tamas (1988).*

Singh, Khushwant, *Train to Pakistan (1998).*

চ) সহায়ক গ্রন্থ

বাংলাঃ

আজাদ, সালাম, *হিন্দু সম্প্রদায় কেন বাংলাদেশ ত্যাগ করছো,* (কলকাতাঃ পুনশ্চ, ২০০১)।

আহমেদ, খাজিম, *পশ্চিমবাংলার বাঙালি মুসলমানঃ অন্তবিহীন সমস্যা,* (দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ উদার আকাশ, ২০২১)।

আহমেদ, খাজিম, *বাঙ্গালী মুসলমান আপন ভুবনের সন্ধানে,* (দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ উদার আকাশ, ২০২১)

কুহু, ডঃ শৈলেন্দ্রনাথ, *আমার কৃষ্ণনাথ কলেজ,* (বহরমপুর: কৃষ্ণনাথ কলেজ, ২০০৩)।

খান, শামসুজ্জমান (সম্পাঃ), *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি গ্রন্থমেলা-চাঁপাই নবাবগঞ্জ,* (বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০১৪)।

গোস্বামী, অর্জুন (সম্পাঃ), *দেশভাগ বিতর্কে দুই বাংলা,* (কলকাতাঃ খড়ি প্রকাশনী, ২০২২)।

ঘোষ, দেবযানী ও মুখার্জি, সায়ক (সম্পাঃ), *দেশভাগা অকথিত ইতিহাস,* (কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০২৩)।

ঘোষ, শংকর, *হস্তান্তর,* (কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯)।

ঘোষ, শঙ্খ, *সুপারিবনের সারি,* (কলকাতাঃ অরুণা প্রকাশনী, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯০)।

ঘোষ, সেমন্তী (সম্পাঃ), *দেশভাগঃ স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* (কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০১৮)

চক্রবর্তী, ড. সুজন (সম্পাঃ), *সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রামঃ বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত,* (কলকাতাঃ এন বি এ, ২০২২)।

চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার, *প্রান্তিক মানব,* (কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩)।

চট্টোপাধ্যায়, ড. বাসুদেব, *মুর্শিদাবাদের দ্বিজাতি তত্ত্ব ও দেশভাগের প্রভাব,* (বহরমপুর: আকাশ, ২০১৮)।

চৌধুরী, মুক্তি, *ছিন্নমূলের ছেঁড়াপাতা,* (কলকাতাঃ এবং মুশায়েরা, ২০২০)।

চ্যাটার্জী, জয়া, *দেশভাগের অর্জন: বাংলা ও ভারত, ১৯৪৭-৬৭,* আবু জাফর অনূদিত, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০২০)।

দত্ত, নীলা, *ছিন্নমূলের ডায়েরি,* (কলকাতাঃ ঋত প্রকাশন, ২০১৬)।

দাশগুপ্ত, অভিজিৎ, *বিস্থাপন ও নির্বাসন ভারতের রাষ্ট্র উদ্বাস্ত সম্পর্ক,* (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৮)।

দাশগুপ্ত, সুখরঞ্জন, *কাছের মানুষ কাজের মানুষঃ গনি খান চৌধুরী,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০২১)।

দে, অমলেন্দু, *প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ,* (কলকাতা, বর্ণপরিচয়, ১৯৯৩)।

নাত, প্রত্যয় ও সেনগুপ্ত, কৌস্তভ মনি (সম্পাঃ), *ইতিহাসের বিতর্ক, বিতর্কের ইতিহাসঃ অতীতের ভারত ওআজকের গবেষণা,* (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০২১)।

পারভেজ, আলতাফ, *যোগেন মন্ডলের বহুজনবাদ ও দেশভাগ,* (ঢাকাঃ প্রথমা প্রকাশন, ২০২২)।

পাল, বাবুল কুমার, *বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্যঃ পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবী উদ্ধাস্ত পুনর্বাসন ইতিহাস,* (কলকাতাঃ গ্রন্থমিত্র, ২০১০)।

পালিত, হরিদাস, *আদ্যের গম্ভীরাঃ বাঙ্গালার ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়,* (মালদহঃ শ্রীকৃষ্ণচরণ সরকার, মাঘ ১৩২০)।

প্রামাণিক, বিমল, *পশ্চিমবঙ্গে অশনিসংকেতঃ বাংলাদেশ থেকে হিন্দু-বিতরণ ও মুসলমান অনুপ্রবেশ,* (কলকাতাঃ এবং মুশায়ারা, ২০০৮)।

বন্দোপাধ্যায়ের, সন্দীপ, *দেশ ভাগ-দেশ ত্যাগ,* (কলকাতাঃ অনুষটুপ, ১৯৯৪)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশী থেকে পার্টিশান,* (কলকাতাঃ ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১৩), পৃ. ৫৩৪-৩৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীপ্রসন্ন, *মধ্যযুগের বাঙ্গলা,* (কলকাতাঃ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, আশ্বিন ১৩৩০)।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের, সন্দীপ, *দেশভাগ-দেশত্যাগ,* (কলকাতাঃ অনুষ্টুপ, ২০২০)।

বসু, অঞ্জন, *বাংলায় বামেরাঃ রাজপথে ও রাজ্যপার্টে, (১৯২০-২০১১),* (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০১৯)।

বসু, স্বপন ও দত্ত, হর্ষ (সম্পাঃ), *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি,* (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ২০০০)।

বাগচী, যশোধরা, *নারী ও নারীর সমস্যা,* (কলকাতাঃ অনুষ্টুপ, ২০১২)।

বাগচী, যশোধরা, *পরিযায়ী নারী ও মানবাধিকার,* (কলকাতাঃ সেতু প্রকাশনী, ২০১৪)।

বিশ্বাস, নবকৃষ্ণ, *ভারতের শরণার্থী (১৯৭১),* (উত্তর ২৪ পরগণাঃ লিপিকা-বিশ্বাস, ২০১২)।

বিশ্বাস, রাজর্ষি, *দেশভাগে বঙ্গসীমান্তঃ ভারত-পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক,* (কলকাতাঃ গাঙচিল, জানুয়ারি ২০২৩)।

বিশ্বাস, সুভাস, *দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যাঃ প্রসঙ্গ নদীয়া জেলা,* (কলকাতাঃ সোম পাবলিশিং, ২০১৬)।

বোস, বিনয়কৃষ্ণ, *মালদা জেলার উদ্বাস্তু ইতিহাস,* (পাকুয়াহাটঃ নিউ সেন প্রিন্টার্স, ২০১৮)।

মজুমদার, প্রদীপ, *১২৫ বছরের আলোকে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস,* (বহরমপুরঃ মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটি, ২০১০)

মণ্ডল, মননকুমার (সম্পাঃ), *বাংলার পার্টিশন-কথাঃ উত্তর প্রজন্মের খোঁজ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড,* (কলকাতাঃ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০২০)।

মিলন, ইমদাদুল হক, *দেশভাগের পর,* (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১৭)।

মিশ্র, ডঃ সমর কুমার, *স্বাধীনোত্তরকালে মালদহ জেলার রাজনীতি ও নির্বাচন,* (কলকাতাঃ অক্ষর প্রকাশনী, ২০২১)।

মুখোপাধ্যায়, শ্রী ফণীন্দ্রনাথ (সম্পাঃ), *ভারতবর্ষ,* অষ্টত্রিংশ বর্ষ-দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম সংখ্যা, পৌষ-১৩৫৭, জ্যৈষ্ঠ-১৩৫৮।

মোঃ শামসুদ্দীন, *ইতিহাসের আলোকে জঙ্গিপুর,* (বহরমপুরঃ শিল্পনগরী প্রকাশনী, ২০১৩)।

রহমান, মজিবুর, *মুর্শিদাবাদঃ সংসদীয় রাজনীতি,* (১৯৫২-২০১৯), (বহরমপুরঃ শিল্পনগরী, ২০১৯)।

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব,* (কলকাতাঃ লেখক-সমবায়-সমিতি, বৈশাখ ১৩৫৯)।

রায়, রনজিৎ, *ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গঃ কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন,* (কলকাতাঃ শঙ্খ প্রকাশন, ১৯৭৭)।

রায়, রাহুল (সম্পাঃ), *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গঃ দেশ বদলের স্মৃতি,* (কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০১৬)।

রায়চৌধুরী, লাডলীমোহন, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ,* (কলকাতাঃ দে'জ, ২০০৪)।

সমাদ্দার, বিমান, *শহরতলীর উদ্বাস্তু কলোনিঃ আত্মপরিচয় নির্মাণে আখ্যান,* (১৯৪৭-১৯৭৭), (কলকাতাঃ অ্যালফাবেট বুকস্, ২০২৩)।

সরকার, দ্বিজেন্দ্রনাথ, *লড়াই-সংগ্রামে জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ,* (বহরমপুরঃ শিল্পনগরী, ২০২২)।

সিকদার, অশ্রুকুমার, *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য,* (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮)।

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, *সেরা ৫০টি গল্প,* (কলকাতাঃ দে'স পাবলিশিং, ২০১৬)।

সেন, শ্রীসুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* (বর্ধমানঃ সাহিত্যসভা, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৫৭)।

সেনগুপ্ত, নীলেন্দু, *দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানব,* (কলকাতাঃ একুশ শতক, ২০১৯)।

সোম, সুস্মিতা, *মালদা জেলার ইতিহাস,* (মালদাঃ দিপালী পাবলিশার্স, ২০০২)।

হোসেন, মোল্লা আমীর, *হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ (১৯৪৭-৭১). খুলনা,* (ঢাকাঃ সুবর্ণ, ২০১৮)।

ইংরেজিঃ

Amin, Shahid, *Event, Metaphor, Memory: Chauri Chaura, 1922-1992,* (Berkeley: University of California Press, 1995).

Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,* (London: Verso, 1991).

Bagchi, Jasodhara and Dasgupta, Subhoranjan (ed.), *The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India,* (Kolkata: Stree, 2003).

Banerjee, Dilip, *Election Recorders: An Analytical Reference*, (Kolkata: Star Publishing House, 2009).

Barman, Rup Kumer, *Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal,* (New Delhi: Abhijeet Publications, 2012).

Bhalla, Alok (ed.), Stories About the Partition of India, vol. 1, (New Delhi: HarperCollins, 1994).

Bhalla, Alok, *Partition Dialogues: Memories of a Lost Home,* (New Delhi: Oxford University Press, 2006).

Bhatia, Nandi and Roy, Anjali (eds.), *Partitioned Lives: Narratives de Home, Displacement and Resettlement,* (New Delhi: Pearson and Longman, 2008).

Bose, Pradip Kumar (ed.), *Refugees in West Bengal*, (Calcutta: Calcutta Research Group, 1999).

Brubaker, Rogers, *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

Brundage, Anthony, *Going to the Sources: A Guide to Historical Research and Writing,* (Hoboken NJ: Wiley Blackwell, 2018).

Butalia, Urvashi, *The Other Side of Silence Voices from the Partition of India,* (Durham, NC: Duke University Press, 1998).

Chakrabarty, Bidyut, *The Partition of Bengal and Assam, 1932-1947*, (London and New York: Routledge Curzon, 2004).

Chakraborty, Paulomi, *The Refugee Woman: Partition of Bengal, Gender, and the Political,* (New Delhi: Oxford University Press, 2018).

Chakravartty, Gargi, *Coming out of Partition: Refugee Women of Bengal*, (New Delhi: Bluejay Books, 2005).

Chatterjee, Partha, *The National and its Fragments: Colonial and Post-colonial Histories*, (New Jersey: Princeton University Press, 1993).

Chatterjee, Suniti Kumar, *The Origin and Development of the Bengali Language, Vol-1,* (London: George Allen and Unwin, 1923).

Chatterji, Joya, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-47*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 1994).

Chatterji, Joya, *Partition's Legacies,* (Delhi: Suny Press, 2021).

Chatterji, Joya, *The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-67,* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2007).

Das, Pallab and Bhattacharya, Arijit: *Divided Bengal: Impact of Partition (1947),* (Burdwan: Avenel Press, 2019).

Das, Veena, *Notional Honour and Practical Kinship: Of Unwanted Women and Children*, (Oxford: Oxford University Press, 1995).

De, Aniket, *The Boundary of Laughter: Popular Performances across Borders in South Asia,* (Oxford University Press, 2023).

Fraser, Bashabi (ed.), *Bengal Partition Stories: An Unclosed Chapter,* (London, Anthem Press, 2008).

Ghoshal, Anindita, *Refugees, Borders and Identities: Right and Habits in East Northeast India*, (London & New York: Routledge, 2021).

Gordon, Leonard A., *Brothers Against the Raj: A Biography of Indian Nationalists Sarat and Subhas Chandra Bose,* (New Delhi: Viking Penguin, 1990).

Harun-or-Rashid, *The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947,* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1987).

Hasan, Mushirul (ed.), *Inventing Boundaries: Gender, Politics and the Partition of India,* (Delhi: Oxford University Press, 2000).

Hasan, Mushirul, *Introduction to India's Partition: Process, Strategy, Mobilization*, (Delhi: Oxford University Press, 1994).

Hobsbawm, Eric, *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991,* (London: Abacus, 1995).

Hodson, H. V., *The Great Divine: Britain-India-Pakista*, (London: Hutchinson & Co, 1969).

Jalal, Ayesha, *The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).

Kaur, Ravinder, *Since 1947: Partion Narratives Among Punjabi Migrants of Delhi,* (New Delhi: Oxford University Press, 2007).

Keller, Stephen L, *Uprooting and Social Change: The Role of Refugees in Development.* (New Delhi: Manohar Book Service, 1975).

Khari, Yasmin, *The Great Partition: The Making of India and Pakistan,* (London: Yale University Press, 2007).

Mahajan, Sucheta, *Independence and Partition: The Erosion of Colonial Power in India,* (New Delhi: Sage, 2000).

Majumder, R. C., *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century,* (Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1960).

Mandal, Monika, *Settling the Unsettled: A Study of Partition Refugees in West Bengal,* (New Delhi: Manohar Publishers and Distributors).

Memon, Ritu and Bhasin, Kamala, *Borders and Boundaries: Women in India's Partition,* (New Delhi: Kali for women, 1998).

Momen, Humaira, *Muslim Politics in Bengal: A Study of the Krishak Praja Party and the Elections of 1937,* (Dacca: Sunny House, 1972).

Nayar, Kuldip, *Scoopl: Inside Stories from the Partition to the Present,* (New Delhi: Harper Collins, 2006).

Oberoi, Pia, *Exile and Belonging: Refugees and State Policy in South Asia,* (New Delhi: Oxford, 2006).

Palit, Dr. Chittabrata and Roy, Dr. Ujjal, *Bengal Before and After the Partition (1947): The Changing Profile of a Province,* (Kolkata: Corpus Research Institute, 2020).

Pandey, Gyanendra, *Remembering Partition,* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

Prakashi, Kranti B., *The Uprooted: A Sociological Study of the Refugees of West Bengal,* (Calcutta: Editions India, 1971).

Ray, Ranjit, *The Agony of West Bengal,* (Calcutta: New Age Publishers, 1971).

Roy, Anjali Gera and Bhatia, Nandi (ed.), *Partition Lives: Narrative of Home, Displacement and Resettlement,* (New Delhi: Dorling Kindersley, 2008).

Saksena, R N, *Refugee: A Study in Changing Attitudes,* (Bombay: Asian Publishing House, 1961).

Samaddar, Ranabir (ed.), *Reflections on Partition in the East,* (New Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1997).

Samaddar, Ranabir, *The Marginal Nation: Transborder Migration from Bangladesh to West Bengal,* (New Delhi: Sage Publications, 1999).

Sarkar, Ashim Kumar, *Changing Profile of A Bengal District Malda, 1932-1953,* (Kolkata: Classique Books, 2008.

Sarkar, Rupan, *English Bazar in Colonial Bengal: An Urban History of Malda 1813–1947,* (New Delhi: Aditya Prakashan, 2021).

Schendel, Willem van, *The Bengal Borderland: Beyond State and Nation in South Asia,* (London: Anthem Press, 2004).

Sen, Shila, *Muslim Politics in Bengal, 1937-47*, (New Delhi: Impex India, 1976).

Sen, Uditi, *Citizen Refugee: Forging the Indian Nation after Partition,* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

Talbot, lan and Singh, Gurharpal (ed.), *Region and Partition: Bengal Punjab and Partition of the Subcontinent,* (Oxford: Oxford University Press, 1999).

Tudor, Maya, *The Promise of Power: The Origins of Democracy in India and Autocracy in Pakistan,* (New York: Cambridge University Press, 2013).

Yong, Tan Tai and Kudaisya, Gyanesh, *The Aftermath of Partition in South Asia,* (London and New York: Routledge, 2000).

Zamindar, Vazira Fazila Yacoobali, *The Long Partition and the Making of Modern South Asia,* (New York: Columbia University Press, 2007).

ছ) প্রবন্ধ

বাংলাঃ

গুপ্ত, সৌম্যেন্দকুমার, "শহর বহরমপুর কালগত বিবর্তনের পথে একটি সামাজিক রূপরেখা", ড: বিষাণ কুমার গুপ্ত (সম্পাঃ), *ইতিহাসের আলোকে বহরমপুর পৌরসভা: ১৮৭৬-২০০৭,* (বহরমপুরঃ বহরমপুর পৌরসভা, ২০০৭)।

ঘোষ, ঋষি, "এপার-ওপারের গম্ভীরাঃ বিস্মৃতির অতলে কিংবদন্তি গম্ভীরা শিল্পী সুফি মাস্টার", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২)।

চন্দ্র, অরূপ, মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহানব, বিষয়ঃ মালদা জেলা সেকাল ও একাল,* (বহরমপুরঃ অষ্টম বর্ষ-২০১৯)।

দত্ত, সৌরভ, 'সিনেমাওয়ালা ঋত্বিক ঘটক', মুক্তধারা, *গণশক্তি,* ৮-ঈ নভেম্বর ২০২৩।

দাশগুপ্ত, সুতপা, 'স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্ত সমস্যা', *ইতিহাস অনুসন্ধান-১১,* ২০০৫, পঃ বঃ ইতিহাস সংসদ।

দাস, রবীন্দ্রনাথ, "মনীষ ঘটকঃ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মুর্শিদাবাদের অন্যন ব্যক্তিত্ব-দ্বিতীয় খন্ড, সপ্তম বর্ষ,* (বহরমপুরঃ মহারুনব প্রকাশনী, ২০১৮)।

দাস, রাহুলরঞ্জন, "আমার জেঠু মিহির দাস", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২)।

দে, বাপী, 'সমকালীন সংবাদপত্রে বীক্ষনে ১৯৪৭ খ্রীঃ থেকে ১৯৫২ খ্রীঃ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্ত আগমনের কারন বিশ্লেষণ', *ইতিহাস অনুসন্ধান-৪,* ১৯৮৯, পঃ বঃ ইতিহাস সংসদ।

বসু, রবি, 'মালদহের গম্ভীরাঃ উত্তরাধিকার ও বিবর্তন', *মালদাঃ উত্তাল কলরোল,* নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা, ২০০৯।

বিশ্বাস, সুভাষ, 'দেশভাগ ও দেশত্যাগ: পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের আগমন পর্যায়', রাখালচন্দ্র নাথ (সম্পাঃ), *উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা,* (কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২)।

ভট্টাচার্য, অপর্ণাকিঙ্কর, "শহর বহরমপুরের ক্রমবিকাশ-একটি স্মৃতিচারণ", বিধানকুমার গুপ্তা *(সম্পা), ইতিহাসের আলোকে বহরমপুর পৌরসভা,* (বহরমপুরঃ বহরমপুর পৌরসভা), ২০০৭।

ভাস্কর, রমাপ্রসাদ, "বিপর্যস্ত উদ্বাস্ত বৃত্তান্ত ও মুর্শিদাবাদ" মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহানব, বিষয়ঃ দেশভাগের যন্ত্রনা,* (বহরমপুরঃ দশম বর্ষ-২০২১)।

মজুমদার, কল্লোল, "ইলা মিত্রঃ মালদা থেকে বৃহত্তর সংগ্রামে", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২)।

মজুমদার, রত্না, "আদর্শ শিক্ষক কৃষ্ণবন্ধু গোস্বামী", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্যা,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২)।

মন্ডল, জগদীশ, "মালদহের বস্ত্র শিল্পের গৌরব, চরম সংকট এবং বাঁচার উপায়", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহানব, বিষয়ঃ মালদা জেলা সেকাল ও একাল,* (বহরমপুরঃ অষ্টম বর্ষ-২০১৯)।

মন্ডল, দীননাথ, "মহাশ্বেতা দেবী", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মুর্শিদাবাদের অনন্য ব্যক্তিত্ব- দ্বিতীয় খন্ড, সপ্তম বর্ষ,* (বহরমপুরঃ মহার্নব প্রকাশনী, ২০১৮)।

রায়, পুষ্পজিৎ, "মালদা জেলার কবিয়াল" মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহানব, বিষয়ঃ মালদা জেলা সেকাল ও একাল,* (বহরমপুরঃ অষ্টম বর্ষ-২০১৯)।

রায়, পুষ্পজিৎ, "গল্পের কথা অল্প", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহানব, বিষয়ঃ মালদা জেলা- সেকাল ও একাল,* (বহরমঞ্জুর। অষ্টম বর্ষ-২০১৯)।

রায়, বিকাশ, "মালদহের মহিলা কবিদের কবিতায় নারীবীক্ষণ", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহানব, বিষয়ঃ মালদা জেলা- সেকাল ও একাল,* (বহরমপুরঃ অষ্টম বর্ষ-২০১৯)।

রায়, রীতা, "স্বাধীনতা ও দেশভাগঃ মালদা জেলায় তার প্রতিফলন", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মহার্নব, বিষয়ঃ দেশভাগের যন্ত্রনা,* (বহরমপুরঃ দশম বর্ষ-২০২১)।

রায়, স্বপ্না, "সৃষ্টির অন্তরালে", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২)।

সমাসদার, বিমান, 'পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুদের আপাত: সংহতিঃ বাস্তব না', *ইতিহাস অনুসন্ধান-১৭,* ২০০৩, পঃ বঃ ইতিহাস সংসদ।

সাহা, নীলিমা, "গাছের বৃক্ষ হওয়া (বিক্রম চক্রবর্তী)", মৌসুমী হালদার (সম্পাঃ), *মুর্শিদাবাদের অনন্য ব্যক্তিত্ব- দ্বিতীয় খন্ড, সপ্তম বর্ষ,* (বহরমপুরঃ মহানব প্রকাশনী, ২০১৮)।

সেনগুপ্ত, অভিজ্ঞান, "দেশভাগ, ১৮ আগস্ট, মালদাঃ একটি মিথের উৎস সন্ধানে", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২২, বিষয়ঃ প্রসঙ্গ মালদা ও অন্যান্য,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২২)

সেনগুপ্ত, অভিজ্ঞান, "মালদার হস্তশিল্প-দুই চারটি কথা", রেশমী মজুমদার (সম্পাঃ), *গৌড় বার্তা-২০২৩, ইতিহাস না ইতিহাসঃ মালদা এবং বিষয়ান্তর,* (মালদাঃ উৎপল মজুমদার, ২০২৩)।

সেনগুপ্ত, নীলেনদু, 'দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাঃ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার প্রেক্ষিতে', *ইতিহাস অনুসন্ধান-২৩,* ২০০৯, পঃ বঃ ইতিহাস সংসদ।

হারুন, বদরুদ্দোজা, 'সম্প্রীতির অগ্রদূত সৈয়দ বদরুদ্দোজা, বিপ্লব বিশ্বাস *(সম্পাঃ), অনন্য জননায়ক সৈয়দ বদরুদ্দোজা,* (বহরমপুরা শিল্পনগরী, ২০২১)।

হোসেন, আকবর, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যেভাবে গঠন করা হয়েছিল রাজাকার বাহিনী', *বিবিসি বাংলা (অনলাইন),* ১৭-ই ডিসেম্বর ২০১৯।

ইংরেজিঃ

Bharadwaj, Prashant, and Others, 'The Big March: Migratory Flows after the Partition of India', *Economic and Political Weekly* (August 30, 2008).

Butalia, Urvashi, "Community, State and Gender onr Women's Agency during Partition" *Economic and Political Weekly*, April 24, 1993, Vol. 28, No.17.

Chakrabarty, Bidyut, 'The 1947 United Bengal Movement: A Thesis Without Synthesis', The *Indian Economic and Social History Review* 30 (4), 1993.

Chakrabarty, Dipesh, 'Remembered villages: Representations of Hindu-Bengali memories in the aftermath of the partition', *Economic and Political Weekly*, 31(32), 10 August 1996.

Chatterjee, Nilanjana, 'The East Bengal Refugees-A Lesson in Survival', Sukanta Chaudhuri (ed.), *Calcutta, The Living City, Vol-II*, 1990).

Chatterji, Joya, 'The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Lartdscape, 1947-1952', *Modern Asian Studies,* 33, (1), 1999.

Gilmartin, David, 'Partition, Pakistan, and South Asian History: In Search of a Narrative,' *Journal of Asian Studies, 57.* no. 4, Nov 1998.

Greenberg, J. D., 'Generations of Memory: Remembering Partition in India/Pakistan and Israel/Palestine, *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 25.1, 2005.

Hans, Asha, 'Refugee Women and Children Need for Protection and Care', Ranabir Samaddar (ed.), *Refugees and the State Practices of Asylum and Care in India, 1947-2000*, (New Delhi: Sage Publication, 2003).

Kaur, Ravinder, 'Distinctive Citizenship: Refugees, Subjects and Post-colonial State in India's Partition', *Cultural and Social History*, 6(4), 2009).

Kudaisya, Gyanesh, 'Divided Landscapes, Fragmented Identities: East Bengal Refugees and Their Revolution in India 1947-79', *Singapore Journal of Tropical Geography*, Vol. 17, No. 1, 1996.

Malkki, Liisa H., 'Refugees and Exile: From Refugee Studies to the National Order of Things', *Annual Review of Anthropology*, no. 24, 1995.

Menon, Ritu and Bhasin, Kamla, 'Recovery, Rupture, Resistance: Indian State and Abduction of Women during Partition', *Economic and Political Weekly,* Apr. 24, 1993.

Nakatani, Tetsuya, 'Away from Home: The Movement and Settlement of Refugees from East Pakistan in West Bengal, India', *Journal of the Japanese Association for South Asian Studies*-12, 2000.

Panday, Gyanendra, 'Partition and Independence in Delhi, 1947-48', *Economic and Political Weekly, 1997.*

Pandey, Gyanendra, 'Memory, History, and the Question of Violence: Reflections on the Reconstruction of Partition', (*Calcutta: Centre For Studies in Social Sciences*).

Portelli, Alessandro, 'The Time of My Life: Functions of Time in Oral History', *International Journal of Oral History,* vol. 2, no. 3, November 1981.

Rahman, M. M., and Van Schendel, 'I am not a Mode refugee, Rethinking Partition Migration', *Modern Asian Studies-37*, 3, 2003.

Sen. Uditi, 'The Myths Refugees Live By: Memory and history in the making of Bengali refugee identity', *Modern Asian Studies*, 48, 1 (2014).

Sengupta, Anwesha, 'Unthreading Partition: The Politics of Jute Sharing between Two Bengals', *Economic and Political Weekly*, Vol. 53, Issue No. 4, 2018.

Weber, Rachel, 'Re-(Creating) the Home: Women's Role in the Development of Refugee Colonies in South Calcutta', Jasodhara Bagchi, Subhoranjan Dasgupta and Subashri Ghosh (eds), *The Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India,* (Kolkata: Stree, 2009).

জ) অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ

Chakravarty, Pallavi, *Post partition refugee rehabilitation in India with special reference to Bengal 1947 to 71,* Thesis Submitted for the Degree of Doctor Philosophy in the Department of History at University of Delhi in 2011.

Sarkar, Ashim Kumar, *Social, Economic and Political Transition of a Bengal District: Malda 1876-1953,* Thesis Submitted for the Degree of Doctor Philosophy in the Department of History at University of North Bengal in 2010.

Sarkar, Dipak Kumar, *Refugee and Migration Problems in West Bengal: Society, Economy and Polity (1947 2000),* Thesis Submitted for the Degree of Doctor Philosophy in the Department of History at University of North Bengal in 2016.

রাজেশ বিশ্বাস, *পশ্চিমবঙ্গে তফশিলিজাতিভুক্ত উদ্বাস্তুদের সমস্যা ও সংগ্রাম (১৯৪৭-১৯৭১),* পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ, ২০১৭, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১০৯।